ISBN 81-7215-213-2

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত ।

আমার স্বামী ও বন্ধু (অদিতিকুমার বসু)-কে

সূচীপত্র

বেহুলার ভেলা

দীর্ঘ পনের বছর পর এক বিখ্যাত, পেশাদার, রঙ্গমঞ্চে কৃতজ্ঞ মক্কেলের নির্বন্ধাতিশয্যে থিয়েটার দেখতে গিয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে সংহিতা দত্তগুপ্তর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। যাত্রা-থিয়েটার-গানের আসর ইত্যাদি সাংস্কৃতিক চিত্তবিনোদনের অবসর বা সুযোগ কোনটাই আমার আজকাল আর হয়ে ওঠে না। প্রত্যেকটি অনুপল বিপল ব্রীফ দিয়ে ঠাসা। কারণ শুধু অন্নচিন্তা নয়, অর্থলালসাকেও পুরোপুরি দায়ী করা যায় না। আসলে, সব দায়িত্বশীল বৃত্তিরই আমিষাশী উদ্ভিদের মতো কতকগুলো আঠাল আকর্ষ থাকে যাদের সাহায্যে বৃত্তিজীবীকে ধীরে ধীরে তারা নিজস্ব পরিপাক যন্ত্রের কেন্দ্রে টেনে নেয়। উদ্ধারের আশা কম। কোর্ট অর্থাৎ মক্কেল অর্থাৎ কেস অর্থাৎ সাফল্য অর্থাৎ আরও মক্কেল—কর্মের চক্রবৎ আবর্তন এই ছাঁচে চলতে থাকে। কাজেই নেহাৎ ভালো ছবি-টবি এলে একে-ওকে-তাকে ধরে টিকিটের ব্যবস্থা যদি বা করে উঠতে পারি, থিয়েটার দেখা বহুকাল ছেড়ে দিয়েছি। তাই ক্লায়েন্ট ভদ্রলোক যখন অযাচিতভাবে সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে একেবারে রথ এবং সারথি নিয়ে উপস্থিত হলেন, না করিনি। থিয়েটার তো এককালে আমারও মগজে ঘুরঘুরে পোকাব মতো ঘুরে বেড়িয়েছে।

ইদানীং যে সমস্ত পেশাদার নাটক চারদিকে হচ্ছে তাদের মধ্যে এটাই নাকি শ্রেষ্ঠ। কলকাতা রঙ্গমঞ্চের সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। নবযৌবন হলে রেকর্ড করা বা রেকর্ড ভাঙা উৎকর্ষের মাপকাঠি নয় জাতীয় ক্লিশে নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করতাম। কিন্তু এখন বহুজননন্দিত বস্তু মাত্রই বৈজ্ঞানিক কৌতূহল জাগায়। কী সেই সংজ্ঞাতীত রহস্যময় উপাদান যা জনগণেশ নামক অস্থিরমতি পাঁচমিশালি ব্যাপারটিকে দীর্ঘমেয়াদী সম্মোহনে রাখবার ক্ষমতা ধরে!

বিদেশী গাড়ির বিলাস-আসনে সাদরে বসিয়ে কিং সাইজ বিদেশী সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে মিঃ মান্না অর্থাৎ আমার মক্কেলটি বললেন—"এ আপনার সোকল্ড এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটারের আঁতলামো নয়, খাঁটি বনেদি জিনিস। শিশির ভাদুড়ি ছবি বিশ্বেস ঘরানার। সহস্র রজনী তো কবেই পার হয়েছে। আরও কত রজনী রান করবে তার ঠিক নেই। দুর্দান্ত অভিনয় শুনছি।"

থিয়েটার হলের সামনে পৌঁছে জনপ্রিয়তার লক্ষণ দৃষ্ট হল। প্রাগৈতিহাসিক মেরুদণ্ডী প্রাণীর কশেরুকা-শ্রেণীর মতো গাড়ির সারি। হাউস-ফুল বোর্ড টাঙানো হয়ে গেছে। অ্যাডভান্স বুকিং কাউন্টারে দীর্ঘ লাইন। টিকিট ব্ল্যাক হচ্ছে। দেয়ালের গায়ে অতিকায় প্রাচীর চিত্র। তবে দামী নামের প্রধান কুশীলবদের নয়, এক ক্যাবারে নর্তকীর। খুব কসরতের ছবি। মুখের ডিটেল বাদ দিয়ে শুধু অবয়বহীন, লোভনীয় লাস্য-ভঙ্গি। মিস

শর্বরী। তৎক্ষণাৎ সহস্র রজনী, শিশির ভাদুড়ি ঘরানা, দুর্দান্ত অভিনয় এই সমস্ত সম্প্রসারিত ভাবের সারমর্ম নির্ভুল উপলব্ধ হল। মনে মনে খুব এক চোট হেসে নিয়ে সামনের সারিতে মিঃ মান্নার মেদলগ্ন হয়ে বসা গেল। আসলে আইনের আড়াই চালে ভদ্রলোককে অনিবার্য ব্যবসায়িক ভরাডুবি থেকে বাঁচানো গেছে, ভবিষ্যতের একটা পাকাপাকি বন্দোবস্তের ভরসাও করছেন, তাই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ভদ্রলোক রৌপ্য রেকাবিতে সোনালি তবক মোড়া যৌন উত্তেজনার নির্দোষ সুড়সুড়ি যখন-তখন উপহার দিতে চাইছেন। বিচক্ষণ লোক। কোন ক্ষেত্রে কোথায় থামতে হয় জানেন। শুধু ফি-তে কি আর এসব কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ হয় ?

কাহিনীটাই একটা হোটেল নিয়ে। ক্যাবারে-পর্ব প্রায় সমস্ত নাটক জুড়ে। তবে এ নটী নায়িকা, উপনায়িকা এমন কি ভ্যাম্পও নয়, এর কাজ শুধু কারুকাজ। আবহসংগীতের মতো আবহনৃত্য। পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে মৌলিক এবং সাহসী। সর্বোপরি, মেয়েটির ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিক্স অবাক করবার মতো। একেবারে মন্দির গাত্র থেকে কেটে তুলে আনা। ওই সাইজের ক্ষীণ কটিদেশ যে কি কায়দায় দু প্রান্তের চমকপ্রদ পৃথুলত্ব ব্যালান্স করে রেখেছে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। এ রমণীর স্রষ্টাকে নির্ঘাৎ ফিজিক্সের অঙ্ক কষতে হয়েছে। মিঃ মান্নাও ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন, সংক্ষেপে বললেন—"ফাটাফাটি।" আড়চোখে দেখলুম, নীচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। তবে অভিনয় সম্পর্কে উনি খুব একটা অতিশয়োক্তি করেননি। কাহিনী-বিন্যাস, সংলাপ, অভিনয়, আলোকসম্পাত এবং আধুনিক মঞ্চের টেকনিক্যাল স্টান্ট সহযোগে সামগ্রিক যোগফল প্রশংসনীয়। পাকা হাতের কাজ। মঞ্চে যান্ত্রিক কলাকৌশল প্রয়োগকে যাঁরা অনাটকীয় মনে করেন এবং অভিনয় শিল্পকে পূর্ণ সুযোগ দেবার জন্য মঞ্চকে সেক্সপীয়রীয় যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান যখন 'অরণ্য' লেখা নোটিশ ঝুলিয়েই দৃশ্য-পরিকল্পনার দায় চুকিয়ে দেওয়া হত আমি তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারি না। ইনটেলেকচ্যুয়ালরা যা-ই-ই বলুন আমার ভালো লাগল।

শেষ অঙ্কের আগে যবনিকাপাত হয়েছে। মিঃ মান্না আমার হাতে ঠাণ্ডা পানীয়ের বোতল দ্বিতীয় দফা ধরিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে অদৃশ্য হয়েছেন এমন সময় জনৈক মঞ্চকর্মী আমার হাতে একটা চিরকুট দিয়ে গেল। সাজঘরের মধ্যে থেকে কেউ আমাকে সমাপ্তির পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যেতে বলছেন। সনির্বন্ধ অনুরোধ। যদি একলা এসে না থাকি সঙ্গী-টি অথবা-দের বিদায় করে যেন অবশ্যই এই কর্মীর সঙ্গে ভেতরে যাই।

নাটক শেষ হলে মিঃ মান্নাকে ব্যাপারটা খুলে বললাম। উনি বললেন—"হুম। নাটকের মধ্যে নাটক। ডাকছে যখন, যাবেন বৈকি ! তা কিছু গেস করতে পারলেন না কি লেডিস না জেন্টস ?" আমি হেসে বললাম—"না।"

"কৌতূহল হচ্ছে কিন্তু স্যার যাই বলুন, গাড়ি রেখে যাচ্ছি, নইলে ফেরবার সময় আপনি বিপদে পড়বেন।"

"শোফারকে বলে যাচ্ছি, যখন যেখানে যেতে চান পৌঁছে দেবে।" বাঁ চোখটা সামান্য টিপলেন মান্না, "আমি একটা ট্যাকসি ধরে চলে যাচ্ছি।" প্রচুর আপত্তিতেও ফল হল না। মিঃ মান্না আমাকে বাধিত করবেনই।

আইনজীবীর বৃত্তিতে মন্দ দিন কাটল না। এখন কৌতূহল উদগ্রতার স্ফুটনাঙ্ক স্পর্শ করে না। মানসিক ভারসাম্য বজায় রেখে চলবার শিক্ষা আরও কয়েকটি স্বাধীন বৃত্তির

মতো এ-বৃত্তিরও অন্যতম শর্ত। খেলার মধ্যে যে কোন রকম আবেগকে প্রশ্রয় দিলে ভরাডুবির শঙ্কা জেনে স্থির মস্তিষ্কে খেলা শুরু এবং শেষ করতে হয়। কিন্তু যবনিকার অন্তরালে সাজঘর কমপ্লেক্সের একটি একান্ত উইং-এ যখন পৃথিবীতে এতো ব্যক্তি থাকতে সংহিতা দত্তগুপ্তর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হল তখন বিস্মিত হলাম বললে কমিয়ে বলা হবে। হতভম্ব হয়ে গেলাম।

সযত্নে মেক-আপ তুলে ফেলেছে। ক্রিমমাখা তেলতেলে মুখ। খোলা চুল। গেরুয়া রঙের শাড়ি আর লাল ব্লাউজ। সংহিতা আমায় দেখে উঠে এলো। কপালে সিঁদুরের তিলক আর হাতে একটা ত্রিশূল ধরিয়ে দিলে উপন্যাসে পড়া সুন্দরী ভৈরবীর বাস্তব সংস্করণ মনে হতে পারত। বিশাল বিশাল চোখ মেলে সত্যিকারের অবাক দৃষ্টিতে দারুভূত আমার দিকে তাকিয়ে সংহিতা বলল—"সার, আপনি এখানে ?"

সামান্য রাগ হল। এটা শুঁড়িখানা না বেশ্যালয় ? যে আমাকে এখানে দেখে এমন বড় বড় চোখ করবে সংহিতা ! পরক্ষণেই অবশ্য বুঝলাম এখানে উপস্থিত থাকাটা গর্হিত এমন ইঙ্গিত করে আমাকে লজ্জা দিতে বেচারা চাইছে না। বহুদিন পর দেখা হলে পরিচিতজনকে তো আমরা প্রথম প্রশ্ন এই-ই করে থাকি ! তুমি এখানে ? কাজেই ইংরেজি হাউ ডু য়ু ডু-র মতো ওর প্রশ্নটা ওকে ফিরিয়ে দিয়েই আমি জবাব দিই। উত্তরের অপেক্ষা করছিলাম না। প্রশ্নটা নেহাৎ করার জন্যই করা। কারণ এতক্ষণে আমি বুঝেই গেছি নাটকের আবহরচনাকারী সেই কারুকুশলিনী ক্যাবারে নর্তকীটি সংহিতাই। বুঝেছি এবং বুঝে মর্মাহত হয়েছি।

সংহিতা বলল—"কফি বলি ?" মান্নাসাহেবকে বাধিত করতে দুবার চা দুবার ঠাণ্ডা পানীয় হয়েছে, আবার কফি ? সামাজিকতা দেখছি আজ আমার স্বাস্থ্য শিকার না করেই ছাড়বে না। কিন্তু সামনে কোনও গরম পানীয় না থাকলে আলাপ জমা তো দূরের কথা। আরম্ভই যে হতে চায় না ! অগত্যা বললাম—"বলো।"

"আপনার কি খবর সার ?"

"ভালো।"

"বৌদি আছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"ছেলে-মেয়ে ?"

"হ্যাঁ।"

"কজন ?"

"এক।"

"প্রোফেশন চেঞ্জ করলেন যে ?"

"এমনি।"

"ভালো লাগছে ?"

"হ্যাঁ।"

"আমায় কিচ্ছু জিজ্ঞেস করবেন না ?" অবশেষে সংহিতা হতাশ গলায় বলল—"আমায় কি ঘেন্না করছেন, সার ?"

"না।"

"ঘেন্না করবার মতো কিছু কি আমি করেছি ?" সংহিতা কারণ ছাড়াই উত্তপ্ত—"সকলেই তো কিছু না কিছু বিক্রি করে। আপনারা বিদ্যা বিক্রি করেন না ? বুদ্ধি

বিক্রি করেন না ? ঈশ্বর যদি আমাকে শো বিজনেসের মূলধন ছাড়া আর কিছু না দিয়ে থাকেন তাই দিয়েই তো সম্মানের অন্ন আমায় যোগাড় করতে হবে ?"

সংহিতা তার পেশার সপক্ষে দীর্ঘ বক্তৃতা ভাঙা ভাঙা বাক্যে দিতে থাকল যেমন করে একদিন ও যুক্তি জালে ওথেলোর মহত্ত্ব ধূলিসাৎ করত, দ্বিতীয় এডোয়ার্ডে রাণী ইসাবেলার সমস্ত দুষ্কৃতি পরিস্থিতির বিচারে ক্ষমার যোগ্য বলে ঘোষণা করত। অবিকল সেই ভঙ্গিতে। কিন্তু আমি তখন বহুদূর মনস্ক। স্মৃতি ট্রেকিং করছে আরোহ, অবরোহ, হিমবাহ সঙ্কুল অতীতবর্ষ্মে, সেই সময়ে যখন আদর্শের জন্য মানবিক ক্ষুধা, সৃজনের রাসায়নিক তাগিদ, দিবা রাত্রের জাগর স্বপ্ন প্রায়শই ঘনীভূত হয় নারীবিগ্রহে। যখন অন্বিষ্ট ছিল সংহিতা।

হ্যাঁ, সংহিতা আমার ছাত্রীই ছিল। উজ্জ্বল ছাত্রী। উজ্জ্বল বুদ্ধিতে। উজ্জ্বল ব্যবহারে। আর আকৃতি ? এখন যে কোনারকের দেবনর্তকী, খাজুরাহোর যক্ষিণী তখন সে তার নবীন বয়সে অধ্যাপকের নবীন চোখে কি ছিল ? অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি, ক্লাসে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে সংহিতা সম্মোহন চৌম্বক-স্পর্শে আমায় গ্রাস করত, আমার সকল গান তখন শুধু তাকেই লক্ষ্য করে, আবিষ্টের মতো শেষ করতাম বক্তৃতা, স্বপ্নচালিতের মতো স্টাফরুমে ফিরতাম। হাইড্রোজেন পরমাণুর একমেব ইলেকট্রনের মতো সংহিতা নিউক্লিয়াসের চারদিকে অমোঘ আকর্ষণে পরিক্রমা করত মন। আমার জীবনের সবচেয়ে গোপন, সবচেয়ে সোচ্চার সেই সংহিতা যুগ। গোপন, কারণ স্পর্শ ভীরু, মর্যাদাসচেতন অধ্যাপক ঘুণাক্ষরেও এ কথা কারো কাছে হাবে-ভাবে, বাক্যে-ব্যবহারে প্রকাশ করেনি, সোচ্চার কারণ নিজের কাছে ওই আকর্ষণের চেয়ে স্পষ্ট এবং জোরালো তার আর কিচ্ছু ছিল না। এই সব অনুভূতির কথা স্বীকার করতে ত্রাস হয় যখন বুঝি হিসেবী জজিয়তির পুরনো অধ্যায়ের ব্যক্তিগত ছেঁড়া পাতা কতো অর্থহীন দেখায়, কিন্তু যতই ওরা এসব দিয়ে মুদীর দোকানের মুড়ির ঠোঙা বানাক, এই ছেঁড়া পাতাই যে আমাদের সাধারণ জীবনের অসাধারণ ছিন্নপত্র !

যাক, গোপন করার শত চেষ্টাও কিন্তু মহিলাদের প্রতিভার কাছে বিফল হয়ে যেতে বাধ্য। বিফল হয়ে যায় এটাই সুখ। সংহিতা বুঝতে পারত বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু কারো কাছে প্রকাশ না করে আমায় বাঁচিয়েছিল, নইলে ক্লাসে নির্ঘাত প্রতিক্রিয়া দেখতাম। সংহিতার সঙ্গে আমার এই অপ্রকাশিত গোপন চুক্তি ছিল বড় আরামের। এ যেন একটা সুখের বল নিয়ে গৃহকোণে দ্বিপাক্ষিক খেলা। দুজনে দুজনের দিকে নিঃশব্দে বল গড়িয়ে দিই। বল তেমনি নিঃশব্দে ফিরে আসে। এটুকুকেই আমি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য ভূমিকা মনে করতাম এবং করে নিশ্চিন্ত থাকতাম। কারণ অধ্যাপক ছাত্রীর সম্পর্কটাকে চট করে রোমিও-জুলিয়েট পর্যায়ে নিয়ে যেতে আমার মানসিক বাধা ছিল। অধ্যাপক মহলে, ছাত্র মহলে বেশ একটা দীর্ঘস্থায়ী, মুখরোচক কেচ্ছায় পরিণত হবার কোনও সাধ আমার ছিল না।

কানে আসত মেয়েটির গোপন নাম না কি ভ্যাট-সিক্সটি নাইন। সার্থক নাম্নী বটে। কিন্তু যে মত্ততা সংহিতা অমন অবলীলায় সঞ্চারিত করত তার দায়িত্ব তার স্বভাবে আদৌ ছিল না। বড় সৎ, আন্তরিক প্রকৃতির মেয়ে বলে মনে হত। সপ্রতিভ, প্রাণোচ্ছল, সচেতন কিন্তু প্রগলভ নয়। রূপের জন্য জীবনের কাছ থেকে বিশেষ কোনও অধিকার দাবী করত বলেও মনে হত না। ফস্টি-নস্টির পাত্রীই নয়। ফস্টি-নস্টিকারী কোনও এক যুবককে পায়ের চটি খুলে মারার অপরাধে একবার ছাত্র ইউনিয়নের দাবীতে তাকে এক

মাস সাসপেন্ড করা হয়। এক মাস পরে কলেজে যোগ দিয়ে সংহিতা প্রথমে প্রিন্সিপ্যালকে তারপর ক্লাসরুমের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সহপাঠীদের জানায় যে শাস্তি সে গ্রহণ করেছে এবং আবার যদি কেউ তার সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহার করতে আসে সে ওই একই দাওয়াই-এর পুনরাবৃত্তি করবে।

সততা, সাহস ও চারিত্রিক গভীরতা এই তিনটি গুণের জন্যই আরও আমি সংহিতার প্রতি আমার দুর্বলতাকে বাড়তে প্রশ্রয় দিয়েছিলাম। নইলে মোহকে বিচারবুদ্ধি দিয়ে শাসন করবার বয়স এবং মনোবৃত্তিতে তখন পৌঁছে গেছি। বিশ্বাস করতাম সংহিতার মধ্যে সেই উপাদান আছে যাতে ও নিজের জোরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। নারী পরগাছা হিসেবে নয়। তার জন্য অবশ্যই প্রস্তুতি চাই। সেই প্রস্তুতি কিভাবে গড়ব, স্বমহিমায় পুরোপুরি ফুটে ওঠবার জন্যে ওর যা প্রয়োজন সে উপকরণ আমি কোথা থেকে কিভাবে সংগ্রহ করে আনব, ব্যক্তিগত গবেষণার চেয়েও জরুরী ছিল তখন এই সব অন্বেষণ।

বি-এ ফাইন্যাল আসন্ন। ভাবলাম পরীক্ষার সময় বিরক্ত করা ঠিক হবে না। পরীক্ষাটা হয়ে গেলে ও আর আমার ছাত্রী থাকছে না। তখনই প্রস্তাবটা পেশ করব। তারপর শুভস্য শীঘ্রম্। কিন্তু কানাঘুষোয় শুনলাম সংহিতা না কি এবার পরীক্ষায় বসছেই না। ওর বাড়ির ঠিকানাটা সংগ্রহ করে রেখেছিলাম। পরীক্ষা না দেবার খবর শুনে আত্মগ্লানির সঙ্গে মনে হল এর আংশিক দায়িত্ব কি আমারও ? একটা চিঠি দিলাম। কোনও একটা দিন বিকেল তিনটে নাগাদ পার্ক স্ট্রীটের চীনে রেস্তোরাঁয় বৈকালিক নিমন্ত্রণ। তিনটের সময় ওই রেস্তোরাঁ একেবারে ফাঁকা থাকে। আলাপ এবং দরকার হলে প্রলাপেরও অসুবিধে নেই। নিশ্চিত হবার জন্য যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে আমার প্রিয় অল-হোয়াইট-লুক অর্থাৎ সাদা শার্ট, সাদা ট্রাউজার্স, সাদা স্লিপ-ওভারে সেজে রেস্তোরাঁর টেবল বুক করে বসে রইলাম। কাঁটায় কাঁটায় তিনটেয় সংহিতা এলো। অঙ্গে চোখ ধাঁধানো কার্ডিগ্যান, নরম রঙের সিল্কের শাড়ি, কানে জ্বলজ্বলে লাল পাথর এবং পেছনে ইউনিভার্সিটির তৎকালীন ছাত্র নেতা—অমিতেশ বাবিক।

সংহিতাকে আমি ক্ষমা করতে পারিনি। দুঃখ, আশাভঙ্গ, অপমান এমন কি প্রতারণাও বোধহয় কালক্রমে ক্ষমা করা যায় কিন্তু উপহাস কদাচ নয়। উপহাসাস্পদ হবার লজ্জা ভোলার জিনিস নয়। তাই আজ পনের বছর পরেও ওর কাছে আমার কিচ্ছু জিজ্ঞাস্য নেই। ওর সব প্রশ্নের জবাবে আমার সব উত্তর একাক্ষরী।

কুজ্ঝটিজাল সরে গেল। দেখলাম ওর চোখের কুয়াশা আর্দ্রতায় রূপান্তরিত হচ্ছে। সংহিতা কি আমায় আরও কিছু জিগগেস করেছিল ? উত্তর পায়নি ? নরম গলায় বললাম—"কেমন আছো বলো সংহিতা।" চিবুকের টোলের ওপর শিশির জমল। ধরা গলায় সংহিতা চোখ নীচু করে বলল—"আপনি আমার কথা, অমিতেশের কথা কিছু জানেন না, না সার ?"

চমকিত হলাম। সংহিতার কথা আমি সত্যিই জানতাম না। কিন্তু সংহিতাদের খবর তো মোটামুটি এক ধরনেরই হয় ! বাল্যপ্রেম, কৈশোরপ্রেম, ধাপে ধাপে। তারপর প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে...। ইলোপমেন্টের পরিকল্পনা। প্ল্যান কেঁচে যাওয়া। অভিভাবক নির্বাচিত তিন হাজারি মনসবদারের দামী গলায় নিরাপদ বরমাল্য অর্পণ অতঃপর, সম্ভবত কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করতে করতে। এবং সুরক্ষা। সংহিতার যা ক্যাপিটাল তাতে করে তিন হাজারি কেন দশ হাজারিও অবলীলায় জুটে যেত। ও কি তবে এখনও অমিতেশের সঙ্গে যুক্ত আছে ? অমিতেশের খবর সামান্য কিছু রাখতাম। সে

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছে। পুলিশ তাকে খুঁজছে, সে আনডারগ্রাউন্ডে—এমনি ছাড়া ছাড়া খবর কানে এসেছে। এর বেশি সংবাদ তো এসব ক্ষেত্রে মেলেও না। তবে অমিতেশ ছিল বেআইনি দেশী কারখানায় তৈরি হ্যান্ডগ্রেনেডের মতো অগ্নিবর্ষী। সে বোমা কাছাকাছির মধ্যে ফাটলে স্প্লিনটারের আগুনে কুচি ছুটতে দেখতাম—এ বিশ্বাস আমার ছিল। যেটুকু জানি গোপন করে বললাম—"আমি তো ভিন্ন পথের পথিক। কিছু জানি না। বলো সংহিতা, তোমাদের খবর বলো।"

সংহিতা প্রায় এক ঘণ্টা ধরে যা বলে গেল তার সারমর্ম হল অমিতেশ বারিকের মতো চাষীর ছেলেকে বিয়ে করার সংকল্প করায় স্বগৃহ থেকে সে বহুদিন বিতাড়িত। অমিতেশের পিতৃকুল পৃথিবীর থেকে মুছে গেছে। প্রতিভাবান ছেলেকে দশজনের একজন দেখবার মানসে সর্বস্ব পণ করেছিলেন কৃষক পিতা। সংসারে আর কেউ ছিল না। সর্ব অর্থে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে তিনি মারা গেছেন। বহুদিন আত্মগোপন করে থাকবার পর অমিতেশ অবশেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। সে খবর, তার ক্রিয়াকলাপ, অজ্ঞাতবাস কিছুর সঙ্গেই সংহিতার কোনও যোগাযোগ ছিল না। তবুও পুলিশ তাকে ছাড়েনি, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় সে ধরা পড়ে, অত্যাচারে তার গর্ভপাত হয়, পরে তার কাছ থেকে কিছু জানা যাবে না নিশ্চিত বুঝে দয়া করে পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়। দু-তিন বছর হল অমিতেশ ছাড়া পেয়েছে। অমানুষিক অত্যাচারে পঙ্গু। তাকে বাঁচাতে সংহিতা শেষ পর্যন্ত এই বৃত্তির দ্বারস্থ হয়েছে।

গল্পটা নতুন নয়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় তৃতীয় দশকের রোম্যান্টিক উপন্যাসের কথাসার। অগ্নিযুগের পর, বহুবাঞ্ছিত স্বাধীনতা লাভের পর যে জাতের উপন্যাস বাতিলের খাতায় নাম লিখিয়েছে। কিন্তু গল্প যখন নিছক সত্য হয় এবং তার পাত্রপাত্রী যখন একেবারে রক্তমাংসের চেনা মানুষ হয় তখন তার আঘাত কি দুঃসহ! অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবার পর আমি সংহিতাকে কথা দিলাম অমিতেশকে দেখতে আমি তাদের ডেরায় অবশ্যই যাবো। সেই মর্মে স্থান এবং কালও ঠিক করা গেল।

যখন শিক্ষক ছিলাম ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা করার অভ্যাস ছিল। ছাত্রপ্রিয়তার সস্তা লোভ হয়ত ভেতরে ভেতরে কাজ করে থাকবে, জানি না। তবে ওদের সঙ্গে ব্যবধানটা সহকর্মীদের সঙ্গে ব্যবধানের চেয়ে কম দুস্তর মনে হত। সদ্য পাশ করে বেরিয়েছি। নীচেকার বেঞ্চ থেকে প্ল্যাটফর্মের চেয়ারে প্রমোশনটা যেন নেহাৎ আপতিক। চোখে তখনও নতুন কিছু করার স্বপ্ন, জিভে নতুন ভাষা, টাটকা ধ্যান-ধারণার সংস্পর্শে আসবার রোমাঞ্চ তখনও আমায় ছেড়ে যায়নি। ছাত্ররা আমায় দেখে সিগারেট লুকোতো না, বারণ করে দিয়েছিলাম। ক্লাসে, করিডরে, কফি-হাউসে যখন-তখন যে কোনও বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে তুমুল তর্ক জুড়ত, তার অনেকগুলোতে আমি গো-হারান হেরে যেতাম এবং কোণঠাসা হয়ে সগর্বে হার স্বীকার করতাম। যে বিষয়ের ওপর বিতর্কে আমার পরাজয় অবধারিত ছিল তা হল পলিটিকস।

সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেওয়া আমার মতে ছিল যৌবশক্তির মারাত্মক অপচয়। অপ্রস্তুত, অর্ধপ্রস্তুত, মন-বুদ্ধি-হৃদয়বৃত্তির-উপকরণ, নিয়ে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে অসম টক্করে লড়তে যাওয়া এবং তার ফলশ্রুতি আত্মহত্যার শামিল বলে মনে করতাম। গবেষকের মেজাজ নিয়ে তথ্য তোমরা যোগাড় করো, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে, সাধ্যমত সমাজ-কল্যাণের কাজে হাত পাকাও, প্রত্যেকটি মানুষই তো সেই একক যাদের পর পর গেঁথে তৈরি হয় সমাজের পাকা গাঁথনি! প্রত্যেকটি ইটের গুণগত উৎকর্ষের ওপর কি

ইমারতের সামগ্রিক উৎকর্ষ নির্ভর করে না ? একাধিক খেলোয়াড়ের মধ্যে ক্ষমতা দখলের ছদ্মবেশী লড়াই চলছে। তার ভেতরের ছবিটা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হয়ে স্রেফ অ্যাডভেঞ্চারের মোহে রাজনীতির নোংরা দাবার ছকে বড়ের চালে পর্যবসিত হওয়া টীন-এজার ভ্রষ্টতরী ছাড়া কি ! মহাকুজ্ঝটিকায় যার ছেঁড়া পাল ভাঙা হাল, এ কূল ও কূল যার চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে !

আমার সমস্ত বাগ্‌বিস্তারের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া ছিল—

"জানি রজতদা, বিপ্লবকে, রক্তপাতকে আপনি ভয় করেন।"

"করি।"

"অথচ আপনার প্রিয় নেতা স্বাধীনতার জন্য রক্তের মূল্য চেয়েছিলেন !"

"স্বাধীনতা ? সে তো তোরা পেয়ে গেছিস ? পাসনি ?"

"ফুঃ। এ জারজ স্বাধীনতা কে চেয়েছিল ?"

"ইতিহাসকে তো উলটে দিতে পারিস না ! যা পেয়েছিস তাকেই প্রাণপণে গড়ে তোলবার চেষ্টা করতে দোষ কি ?"

"আমরা স্পার্টান আদর্শে বিশ্বাসী। আঠাশে শিশু প্রতিপালন করবার চেয়ে বরং ইতিহাসের ছক উল্টে দেব। দেওয়া যায়। আপনিও জানেন, আমরাও জানি।"

"ক্রমিক অসহযোগ কিংবা হঠকারী ক্যু দিয়ে শাসনযন্ত্রের উৎপাটনের যে প্রচেষ্টা তাকে সার্থক করতে হলে প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, পৌরুষ এবং সর্বোপরি শুভবুদ্ধি থাকা দরকার। তার পুঁজি তোদের কুষ্ঠগ্রস্ত নেতৃত্বে নেই, বিশ্বাস কর। এখনকার সব লড়াই শেষ পর্যন্ত গদীর লড়াই। দল ভেঙে উপদল হয়, উপদলও আবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়, আদর্শের চুলচেরা পার্থক্যের খাতিরে নয়, স্বার্থের চুলচেরা হিসেবের জন্যে। যদি ভেবে থাকিস তোরা সেতুবন্ধের কাঠবেড়ালি, ভুল করবি, তোদের ভবিতব্য সেই হতভাগা মূষিকগুলোর মত বাঁশিওলার মারণসুরের তালে তালে যারা নদীতে গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিল।"

ওদের তর্ক আবার উত্তাল হয়ে উঠত। সারা বিশ্ব খুঁড়ে খুঁড়ে নিয়ে আসত উদাহরণ। বিপ্লব এবং বিপ্লব। এবং আশ্চর্য একই উদাহরণ থেকে আমরা কিরকম ভিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী শিক্ষা গ্রহণ করে থাকি ! অবশেষে ওরা ফিরে আসত স্বদেশের অগ্নিযুগে। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল। অবোধ-কৈশোরের আনাড়ি হাতে মারণাস্ত্র ধরিয়ে দিয়ে ফাঁসি-মঞ্চে পাঠাবার দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নিয়ে গর্ব করার এই জাতীয় প্রবণতা স্মরণ করলে এক দুর্জয়, আর্তক্রোধে আমার অন্তরাত্মা জ্বলে যেত। স্বরাজপূর্ব বালকবলির ট্র্যাডিশন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে সব মাস-হিপনটিস্ট আজও চালিয়ে যেতে চায় আমি তাদের সর্বান্তঃকরণে অভিশাপ দিই। কিন্তু ওদের সামনে এতটা উষ্মা প্রকাশ করা কি সমীচীন ?

"বিপ্লব না হলে আপনাদের পচা সমাজের কাঠামো পালটাবে না।"

"ভবিষ্যৎ সমাজের ছকটা তোদের কাছে তা হলে পরিষ্কার !"

"ইয়েস, ব্লু-প্রিন্ট তৈরি।"

"তাই বুঝি ? আমার ধারণা ছিল থিয়োরি একটা খসড়া করে দেয় মাত্র। তারপর দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে তার অদলবদল না হওয়াটা অ-স্বাস্থ্যকর। জীবন যখন চলিষ্ণু, তত্ত্বকেও তখন তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, নইলে আবার তৈরি হবে অচলায়তন যাকে ভাঙতে আবার তোদের শাবল, গাঁইতি, গ্রেনেড, ডিনামাইটের দরকার হবে।"

"উপহাস করছেন রজতদা ?"

"উঁহু। তোরা আমাদের বংশধর। তোদের হাতে সাধের বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে চলে

যাবো বলেই আমাদের দাঁড়িয়ে থাকা। তোদের ক্যানন ফডার হতে দেখে ভেতরটা জ্বলে যায়। যা মহাকাশযান হতে পারত তা আতসবাজিতেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। তোরা হলি ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সেই হতভাগা রেজিমেন্ট যারা ভুল কম্যান্ডে চোরাবালির অতলে গিয়েছিল।"

"তারা বীর ছিল রজতদা। আপনাদের মতো কাপুরুষ নয়। নিজেদের পিঠ বাঁচাতেই আপনাদের এই সমস্ত পুঁথিগত যুক্তির ভণ্ডামো !"

নিঃশ্বাস ফেলে ব্রেখটের গালিলিওর সেই উক্তি স্মরণ করতাম—হতভাগ্য সেই দেশ যে দেশে শুধু বীরপুরুষেরই প্রয়োজন হয়। সোল্লাস স্লোগান ভেসে আসত—"চলছে, চলবে, লড়াকু ছাত্র লড়ছে, লড়বে।" মনে মনে বললাম—লড়ছে, লড়বে, মরছে, মরবে, আস্তিনের পেছনে যারা হাসবার তারাও হাসছে হাসবে। কত বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাহিত্যিক, রাষ্ট্রনায়ক, সমাজতাত্ত্বিক, চিকিৎসক, কত প্রতিভাধর এমনি করে বোকা বনে অপঘাত লুঠছে তার হিসেব তো তোরা চাস না ! এই জন্য, এরই জন্য কি সৃষ্টির সূর্য জ্বলেছিল !

উনিশ'শ বাহাত্তর। তিন বিখ্যাত ছাত্র নির্মলেন্দু লাল, প্রদীপ জানা আর মনোজিৎ বাগচি বেপাত্তা হল। নির্মল যার পেপার মাত্র সতের বছর বয়সে বিখ্যাত জার্মান জার্নালে প্রকাশিত হয়ে বিশ্ববন্দিত হয়েছিল সে আমার চোখের সামনে বৃদ্ধ প্রিন্সিপ্যালকে রিঅ্যাকশনারি বাস্টার্ড বলে ঠাস করে এক চড় কষাল। পাইপগান তাক করে মনোজিৎ বলল রেজিগনেশন লেটারটা পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে সই করে না দিলে গরম সীসেগুলো নাকি সোজা ওঁর বস্তাপচা ব্রেনের মধ্যে সেঁদিয়ে যাবে। তখনকার মতো সমবেত প্রচেষ্টায় তাদের নিরস্ত করা গেল। কিন্তু পরে কলেজ ক্যাম্পাসে যখন তিনি খুন হলেন সকলেই অনুমান করল এ ওই ত্রয়ীর কাজ। আমি অনুমান করতে চাইনি। মনোজিৎ আমার সবচেয়ে গর্বের ছাত্র ছিল। মহাশক্তিধর কলম ছিল তার। অধ্যাপক মহলে প্রদীপের নাম ছিল হিউম্যান কমপিউটর। শ্রদ্ধেয়, প্রবীণ শিক্ষাগুরুদের শেষ প্রজন্মের সঙ্গে সঙ্গে নিহত হল বিজ্ঞানী, শিল্পী, গণিতবিদের প্রতিভাধর নব প্রজন্ম। বিপ্লবের হাতে।

সেই আমি চাকরি ছাড়লাম। আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি তখন থেকেই। সিভিল প্র্যাকটিস করি। আদালত আমার বিবেককে মোটামুটি একটা সহনীয় আশ্রয় দিয়েছে। সুখী নই। সন্ত এবং মূঢ় ছাড়া এ পৃথিবীতে সুখী কে ? কিন্তু ন্যূনতম শান্তির জন্য জীবনের সঙ্গে একটা রফায় পৌঁছনো দরকার। হাজার হাজার বছরের পুঞ্জিত সভ্যতার সম্পদকে লাথি মেরে ওরা নখদন্তে বর্বর আরণ্যক আইনের কাছে ফিরে যাবে, নপুংসকের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব এ মর্মদাহ থেকে মুক্তি চেয়েছিলাম।

গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম গ্র্যান্ডের তলায়। সংহিতা এলো। ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে। ও একটু একটু ভিজেছে। চুলে বৃষ্টির কুচি। চোখের বড় বড় পাপড়িতেও দু-একটা পোখরাজের দানার মতো আটকে আছে। আঁচলে মুখটা মুছে নিল সংহিতা। থিয়েটারের চড়া মেক-আপ ব্যবহারে ওর মুখের চামড়ায় খয়েরি খয়েরি মেছেতার মতো দাগ। আগের বার বিজলীবাতির তলায় বুঝতে পারিনি। শ্রমসাধ্য জীবিকার কালি চোখে মুখে। সব রূপসী নারীই তা হলে ইন্দ্রাণীর সিংহাসনে সখিপরিবৃতা হয়ে বিরাজ করে না ! ভুবনজুড়ে অলক্ষ্য ফাঁদ বিসর্পিত, মহাকবির ভাষায় কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে। যে যেখানে যাবে বলে বেরিয়েছিল, যাওয়া হয় না। ভুল স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে ট্রেন চলে যায়। মুখ যেমন মনের আয়না নয়, সকাল যেমন নয় পরিণত দিনের অভিজ্ঞান তেমনি কার কর্মফল কাকে কোন চক্রনেমিতে বেঁধে মহাকালের পথ পরিক্রমা করাবে কারো জানা

নেই।

ঠিকানা পূর্ব কলকাতার। সংহিতার নির্দেশে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে যাচ্ছি। চোখ উইন্ডস্ক্রীনে। রক্ষণশীল মেজাজের লোক। পরকীয়াতত্ত্বকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারি না। একদম অপ্রাসঙ্গিক ভাবে সংহিতা বলে উঠল—"আমি কিন্তু অন্য চাকরিও খুঁজেছিলাম, সার।"

বুঝলাম গতদিনের সাক্ষাৎকার এখনও ওর বুকে হুল ফুটিয়ে রেখেছে। বড় কষ্ট হল, বললাম—"কি হল, পেলে না ?"

"আমার তো সেই থেকে বি এ-টা কমপ্লিটই হল না ! ও যখন নিরুদ্দেশ চেষ্টাচরিত্র করে স্টেনোগ্রাফি শিখে নিয়েছিলাম। ও চাকরি করেওছিলাম কিছু দিন। কিন্তু অত সামান্য টাকায় এখনকার খরচ আর চালাতে পারি না।"

"কত টাকার দরকার তোমার, সংহিতা !"

"অনেক অনেক সার। সে আপনি না-ই শুনলেন। ডাক্তারদের ফি-এর কথা তো আপনি জানেনই। সব্বাইকে নিয়মিত বাড়িতে ডাকতে হয়। প্যাথলজিক্যাল টেস্ট রেগুলার। শুশ্রূষা এবং আনুষঙ্গিক আরও। শরীরে ওর কিচ্ছু নেই। সাইকিয়াট্রির কি প্রচণ্ড খরচা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না সার, প্রতি সপ্তাহে অ্যানালিসিস, এক একটা সীটিং পঞ্চাশ। পুরো দেড় বছর এই জিনিসও চালাতে হয়েছে।"

"তোমার পেশাটা বিপজ্জনক, সংহিতা" সন্তর্পণে উচ্চারণ করি।

"যতটা ভাবছেন ততটা নয় সার, স্টেনোগ্রাফারের চাকরিটা এর চেয়ে হাজারগুণ বিপজ্জনক ছিল। সেখানে বিপদ কোনদিক থেকে কিভাবে আসবে বোঝা যেত না। এখানে বুঝি। আওয়ার্স কম। টাকা বেশি। অমিতেশকে সময় দিতে পারি।"

"এদিকে যখন এলেই ফিলমে-টিলমে গেলেও তো পারতে। তোমার টাকার ব্যাপারটা ফর গুড সলভ্ড হয়ে যেত !"

"অত সোজা ভাববেন না সার, তেমন যোগাযোগও আমার ভাগ্যে ঘটে ওঠেনি। তা ছাড়া আপনি বোধহয় সিনেমা দেখেন না, আমার চেহারায় একজন নামকরা স্টারের ভীষণ সাদৃশ্য আছে। ওই জন্যেই ও লাইনে আমার কোন দিন কিছু হওয়া শক্ত। তৃতীয় সারিতে থেকে যাওয়ারই কপাল !"

"নাচই যখন বেছে নিলে, সত্যিকার নৃত্যশিল্পীও তো হতে পারতে !"

"আপনি এখনও আগের মতোই ছেলেমানুষ আছেন সার," সংহিতা বলল,

"আমি কি কোন দিন নাচের জন্যে তৈরি হয়েছি, নাকি ? তা ছাড়া উপযুক্ত গুরু, শিক্ষার সুযোগ, প্রতিভা কিছুই কি আমার ছিল ? পড়ে গেলাম তো ঘূর্ণিঝড়ে ! আমার ফিগারে ক্ল্যাসিক্যাল ডান্স হওয়াও শক্ত। আপনার মনে নেই "উওম্যান অফ রোম"-এ আদ্রিয়ানাকে ব্যালে-স্কুল থেকে কেন ফিরিয়ে দিয়েছিল ?"

বলেই সংহিতা অপ্রস্তুত হয়ে ঠোঁট কামড়ালো। ওর মনে হয়ে থাকবে তুলনাটা বেফাঁস হয়ে গেল। বাকি সময়টা ও কাঠ হয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কাটিয়ে দিল, আর একবারও মুখ ফেরাবার সাহস সঞ্চয় করতে পারল না।

আশ্চর্য হয়ে দেখলাম অমিতেশকে সংহিতা খুব সুখে রেখেছে। আমি বেলেঘাটার বস্তি-টস্তি আশঙ্কা করেছিলাম। মোটেই না। দু কামরার ছোট ফ্ল্যাট। দোতলায়। নতুন চুনকাম। আসবাব কম কিন্তু অতি পরিচ্ছন্ন। প্রচুর আলো হাওয়া, বাতাসে চন্দন ধূপের গন্ধ। কিন্তু অমিতেশকে চেনা যে কোনও লোকের পক্ষে শক্ত ছিল। ব্যূঢোরস্ক, বৃষস্কন্ধ

সেই বীরভূম ঘরানার কৃষক সন্তান যার পিতৃপুরুষ শুধু কাঁধের জোরে জোড়া বলদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত শ্বেতির তাপ্পি। স্বাভাবিক গ্রামবাংলার নির্ভেজাল কৃষ্ণবর্ণের সঙ্গে শ্বেতির এই বৈপরীত্য এক কথায় বীভৎস। লোহার ফ্রেমের মধ্যে শরীরটা আটকানো। পাঁজরা বাঁকা। অনেক রকম রোগ, অনেক রকম চিকিৎসা হয়েছে, শেষ পর্যন্ত সব সেরে যাতে এসে দাঁড়িয়েছে তার নাম স্পাইন্যাল টিউবারকুলোসিস। সংহিতা আশ্বস্ত করল রোগটা ছোঁয়াচে নয়। হাতের আঙুলগুলো ব্যবহার করতে পারে না। প্রত্যেকটি আঙুলের গাঁটে পুলিশ কি কায়দা করেছে যার জন্য আঙুলগুলো অকেজো হয়ে গেছে। ফিজিওথেরাপি চলছে। দূর ভবিষ্যতে নিজের হাতে খাওয়া-দাওয়া করার ক্ষমতা ফিরে পেলেও পেতে পারে। অন্তত সংহিতার তাই আশা।

অমিতেশ ঠোঁট ছড়িয়ে হাসল। —"যাতে আর কোনদিন ছুরি-ছোরা-রিভলভার ধরতে না পারি তার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, রজতদা। জানে না আঙুলের গ্রন্থি আসল রিভলভারটা ধরে না।"

সতেজ কণ্ঠ। সজীব চোখ। সজীব মস্তিষ্ক। বিধাতার কী আশ্চর্য সৃষ্টি এই বীরপুরুষেরা।

ধবধবে বিছানার প্রান্তে একটা অয়েল ক্লথ ভাঁজ করে পেতে দিল সংহিতা। বড় ট্রেতে খাবার নিয়ে এলো। মুরগীর স্টু, কাঁচা স্যালাড, সুগন্ধ ভাত, ছানার সন্দেশ। চামচ করে খাইয়ে দিল। তারপর সযত্নে ধুইয়ে মুছিয়ে অয়েল ক্লথ ট্রে তুলে নিয়ে গেল। আমাকে বলল—"রোগীর ঘরে আপনাকে দোব না সার, আপনি বাইরে আসুন।"

"আমার তো খাওয়ার কথা ছিল না! লাঞ্চ সেরে বেরিয়েছি সংহিতা।"

"সে কী! আমরা খাবো, আর আপনি খাবেন না, তাই কি হয়? খেতেই হবে।"

বললাম—"শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের যুগ চলে গেছে। জোর করে খাওয়ালে আজকালকার বাঙালী পুরুষ কিন্তু মোটেই খুশী হয় না। আমার খাওয়া-দাওয়ার সময়, পরিমাণ সব বাঁধা। যাবার সময় চা খেয়ে যাবো, তুমি ব্যস্ত হয়ো না সংহিতা।"

মুখটা ওর ম্লান হয়ে গেল। কিন্তু আর জোর করল না।

আমি অমিতেশের সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। অন্তরালে সংহিতা তার গৃহস্থালির লক্ষ কাজ সারতে লাগল। সম্ভবত রান্নাবান্না, ঝাড়পোছ, ধোয়াপাকলা বাজারহাট, সর্বোপরি শয্যাগত পঙ্গু রোগীর সেবা, যে জলটা পর্যন্ত নিজে খেতে পারে না—এ সবের জন্য ওর কোনও সাহায্যকারী নেই।

অনেকদিন পর কথা বলার লোক পেয়ে অমিতেশ খুব খুশি। সমাজ পরিত্যক্ত, নির্বান্ধব, রাহুগ্রস্ত এই যুগলের কাছে কে ই বা আসে! কিন্তু কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরই বুঝলাম পনের বছরেও অমিতেশ একটুও বাড়েনি। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের ত্রিমাত্রায় গড়া মানুষ সে নয়। সে একমাত্রিক। শুধু ভবিষ্যতের আয়তনে বিশ্বাসী। তার অনতি-অতীত জীবনের কথা আমি জানি না, অনুমান করতে পারি। কিন্তু অমিতেশ সে ধার দিয়েই গেল না। সে যেন আরব্য উপন্যাসের সেই ধীবর। অতীতের দৈত্যটাকে কলসীর মধ্যে পুরে কোন মহাসমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ে হাত ধুয়ে এসেছে। বলল—"খুব ভালো আছি রজতদা, নেভার ফেল্ট বেটার। এই খাঁচাটা দেখছেন? বছরখানেক পর মনে হয় এটার আব দরকার হবে না। উঠে দাঁড়াতে পারব। আঙুলগুলোর কথা ভাবি না। শরীরটা আর বিপ্লবের কাজে লাগবে না। কিন্তু অমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। সংগঠন তৈরির কাজে শীগগিরই হাত দেব। ফুল প্রুফ।

বুলেট প্রুফ।"

আমার হয়ত অনধিকার চর্চা। তবু কিসের তাগিদে বলে ফেললাম জানি না—"বিপ্লবের প্রতি কর্তব্য ছাড়া আর কিছুর প্রতি কোনও কর্তব্যের কথা তোমার কখনও মনে হয় না অমিতেশ ?"

"আপনি কি সংহিতার কথা বলছেন ?"—অমিতেশ একদেশদর্শী হতে পারে, বোকা নয়।

"খানিকটা।"

"একটা মহৎ স্বপ্ন সত্য করতে গেলে ও রকম অনেক মেয়ের আত্মত্যাগের দরকার হয় রজতদা। যারা কম্প্যানি এগজিকিউটিভের বৌ হয়ে শেষ দুপুরের কফি পার্টিতে সোশ্যাল ওয়ার্ক করতে যায় সে রকম শৌখিন মজদুরির ধাত সংহিতার নয়।"

এ কথা আমি খুব জানি ! তুলা রাশি, ধনু লগ্ন। জ্যোতিষে বিশ্বাস করি আর না-ই করি, শুনেছি মানিয়ে নেবার অমানুষিক ক্ষমতা থাকে এসব জাতক-জাতিকার। বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠা তুলনাহীন। সংহিতার ভবিতব্যই তাকে হাত ধরে বিপ্লবের এই নাভিকেন্দ্রে পৌঁছে দিয়ে গেছে। কিন্তু এ-ও নিশ্চিত জানি সে ভবিতব্যের অন্য নাম ভালোবাসা, সেই পুরাণ কথিত বস্তু যার জোরে মানুষ অসাধ্যসাধন করতে পারে। সংহিতার মুখে আমি সন্ত্রাসী বিপ্লব সম্পর্কে কোনও বিশ্বাসের কথা কোনদিন শুনিনি। বিপ্লবের প্রয়োজনে সে সামান্য দৌত্যের কাজও কখনও করেছে বলে জানি না। দরজার দিকে সভয়ে তাকালাম। ধারে কাছে নেই তো ? না থাকলেই ভালো। অমিতেশের ভাষায় তার দেওয়া-নেওয়ার হিসেব-নিকেশ সংহিতার পছন্দ হবে কি ?

অমিতেশ আলাপে আগ্রহী। তার পরিকল্পনার রূপরেখা আমার মতো অবিশ্বাসী কাফেরকে সে বলবে কেন ? কিন্তু স্বপ্নসৌধের সম্ভাব্যতার কথা আলোচনা করতে তো দোষ নেই। জ্বলজ্বলে চোখে, গমগমে গলায়। কিন্তু আমি এই আলোচনায় এই বিতর্কে একদিন এতো বেশি যোগ দিয়েছে এবং শুধু প্রাণশক্তির প্রবল জোয়ারি চাপে বুদ্ধির সমস্ত শক্তিকে পরাভূত হতে দেখেছি যে এই নিষ্ফল বাদানুবাদের মধ্যে প্রবেশ করতে আমার এখন বড় ক্লান্তি ! আমি শুধু মানবিক, বৌদ্ধিক আলাপচারিতে রাজি অমিতেশ !

বহুক্ষণ একতরফা উত্তেজিত বক্তৃতার পর তাই শ্লিষ্ট হাসি হেসে ও বলল—"আসলে কি জানেন রজতদা, ব্রিটিশদের তৈরি সাহিত্যগুলো আর ওই অপসংস্কৃতিতে ভর্তি স্যান্‌স্ক্রিট লিটারেচার-টারগুলো আপনারা বড্ড বেশি পড়েছেন। আপনাদের ধাতটা হয়ে গেছে কন্‌সটিট্যুশন্যাল। ছকের বাইরে কিছুর কথা আপনারা কল্পনা করতে পারেন না। নীচ প্রবৃত্তিগুলোর সাবলিমেশনকে শিল্পের নামে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। আপনারা বোধহয় স্বপ্নও দেখেন বানান করে করে। ফ্রয়েড সাহেবের ফর্মূলা অ্যাপ্লাই করলে অ্যাভারেজ বাঙালীর চিত্তবৃত্তি থেকে সাপ্রেশ্‌ড্‌ লিবিডো ছাড়া কিছুই বেরোবে না। আসলে আপনি চিরকাল সেই আদি, অকৃত্রিম শোধনবাদী বুর্জোয়াই রয়ে গেলেন।"

সংহিতা বাইরের পোশাকে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখে গভীর ক্লান্তির কাজল। ওর মঞ্চে যাবার সময় হল। আমিও এবার উঠি, সৈনিকের তিরস্কার শিরোধার্য করে। বলার কিছু আছে কি ? দৃষ্টিহীন সংকল্পে বেঁকে আছে বিদ্রোহীর কঠিন করতল। ওদিকে ঘাটে ঘাটে সাধ্বীত্বের কঠিনতর পরীক্ষা দিতে দিতে নাগিনীদষ্ট, পূতিগন্ধময় শবদেহ নিয়ে ভেলা চলেছে। লম্পট সভায় ছিন্ন খঞ্জনার মতো নেচে নেচে বেহুলা নাচনী একদিন না একদিন আদায় করে আনবেই মুক্তিপণ। বিপ্লব জানতে চাইবে না কিসের মূল্যে মুক্তি খরিদ হল।

বিবাহ-বিভ্রাট

'জোতে শালার কারবার শুনেচিস তপ্‌না ?'

—'বেইজ্জত করে ছেড়ে দিলে মাইরি !'

—'শুধু বেইজ্জত ? কেলো ! কেলো !'

—'দু-দুবার হড়কে কোনমতে তো একটা এম এস করেচিস। তা মনে করেচিস কি নিজেকে ?'

—'করাচ্চি মনে। এর পর ক্লাবে এলে অ্যায়সা ঝাড় দেব না..'

আমাকে মাঝখানে এক চিলতে নেটের মতো সাক্ষীগোপাল খাড়া রেখে শৈল-গোরা দুই বন্ধু দুদিক থেকে উপরি-উক্ত কায়দায় পিংপং পারাপারি করে গেল। দুজনেই মারকুটে, দুজনেরই হাতে বাছা বাছা শট। ঝাড় দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে শৈলটা একটা পয়েন্ট স্কোর করল মনে হল। আপাতত বিরতি। বললুম—'কেসটা কি রে ?' টানা আড়াই বছর বেকার-বৃত্তির পর মাত্র মাস ছয় হল দুর্গাপুর স্টীলে কাজ পেয়েছি। প্রোবেশন চলছে। ছুটি-ছাটার তাই সুবিধে নেই। কিন্তু দিন তিনেকের সীজ-ওয়ার্কের সুযোগে প্রথম ট্রেনেই ক্লাবে হাজরে দিয়েছি। মাত্র ক'মাসের মধ্যে এমন কি ফাটাফাটি ব্যাপার হল যে এরা সব্বাই জ্যোতির ওপর এতো খাপ্পা।

শৈলই মুখভঙ্গি করে বলল—'ডাক্তারি ফাস করে উনি প্র্যাকটিস শুরু করেছেন।'

—'সে তো ভালো কথা। তা আমাদের থেকেও ফি-টি নিচ্ছে নাকি রে ?' এটা এদের উষ্মার একটা সঙ্গত কারণ হতে পারে বটে।

—'হুঁঃ ! কার কড়ি কে ধারে ? ওসব ফিস-ফাস নয়। উনি মেয়ে দেখা প্র্যাকটিস শুরু করেছেন।'

শেষের কথাগুলো শৈলর দাঁতের ফাঁক দিয়ে চিবোনো ডাঁটার মতো ছিবড়ে হয়ে বেরুলো। সেরেছে ! জোতেটা শেষ পর্যন্ত নারীঘটিত কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ল। ছি ! ছি ! জোতের এমন ন্যক্কারজনক পরিণতি হতে পারে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি। সম্পর্ক কি আজকের ? ছেলেবেলাকার বন্ধু। শুধু এক পাড়ার নয়, এক স্কুলের, এক ক্লাসের। দুজনে দুজনের হয়ে লড়ে যাচ্ছি সেই মার্বেল-ডাংগুলির বয়স থেকে। হায়ার সেকেন্ডারির পর থেকে দুজনের পথ দুদিকে হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু পয়লা নম্বরের দোস্ত্ বলতে এখনও আমার জোতে, জোতের আমি।। সেই জোতে উন্মার্গগামী হয়ে গেল ভেবে খুবই মুষড়ে পড়েছি। বিমান মাঝে পড়ে প্রাঞ্জল করে দিল ব্যাপারটা।

—'জ্যোতিবাবু বিয়ে করবেন। গড়ে দশখানা করে কমসে কম মেয়ে দেখে যাচ্ছেন ফি মাসে। তা হলে পাঁচ মাসে কটা হয় হিসেব কর। পাঁচ দশে পঞ্চাশ প্লাস ফাউ। তিন

দিনে একখানা করে রেট। স্পীড শিগগির বাড়বে মনে হচ্ছে। দুখানা বাংলা কাগজে "পাত্রী চাই" অলরেডি আউট।'

শৈল মন্তব্য করল—'তবে আর কি ? শালার পোয়াবারো। মাগ্‌গি-গণ্ডার বাজারে টিফিনটা রোজ মেয়ের বাপের ঘাড় দিয়েই উঠে আসবে। চেম্বার তো এখনও গড়ের মাঠ। কারবার জানি না আমরা ?'

গোরা বলল—'ওঠাচ্ছি ওর টিফিনের খরচা। আমাদের ও চেনেনি এখনও। ডাউরি-সিসটেম উঠে গেল, মেয়েরা বাপের সম্পত্তির শেয়ার পাচ্ছে ; লিগ্যাল টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যানসি অ্যাক্ট পাস হয়ে গেল, এখনও শালা খোঁপা খুলিয়ে, পায়ের গোছ দেখে, রসগোল্লা-পানতোয়া-শিঙারা কচুরির ছেরাদ্দ করে বিয়ে করবে ? প্রগতি সঙ্ঘের মেম্বার হয়ে ? মামদোবাজি ! আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে যদি গলির মোড়ে রাতের অন্ধকারে কে বা কাহারা ওর ঠ্যাং ভেঙে দিয়ে না যায় তো আমার নামে তোরা কুকুর বেড়াল যা ইচ্ছে পুষিস !'

জিগগেস করলুম—'মনস্থির করতে পারছে না, না কি ?'

—'মন ওর আছে, যে তার স্থির-অস্থির ?' শৈল বলল– 'একেবারে হার্টলেস চশমখোর। অ্যাদ্দিন মিশছি টের পাইনি। এইবারে খড় বেরিয়েছে।'

বিমান বলল—'বিবির বাগানের হরিহর উকিলের সেজ মেয়েকে দেখেছিস তো তপ্‌না ? সুন্দরী না হোক, গ্ল্যামারস, অস্বীকার করতে পারিস ? জোতে দেখে এসে কি বলে জানিস ? সব ভালো, নাক ছোট। কতো বড় নাক নিবি রে শালা ? বৌ-এর নাক ধুয়ে কি জল খাবি ? নাকি কেটে নিয়ে নিজের খ্যাঁদা নাকে সেলো দিয়ে জুড়বি ?'

শৈল বলল—'আরও আছে। আরও আছে। মুখ ভালো তো রঙ কালো, রঙ চলে তো মুখ চলে না। হাড়-জিরজিরে, চোখ কুতকুতে, ঘাড়ে-গর্দানে, ভুঁড়িদাস, শিড়িঙ্গে, হিড়িম্বা, হোঁৎকা, চ্যাপ্টা, মোটকা, বাঁটকুল...'

—'জোতের নিজের চেহারাখানার কথা চিন্তা করে পার্সপেকটিভটা ঠিক করে নিস তপ্‌না,' গোরা হেঁকে উঠল, 'এ ব্যাপারে চামচাগিরি করতে এলে তুইও ইম্মিজিয়েটলি আউট।'

বিমান সখেদে বলল—'কিছুতেই আর নাক চোখ-মুখের সাইজ ঠিক হয় না শালার। মেজারিং টেপ পকেটে নিয়ে ঘুরছে। গত হপ্তায় একটা মেয়ে দেখে এসে বললে, এখানেই লাগিয়ে দিতুম, কিন্তু চুলের কালারটা কেমন ম্যাড়মেড়ে, অ্যাকিউট ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি। শিগগিরই পেকে যাবে। বল, এর জবাব আছে ! পাকেনি, পাকবে, এর পরে বলবে মোটায়নি মোটাবে। শিঁটোয়নি শিঁটোবে, বুড়োয়নি বুড়োবে।'

গোরা বলল—'আরে বাবা অপ্সরী বিদ্যেধরী মেয়ে এতো লোক থাকতে তোর মতো হামবড়া বোম্বেটেকে কেন মালা দিতে যাবে সে কথা একবারও ভেবে দেখেছিস ?'

আমার এই পাড়াতুত বন্ধুদের কিঞ্চিৎ 'স'-এর গোলযোগ আছে। উপরন্তু ল্যাজা-মুড়োয় শালা ছাড়া কেউ কথা বলতে পারে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের এ এলাকার শান্তি-সংস্কৃতি রক্ষায় এদের এই প্রগতি সঙ্ঘের গুরুত্বপূর্ণ অবদান যে নিছক কথার কথা নয় তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। চাঁদা নিয়ে গেরস্থকে জোর-জুলুম, শেতলা-রক্ষাকালী মা-মনসার নাম করে লাউডস্পীকারের হামলা, যখন-তখন বোমবাজিতে পিলে চমকানো—এইসব পাড়ার-ছেলেসুলভ ক্রিয়াকলাপ প্রগতি সঙ্ঘের প্রোগ্রাম বহির্ভূত। আমাদের রাস্তা বারো মাস ছিমছাম, পরিষ্কার, মিউনিসিপ্যালিটির

জমাদার চলে যাবার পর দফায় দফায় রাস্তায় জঞ্জাল ফেলা নিষিদ্ধ। বর্ষায় জলকাদা জমে না, মেয়েদের 'আওয়াজ' দেওয়া, বয়স্কদের অসম্মান করা, পরিত্যক্ত কবরখানায় মদের ভাঁটি, পলিটিক্যাল পার্টির পেটোয়া গুণ্ডাদের নাশকতামূলক কার্যকলাপ—সব বন্ধ হয়েছে এই প্রগতি সঙ্ঘেরই উদ্যোগে। বিপদে-আপদে সঙ্ঘ হামেহাল হাজির। রাজদ্বারে শ্মশানে চ দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে একেবারে আক্ষরিক অর্থে। ইটখোলার জনার্দন ঢ্যাং প্রতিবেশীর দক্ষিণ চেপে তেতলা তুলছিল, পিলার ঢালাই শুদ্ধু সারা। প্রগতি সঙ্ঘ কোর্ট ইনজাংশন বার করে আনল। ইনকাম ট্যাক্সের ঘোষদা, জনান্তিকে ঘুষদা, বাড়ির উঠোনে কি সব বিদঘুটে কেমিক্যাল তৈরি করতে আরম্ভ করে, কিছুতেই কারো কথা শুনবে না, এদিকে বিষাক্ত গ্যাসে লোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত। প্রগতি সঙ্ঘের দরবারে কুটিরশিল্প দপ্তরের নির্দেশনামা নিয়ে পুলিশ এসে দু মিনিটে কারখানার বারোটা বাজিয়ে দিল। এই তো সেদিন সুশান্তদার দু বছরের পুঁচকে মেয়েটা স্রেফ প্রগতি সঙ্ঘের তৎপরতার জন্যেই বেঁচে গেল। দোতলার বারান্দার গ্রিল বেয়ে বেয়ে কেমন করে উঠেছিল, ধুপ করে পড়ে যায়, গোরা-মুরারির চোখের সামনে। তক্ষুনি দুজনে ট্যাকসি ধরে তাকে নিয়ে ছুট। মেডিক্যাল কলেজের এমার্জেন্সি ইউনিটে তার চিকিৎসা শুরু হয়ে গেছে, তখন সুশান্ত বৌদি ফোনে খবর পেয়ে বারান্দায় ছুটে এসে কান্না জুড়ে দেন।

কাজেই জ্যোতির এ ব্যবহারে প্রগতি সঙ্ঘের কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যরা অর্থাৎ বিমান-শৈল-গোরা-মুরারি ক্রুদ্ধ হতে পারে বইকি। সে অধিকার এদের আছে। অতএব জরুরি অবস্থামূলক শীর্ষ সম্মেলন করে স্থির হল জোতেকে আর একটি মাস চান্স দেওয়া হবে, তার মধ্যে ও এসপার-ওসপার কিছু একটা করুক। আলটিমেটাম শুদ্ধু সমনটা আমাকেই ধরাতে যেতে হবে। অন্যথায় গণ আদালতে জোতের গণ বিচার। গর্দান গেলেও যেতে পারে।

এমার্জেন্সি। সুতরাং সেইদিনই সন্ধেবেলায় জ্যোতিকে পাকড়াও করা গেল। শূন্য চেম্বারে বসে খুব গম্ভীর মুখে নাকে চশমা এঁটে জ্যোতি একখানা মেডিক্যাল জার্নাল পড়ছিল। আরও এক ঝাঁক জার্নাল টেবিলের পাশে গাদা করা। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পড়ার ভান করার পর বলল,—'কবে এলি ?'

—'এই তো সকালে। তোর কি খবর ? রুগীপত্তর কেমন হচ্ছে ?'

—'ওসব আস্তে আস্তে হয়। একদিনে ছপ্পর ফুঁড়ে রোগী পড়ে না। ওয়েট করতে হয়।'

বাপ্ রে। ফোর ফর্টি ভোল্ট। বোম হয়ে আছে। প্র্যাকটিস জমছে না। মেজাজ খারাপ। তায় আবার আমি ভগ্নদূত। কপালে যে আজ কি আছে ! যাক, যা হবার তাড়াতাড়ি হতে দেওয়াই ভালো। বললুম—'তুই নাকি... বিয়ে...টিয়ে... করবি টরবি ? মেয়ে-টেয়ে... দেখছিস-টেখছিস... !'

জ্যোতি এক হাতে কলম আর এক হাতে জার্নাল নিয়ে কিছুক্ষণ থম মেরে বসে রইল। ঝড়ের আগের অবস্থা। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল—'দ্যাখ তপন, এখানেও একটা ফুল-ফ্লেজেড এস্পিয়নেজ সিসটেম কাজ করে যাচ্ছে। মগজের মধ্যে বিলট-ইন ওয়্যারলেসও বলতে পারিস,' নিজের মাথায় টোকা মারল জ্যোতি, 'তোর প্রগতি সঙ্ঘের এগজিকিউটিভ কমিটিকে বলে দিস একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে ইনটারফিয়ার করাটা অরিজিন্যাল স্ট্যাটুটে ছিল না।'

আমি বললুম—'না... মানে... কোন্‌টা ব্যক্তিগত কোন্‌টা নয়... আসলে ওদের

ফিলিংটা... মানে ওরা ভাবছে...'

—'চেষ্টা করিসনি। চেপে যা তপ্‌না। তবে কথা বলতে না পারিস মগজটা তো একটু-আধটু খেলাতে পারতিস এককালে! এখন কি একেবারে ধোলাই করিয়েই ঢুকেছিস?'

—'না... মানে...

—'মানে-ফানে নয়। বিয়েটা কার? তোর না বিমানের না শৈলর না গোরার? ছাঁদনাতলায় তোরা কে দাঁড়াচ্ছিস? খুলে বল, যে দাঁড়াবি তার ফরমাসমাফিক এগোবো। তবে হ্যাঁ, বিয়েটা যদি আমার হয় সেটা আমাকেই করতে দে। প্রমিস করছি বরযাত্রীর নেমন্তন্ন পাবি। পেয়ে যাবি।'

আমি শান্তির জল ছিটোতে থাকি—'এই জ্যোতি, যা যা তুই শুধুমুধু রেগে যাচ্ছিস। আচ্ছা, তোর পয়েন্টগুলোও তো একটু খোলসা করে এক্সপ্লেন করতে পারিস। জানতে পারলে আমার সুবিধে হত।'

জ্যোতি বলল—'তা তুই জানতে চাইতে পারিস তপনা। সে এক্তেয়ার তোর আছে। বলি জেলা-ইস্কুলে বরাবর ফার্স্ট হয়ে গেছে কে? আমি না তুই?'

—'তুই।'

—'দস্তুরমতো ভায়া কমপিটিশন, ভায়া প্রপার চ্যানেল মাটিয়া কলেজে ঢুকেছি। নো বাবা-মামা-কাকা বিজনেস! সত্যি কি না?'

—'ওহ শিওর, শিওর।'

—'নাইনটি পার্সেন্ট বাঙালীর মতো জিয়ার্ডিয়া আর অ্যামিবিক ডিসেন্টরিতে ভুগি না। ফার্স্ট ক্লাস ফুটবলে খেলেছি। ইদানীং জ্যোতিশংকর ডাট ছেড়ে দেবার পর তোদের ক্লাব ফার্স্ট ক্লাস সকার থেকে অর্ধচন্দ্র খেয়েছে? এ শর্মাকে রিপ্লেস করতে পারিসনি। ঠিক কিনা?'

—'ঠিক।'

—'বিড়ি-সিগারেট-গাঁজা-চরস পান-জর্দা বিয়ার হুইস্কি চলে না। অর্থাৎ ট্যাঁকের পয়সা চট করে ফুঁকে দিচ্ছি না। ক্যানসারের চান্স মোটে ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট।'

—'এটা জানি না ভাই।'

—'আচ্ছা, যা জানিস না তেমন আরও কটা বলছি। শুনে যা। ডাউরি সিসটেম ওঠেনি, পুরোদস্তুর চালু। যে কোনও বিয়ের দলিলে বিটুইন দা লাইনস অদৃশ্য কালি দিয়ে লেখা থাকে। আমি, ফর ইয়োর ইনফর্মেশন, এক নয়া পয়সাও নিচ্ছি না। ফ্রীজ, টিভি, সোনার বিস্কুট এ বিয়েতে ট্যাবু।'

—'বাঃ বাঃ', আমি প্রশংসায় বিগলিত।

—'আরও শোন। যে যতই যাই বলুক মেয়েরা শ্বশুর-শাশুড়ি- জা-ননদ- দেওর-ভাসুর পছন্দ করে না, কেমন তো?'

—'তা যা বলেছিস।'

—'আমি ঝাড়া হাত পা। আছেন খালি এক পিসীমা। তা তিনি হলেন গিয়ে সেই গরু যে খাবে কম, দুধ দেবে বেশি... ইত্যাদি ইত্যাদি। নিজের জপতপ, নিরামিষ হেঁশেল নিয়ে আছেন। তবে?'

—'তবে কি?'

—'তবে আমি একটা মনের মতো বিয়ে করতে পারব না কেন? বুঝিয়ে দে।

শিক্ষিত, খুব উচ্চশিক্ষিত নয়, স্মার্ট, ওভারস্মার্ট নয়, সুশ্রী। প্রকৃত সুন্দরী-টুন্দরী দরকার নেই। সপ্রতিভ অথচ নাক উঁচু নয় এমন একটি সহধর্মিণী যিনি আমার পাশে বেশ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন। খুব বেশি চাইছি ?'

—'মোটেই না', আমি উৎসাহ দিয়ে বলি, 'তা পাচ্ছিস না ?'

—'না। উদাহরণ দিই শোন। তোর ওই শৈল গোরা যাই বলুক না কেন। বালিগঞ্জে মেয়ে দেখতে গেছি। বেশ হাসি-খুশি, মিষ্টি-মিষ্টি, চটপটে, তোদের মতো মিটমিটে ফন্দিবাজদের হ্যান্ডল করতে পারবে মনে হচ্ছে। মডার্ন বাড়ি। অভিভাবকরা কথা বলবার সুযোগ দিয়ে আড়ালে আবডালে অপেক্ষা করছেন। জিগগেস করলুম—'আপনার হবি কি ?' একগাল হেসে বললে, 'মার্কেটিং। মার্কেটিং করতে না আমার ভী-ষণ ভালো লাগে।' বোঝ তপনা। এ হবির ফুল ইমপ্লিকেশনটা ভালো করে বোঝ। বিষম খেয়ে জল চাইলুম। স্ট্রীট-সিঙ্গারদের হারমোনিয়মের মতো প্যাঁ পোঁ করে বললে—'ব্যা-রা, সাবকো বাস্তে পানি লাও।' মনশ্চক্ষে দ্যাখ তপন, সারাদিন গাধার খাটুনি খেটে, হাজারটা রোগ আর রোগী ঘেঁটে কেটেকুটে বাড়ি ফিরে জল চাইছি, আর গিন্নি সেজেগুজে মার্কেটিং সেরে মানে পয়সাগুলো স্রেফ ফুঁকে দিয়ে ফিলিম ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতে ওলটাতে মেমসায়েবি কেতায় হেঁকে বলছে—'ব্যা-রা পানি লাও।' লাইফ যে হেল হয়ে যাবে রে !'

আমি বললুম—'বেশ, এ তো গেল একটা। আরগুলো ? শুনলুম ডজন ডজন মেয়ে দেখেছিস ?'

—'হুঁ। শৈলরা তোকে বেশ বায়াসড্ করেই বাজারে ছেড়েছে দেখছি। তোকে জিগগেস করি তপন, তুই খোনা মেয়ে বিয়ে করবি ? করতে চাস তো বল। আমার হাতে অপূর্ব রূপসী মেয়ে আছে, এক্ষুনি লাগিয়ে দিচ্ছি।'

—'কি রকম ? কি রকম ?—জ্যোতির প্রত্যাখ্যাত সুন্দরী পাত্রী রিবাউন্ড করে আমার দিকে আসার সম্ভাবনায় আমি আগ্রহী হয়ে পড়ি।'

—"এ মেয়ে বউবাজারের। দুধে আলতা রঙ। গ্র্যাজুয়েট। পায়ের পাতাগুলো অবিকল পদ্মফুলের পাপড়ির মতো, বাড়িয়ে বলছি না তপনা। চোখদুটো লিটর্যালি স্যানসক্রিট কাব্য স্টাইল—জোড়া ভোমরা বসে আছে। নাম জিগগেস করলুম, বললে মিনতি মান্না। তখনও বুঝতে পারিনি। ম, ন সবই অনুনাসিক বর্ণ তো ? —'কোন্ কলেজে পড়েছেন ?' —'মণীন্দ্র নন্দী।' আবার ম, ন। গান শুনতে চাইলুম। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ডিগ্রি পাওয়া মেয়ে। গান শুনতে চাওয়া কি আমার অন্যায় হয়েছে বল ? গাইয়ে মেয়ের কাছে তো লোকে এমনি এমনিও শুনতে চাইতে পারে। তখনই শুরু হল নাসিকা বাদ্য বা নাক সানাই যা বলিস। যাঁও যাঁও যাঁও গোঁ এঁবাঁর যাঁবাঁর আঁগে রাঁঙিয়ে দিঁয়ে যাঁও। ওরে বাপ রে বাপ। তখন আমি যাওয়া ছেড়ে লেজ তুলে দৌড় লাগাতে পারলে বাঁচি।"

জ্যোতির প্রস্তাব পরদিনই ওর একটা মেয়ে দেখতে যাবার কথা। আমি যেন ওর সঙ্গে যাই। ওরও দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকলে সুবিধে হয়, আমিও ওর বিরুদ্ধে চার্জ শীট তৈরি হয়ে যাবার আগে চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করে আসতে পারি।

অতঃপর স্থান—উত্তর কলকাতা। কাল—সকাল সাড়ে নয়। পাত্র—জ্যোতিশংকর ডাট এম বি এম এস এবং অধম।

দেউড়িওলা পুরনো স্টাইলের বাড়ি। জ্যোতি চুপিচুপি বলল—'এদিকের বিখ্যাত মিত্তির বাড়ি রে ! প্রথমত মিত্তির কুটিল অতি। দ্বিতীয়ত বুর্জোয়া ফ্যামিলি। বুর্জোয়া

ব্যাকগ্রাউন্ড আমার পছন্দ নয়।' মনে মনে বললুম মরেছে। ব্যাকগ্রাউন্ডই পছন্দ নয় তো এলে কেন বাবা।

ধবধবে ধুতি মেরজাই পরা ফর্সা ফর্সা গোলগাল মাঝবয়সী ভদ্রলোক আমাদের এগিয়ে নিতে এলেন। ট্যাকসি থেকে নামালেন প্রায় জামাই খাতিরে। লম্বা দালান। দুদিকে পালিশ-করা কাঠের দরজা। মোটা মোটা পেতলের ডাণ্ডা থেকে ভারি ভারি পর্দা ঝুলছে। দালানের শেষ প্রান্তে একটা গোল চত্বর। দোতলার সিঁড়ি উঠে গেছে। কারুকার্যকরা সেকেলে কাঠের চেয়ার, পুরু গদী দেওয়া, মোরাদাবাদী পেতলের টপওয়ালা এক জমজমাট টেবিল। এইখানেই আমরা উপবিষ্ট হলুম। আমি বসেছি হাত-পা গুটিয়ে মাছ কুটুনির পাশে মেনি বেড়াল মেনি বেড়াল ভঙ্গিতে। জ্যোতি বসেছে সোজা, বুক চিতিয়ে, স্মার্টলি। ওর এখন এসব জল ভাত। অবশ্য পাঁচ দশে পঞ্চাশ প্লাস একের স্ট্যাটিসটিকসটা যদি সত্যি হয়। বসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির দাসী ট্রেতে করে খাবার নিয়ে এলো। ফুলকো ফুলকো সাদা-সাদা কচুরি, আলুর দম, মাংসের ঘুগনি, ক্ষীর... সর্বনাশ। এরা কি পাকা-দেখার খাওয়াটা আজকেই খাইয়ে দিচ্ছে।

জ্যোতি গম্ভীর মুখে বললে—'আমাদের তো এসব চলবে না।'

বড় মিত্তির বললেন—'সে কি বাবা, ইয়াং ম্যান, এটুকু আর খেতে পারবে না? সকালবেলা! জলযোগের সময়!'

জ্যোতি বাধা দিয়ে বলল—'আজ্ঞে পারব না তা তো বলিনি, বলেছি খাবো না। অন প্রিন্সিপল। পাত্রী দেখতে এসে ফাঁসির খাওয়া খাওয়াটা আমাদের সমাজের একটা বিশ্রী রীতি। খুব দৃষ্টিকটু এবং ক্রুয়েল।' অর্থাৎ প্রগতি সঙ্ঘের সব কথাই কানে গেছে জোতেটার। বেশি করে সাধু সাজা হচ্ছে আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে, যাতে গিয়ে রিপোর্ট করতে পারি।

অনেক উপরোধে একটা রাজভোগ তুলে নিল জ্যোতি। আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে বলল—'তুমি খাও না তপন, তুমি তো ভাই থার্ড পার্সন। এঁরা খুব অতিথিবৎসল, মনে দুঃখু পাবেন।'

দুই মিত্তির বললেন—'ঠিক বাবা, তুমি শুরু করো। ও কি কথা, সম্বন্ধ হোক চাই না হোক, একটু সামান্য জলযোগ করাতে কি দোষ?'

আমি মোটেই ওর ও চালে ভুললুম না। মহা ধড়িবাজ ছোকরা। একটা বালিশের মতো চিত্রকূট তুলে নিয়ে আমিও সব প্রত্যাখ্যান করে দিলুম।

তারপর সামনের সিঁড়ি দিয়ে, যাঁর জন্য আসা সেই দ্রষ্টব্যা কন্যাটি নেমে এলেন। আহা! আহা! আহা! দ্রষ্টব্যা তো নয় দর্শনীয়া! নেমে আসা তো নয় অবতরণ! এদেরই বোধ হয় সংস্কৃত সাহিত্যে বরবর্ণিনী বলত। বর বর্ণই বটে। ক'পুরুষ রূপটান মেখে মেখে যে এরা চামড়ার এমন জেল্লা পায়! আগাগোড়া চেহারাটি যেন পলসনের মাখন দিয়ে গড়া। খোলা চুল কোমরের একটু ওপর অবধি এসে থেমে গেছে। মাথার পেছনে চমৎকার একটি চালচিত্তির। সাদা লাল পাড় শাড়ি, সাদা ব্লাউজ, কপালে একটি সূক্ষ্ম কুমকুমের টিপ ছাড়া কোনও প্রসাধন নেই। কানের লতিগুলো পর্যন্ত দোপাটির পাপড়ির মতো ভিজে ভিজে নরম নরম।

খুব সহজভাবে এগিয়ে এসে নমস্কার করে মেয়েটি বসল। বিনা ভূমিকায় মিষ্টি হেসে বলল—'আমি যশোধরা মিত্র। গত বছর বেথুন থেকে বটানি অনার্স নিয়ে বি এসসি পাশ করেছি। এখন সায়েন্স কলেজে এম এসসি করছি। এক বছর চিকেন-পক্সের জন্য

পরীক্ষা দিতে পারিনি। আমার একুশ বছর বয়স।'

জ্যোতির মুখে কথা নেই। আমারও না।

একটু পর মেয়েটি আবার তেমনি সহজভাবেই বলল—'আমি গান খুব ভালোবাসি। বিশেষত ইনডিয়ান ক্ল্যাসিক্যাল। অ্যাপ্রিশিয়েট করবার মতো শিখেছি, গাইবার মতো শিখিনি। সেলাই করতে একদম ভালোবাসি না। ডিসকো-মিউজিক পছন্দ করি না। দেশ-বিদেশের রান্না করতে পারি। বাড়িতে শেফ রেখে শিখেছি। ডাল-ঝোল-সুক্তো-চচ্চড়ি ঠাকুমার কাছে।'

জ্যোতি কিছু বলছে না। আমিও না।

বড় মিত্তির বললেন—'তোমরা কিছু জিগগেস করবে না ? লজ্জা-সঙ্কোচ কোরো না। আমরা দু ভায়ে না হয় একটু সেরেস্তায় গিয়ে বসি। কাজকর্মও আছে তো আবার।'

জ্যোতি হাত তুলে বলল—'না না-না-না-না-না। আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

ছোট মিত্তির বললেন—'বেশ তো তোমরা একটু নিরিবিলিতে আলাপ-সালাপ করতে !'

'কোনও দরকার নেই,' জ্যোতি বলল, —'যা বলার উনি তো নিজেই সুন্দর গুছিয়ে বলে দিলেন। যা জানবার পরিষ্কার জেনে গেলুম। তা ছাড়া আমাদের দেখাও তো হয়ে গেছে।'

আড়চোখে তাকালুম। এ মেয়েটি কি আবার ওভার স্মার্টের ধাক্কায় পড়ল ? যা স্ক্রু-ঢিলে ছোকরা। কিন্তু শুনলুম জ্যোতি বলছে—'আমাদের পছন্দ হয়ে গেছে। অভিভাবক নেই তাই নিজ মুখেই বললুম কথাটা, মনে কিছু করবেন না। আপনাদের যখন সুবিধে দিন ঠিক করুন। তবে তিন মাসের মধ্যে। বরং ইতিমধ্যে আমার সম্বন্ধে যদি ফার্দার কিছু জ্ঞাতব্য বা জিজ্ঞাস্য থাকে...'

দু'ভাই ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন—সে কি কথা ! সে কি কথা ! তোমার সম্পর্কে সমস্ত খোঁজখবর না নিয়ে কি আর আমরা অ্যাদ্দূর এগিয়েছি ! তুমি যখন কথা দিয়ে দিলে, তখন বাড়ির মেয়েদের বলি, ঠাকুরমশাইকে ডাকাই। বাঃ, খুব চমৎকার চুকে গেল তো ব্যাপারটা !' দু'ভাই যৎপরোনাস্তি খুশি হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

জ্যোতি মুখ ফিরিয়ে এবার পাত্রীর দিকে তাকাল।

—'আমার কথা তো শুনলেনই। আপনাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করার একটা চান্স দেওয়া উচিত। আপনার কিছু বলার নেই ?'

মেয়েটি হাসিমুখে বলল—'হ্যাঁ।'

—'বলুন কি জিগগেস করবেন।'

—'কিচ্ছু জিগগেস করব না, শুধু একটা কথা বলব। আমি বিয়ে করব না।'

মেয়ের বাবা কাকা দুজনেই হাঁ-হাঁ করে উঠলেন—'কী বলছিস রে খুকি! বিয়ে করবি না কখনও তো বলিসনি !'

—'করব না তো বলিনি। এখানে করব না।'

—'কেন মা, তোকে তো সব জানিয়েছিলুম।'

—মেয়েটি কিছু না বলে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

—'তবে কি তোর পছন্দ হয়নি।'

—'না।'

জ্যোতি গোঁ ধরে বসেছিল বিয়েই করবে না। কতলোক তো চিরকুমার হয়ে, ব্রহ্মচারী

হয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়। তাদের দিন কি এমন মন্দ কাটে ? তা ছাড়া সবাই যদি সংসার ধর্ম করবে তো দেশের কাজ, দশের কাজ করবেটা কে শুনি ? এই হতভাগা দেশে প্রজাবৃদ্ধি করেই বা কি লাভ ? ডাক্তারের লাইফ এক হিসেবে ডেডিকেটেড লাইফ। বিয়ে করলে সাধনায় বিঘ্ন হতে পারে ! জ্যোতির গার্হস্থ্য-সুখ-ত্যাগে গ্রামে গ্রামে, গঞ্জে-গঞ্জে কতো দরিদ্র, চিকিৎসা বঞ্চিত, মূঢ়-ম্লান-মূক মুখে হাসি ফুটবে। বিবেকানন্দ, বিধান রায় বলে গেছেন... ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেক করে বোঝানো হল চোরের ওপর রাগ করে কি কেউ মাটিতে ভাত খায় ? সব শুনে এমন কি খোদ কার্যনির্বাহিক কমিটি পর্যন্ত বোঝাতে এসেছিল। হাজার হোক বন্ধু লোক। ডিপ্রেশনে ভুগছে, বন্ধুদের একটা মানবিক দায়, একটা নৈতিক দায়িত্ব নেই ? বিবাদ যা ছিল সে ইডিওলজিক্যাল, বাস্তবের মানবিক দাবীর কাছে ইডিওলজি ? আদালত থেকে কেস তুলে নেওয়া হয়েছে। সত্যিই ছেলেটার একটা বিয়ে দরকার। তিনসংসারে কেউ নেই। এক বৃদ্ধা পিসীমা। তিনি চোখ বুজলে দুটো ভাত রেঁধে দেবে কে ? সারাদিন হাসপাতাল ঠেঙিয়ে ছেলেটা শুকনো মুখে চেম্বারে বসে থাকে।

জ্যোতির জন্যে আমার দ্বিতীয় মেয়ে দেখা দক্ষিণ হাওড়ায়। শুধু আমি নই। এবার আমরা। আমি, শৈল, বিমান, গোরা, মুরারি, শিবে এবং জ্যোতি স্বয়ং তো বটেই। আমরা এতোজনে যেতে ইতস্তত করছিলুম। কিন্তু কন্যাপক্ষ নাকি পই পই করে বলে দিয়েছে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও সঙ্গে নিয়ে যেতে।

মাঘ মাসের সন্ধে। ধোঁয়ায় চারদিক ধোঁয়াক্কার। ভারতবর্ষের শেফীল্ড সগর্বে ধূম্র-উদগীরণ করে ভারি বাতাসে দিব্যি একটি ধূম্রজালিকার চাঁদোয়া বিছিয়ে দিয়েছে। তার নিচ দিয়ে আমরা পাত্রী সন্দর্শনে সবেগে ধাবিত হচ্ছি। গলির গলি, তস্য গলি। ঢুকছি তো ঢুকছি, বেঁকছি তো বেঁকছিই।

মুরারি বললে—'শ্ শালা। এ যে দেখছি শহরের স্মল ইনটেসটিন ! আর ক' গণ্ডা টার্ন নেবে বাবা ! মুখস্থ করতে করতে চল্ রে জোতে, জামাই-ষষ্টীর দিন "কিছু মিছু" মাথায় নিয়ে মহা বেকায়দায় পড়ে যাবি নইলে, আই মীন বিয়েটা হলে।"

গোরা বলল—'ডাইনে পানা-পুকুর, বাঁয়ে ভাগাড়, বাঃ। ইলেকট্রিক্যাল ফিটিংস এর দোকান বাঁয়ে রেখে ঢুকছি। টিউবওয়েল, লাইন পড়েছে, মিউনিসিপ্যালিটি জল দেয়নি মনে হচ্ছে, 'শ্রী নিবাস', ওল্ড হাওড়া স্টাইল, নতুনদার কায়দায় বলতে ইচ্ছে করছে "ছিরিনিবাস।" টিউবওয়েল নাম্বার টু, লোক নেই, অর্থাৎ ঘটাং-ঘটাং না-ই রস না—ই। ডাইনে বেঁকলুম রাখোহরি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের পাশ দিয়ে, বাপ রে গলির মধ্যে যে পেল্লায় নার্সিংহোম হাঁকিয়েছে রে। বাঁ-ডান, বাঁ-ডান, একি রিপাবলিক ডে'র কুচকাওয়াজ প্র্যাকটিস করাচ্ছে ! সেন্ট এলিজা নার্সারি স্কুল। সেন্ট এলিজাটি আবার কে রে ? সেন্ট কি চাদ্দিকে ব্যাঙের ছাতার মতো গজায় ?'

ব্লাইন্ড লেন। বিরাট গেটওয়ালা দুর্গের মতো দুর্ধর্ষ বাড়ি। আমাদের ট্যাকসিটা দাঁড়াতেই দু-তিনটে অ্যালসেশিয়ান আর গ্রে-হাউন্ড গাঁউ-গাঁউ করে গম্ভীর অভ্যর্থনা জানাল। বিরাট হাতা। অনেকটা হেঁটে পাত্রীর বাবা এবং আরও বিস্তর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ভেতরে ঢোকা গেল। জ্যোতি চুপিচুপি বলল—'যৌথ পরিবার, যদ্দূর শুনেছি তিনপুরুষ একসঙ্গে থাকে। তা এ মেয়ে আমার আপনি-মোর-কপনির বাড়িতে থাকতে পারবে তো রে ?'

গোরা বলল—'তুই চুপ যা।'

হলঘরের মতো বৈঠকখানা। একদিকে বিরাট চৌকির ওপর ফরাস পাতা। তাকিয়া-টাকিয়া দিয়ে জমিদারি ব্যাপার। তিন-চারটে তাসের প্যাকেট পড়ে আছে। অর্থাৎ নিয়মিত তাসের আড্ডা বসে। অন্যদিকে সোফা-কৌচ। সেখানেই আমাদের আদর করে বসানো হল। পরিচয়ের আদান-প্রদান, আসুন-বসুন, কি সৌভাগ্য। খাতিরের চোটে আমাদের নিজেদের এক-একটা নবাবজাদা মনে হতে লাগল। একটি বাচ্চা ছেলে এই শীতের মধ্যে খানিকটা গোলাপজল স্প্রে করে গেল, আর একজন রুপোর রেকাবিতে তবক-দেওয়া মিঠে পান দিয়ে গেল। ওদিকে ঘড়র-ঘড়র করে জেনারেটর চলছে, তিন সেট ঝাড়বাতি। এলাহি ব্যাপার।

অন্দরের দিকের দরজার পর্দাটা নড়ে উঠতেই শৈল চুপিচুপি বলল—'এই তপন, আমার কিন্তু খেতে-টেতে খুব লজ্জা করবে যাই বলিস। এ মেয়েটাও যদি জোতেকে নো করে দেয় ?'

কিন্তু না। খাবার-দাবার নয়, মেয়েই এলো। বাঃ। প্রথম দর্শনেই আমাদের সব্বার একযোগে পছন্দ হয়ে গেল। বাগবাজারের মেয়েটির মতো রূপসী বলাকা হয়তো নয়। কিন্তু মেয়েলি প্রবাদ-বাক্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করে—নাকটি চাপা চোখটি ভাসা এ মেয়েটি দেখতে সত্যিই খাসা। জোতের সমান সমান। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। ঢেউ খেলানো চিকণ চুল। বড় বড় পল্লব ঘেরা কালো চোখ। আসল কথা, দেখবামাত্র ভালো লেগে যায়। চোখে চোখে ইশারা হয়ে গেল এখানেই ফাইন্যাল। আমি মনে মনে নিজের পিঠ চাপড়াতে লাগলুম। যবে থেকে আমি দেখতে আসছি তবে থেকেই জ্যোতির ভাগ্য খুলে গেছে। মেয়েটি একটু ঘাবড়ে গেছে মনে হল। চোখ নিচু করে রইল। নমস্কারও করল না।

শিবুই গলা-খাঁকারি দিয়ে জিগগেস করল—'আপনার নামটা যেন কি ?'

মেয়ের বাবা বললেন—'ললিতা।'

শিবু বলল—'পড়াশোনা কদ্দূর করেছেন ?' বড় বড় কথা বলা সত্ত্বেও শিবেটা সনাতন পদ্ধতিতে এগোচ্ছে।

মেয়ের জ্যাঠা বললেন—'বি এ তো পাশ করে গেছে বাবাজি। চিঠিতে তো সব খুলে লিখেছিলুম ! ডিগ্রি-টিগ্রিগুলো আনব ? ওরে মদ্না, তোর খুড়িমার কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে মার্কশিট-টিটগুলো নিয়ে আয় তো !'

আমরা সবাই সমস্বরে--'না না ওকি কথা, না না সে কি কথা,' করতে থাকি।

শিবু ইনটারভিউটা একচেটে করে নিচ্ছে দেখে এই সময়ে বন্ধুদের মধ্যে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। বিমান তাড়াতাড়ি জিগগেস করল—'কোন কলেজে পড়েছেন ?' গোরা বলল, 'কি কি সাবজেক্ট ছিল ?' শৈল বলল—'এম এ-টা পড়লেন না কেন ?'

এক বৃদ্ধ, খুব সম্ভব পাত্রীর দাদু, দাড়ি নেড়ে ফোকলা মুখে ফকফক করে বললেন—'আজকাল তো অনার না হলে এম এ পড়তে দেয় না, জানো না বাবারা ! তাই তো দিদিভাইয়ের আমার ইউনিভার্সিটিটা আর দেখা হল না। নইলে ছাত্রী কি খারাপ ছিল ? ডিস্টিংশন তো ক'নম্বরের জন্যে ফসকে গেছে !'

এই সময়ে ভেতর থেকে পাকামাথায় সিঁদুর এক মোটাসোটা মহিলা গুচ্ছের কাগজপত্র এবং পর্বতপ্রমাণ টেবিল ক্লথ , ট্রে ক্লথ, রুমাল, শার্ট, প্যান্ট, পাঞ্জাবি ইত্যাদি নিয়ে ঢুকলেন। মেয়ের স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত সমস্ত প্রোগ্রেস রিপোর্ট, সার্টিফিকেট, মার্কশীট এবং সূচীকর্ম। খুলে খুলে প্রত্যেকটি দেখাতে লাগলেন সবাই। ভদ্রমহিলা

ঘোমটা টেনে বললেন—'নিজের নাতনি বলে বাড়িয়ে বলচি না বাবা, ললির মতো লক্ষ্মী মেয়ে আমাদের এতো বড় বংশেও আর দ্বিতীয় নেই। লেকাপড়া তো শিকেইচে, ঘরের কাজ-কর্মে একেবারে এসপাট। ইকিবেন শিকে ফুল দিয়ে ঘর যা সাজায় দেখলে চক্ষু জুড়িয়ে যাবে। এইসব সেলাই-ফোঁড়াই অন্য লোকের করা ওর বলে চালাচ্চি মনে কর না বাবা, সব নিজ হাতে একটি-একটি করে করেচে। যেমন ছুঁচের কাজ, তেমনি কাটিং।'

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখলুম নিচের ঠোঁটটা সজোরে কামড়ে ধরেছে। জ্যোতি আমার কানে কানে বললে—'ওসব সেলাই-ফেলাই রাখ তপন। আমি কি দর্জি খুঁজতে এয়েচি নাকি ? গলার আওয়াজটা খুব ইমপর্ট্যান্টি। পদ্মিনী মেয়ের স্বর হবে সেতারের মতন। এ যে কথাই বলে না রে ? এতো লজ্জাশীলা হলে তো আমাকে না করে আমার দাদুকে বিয়ে করলেই পারত !'

ওর নির্দেশমতো জিগগেস করলুম—'ইকেবানা শিখেছেন কার কাছে ?' মেয়ে চুপ। আমাদের ধারণা ঠিক। জ্যাঠা-বাবা-কাকা-দাদুরা উত্তরটা জানেন না। মেয়েটি যেন কেমন-কেমন চোখে জ্যোতির দিকে তাকাল। চোখদুটো ছলছল করছে।

জ্যোতি বলল—'জাপানী মহিলা ?'

মেয়ে ঘাড় নাড়ল।

—'কি নাম ভদ্রমহিলার ? আমারও খুব শেখবার ইচ্ছে কি না তাই জিগগেস করছি।'

সবাই চুপ। মেয়েটি দু-একবার ঠোঁট ফাঁক করল। ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে। ঘড়ির কাঁটা তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। পাঁচ মিনিট পার। দশ মিনিট পার। আমরা সবাই ঘামছি।

জ্যোতিই প্রথম উঠে দাঁড়াল। সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করে বলল—'আচ্ছা, তবে চলি।'

যেন হিমঘরের নীরবতার মধ্যে দিয়ে আমরা এগোচ্ছি। বাইরের দিকের দরজা দিয়ে জনাদশেক লোক ঢুকে এল। শেষজন ঢুকল কোলাপসিব্‌ল গেটটা সশব্দে টেনে দিয়ে।

—'কোথায় চোললেন দাদারা ? অ্যাতো তাড়া কিসের ?' কথায় হিন্দুস্থানী টান। ইয়া ছাতি, ইয়া গুল।

—'মেয়ে কেমোন দেখলেন ?'

মুরারি চড়া গলায় বলল—'ডিফেকটিভ মেয়ে গছাবার তালে ছিলেন আবার কেমন দেখলুম জিগ্‌গেস করছেন ?'

—'কিসের ডিফেক্‌ট ?'

—'কিসের ডিফেক্ট আপনিও জানেন, আমিও জানি।'

—'কাকে চোখ রাঙাচ্ছেন দাদা তোখন থেকে ?' বলতে বলতে একজনের হাত জ্যোতির কলারে উঠে এলো।

গায়ে হাত তুলছে যে ? আমরা প্রগতিরা হাঁ-হাঁ করে এগিয়ে যাই। দশ ষণ্ডামার্কা বজ্রমুষ্টিতে আমাদের হাত ধরে ফেলে। একজন ঠাণ্ডাগলায় বলে—'যোগাড় যোন্তোর সোব রেডি। মোন্তোরগুলো পোড়ে লিয়ে বেরুবে, আগে নোয়।'

—'মানে ?'—আমাদের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। গোরা-শৈল-বিমান আস্তিন গোটাতে থাকে। —'জোর করে বিয়ে দেবে ? মগের মুলুক নাকি ? পুলিশ নেই ?'

—'সেই কোথাই তো বলছিলাম দাদা ?' ষণ্ডামার্কতম একটা নীলচে পিস্তল লোফালুফি করতে করতে হেসে বলে—'হুমুর ডেরায় পুলিশ ভি ঘুঁষতে ভোয় পায়, আর

আপনেরা তো জেনারল্ পাবলিক আছেন।'

এই সময় সেই দাড়িঅলা দাদু এগিয়ে এসে বললেন —'কিছু মনে কর না বাবারা, এরা ললিদিদিকে বড্ড ভালবাসে। নাতনির আমার কোনও খুঁত নেই। পার্ট ওয়ান পরীক্ষার পর বরশুলে মামাবাড়ি গিয়ে যে কি সর্বনেশে জ্বর নিয়ে এল, ডাক্তার ধরতে পারলে না। পনের-ষোল দিন যমে-মানুষে টানাটানি। ফিরে এল বটে কিন্তু সেই থেকে দিদি আমার নীরব। ফিসফিসিয়ে বই কথা বলতে পারে না, কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন বৃদ্ধ, 'তুমি ডাক্তার বলেই আরও তোমার ওপর ওর বাপমায়ের ঝোঁক ভাই। ডাক্তার হয়ে যদি একটা নিদ্দুষী মেয়েকে এ বিপদ থেকে বাঁচাতে না পারো তবে আব কেন লাখ লাখ টাকা খরচ করে সরকার তোমার মতো সোনার চাঁদদের ডাক্তার করে? তোমার হাতযশে আর পয়ে ওর ও-রোগ তো সেরে যেতেও পারে, জন্মগত তো আর নয়। আমি বৃদ্ধ মানুষ। বলছি তোমার মঙ্গল হবে।'

মেয়ের বাবা বললেন—'তোমাকে আমরা চৌরঙ্গিতে চেম্বার সাজিয়ে দেব বাবাজীবন। আড়াই লাখ টাকা এক্ষুনি তোমার নামে ব্যাঙ্কে ট্রানসফার করে দিচ্ছি। কাগজপত্র রেডি।'

—'টাকার লোভ দেখাচ্ছেন আমাকে? ছি! ছি! ছি! টাকা দিয়ে জামাই কিনবেন? টাকা দিয়ে মানুষ কিনতে চান?'

—'টাকার লোভ ঠিক দেখাইনি বাবা। তা হলে তো আরও আগে মেয়ে পার করতে পারতুম। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব? মেয়ের উপযুক্ত জামাই খুঁজছিলুম বাবাজি। নইলে টাকাটা গাপ করে বৌকে ত্যাগ করে কি তার ওপর অত্যাচার করতে কতক্ষণ? এতো আখচার হচ্ছে আজকাল।'

—'আমি তা করব না জানলেন কি করে?' জ্যোতি তেরিয়া।

—'সে তুমি পারবে না বাবাজি। তোমার সম্পর্কে আমরা খুঁটিয়ে খোঁজ নিয়েছি। এমন কি তোমার এই বন্ধুদের সম্পর্কেও। এই "অগ্রগতি সঙ্ঘ" না কি? বন্ধু দিয়েই মানুষের পরিচয় এমনি একটা ঋষিবাক্য আছে না? বলো না বাবাজিরা! তোমরা কি তোমাদের বন্ধুকে অ্যাতো বড় একটা অন্যায় করতে দেবে?' সম্ভাব্য অন্যায়ের ব্যাপারটা যে সম্পূর্ণ একতরফা, এ বিষয়ে দেখলুম ভদ্রলোকের বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

পূর্বোক্ত ষণ্ডামার্কাদের একজন এই সময়ে বাড়ির ভেতর থেকে একটা চওড়া পাড় বেনারসি জোড় আর একটা জমকালো টোপর নিয়ে ঢুকে গ্রাম্ভারি চালে বলল—'কুর্তা-পাৎলুন ছেড়ে এ সাড়ি পোরে লিন জলদি। টোপর লাগিয়ে লিন। কনে রেডি।' হাঁ হাঁ করতে করতেই ছন্নু এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের দুর্ভেদ্য ব্যূহর মধ্যে জ্যোতির বস্ত্রহরণ এবং বস্ত্র পরিবর্তন পালা সমাধা হল অ্যালসেশিয়ান কুলের গাঁউ গাঁউ রবের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের মধ্যে দিয়ে। আমাদের কুংফু, ক্যারাটে কিচ্ছু কাজে লাগল না। হাতে হাতেই অন্দরে পাচার হয়ে গেল জ্যোতে। একটু পরে আমাদেরও ডাক পড়ল। যদিদং তদিদং করে জ্যোতিশংকরের বিবাহ-পর্ব চুকে গেল।

মেজাজে আছে জ্যোতি। অন্তত আমি তো তাই দেখছি। চৌরঙ্গিতে রাজোয়াড়া চেম্বার। চেম্বারই রুগী টানছে। এর পর হাতযশ চাউর হয়ে গেলে পসার মারে কে? ফি মাসে জ্যোতির শ্বশুরবাড়িতে প্রগতি সঙ্ঘর নেমন্তন্ন বাঁধা। ওর শ্বশুরমশাই অবশ্য কক্ষনো প্রগতি বলেন না, বলেন অগ্রগতি। উনি নাকি 'অগ্রগতি'র ভরসাতেই মেয়ে দিয়েছেন। সুতরাং জ্যোতির চাইতে অগ্রগতির খাতিরই ওর শ্বশুরবাড়িতে বেশি।

মোগলাই, চীনে, গোয়ানীজ ভোজ হয়ে গেছে। পরের মাসে শুনছি ফরাসী কুইজিন। জ্যোতি বড় বড় ই এন টি দেখাচ্ছে। ভেলোরে নিয়ে যাবে শীগগির। সেখানে কিছু না হলে ভিয়েনা। তবে জনান্তিকে আমায় বলেই রেখেছে —'দ্যাখ তপন, সারলে ভালো, না সারলে আরো ভালো। মেয়েদের কথা বলার চান্স দিয়েছিস কি মরেছিস!'

সবর্ণ

সবেমাত্র আলোটা জ্বেলে দিয়ে সারাদিনের পর একটা পত্রিকা হাতে একটু গা এলিয়েছেন সুমিত্রা, ঝপ করে বিদ্যুৎ পিঠ-টান দিল। সদর দরজার কড়াটাও সঙ্গে সঙ্গে যেন ষড়যন্ত্র করেই খটাখট নড়ে উঠল। বাইরে ধোঁয়াশার পিঠে ভর দিয়ে উঁচিয়ে আছে মধ্য পৌষের দমচাপা, হিমেল সন্ধে। কাজের লোক, মুনমুনের বাবা কেউ এ সময়টা বাড়ি থাকেন না, শুধু তিনি আর মেয়ে। এই পরিস্থিতিতে দরজার কড়া নড়া টড়া একেবারেই মনঃপূত নয় তাঁর। বহুবার শিবনাথকে বলেছেন একটা ম্যাজিক-আইয়ের ব্যবস্থা করতে। সন্ধে হোক আর যাই হোক, কড়া-নাড়া মানুষটার আবছা আদলও তো বোঝা যায়! তা এসব তুচ্ছ বৈষয়িক কথাবার্তায় সে ভদ্রলোক কান দিলে তো! মাইক্রো অথবা ম্যাক্রো এই দুই চরম জগতেই তাঁর ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ। মধ্যবিত্ত ব্যাপার চট করে শ্রুতিগোচর হয় না।

অগত্যা জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন সুমিত্রা। —'কে?' গলার আওয়াজে যদি জানান দেয়।

—'আমি!' নিচ থেকে উত্তর এল।

—'কোন আমি রে?'

—'আমি পার্থ, কাকিমা।'

গলা শুনে বুঝতেই পেরেছিলেন। তবু নিশ্চিন্ত হয়ে নিলেন। বাইরে এখন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সাবধানের মার নেই।

আজ সন্ধেতেই পার্থ এমন হুড়মুড়িয়ে এসে পড়বে ভাবেননি সুমিত্রা। সকালবেলা কলেজ যাবার মুখে কাগজটা দিয়ে গিয়েছিল। গুণাবলীর বিস্তৃত বিবরণ। ওর নিজের। একটা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দরকার। দেবেন ওর কোন মাস্টারমশাই। লিখে, টাইপ করে নিয়ে যেতে বলেছেন, দস্তখৎ করে স্ট্যাম্প বসিয়ে দেবেন। তাই সুমিত্রার দ্বারস্থ হয়েছিল। ভালো করে গুছিয়ে লিখে দিতে হবে জিনিসটা। তা এখনও কাগজটা ভালো করে দেখবার সুযোগই পাননি তিনি। চারটে ক্লাস ছিল পরপর। তারপর মাঝখানে একটা মাত্র অফ দিয়ে আরও একটা। ডিপার্টমেন্টে লোক কম। এ সময়টা বিদায়ী সেকেন্ড ইয়ার আর প্লাস টু নিয়ে তাঁরা নাস্তানাবুদ হচ্ছেন। মুনমুনকে চেঁচিয়ে বললেন দরজাটা খুলে দিতে তারপর হারিকেনের আলোয় খুব ক্লান্ত চোখে কাগজটা মেলে ধরলেন।

হায়ার সেকেন্ডারিতে স্টার মার্কস। অঙ্ক এবং দুটো বিজ্ঞানে লেটার। এম টেক-এ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। এদিকে আবার মাউন্টেনিয়রিং-এ ট্রেনিং নিয়েছে। সাঁতারে

সার্টিফিকেট আছে। বাব্বাঃ, এতো সব এরা করে কখন ? ছেলে ভালো জানতেন, ডিবেটে স্কুলের প্রতিনিধিত্ব করেছে বহুবার। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে আরও এতো গুণ তা সত্যিই জানা ছিল না। এতোটা চৌখস দেখলে মনেও হয় না। লম্বায় বেশ ছাড়ালো হলেও ছেলেটার মুখে চোখে একটা মেয়েলি লাবণ্য, কর্কশকান্তি হয়নি এখনও। যুবক নয়, বরং যেন সেইসব কাকপক্ষধর কিশোর স্নাতকের মতই দেখায় ওকে—ডিগ্রিলাভের আগে আচার্যের প্রসাদ-লাভের আশায় যারা গুরুগৃহের সবরকম আবদার-অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করত। অথচ ফাইন্যাল পরীক্ষা পাশ করেছে তাও আজ বছরখানেকের ওপর হয়ে গেল। নিজের ছেলে নেই বলেই কি এ ছেলেটার ওপর কেমন একটা ঝোঁক সুমিত্রার ?

মুনমুনের সঙ্গে কথা বলতে ঘরে ঢুকলো পার্থ। এশিয়ান গেমসের ফলাফল নিয়ে খুব উত্তেজিত দুজনেই। সুমিত্রা বললেন—'তোর কাজটা এখনও হয়নি রে ! দেখবার সময়ই পাইনি সারাদিন। পাঁচ-পাঁচটা ক্লাস ছিল।'

—'তাতে কি হয়েছে ?' অপ্রস্তুত হয়ে বলে উঠল পার্থ। 'আমি আপনাকে তাড়া দিতে আসিনি কাকিমা, কাল কিংবা পরশু হলেও চলবে।'

—'কি কাজ রে ?' মুনমুন জিজ্ঞেস করল। এবং শুনেই ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিল কাগজটা। পরক্ষণেই চোখ বড় বড় করে বলল—'আরিস্ সাবাস। তোর নম্বর দেখে যে আমার মাথা ঘুরছে ? লেটারই মেরেছিস তিন-তিনটে ? অঙ্কেতেও ? নাঃ গুরুদেব লোক তুই, পায়ের ধুলো দে।'

—'আঃ মুনমুন !' আজকালকার মেয়েদের এইসব চ্যাংড়া-চ্যাংড়া পুরুষালি বুলি একদম পছন্দ হয় না সুমিত্রার।

পার্থ বলল—'কেন, তুই কত পেয়েছিলি ?'

—'শুনলে তোরও মাথা ঘুরবে, তবে উল্টো বাগে।'

—'বল না কতো ?'

সুমিত্রাই বললেন—'কত আবার পাবে, পঞ্চান্ন না ছাপান্ন।'

পার্থ বলল—'বাঃ বাঃ। চমৎকার পেয়েছিস তো ! মেয়েরা অঙ্কে একটু কাঁচাই হয়, বাংলা-টাংলা হিস্ট্রি-টিস্ট্রি পড়বে, ক্ষতি কি ?'

মুনমুন রেগে বলল—'আর আমাদের ফার্স্ট গার্ল যে বিরানব্বই পেয়েছে, তার বেলা ? আমি কাঁচা বলেই অমনি সমস্ত মেয়ে-জাতটাই অঙ্কে কাঁচা হয়ে গেল ? সাধে কি তোকে হাঁদা বলি !'

পার্থ বলল—'রাগ করছিস কেন ! কথাটা আমার না, সমাজবিজ্ঞানীদের। রীতিমত স্ট্যাটিস্‌টিক্স নিয়ে দেখা গেছে। আমি শুধু কোট করছি, বুঝলি বুদ্ধু !'

ঝগড়া করতে করতেই বেরিয়ে গেল দুজনে। মুখে একটু অন্যমনস্ক হাসি নিয়ে অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকলেন সুমিত্রা। এ তো ভালো ! ছেলেবেলায় ওরা রীতিমত চুলোচুলি করত। এখন আর পার্থর মাথায় মুনমুনের হাত পৌঁছয় না। অন্তত এক হাত উঁচু। তাই-ই বোধহয় সম্পর্কটা খুনসুটিতে দাঁড়িয়েছে। সুমিত্রারা ছিলেন চার ভাই বোন। চুলোচুলি করবার লোকের অভাব ছিল না বাড়িতে। ছোটবেলার মারামারির চিহ্ন এখনও তাঁর হাতে আর পিঠোপিঠি ভাইয়ের গালে রয়ে গেছে। ভাইবোনের এইসব বাল্যকালীন চুলোচুলির স্মৃতিও যে কতো গুপ্তসুখের বন্ধ দরজা মন্ত্রবলে খুলে দিতে পারে তা তাঁর অজানা নেই। চেষ্টা-চরিত্র করেও মুনমুনের একটা সঙ্গী জোটাতে পারেননি

তিনি। প্রথম সন্তানই বহু কষ্টের। ডাক্তার বলেই দিয়েছিলেন আর আশা নেই। তা নয়ত গড়পড়তা মায়ের মতো একটি পুত্রসন্তানের আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল বইকি ! মুনমুনের বাবা অবশ্য বলেন—'ভালোই হয়েছে। বিয়ে দিয়ে দোব, চুকে যাবে। বদসঙ্গে পড়ল কি-না, পলিটিক্সের খপ্পরে পড়ল কি-না দেখতে হবে না।' যেন মেয়েরা আর বদসঙ্গে পড়ে না, রাজনীতি করে না।

কতই আর বয়স হবে পার্থর। মুনমুনের চেয়ে জোর বছর তিনেকের বড়। শক্ত হাত পা। চ্যাটালো বুক। কিন্তু মুখটা বড় সুকুমার। র‍্যাফেলের দেবদূতদের মতো অপাপবিদ্ধ। পরদিন অফ পিরিয়ডে বসে যত্ন করে সার্টিফিকেটটা লিখে ফেললেন সুমিত্রা। ছেলেটা বড় হবে মনে হয়, হোক। ক্ষমতা আছে, উচ্চাশা আছে, চেষ্টাও আছে। ওর উত্তরোত্তর উন্নতির নাটকে তাঁর এইটুকু পরোক্ষ ভূমিকা থাক। কাকিমা কাকিমা করে। সেই এতটুকুনি বয়স থেকে দেখছেন। মাঝে হোস্টেলে থাকতে কিছুটা চোখ-আড়াল হয়েছিল। কিন্তু এখন যেন সেই ফাঁকিটুকু উশুল করে নিতেই এ-বাড়িতে দিবারাত্র গতায়াত। সব কিছু শলা-পরামর্শ, আলাপ-আলোচনা—হয় কাকাবাবু, নয় কাকিমা। নিজের বাড়িতে মানসিক রসদের যোগান পায় না, এ সন্দেহও নেহাত অমূলক নয়।

মুনমুনকেই বললেন বিকেলবেলা—'দিয়ে আসবি এটা ?' এক ঝটকা দিল মেয়ে—'আমি পারব না।'

—'কেন গানের স্কুলে তো যাবিই ?'

—'সে তো উল্টো দিকে ! তা ছাড়া আমার ভাল লাগে না। নিজে এসে নিয়ে যাক না।'

সুমিত্রাকেই উঠতে হল অগত্যা। মুনমুন আছে আছে বেশ আছে। কিন্তু ও মেয়ের 'না'কে 'হ্যাঁ' করা কোনও যন্ত্রের কর্ম নয়। তা নয়ত তাঁর সংসার মাথায় করে রাখে মেয়ে। ঘরদোর গুছোনো, সব টিপটপ। কাজের লোক না এলে অর্ধেকের ওপর কাজ ও একাই করে দেয়। স্বভাবটাই সুগৃহিণীর। কিন্তু এই এক দোষ। বড্ড জেদী। কিন্তু মুখে না বললেও পার্থর দরকারটা জরুরিই। প্রতিদিন তাড়া দিতে আসতে ওর সঙ্কোচ হতেই পারে। বাইরে যাবার খুব চেষ্টা করছে বলছিলেন শিবনাথ। দুটো তিনটে ভালো চাকরির অফার ছেড়ে দিয়েছে। স্বাভাবিক। এ বয়সে ভালো কেরিয়ারের ছেলে সবাই বাইরে যেতে চায়। ইন্টারভিউও বোধহয় দিয়েছে দু-একটা।

পার্থর মায়ের সঙ্গে ভালোই আলাপ আছে তাঁর। সঙ্গী না হলেও প্রতিবেশিনী। ছেলেবেলায় যখন পার্থ সারাক্ষণ সুমিত্রাদের বাড়িতেই পড়ে থাকত এবং অনেক সময় রাত্তিরেও বাড়ি যেতে চাইত না, তখন উনি এসে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যেতেন। সেই সূত্রেই আলাপ। তা নয়তো দুজনের জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা। সুমিত্রার থেকে বয়সেও বেশ বড়। বড় তিন মেয়ের বিয়েই হয়ে গেছে। পার্থ সবার ছোট।

গেলে খুব খাতির-যত্ন করেন পার্থর মা। এত বেশি যে সময়ে সময়ে অস্বস্তির কারণ হয়। আজকেও যেতে যেন হাতে চাঁদ পেলেন ভদ্রমহিলা—'আসুন আসুন, কি সৌভাগ্য কার মুখ দেখে উঠেছিলুম আজ ?'

আপ্যায়নের ধ্রুপদী ধরনে হেসে ফেলে সুমিত্রা বললেন—'আমি তো মাঝে মাঝে আসিই। আপনিই বরং...'

—'কোথায় আসেন দরকার ছাড়া ? সে ভাগ্যি কি আর করেছি ! আর আমি ! আমার

কথা বাদ দিন। সংসারের ঘানি ঘুরিয়ে যাচ্ছি। জ্ঞাত-গুষ্টি নিয়ে সংসারটি তো নেহাত ছোট নয়। সময় কোথায় ? অভ্যাসও নেই। উনি তো আবার ওই একরকম। জানেনই তো ! পছন্দ-অপছন্দ সব সেই একশ বছর আগে গিয়ে বসে আছে।'

এঁর এই উনিটিকে দেখলে সত্যিই বড় আশ্চর্য লাগে। পার্থ, শুধু পার্থ কেন, তার দিদিদেরও জনক বলে মনে হয় না। ছেলেমেয়েরা বোধহয় সব মাতুলক্রম হয়েছে। একতাল ভুঁড়িসুদ্ধু চলন্ত পান্তুয়ার মতো আকৃতি। ঠোঁটের কোণ দিয়ে সদাসর্বদা পানের কষ গড়াচ্ছে। পড়াশোনা খুব সম্ভব এ-পাশ ও-পাশ। কাজকর্মও কিছু করেন না। তিন ভাই মিলে দিদিমার বিষয় পেয়েছেন, তারই আয়ে চিরকাল চলে এসেছে। পাড়ার দুষ্টু ছেলেরা নিত্যগোপাল নাম বদলে রেখেছে নাড়ুগোপাল। জনান্তিকে এই নামই চালু।

কাগজটা পার্থর মা'র হাতে দিয়ে সুমিত্রা বললেন—'আপনার সন্তানভাগ্য কিন্তু সত্যিই ঈর্ষা করবার মতো !'

মুখটা মুহূর্তে উদ্‌ভাসিত হয়ে গেল ভদ্রমহিলার। —'এ কথা সত্যি। আমি হাজার মুখে স্বীকার করছি ভাই। আমার ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত বাপ-মা আমরা নই।

—'ছি, ছি, এসব কি বলছেন।'

—'সবাই বলে। না বললেও আমরা জানি কিন্তু আপনারই বা সন্তানভাগ্য খারাপ কিসে ? অমন ঢলঢলে ঢোলকলমি ফুলের মতো মেয়ে আপনার ? গলা কি, যেন মধু ঝরছে ! যার বাড়ি যাবে, আলো করবে।'

—'তবেই হয়েছে। কথাবার্তা যদি শুনতেন ! যে শুনবে আর ও পথ মাড়াবে না।'

—'বিনয়ী বাপ-মায়ে এটুকু বলেই থাকে ভাই।' পার্থর মা হাসলেন।

সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে। চা না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়লেন না উনি। গুচ্ছের দুধ এবং চিনি দেওয়া প্রায় বড়োবাজারি চা। সঙ্গে কচুরি, রসগোল্লা। খাবার জন্য এমন ঝুলোঝুলি করতে লাগলেন যেন ব্যাপারটার ওপর ওঁর জীবনমরণ নির্ভর করছে।

বাড়িতে পৌঁছতে পৌঁছতেই আশপাশ থেকে শাঁখের ফুঁ শুনতে পেলেন সুমিত্রা। মধ্য-কলকাতার এ অঞ্চলে এখনও লোকে সন্ধ্যার মঙ্গলশঙ্খ ভোলেননি। তাঁদের বাড়িতে শাশুড়ি যাবার পর থেকে বেকার পড়ে আছে শাঁখটা। তার মনে থাকে না। ঠাকুরদেবতার সাবেক ছবিও সব তুলে ফেলেছেন। ভেতরের কোনও তাগিদ নেই। শুভাশুভের ধর্মাধর্মের সাবেক ধারণাগুলো পুরনো পাঁজির মতো ধীরে ধীরে বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু শুনলে ভালোই লাগে। ঠাকুরদালানের কোলে দাঁড়িয়ে ভটচায্যি বাড়ির এমনি কত শত সন্ধ্যার মুখ শঙ্খ বাজিয়ে গেছে। চৌকাঠে পড়েছে স্বপ্ন সাধের মাঙ্গলিক জলছড়া। অনুষঙ্গ সবই সুখবহ নয়। তবু ভালো লাগে। ব্যথা-মিশ্রিত কেমন এক ধরনের শান্ত ভালো-লাগা। অভিজ্ঞতার রসায়নে ভালো-মন্দ সব সংহত হয়ে যাওয়ার ভালো-লাগা।

সদর দরজা ভেজানো ছিল। ঢুকতে ঢুকতে বাইরের ঘরে পার্থর গলা শুনে চমকালেন সুমিত্রা। গলায় ঝাঁঝ।

—'কিসের এতো ডাঁট তোর ?'

—'কিসের, তুই-ই বল না,' মুনমুনের ধারালো গলা।

—'তবে শুনে রাখ, তোর ও ডাঁট আমি আইডেনটিফাই করতে পেরেছি, ওটা জাতের ডাঁট। তুই মধ্য ভারতের ঠাকুরসাহেবদের সগোত্র। এখনও যে মেন্টালিটি থেকে এদেশে মানুষ হরিজন পোড়ায় তোর মধ্যেও সেই একই মেন্টালিটি।'

—'তাই নাকি ? সবই তো জেনে গেছিস তা হলে। যা ভাবিস ভাব। ডাঁট তো আমি ইচ্ছে করে কাউকে দেখাতে যাইনি। তুই কেন খোঁচাচ্ছিস ?'

—'শিবকাকার থেকে আমি কম কিসে রে ?'

—'বাবার কথা তুলছিস ?' মুনমুনের গলায় সক্রোধ বিস্ময়। 'তুললি ভালোই করলি। আমার বাবার মতো বাবা, আমার মায়ের মতো মা আর ক'টা আছে এ পাড়ায় ?'

—'দ্যাখ মুনমুন, শিক্ষা-দীক্ষা, স্ট্যাটাস দিয়ে বাবা-মার বিচার করতে নেই। বাবা-মা আমাদের সবারই শ্রদ্ধা-ভালোবাসার জিনিস।'

—'কর গে না শ্রদ্ধা। আমি কি তোকে বারণ করেছি ?'

—'তোর ওই ডাঁট আমি ভাঙব।'

সুমিত্রা যেদিক থেকে এসেছিলেন সেদিকেই নিঃশব্দে ফিরে গেলেন। যেন পরের বাড়ির দোরগোড়া থেকে। এদের এতো বাগ্‌-বিতণ্ডা কিসের ? কিসের লড়াই ? বাবা মা এসব কি ? যাই-ই হোক, ব্যাপারটা যে একান্ত ব্যক্তিগত এটা তিনি বুঝেছেন। এবং বুঝে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। আর, ব্যক্তিগত কোনও ব্যাপারের ওপর চড়াও হতে তাঁর রুচিতে বাধে। সে নিজের মেয়ে হলেও। উনিশ-কুড়ি বছর বয়স তো হল। ও-ও তো এখন একটা পরিপূর্ণ মানুষ !

একটু বাদে বাড়ি না ফিরলে উভয় পক্ষই অপ্রস্তুতে পড়বে। কি দরকার ! মোড়ের দোকান থেকে বেশ সময় নিয়ে কয়েকটা মশলা-দেওয়া মিঠে পান সাজালেন তিনি। সেগুলো সংগ্রহ করে খুব বিলম্বিত লয়ে বাড়ি ফিরে দেখলেন সদর খোলা। পার্থর গলা আর শোনা যাচ্ছে না। মুনমুন বসবার ঘরের সোফায়, হাতে একটা বই। বললেন—'সন্ধের মুখে দরজা খুলে রেখেছিস যে বড় ? কতবার বারণ করেছি না ?'

জবাব দিল না। উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল। আড়চোখে দেখলেন মুখটা থমথম করছে। বইটা আদৌ পড়ছে বলে মনে হল না। একটু পরে সেটাকে র‍্যাকে যথাস্থানে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নিঃশব্দে ওপরে চলে যেতে দেখলেন। সম্ভবত নিজের ঘরে। একটু পরে শিবনাথ যখন ফিরলেন তখন বাড়িটা এতো অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা যে ভদ্রলোক জিজ্ঞেসই করে ফেললেন—'আজ এতো চুপচাপ যে !' সুমিত্রাই উত্তর দিলেন—'হই হই করবার কে আছে বলো।' কথাটায় একটা আলতো খোঁচা। যেন হই হই করে সন্ধের ঝোঁকে বাড়ি জমিয়ে রাখবার ভারটা শিবনাথই নিত্য নিয়ে থাকেন। হই হই করবার কেউ না থাকবার জন্যে তিনিই দায়ী। কিন্তু বাবার ঠিকই নজরে পড়েছে মেয়ের মুড ভালো না। এক সন্তানের বাবা-মার অনুভবশক্তি আর পাঁচজনের চেয়ে প্রখর হবেই।

—'বকাঝকা করেছ নাকি ?' রাত্রে শুতে এসে বললেন সুমিত্রাকে। নীল আলোর বাল্‌বটার দিকে চেয়ে জবাবের অপেক্ষা না রেখেই বলে গেলেন একটানা—'বকাঝকা করে কোনও লাভ হয় না, বুঝলে ? এক জিনিস নিয়ে খিটখিট করাটা ঠিক না। আরও বিতৃষ্ণা এসে যাবে। আর ছেলে-মেয়ে যে বাবা-মার প্রোটোটাইপই হবে এমন কোনও কথা নেই, বুঝলে ?'

সুমিত্রা শুধু ঘাড় হেলিয়ে বুঝিয়ে দিলেন বুঝেছেন। এ ভদ্রলোক ধরেই নিয়েছেন পড়াশোনা নিয়ে মায়েতে-মেয়েতে কথা-কাটাকাটি হয়েছে। মেয়ে বকুনি খেয়েছে। সুতরাং...কথা বাড়িয়ে আর লাভ কি ! এ ভদ্রলোক সারা জীবন ধরেই অনেক কিছু ধরে নিচ্ছেন। এ ভাবেই চলে আসছে। চলুক। ছেলেমেয়ে মানুষ করার ব্যাপারে ইয়ুঙের

মত কি বিড়বিড় করে সেইসব আওড়াতে আওড়াতে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন শিবনাথ। অনেক সাংসারিক কর্তব্য করা হয়েছে আজ। একটি নিটোল নিদ্রাসুখ উপার্জন করে ফেলেছেন।

এভাবেই ঘর-বার, ভিতর-বাহির, জটিল-সরল সব অঙ্ক মেলাবার দায় সুমিত্রারই। সংশয়, উদ্বেগ, দ্বিধা, বেদনা কোন কিছুর কথাই বলার কেউ নেই। নিষ্প্রদীপ মঞ্চে, শূন্য প্রেক্ষাগৃহে নির্জন সংলাপ।

কাজে-কর্মে সচেতন মন থেকে প্রায় মুছেই গিয়েছিল ঘটনাটা। মুনমুনও মোটামুটি স্বাভাবিক। কলেজ যাচ্ছে, গানের পরীক্ষা দিয়ে এল। পার্থর মা আর বড়দি হঠাৎ এসে উপস্থিত। এ কথা সে কথার পর পার্থর মা বললেন—'ছেলের বিদেশ যাওয়া তো প্রায় ঠিক। যাওয়ার আগে মুনমুনের সঙ্গে বিয়েটা চুকিয়ে দিতে চাই আমরা। তারপর ও বউকে সঙ্গেই নিয়ে যাক। কি পড়াশোনা শেষ করবার জন্য এখানেই রেখে যাক, সে ওদের অভিরুচি।'

একেবারে চমকে উঠলেন সুমিত্রা। এ সম্ভাবনাটার কথা তো কখনও মনে হয়নি! প্রস্তাবটা তো খারাপ না। কিন্তু ইনি এমনভাবে কথাটা বলছেন যেন বিবাহ ব্যাপারের লক্ষ কথার নিরানব্বই হাজার ন'শো নিরানব্বইটা কথা হয়েই গেছে। শেষ কথাটা আজ এইমাত্র হল। তাঁকে নীরব দেখে পার্থর বড়দি বলল—'আজকাল তো জাতপাত কেউ তত মানে না, বিশেষ আপনাদের মতো উচ্চশিক্ষিত পরিবারে, না কি বলুন কাকিমা! পার্থর ওকে বড্ড পছন্দ। আর আপনি তো জানেনই ও আর পাঁচটা সাধারণ ছেলের মতো নয়।'

সুমিত্রার এবার মনে হল ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট-টিকেট সব বাজে। আসলে পার্থ নিজের গুণপণার কথা কাকিমাকে কৌশলে জানাবার জন্যেই দিয়ে গিয়েছিল কাগজটা। বা রে ছেলে! ভারি চালাক তো! দেখলে মনে হয় ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না, কিন্তু কার্যসিদ্ধির উপায়-টুপায়গুলো ভালোই জানা মনে হচ্ছে। মনে মনে ঈষৎ প্রশ্রয় এবং তারিফের হাসিই হাসছিলেন, সহসা আগের দিনের সংলাপটা মনে পড়ে গেল। ঠিক ধরতে পারেননি, কিন্তু কোথাও যেন একটা চড়া বেসুর বেজেছিল। অন্যমনস্কভাবে বললেন—'পার্থকে আমি খুবই পছন্দ করি। কিন্তু মেয়ের তো নিজস্ব মতামত হয়েছে; জিজ্ঞাসাবাদ করি। ওর বাবাকেও বলা দরকার।' উত্তরে পালগিন্নি তাঁর বড় মেয়ের দিকে চেয়ে যেন কি এক গোপন রসিকতায় হাসলেন, মুখে বললেন—'তা করবেন বইকি। আমিও তো কর্তাকে বলিনি এখনও।'

মুনমুন ফিরল ওঁরা চলে যাবার বেশ খানিকটা পরে। সুমিত্রা তখনই কিছু বললেন না। এখন মেয়ে অন্য মুডে আছে। গুনগুন করে তিলঙ-ঠুংরী ভাঁজছে। এইভাবেই গুনগুন করতে করতে এঘর-ওঘর করবে খানিক, বাবার টেবিল গোছাবে, ধূপ জ্বালবে গোছা গোছা, ফুলদানির জল পাল্টাবে, এটা নাড়বে, ওটা টানবে। এখন থাক। ঘণ্টাখানেক পর জিজ্ঞেস করলেন কথাটা—'তোর সঙ্গে পার্থর কোনও কথা হয়েছে?'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল মুনমুন। কানের সোনার মাকড়ি দুটো দুলে উঠল। কপালের ওপর কোঁকড়া চুলের গুছি বিদ্রোহের ভঙ্গিতে উড়ছে। —'কেন?'

—'ওর মা আর দিদি মানে সীমা আজ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল।'

—'ইস্‌স্‌স্‌স্‌।'

—'তোরা যদি ঠিক করে থাকিস, আমার দিক থেকে কোনও আপত্তি হবে না।'

—'তুমি কি পাগল হয়েছ মা ?'

—'কেন বল তো ? পাগলের কি হল ?' বিমূঢ় হয়ে বললেন সুমিত্রা—'ছেলে তো ভালোই। খুবই ভালো।'

তিনি আশা করেছিলেন অশ্রু, লজ্জা, স্বস্তি। কিন্তু মেয়ে বলল—'তুমি ভাবতে পারো ওদের ওই তিন শরিকের বাহান্ন ডালপালার বাড়িতে আমি ঘোমটা মাথায় সবার বউমা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি !'

—'না ভাবার কি আছে ? পরিবেশ তো জীবনে বারবার বদল হয়ই, আর হওয়াটাই স্বাস্থ্যকর, কার চরিত্রের কোথায় জোর, পরিবেশ না পাল্টালে তো বোঝা যায় না মুনমুন। মানুষ তো আর সাজিয়ে রাখার কাচের পুতুল নয় যে এক আলমারি থেকে আর একটা আলমারিতে যাওয়াই তার ভালো !'

—'তাই বলে নাড়ুগোপাল শ্বশুর ?'

—'ছি ! এ ভাবে ভাবা ঠিক নয় মুনমুন !'

—'আর কি ভাবে ভাবব তা হলে ?'

সে কথার জবাব না দিয়ে সুমিত্রা বললেন—'এতো ভালো ছেলে কিন্তু পাওয়া মুশকিল। শুধু কেরিয়ারের জন্য নয়, যুগ পাল্টে যাচ্ছে, ছেলেরা আজকাল বিশ্বাসের যোগ্য প্রায়ই হয় না। আর তা ছাড়া ও তো বাইরেই চলে যাচ্ছে, যদিও কারও জন্যেই মা-বাবাকে ত্যাগ করার কথা আমি ভাবতে পারি না।'

—'নাড়ুগোপাল পালের ছেলেকে বিয়ে করলে আমার বাবার মানটা কোথায় থাকবে শুনি ?'

মেয়ের কথার ধরন শুনে অবাক হলেন সুমিত্রা। মেয়ে তো নয় যেন মেয়ের ঠাকুমা। কোত্থেকে এতো জ্যাত্যভিমান হল এর এই যুগে, এই বয়সে ! খুব সম্ভব পিতামহীর প্রভাব। নিষ্ঠাবতী, রক্ষণশীল ব্রাহ্মণঘরের বিধবা ছিলেন শাশুড়ি। যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি কর্মঠ। কিন্তু বংশ আর বিদ্যার অভিমান ছিল বড্ড। মুনমুনকে কি তিনিই এমনি করে ভাবতে শিখিয়ে গেছেন ? স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তো বেরিয়ে যেতেন। নাতনিকে তো ঠাকুমাই এক রকম মানুষ করেছেন।

দু দিন পর একটু লাজুক লাজুক মুখে এল পার্থ। মুনমুন অদৃশ্য। সুমিত্রাই গল্পগাছা করলেন, চা দিলেন, যেন মাঝখানে অন্যরকম কোনও ঘটনা ঘটেনি। একটু হতাশের মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে শুকনো মুখে ছেলেটা চলে গেল।

সমস্ত ব্যাপারটাই সুমিত্রার কাছে রহস্যময়। এই এতো ভাব ! এতো ঘনিষ্ঠতা ! এই বয়স ! পরিবার, সমাজ তাদের রক্তচক্ষুর শাসন উঠিয়ে নিয়েছে। বিচারে-ব্যবহারে প্রায় সিকি শতাব্দী আগে যখন ওকে জোর করে পিঁড়িতে তোলা হয়েছিল তখনকার সঙ্গে কত তফাত ! মুনমুনকে বললেন—'পরিবার, জাত ইত্যাদি ছাড়া আর কিছু আপত্তি আছে তোর ?'

—'ক্যাবলা।'

—'তাই বুঝি ডিবেটে প্রাইজ পায়, পাহাড়ে চড়ে !'

—'মাকুন্দ।'

—'তোদের দুজনে তো বেশ ভাব ছিল !'

—'বন্ধু হিসেবে মেশা এক, বিয়ে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস মা।'

—'আমি ভালো বুঝি না, আর একটু বুঝিয়ে বল মুনমুন।'

—'বড়দির ছেলের পৈতে হবে, মিণ্টুর ছেলের পৈতে হবে, আমার ছেলের হবে না, না ? বাপের বাড়ির কাজে-কর্মে কি পরিচয় হবে আমার ? পালেদের বাড়ির ছোট বউ ? তোমার কি এতটুকুও প্র্যাকটিক্যাল সেন্স থাকতে নেই মা ? আর এতো কথা বলছই বা কেন ? পার্থ কি তোমাকে তার উকিল রেখেছে ?'

কথাগুলো ঝড়ের মতো বলে মুনমুন চোখ-মুখ লাল করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। যেসব কথা একদিন অভিভাবকদের মুখ থেকে নিরুপায় শুনেছেন, সেইসব হতাশাজনক, মনুষ্যত্বের সত্য মূল্য নিরূপণে পরাঙ্মুখ, মানবতাবিরোধী কথাবার্তা আজ এক যুগ পরে আত্মজার মুখে পুনরাবৃত্ত হতে দেখে কেমন আতঙ্কিত, বিহ্বল হয়ে মুখ ঢাকলেন সুমিত্রা। কোন মন্ত্রে এক প্রজন্মে ভূমিকা এমন পালটে যায় ! মুনমুন তবে কার মেয়ে হল ? আচারান্ধ পিতৃপুরুষের ? তাঁর নয় ?

যাক, যারই হোক, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন তিনি. ভালোবাসলে কখনও এমন কাটা কাটা, হিসেবী কথাবার্তা বলতে পারত না। কথাটা সোজাসুজি জিজ্ঞেস করা যায়নি। যতই আধুনিক মা হন। তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এতো প্রশ্ন করা। যাক আচরণেই বোঝা যাচ্ছে। প্রশ্ন বাহুল্য। ব্যাপারটা একতরফাই।

নিজমুখে কোন কথা জানাতে খারাপ লাগল। মুনমুনের মত নেই জানিয়ে একটা চিঠি ছেড়ে দিলেন। শিবনাথকে কিছু বলবার দরকার মনে করলেন না।

পার্থর সঙ্গে দেখা হল দু'দিন পরই। একই পাড়ার এ-মোড ও মোড়ে থাকা, দেখা না হওয়াই আশ্চর্য। তাঁকে দেখেই উল্টোদিকের ফুটপাথে চলে গেল। সুমিত্রা তা সত্ত্বেও রাস্তা পার হলেন, কাছাকাছি গিয়ে খুব কোমল গলায় বললেন—'কি রে পার্থ, কাকিমাকে কি ভুল বুঝলি ?' মাটির দিকে চোখ রেখে শুকনো ঠোঁট দুটোকে শুধু প্রসারিত করল পার্থ। উত্তর দিল না। গালে ওর র‍্যাফেল-ভুলির সে টোল যেন ভেঙে গেছে। মাথার উড়ো চুলের বাবুই-বাসায় একবার হাতটা ছোঁয়াবার প্রচণ্ড পিপাসা পেল সুমিত্রার। কিন্তু সব পিপাসাই কি মেটে ? কোনও পিপাসাই কি মেটে ?

আজ সীমার অর্থাৎ পার্থর বড়দির চিঠি এসেছে। লিখেছে : 'আমার ভাই মুনমুনের চেয়ে অনেক চৌখস মেয়ে পেতে পারত কাকিমা। কিন্তু ভালোলাগার ওপর তো কারও হাত নেই ! পার্থ তো বোকা নয় ! কারও ওপর জোর করার ছেলেও ও নয় ! মুনমুনকে ও কি এতোই ভুল বুঝল ? ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখবেন তো ? অনেকেই অনেক কিছুর সাক্ষী আছে, কাকিমা। আর, এই সিদ্ধান্তই যদি ও নেবে, আর একটু সংযত আচরণ করলেই কি ঠিক হত না ? পার্থ চাকরি নিয়ে কানাডা চলে যাচ্ছে। আঠাশে জানুয়ারি। বড় সিরিয়াস ছেলে। জানি না আর ফিরবে কি-না। ভায়ের এই খামখা কষ্টটা আমাদের বুকে বড় বেজেছে। মুনমুন কি ভালো করল ? আপনারা কি ভালো করলেন ?'

চিঠিটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন সুমিত্রা। কেন এতো মন খারাপ লাগছে তিনি জানেন না। তাঁর নিরপেক্ষ ভূমিকায় ওরা বিশ্বাস করেনি, তাই কি ? মুনমুনকে তিনি কতটুকু চেনেন ? জননী বলেই হয়ত সবার চেয়ে কম। ওকি তবে পার্থকে ডাক দিয়ে মুখ ফেরালো ? না না তা নয়। অন্তত তা নিশ্চয়ই নয়। যৌবনই যৌবনকে এমন হাতছানি দিয়ে ডাকে। ভুলিয়ে নিয়ে যায় মিথ্যে আশার আলেয়া দেখিয়ে কাদা জলায়, জল ঝাঁঝির দামে। তারপর দপ করে নিবে যায়। কারণটা প্রাকৃতিক, বৈজ্ঞানিক। আর কিছু নয়। মুনমুন কিছু করেনি, জ্ঞাতসারে কিছু করেনি।

মাথার ওপর একটা জেট প্লেনের আওয়াজ পেয়ে ছেলে-মানুষের মতো জানলার কাছে

ছুটে গেলেন সুমিত্রা। যেন তিনি ফিরে গেছেন বহুকাল আগেকার সেই ব্যাকুল কৈশোরে। আজই যে সেই তারিখ! আঠাশে জানুয়ারি। খুব নিচু দিয়ে যাচ্ছে প্লেনটা। ওতেই কি পার্থ আছে? চলে যাচ্ছে। অভিমান করে চিরদিনের মতো চলে যাচ্ছে?

পার্থ কি তাঁর জীবন থেকে এই দ্বিতীয়বার বিদায় নিল?

পরমা

কর্মস্থল পুনে। কলকাতায় জন্ম হলেও কর্ম নয়। পনের বছরেরও ওপর প্রবাসে কেটে গেল। এখানে আর আমার শেকড় থাকার কথা না। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক বৃক্ষের মতো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে বুঝি ভিন্ন মাটিতে রোপণ করা যায় না। নিজস্ব মাটির গন্ধ তাকে ভেতরে ভেতরে পেছু হাঁটাবেই। বুকের মধ্যে আনচান ঘুমের মধ্যে বোবায় ধরে। কোন মহাজলধির অন্ধকার গর্ভগৃহ থেকে পাতালশঙ্খের ধ্বনি আবর্তিত হতে হতে উঠে আসে। জলকল্লোলের মধ্যে পিষ্ট হতে থাকে অস্তিত্ব। আঁকুপাঁকু করে জেগে উঠি। প্রাণপণে বর্তমানের সচেতনের ভাঙা পাড় আঁকড়ে ধরি, যা নাকি অবচেতনের অনুপাতে আইসবার্গের দৃশ্যমান এক অষ্টমাংশের মতই অকিঞ্চিৎকর। নিজের পায়ের ছাপ ধরে ধরে মাঝে মাঝেই তাই ফিরে আসি বর্তমানের অব্যর্থ শরসন্ধানে যদি অতীতের বিক্ষিপ্ত হারানো তীরের ফলাটা বিদ্ধ করে আনতে পারি। কিন্তু পারি না। যা নিজেরই হৃৎপিণ্ডের গভীরে প্রোথিত তাকে কি নিজ হাতে তোলা যায় ? কেউ কি পেরেছে ?

এবার আসাও বিশেষ করে সেই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। মূলের সঙ্গে যোগ সর্বস্তরে হওয়া চাই। নইলে বৃক্ষ বাঁচে না। প্রত্যেকবারই অনেক ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের তলায় এই জরুরি আসল উদ্দেশ্যটা চাপা থাকে। কোনবারই কাজটা হয়ে ওঠে না। এবার আমার সেই প্রয়োজন আমার সমস্ত অস্তিত্বের টুটি টিপে ধরেছে। আর সবুর সইছে না। ভালো করে নিঃশ্বাস নিতে পারি না। ফাউন্ড্রির গরমের মধ্যে বসে অন্য এক গূঢ়তর তাপ আমায় দগ্ধায়, থেকে থেকে দম আটকে আসে।

খবর দেওয়া ছিল না। নইলে দুই দাদার কেউ না কেউ নিশ্চয়ই স্টেশনে যেতেন। যেন আমি অথর্ব কি পঙ্গু। কত বার বলেছি এসব কর না। এক চিলতে একটা সুটকেস হাতে নিয়ে মিনি কি স্পেশ্যাল কি একটা ট্যাক্সি ধরে হাওড়া স্টেশন থেকে মাইল চারেক পথ চলে আসা সমর্থ পুরুষমানুষের কাছে কিছু না। মাধবী কিংবা পিকলু থাকলেও বা কথা ছিল। কিন্তু দাদারা শোনবার পাত্র নন। মুখে কিছু বলেন না, শুধু ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মের গলিতে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে বড়দার কাঁচাপাকা চাপ-দাড়ি-অলা শেল-ফ্রেমের চশমায় তপস্বী তপস্বী চেহারাখানা, কিংবা ছোড়দার ভারি শরীরের ওপর রদ্যাঁর ভাস্কর্যের মতো বসানো ভারি মাথাটা আমাকে যুগপৎ অপরাধী এবং তৃপ্ত করতে থাকে। সত্যিকারের ভদ্রতা এবং আন্তরিকতার মধ্যে অর্থের কোনও তফাত বোধ হয় নেই। এবারে খবর দিইনি। ঠিকও করলাম হঠাৎ। খবর দেবার সময় ছিল না।

ট্যাক্সি থেমেছে কি না থেমেছে বড়দার ছেলে সৌম্য দৌড়ে এসে দরজাটা খুলে ধরল। চীনে চীনে মুখে ঠোঁটজোড়া হাসিতে সরলরেখা হয়ে গেছে। কি করে বুঝল কে

জানে ! পেছন পেছন ছোড়দা। হাত থেকে সুটকেসটা কেড়ে নিয়ে বললেন—'কি রে, আর কোনও মাল নেই তো ?'

হেসে বললাম—'আসল মাল রেখে এসেছি। হালকা হয়েই ট্রাভল করা ভালো।'

—'গুরুজনের সঙ্গে ইয়ার্কি মারছিস !'

সদর ঘরের জানলা দিয়ে দুই বউদির হাসি-হাসি মুখ উঁকি মারছে। মধ্যিখানে মুনিয়ার কোঁকড়াচুলে ভরা ছোট্ট মাথাটা। দেরিতে উদয় হয়ে মুনিয়াটা মা আর জেঠিমাকে অতিরিক্ত স্নেহের মাখনে সেঁটে স্যান্ডউইচ বানিয়ে রেখেছে। এইজন্যেই বোধ হয় আমি আনন্দ লেনের বাড়িতে ঘুরে ফিরে আসি। এই হাসি মুখ, উৎসুক চোখের আদর-চাউনি দেখতে, আমন্ত্রণের উদ্যত হাত ধরে এতগুলো মানুষের বুকের মাঝখানে অনায়াসে পৌঁছে যেতে। এইজন্যেই এখানে এলে মনে হয় পৃথিবীর এই এক জায়গায় আমার মতো হতভাগার জন্যেও ঠাঁই চিরকালের মতো কায়েম হয়ে আছে।

বড় বউদি চা নিয়ে এল। ছোট বউদি খাবার। বললাম—'আমাকে মুখ হাত ধোবার অবসরও বোধ হয় তোমরা দেবে না। পিসিমার ভাষায় এই অ্যাড়াব্যাড়া কাপড়ে, ট্রেনের ছত্তিশ জাতের নোংরা মেখে...'

—'খুব হয়েছে, তাড়াতাড়ি কর তো। লেকচার দিতে হবে না। লুচিগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

—'বা বা বা ! অ্যাদ্দিন পর এলুম আর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা চামড়া-চামড়া লুচি দিয়ে অভ্যর্থনা ? নাঃ, কদন্নে পুণ্ডরীকাক্ষ করে ছাড়বে দেখছি !'

—'তা কি করব ? খবর না দিয়ে এলে আমাদের দোষ। তাও কদিন ধরে তোমার দাদার মনটা সুকু সুকু করছিল বলেই না রোজ এ সময়টা খাবার দাবার রাখি। নইলে হরিমটর। তা তোমার ট্রেন লেট করলে আমরা কি করব ?'

বউদিদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এই রকমই। নিজের ভাইবোন নেই। এই জাঠতুতো দাদাদের সুখী পরিবারের জন্য কোনদিন বুঝতে পারিনি। জ্যাঠাইমার কোলে-পিঠে মানুষ। কোনদিন বুঝিওনি এঁরা আমার সহোদর নন।

ট্রেনের কাপড় ওরা ছাড়তে দিল না। শুধু মুখ হাত পা ধুয়ে আসবার ছুটিটুকু দিল। আমার মুখচোখ নাকি বলছে আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। আসলে এক সময়ে দারুণ শরীর চর্চা করতুম। তখন আমার শরীরের যত্ন, খাওয়া-দাওয়ার নানান খুঁটিনাটির হাঙ্গামা দুই বউদি পুইয়েছে। ওরা মনে করে এখনও আমি সেই হেভিওয়েট লিফটার সুকুমারই রয়ে গেছি যে গব্য দুগ্ধের বরাদ্দ ছাড়াও সয়াবীনের প্রোটিনের জন্য বউদিদের নিত্য জ্বালিয়েছে।

সবে লুচিতে বেগুনভাজা মুড়ে একটা কামড় দিয়েছি কি দিইনি, বড় বউদি দ্বিতীয়বার চা আনবার জন্যে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়েছে, ছটকুন অর্থাৎ ছোটবউদি হঠাৎ চুপিচুপি গলায় বলল, 'জানো সুকু, রঞ্জুটার না এমন বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে !'

এমন চমকে দিয়েছে যে জিভ কামড়ে ফেলেছি। ছটকুন অপ্রস্তুত। ঢোক গিলে বলল—'খারাপ বলতে অসুখ-বিসুখ কিছু মনে কর না। বিশ্রী মোটা হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বাচ্চাটা হবার পর থেকেই বেঢপ একেবারে। চুলগুলোও যে কি করে অমন পাতলা হয়ে গেল ! সে রঞ্জু বলে চিনতে পারবে না, মাইরি বলছি।'

এই ছটকুনের একটা মস্ত দোষ। কথায় কথায় এই মাইরি বলা। ছোড়দা থাকলে ধমক দেন। আমার কিন্তু খুব মজার লাগে, মেয়েলি মুখে গুরুগম্ভীর চালে ওই মাইরি

বলা। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লুম। ছটকুন কাঁচুমাচু মুখে বলল—'রান্না রেডি হতে বেশ দেরি, রোববারের বেলা সুকু, আর দুখানা লুচি নিলে না? যাও, তবে, এখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোওগে যাও!'

ঘুমোব। শুধু কদিন পর। কতদিনের নিঘুম রাত উশুল করা ঘুম। এখন ঘুম জানি না, জাগাও জানি না। পর্দা ফেলে দিয়ে এখন চুপচাপ বসে থাকবো। জানলার ধারে, বারান্দার দিকে মুখ করে। এই বারান্দার পাড়ে ইয়ো-ইয়োর মতো পাক খেতে খেতে কেটেছে আমার বাল্য। এই বারান্দা চিরে দুরন্ত কৌতূহলী পায়ে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে কৈশোর। এখন আমার পরিণত যৌবন এই বারান্দায় কুমীর-পিঠ পেতে কিছুক্ষণ ক্লান্তির রোদ পোহাক। ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চঞ্চু পাখিরা আসুক সব, মস্তিষ্কের ফাঁক-ফোঁকর থেকে টেনে বার করে ফেলে দিক স্মৃতির ভুক্তাবশেষ। যা পুষ্ট করেছে, লালিত করেছে, অতীতের সেই স্বাস্থ্যকর স্মৃতি গভীর সুখে পরিপাক করি। যা ভেতরে প্রবিষ্ট হতে চাইল না, সেই উঞ্ছ-উদ্বৃত্ত নিয়ে কি করব?

এই ঘরে ডন দিতুম। মুগুর ভাঁজতুম। সে মুগুরগুলো সৌম্য ব্যবহার করলে অমন পলকা চেহারা হত না ছেলেটার। ওই টেবিলে লক্ষ করলে এখনও দেখতে পাওয়া যাবে জটিল অঙ্ক ভাবতে ভাবতে কত অন্যমনস্ক কাটাকুটি করেছি। পৈতৃক বাড়ির অংশ আমি নিইনি। দাদারা বদলে আমাকে টাকা দিয়েছেন। সেই নগদ টাকা দিয়ে নামী কোম্পানির নিরাপদ শেয়ার কিনে আমি আমাদের তিনজনের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করেছি। কিন্তু আমার সাবেক ঘরটা বউদিরা সযত্নে গুছিয়ে রেখেছে। এটা এখনও 'সুকুর ঘর'। এতো মায়া! বলে—'ঘরটুকু না থাকলে তুই আর আসবি না সুকু।' অন্য সময় সৌম্য থাকে বোধ হয়। ওর ডাক্তারির বই-টই টেবিলের ওপর দেখেছি। অ্যানাটমি, মেটিরিয়া মেডিকা। কিন্তু আমি এলে কেউ বিরক্ত করে না। নিজের সমস্ত বসবাসের চিহ্ন সৌম্য বেচারি নিঃশেষে তুলে নিয়ে যায়।

এ ঘরের গোপনীয়তা আমার নিজের সংসারেও কোথাও নেই। সেখানে মাধবীর সঙ্গে ভাগের কারবার। বারোয়ারি বৈঠক, অংশীদারীর শোবার ঘর। এমন নির্জন বারান্দা সেখানে নেই, নেই এমন পূর্ণকুম্ভ শূন্যতা। জানলার প্রত্যেকটা গরাদ এখানে নীরবে আমার সঙ্গে কথা বলে, ঘরের প্রত্যেকটি কোণে হারানো দিনের কণ্ঠ গমগম করে। সওয়াল জবাব চলতে থাকে মেঝের সঙ্গে, ছাদের সঙ্গে। স্বল্প আসবাবকটা আলাপচারিতে যোগ দেয়।

—'কেন তুমি চলে গেলে?'

—'নদীর স্রোত আর সময় তো চলেই যায়!'

—'সময় যাক, তুমি কেন গেলে?'

—'সময় দিয়েই যে তৈরি জীবন, সময় দিয়েই তৈরি শরীর।'

—'কিন্তু তুমি তো গিয়েও পুরোপুরি যাওনি?'

—'কেন? কেন? কেন, সুকু?'

কিন্তু ছটকুন আচমকা কি যেন একটা বলে গেল! রঞ্জু মোটা হয়ে গেছে? সেই কঞ্চির মতো ফিনফিনে রঞ্জু মোটা! ভাবতে পারছি না। স্থূলত্ব অনেকের অঙ্গে, অনেক প্রসঙ্গে সয়ে যায়, মীনামাসিমা এক সময় ডিগডিগে রোগা ছিলেন। কণ্ঠার হাড়ের গর্তে টেনিস বল ঢুকে যেত, এখন মীনামাসিমার ঘাড় নেই, কণ্ঠা নেই, বুক পেট-পিঠ আলাদা করে চেনা যায় না। রঞ্জুর বেলা স্থূলত্ব সইবে না। স্থূলত্ব রঞ্জুর বেলা অশ্লীল। চুল নাকি

পাতলা হয়ে গেছে! বাহান্ন বিঘের চওড়া কালো রাস্তাটা যুগল শিরিষের তলা দিয়ে যেখানে লাল কাঁকরের পায়ে চলা মেঠো পথটার সঙ্গে মিশেছে সেখানে অব্যবহৃত কুয়োর পরিত্যক্ত চাতালে ওই তো রঞ্জু প্রাণপণে স্কিপিং করে যাচ্ছে, যেমন ওকে প্রথমে দেখেছিলুম মোটা বেণীটা সপাং সপাং করে পিঠের ওপর চাবুক মারছে! লাল আকাশে কালো বিদ্যুৎ, নীলের কোলে কিশোরী বিজলি চমকে যাচ্ছে। তির্যক, নিটোল। আদিম পৃথিবীর বুকে প্রথম বৃক্ষের জন্মের মতো বিস্ময়কর!

গতবারেও ছটকুন বলেছিল—'জানো সুকু, রঞ্জুটা যে কি কালো, শ্রীহীন হয়ে গেছে, তুমি ধারণাই করতে পারবে না। তেমনি বুড়োটে। এখন দেখলে তোমার পিসিমা মনে হবে।'

আমার চোখের সামনে রঞ্জুকে কে থাবড়া থাবড়া কালি মাখিয়ে দিতে লাগল! এ যেন শুধু বাঁদুরে রঙের বীভৎস এক হোরিখেলা। রঞ্জুর দাঁতগুলো, তাই থাকে কেন? খসে পড়তে লাগল ঝরঝর করে, মাথা থেকে চুলগুলো কোন অদৃশ্য চুম্বকের টানে লোহার তারের মতো ছিটকে ছিটকে যেতে লাগল। আমার চারপাশে যেন রাক্ষসীর চুলের স্তূপ। রঞ্জু, কেশহীনা দন্তহীনা কদর্য রঞ্জু বেলুনের মতো ফুলতে লাগল। ফুলতে ফুলতে ফটাশ। মনে মনে বলতে চাইলুম—'সুরঞ্জনা, সুরঞ্জনা, তুমি আজ মৃত।' তারপরেই দেখলুম সমস্ত ঘরে বিদেহী রঞ্জুর শব্দহীন রূপদ্যুতিময় হাসি তরঙ্গে তরঙ্গে ছড়িয়ে যাচ্ছে। রঞ্জনার হাতের অশরীরী মুদ্রা বঙ্কিম বিভঙ্গে ঘরের কোণে কোণে মঙ্গলঘটের মতো স্থিত। যতই মারি সুরঞ্জনাকে আমি মেরে ফেলতে পারি না। ও আবার বেঁচে ওঠে। নতুন শক্তি নিয়ে নবোদ্গত যৌবন নিয়ে। ওর এই অনন্ত যৌবন নিয়ে বেঁচে ওঠা অহোরাত্র আমায় মারছে, আবার এই মৃত্যু না থাকলে আমি যে কেমন বাঁচা বাঁচতুম, তাও জানি না। সুরঞ্জনার স্মৃতিভারহীন সে কেমন লঘু, নিরর্থ জীবন?

হাতের কাজ সেরে দুপুরবেলায় দুই বউদি উলটুল নিয়ে আমার ঘরে এসে গুছিয়ে বসল। দাদাদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। সৌম্য রবিবাসরীয় আড্ডায়। মহিলামহলে আমিই একমাত্র হংসমধ্যে বক। বউদিদের মতে অবশ্য নিছক মেয়েলি আড্ডা খুব ক্লান্তিকর। একজনও অন্তত পুরুষ থাকা চাই, নইলে ভারসাম্য থাকে না।

—'কি সুকু, টোয়েন্টি-নাইন হবে?'

—'খুকিদের খেলা ছেড়ে এবার একটু সাবালক হও বউদি।'

—'এ জন্মে আর হল না রে।'

—'শিখিয়ে দিচ্ছি ব্রিজ, তাস দাও।'

—'শেখাতে চাইলেই শিখছে কে রে?'

—'নাঃ বউদি, হোপলেস তোমরা। ইনকরিজিবল্। তিনজনে তবে আর গোলামচোর ছাড়া হবেটা কি?'

মুনিয়াটা অনেকক্ষণ জেঠিমার কোল ঘেঁষটে বসেছিল, নতুন গল্পের বই হাতের মুঠোয়, নতুন পুতুল কোলের ভেতর আঁকড়ে ধরে। খেলা দেখতে দেখতে চোখে ঘুমের ঢল নামল। ছটকুন বলল—'আচ্ছা দিদিভাই, আমি বললে সুকুটা বিশ্বাস করতে চায় না, তুমিই বলো তো রঞ্জু কিরকম খিটখিটে খটখটে মতো হয়ে গেছে না আজকাল?'

বড় বউদি বলল—'কিছু মনে করিসনি মিতু, মায়ের পেটের না হলেও হাজার হোক তোর বোনই তো, শ্যামলীর বিয়েতে দেখলুম যেন জয়ঢাক। তার ওপর সব সময় গলা বাড়িয়ে চেঁচাচ্ছে।'

আমি আস্তে বললুম—'তোমরা থামবে ?'

বড় বউদি বলল—'থামব বইকি। মিতু কথাটা তুলল তাই। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই রে সুকু। কে যে পরে কি দাঁড়াবে সে গোড়ার রকমসকম দেখে খানিকটা বোঝা যায় বইকি। রাখ্ তো ওসব। তোদের খবরাখবর এখনও ভালো করে শোনাই হল না। এই মিতু, রাখ্ তো তাস। মাধবীকে কতদিন দেখিনি। পিক্‌লুর ছবি এবারেও আনিসনি তো !'

কেন যে ছটকুন এভাবে বারবার রঞ্জুর প্রসঙ্গ তোলে ! প্রথম প্রথম তুলত না। বহু বহু দিন এ বাড়িতে রঞ্জু কবরস্থ ছিল। মাধবী এসেছে। পিকলু এসেছে। পুনের সংসার স্থায়ী হয়েছে। কোনদিন এ বাড়িতে মৃতের পুনরুত্থান হবে ভাবিনি। সে জীবিত ছিল একটিমাত্র মানুষের নিদ্রাহীন রাত্রির গূঢ়ৈষায়। বছর তিন আগে ছটকুন হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে এলোমেলো খানিকটা রঞ্জুর নিন্দে করে গেল। খুব নাকি গুমুরে হয়েছে, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। আমি যতই লুকোতে চাই, এই সব করুণ হৃদয় মহিলা জেমস্ বন্ড কেমন করে নির্ভুল জেনে গেছে রঞ্জু আমার হর্ষ, রঞ্জু আমার বিষাদ, রঞ্জু আমার চোখের তারায়, রঞ্জু আমার হাতের পাতায়, নিঃশ্বাসে, প্রশ্বাসে, এখনও, এখনও। ওরই জন্যে আমি অফিসের কাজের নাম করে একা একা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে আসি। অবোধ বালক যেমন মায়ের পরিত্যক্ত শাড়ির মাতৃগন্ধে সান্ত্বনা পায়, কলকাতার হাওয়ায় তেমনি আমি সুরঞ্জনার দেহগন্ধ পাই। শুধু একবার দেখব। দেখা হয় না। বড় ভয় করে। রঞ্জু যে আমার ছিন্ন অঙ্গ, আমি অন্ধ। রঞ্জু আমার দৃষ্টিশক্তি হরণ করে হারিয়ে গেছে। হে ঈশ্বর, বিমূর্ত আলো দাও। আমি আর একবার রঞ্জুকে প্রত্যক্ষ করি। এতো বড় জীবনের পরিসরে আর কেউই যে আমার পরিপূর্ণ আপন হল না। বড় ভয় ! রঞ্জু মোটা হয়ে গেছে। কণ্ঠে আর সুরবাহার বাজে না। তার চাইতে ও সেখানে থাক যেখানে আছে। ভেতরে এবং বাইরে। রঞ্জুর ছবি গোপন অ্যালবামের পাতায় সেঁটে বহনক্লান্ত, রাহুগ্রস্ত আমি আবার কি ফিরেই যাবো ?

সন্ধের দিকে বেরোলুম। একটু ঝিরঝিরে মতো বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তাগুলো অশ্রুময়। গাছের ডগা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের দুধারে পসরা। পলিথিনের ঢাকা সরিয়ে ফেলছে হকাররা। মানুষ হাঁটার জায়গা নেই। কম্বুলিটোলা দিয়ে বেরিয়ে শোভাবাজারের দিকে হাঁটা দিলুম। আবার মুখ ফিরিয়ে জোড়াবাগান। পার্কের পূবকোণে রায়চৌধুরীদের রঙিন কাচওয়ালা বারান্দায় ইলেকট্রিকের আলো পড়ে রঙ চলকাচ্ছে। কোথাও যাবো না। সর্বত্র যাবো।

লোডশেডিং হয়ে গেল। সমস্ত উত্তর কলকাতা নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে হারিয়ে গিয়ে অন্ধকারেই জেগে উঠল আবার। প্রত্যেকটি বাড়ির, পার্কের, রাস্তার, যানবাহনের প্রেত তাদের দ্বিতীয় অস্তিত্বের জানান দিয়ে আমার দ্বিতীয় অস্তিত্বকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। —'ভয় কি ? বেরিয়ে আয়। কতকাল আর চোখ ধাঁধানো আলোর অন্ধকারে চাপা থাকবি ?' আমি খুব প্রাণবন্ত এক আত্মবিশ্বাসী, তরতাজা, টগবগে যুবককে আমার ভেতর থেকে সবেগে বেরিয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের ফুটপাথ ধরে দক্ষিণমুখো ছুটে যেতে দেখলুম। খুব ঝকমকে দাঁতে সে প্রাণখোলা হাসি হাসছিল। হাতে একটা ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট। চৌরঙ্গির অন্ধকার চিরে তন্বী আলোর রেখা জেগে উঠছে। এতো ক্ষীণ যে ভয় হয় হারিয়ে যাবে। রঞ্জনাকে পাশে নিয়ে আমার অতীত হাসতে হাসতে এগিয়ে যাচ্ছে। চিবুক উঠছে, নামছে। বেলকুঁড়ি থেকে শব্দের সৌরভ।

তারপরেই সেই অতীত, যা এখনকার আমার থেকে বহুগুণে সত্য এবং জীবন্ত, একটা ডবলডেকার থেকে ভীষণ রুষ্ট মুখে রঞ্জনাকে হাত ধরে নামাল।

—'লোকটা কি রকম বিশ্রীভাবে তোমার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, রঞ্জু, তুমি তো কিছু বললে না ?'

—'কই আমি তো বুঝতে পারিনি। অত ভিড়ের মধ্যে বোঝা যায় না কি ?'

—'বেশ বোঝা যায়। ভালোই বুঝতে পারছিলে।'

—'মানে ?' রঞ্জনার চোখে আহত বিস্ময়।

আকাশের মেঘ মিলিয়ে এসেছে। মেঘ ফুঁড়ে রোদ্দুরের তীর। গোধূলির আকাশে হেলান দিয়ে সুরঞ্জনা গান গাইছে। গোধূলি-লগ্নে কার আগমনীর গান।

—'রঞ্জু তোমার কলেজ গেটে কাল ওটা কে তোমার সঙ্গে কথা বলছিল ?'

—মনে করার চেষ্টায় রঞ্জুর ভ্রূ কুঁচকে গেছে। —'কে বলো তো ?'

—'ওই তো ঝাঁকড়াচুলো, মোটা ঝুলপিঅলা...

—'ওঃ, ও তো রীমার দাদা। আমার স্কুলের বন্ধু রীমা, চেনো তো ? ওর সেই ফটোগ্রাফার দাদা ! লাইফ ম্যাগাজিনের ফটোগ্রাফি কম্‌পিটিশনে প্রাইজ পেলো !'

—'কি চায় ?'

—'কিছু তো না ! রীমাকে নিতে এসেছিল, কাকে যেন এয়ারপোর্টে সী-অফ করতে যাবে।'

—'তোমার সঙ্গে অত কিসের কথা ?'

রঞ্জু অবাক হয়ে বলল—'বা রে, রীমা আমার পুতুলখেলার বয়সের বন্ধু, এইটুকু বয়স থেকে ওদের বাড়ি যাচ্ছি। ওর দাদা আমার সঙ্গে দেখা হলে কথা বলবে না ?'

নিঃশব্দে চা খেয়ে যাচ্ছি। সুরঞ্জনা আরও গান গাইছে। সন্ধ্যার আকাশ সুরে ভাসিয়ে। কিন্তু কানে আর মধু ঢালছে না। রসহীন, শুষ্ক, নিরর্থক গান সব।

যাবার সময় আড়ালে ডেকে বলে গেলুম—'কলেজ গেটে কি আর কোথাও কোনও ঝুলপি-মোচঅলা ফন্দিবাজকে আমি যেন আর তোমার সঙ্গে কথা বলতে না দেখি। আর কাল থেকে তোমায় ট্যাকসিতে নিয়ে বেরোব।'

—'ট্যাকসি কেন, সুকুদা ? পালকি নয় ? ওপরে দু পরত ঘেরাটোপ, দুপাশে দুই আসাসোঁটাধারী বরকন্দাজ। আর তুমি চলবে রাঙা ঘোড়ায় চড়ে টগবগিয়ে আমার পাশে পাশে...'

সারা শরীরে রঞ্জু নাচের ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

—'রঞ্জু তোমার আঁচল ঠিক করো।'

—'কি ঠিক করব ? ঠিকই তো আছে।'

—'উড়ছে, উড়ছে, এক্ষুণি উড়ে যাবে।'

—'বাঃ, দমকা হাওয়ায় ওড়বার জন্যেই তো আঁচল। তখনই তো একমাত্তর নিজেকে পাখি পাখি লাগে।'

—'হুঁ। আর রাস্তাসুদ্ধু লোক তোমার পাখি-ওড়ানো দেখুক।'

রঞ্জু হাসতে থাকে—'সত্যি, পাখি দেখার চোখ যাদের আছে তারা ছাড়া আর কেউই পাখি দেখতে পায় না, জানো না ? আলোর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে থাকলেও দেখে, অন্ধকারের আড়ালে থাকলেও দেখে।... আর তা ছাড়া এই ভর দুপুরবেলা এখানে দেখার লোক কই ?'

—'তুমি অত্যন্ত অশালীন হয়ে যাচ্ছো রঞ্জনা।

উল্টো দিক থেকে একটা নিম্নশ্রেণীর লোক মাথায় ঘাসের বোঝা নিয়ে কিসের তাড়ায় কে জানে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসছে। রঞ্জুকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে চলে গেল। আমি বাঘের মতো গিয়ে তাকে ধরলুম, তারপর ব্যায়াম-করা চওড়া হাতের পাঞ্জায় একটা ঘুঁষির বোমা ফাটালুম তার রগে—'উল্লুক, বেতমিজ, বেয়াদব।' লোকটা অবাক হয়ে এক পলক তাকিয়ে পাল্টা গালাগাল আরম্ভ করল। তখন লাগালুম কষে চড়, থাপ্পড়, লাথি। লোক জমে গেল। ভদ্রমহিলার শ্লীলতাহানির চেষ্টার দায়ে অবশেষে তাকে এক বাইকধারী সার্জেন্টের হাতে সমর্পণ করে গনগনে মুখে বিবর্ণ রঞ্জুর দিকে তাকিয়ে বললুম—'এখনই দেখছ কি? তোমাকে আমি ঘরে বন্ধ করে রাখব। ছাদের দরজায় তালা লাগাব। জানলায় লোহার জালি।' প্রচণ্ড রাগের মাথায় খেয়াল করিনি রঞ্জুর মুখে জোঁক লাগছে, কণ্ঠনলীতে দাঁত বসিয়েছে রক্তচোষা বাদুড়।

পরদিন ওকে নির্দিষ্ট জায়গায় পাইনি। পরদিনও না। তারপর সোজা ওর বাড়ি। ছটকুনের মেসোমশাই বললেন—'সে কি সুকুমার, রঞ্জু যে ওর বন্ধুদের সঙ্গে রাজগীরে এক্সকারশনে গেল। তোমায় বলে যায়নি? ওখান থেকে বেনারস যাবে, চুনার যাবে, লম্বা প্রোগ্রাম যে ওদের এবার!'

পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের মতো ছটফট করছি ক্রোধে। বেনারস থেকে ছোট্ট চিঠি। সম্বোধন নেই। সই নেই।

"এতদিনের সম্পর্ক ভাঙতে কি হয়, যে ভাঙে সেই জানে। ছেড়ে দাও আমায়। নিজেও শেষ হবে, আমাকেও শেষ করবে। কোনও কিছুর খাতিরেই আমি সন্দেহভাজন আসামীনী হয়ে অমূল্য জীবন লোহার গারদে আটক কাটাতে পারব না।"

বহু ক্ষমাভিক্ষা, অনুনয় বিনয়, প্রতিশ্রুতি। টলাতে পারলুম কই? আর একবারও সে দেখাই করল না। আত্মীয়স্বজন কারো মতামত গ্রাহ্য করেনি। কারণ বলেনি কাউকে। কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নয়। খালি বলেছে ব্যথার গলায় 'ভালো লাগছে না, ভালো লাগছে না।' ছোট বউদি আজও জানে না ঠিক কি ধরনের মনান্তরের ফলে আমাদের সম্পর্ক ছিঁড়ে গেল। আমার প্রতি মমতায়, বোনের প্রতি বিতৃষ্ণায় কত কিই যে বলে যায় বেচারি ছটকুন। বোধ হয় ভাবে ওর বিরুদ্ধে আমার মনটাকে তেতো করে দিতে পারলে সেই তিক্ততায় আমার এ বিষক্ষত সেরে যাবে। সবই বুঝি। শুধু বুঝি না কতটা সত্যি কতটা মিথ্যা এই সব রটনা।

কতগুলো দীঘল বছর কেটে গেছে। এখনও মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। মাঝরাত তো নয় যেন মাঝগাঙ। হাবুডুবু খেতে খেতে জেগে উঠি। রঞ্জু! রঞ্জু! ডুবন্ত মানুষের আর্ত চিৎকার কেউ শোনে না, ডুবন্ত মানুষের উদ্যত হাত ধরে টেনে কেউ ডাঙায় তোলে না। মাঝ নদীতে ভরাডুবি। অপঘাত। বকুল ঝরছে। তারা খসছে। উল্কাপিণ্ড ফেটে গেল। রঙের ফানুস পুড়ে যায়। রজনী তামসী। দেবী পশ্চিমাস্যা। অমাবস্যার কালো আকাশে কালো বরফের চাদরের মতো সুরঞ্জনা বিছিয়ে আছে।

শ্রীহীনা, রুক্ষভাষিণী, স্থূলাঙ্গিনী রঞ্জুকে একবার দেখতে পেলেই কি মহাকালের ধ্যানভঙ্গ হবে? এ ধ্যান কি রূপের ধ্যান? অপঘাত ঠেলে ফিরতে পারব ডাঙায়? ফিরতে পারব ভাঁটির প্রবল টান এড়িয়ে জীবনের কাছে?

শ্যামবাজারের মোড় থেকে শহরতলির বাস নিলুম। অভিজ্ঞ দুপুর এখন শান্তিপর্বের শরশয্যায়। তাকে ঘিরে সমস্ত প্রশ্ন চুপ। পশ্চিম দিগন্তে শেষকৃত্যের মহাপ্রস্তুতি আরম্ভ

হচ্ছে। দক্ষিণ শহরতলির সুদূরতম প্রান্তে যখন পৌঁছলুম কামনারঙের শিখাগুলি তখন ভস্ম উদ্‌গার করছে। লাল মাটির রাস্তায় আবীরের মতো ছড়িয়ে আছে কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী। ঝিরিঝিরি পাতার কাঁপনের মধ্যে দিয়ে অস্থির দিঘির মতো চাপ চাপ আকাশ। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি বাগানঘেরা ছোট্ট বাড়িটা। আটলান্টিকের মাঝ-মধ্যিখানে যেন নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে একলা জাহাজ। এখুনি ভোঁ বেজে উঠবে, বোগেনভিলিয়ার বেগুনি মাস্তুল উঁচিয়ে পালতোলা মাটির জাহাজ চলতে আরম্ভ করবে। শুনেছি ওই বাড়ির দোতলাটা পুরোই স্টুডিও। রঞ্জুর স্বামী শিল্পী। উত্তর দিকের দেওয়ালে কাচের ওপর অস্তরাগ প্রতিফলিত হয়ে আকাশের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। আমি কি ওঁর সামনে গিয়ে এমনি উদ্‌ভ্রান্তের মতো দাঁড়াব? দাঁড়াব সিকন্দরের সামনে শৃঙ্খলিত পুরুর মতো মাথা উঁচু করে? ভিক্ষুকের মতো দাঁড়াব গিয়ে কাঙাল চোখে? শিল্পীদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে। উনি কি বুঝতে পারবেন আমি কে? উনি আমাকে কিভাবে নেবেন? আমিই বা ওঁকে, আমার ওই মেঘলোকবাসী প্রতিদ্বন্দ্বীকে কোনদিনই যাঁকে সম্মুখ সমরে চূড়ান্ত দ্বৈরথে পেলুম না, তাঁকে কিভাবে নেবো? ভাবতে ভাবতে বাগানের গেটে হাত বেধে গেল। খুলতে গিয়েও খুলতে পারলুম না। দূরদূরান্ত শব্দে কাঁপিয়ে ট্রেন চলে গেল। পেছু ফিরে দাঁড়ালুম এসে এক জোড়া অশ্বত্থের তলায়। কোলের কাছে মাতৃগর্ভের মতো কোমল অন্ধকার। অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম সেখানে। যেন আমি জন্মের জন্য অনন্তকাল প্রতীক্ষারত অজাত ভ্রূণ।

গোধূলি গিয়ে সাঁঝ। সাঁঝ পেরিয়ে সন্ধ্যা। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত। শহরতলি কাঁপিয়ে ঝিঁঝির তানকর্তব শুরু হয়ে গেল। মুক্তাঙ্গনে লক্ষ নর্তকীর নূপুরশিঞ্জিনী। বেগবান হাওয়ার সমর্থ সঙ্গত। ঘড়ি দেখতে ভুলে গেছি। আকাশে চাঁদ নেই। শুধু তারার আলোয় জেগে আছে অলৌকিক জাহাজ বাড়ি, তারার আলোয় দাঁড়িয়ে আছে ত্রিকাল-সাক্ষী অশত্থ। কতক্ষণ পর জানি না, কাঁকর-ভাঙার মৃদু আওয়াজে চমক ভেঙে গেল। তারার জ্যোৎস্নায় দেখলুম—কি আশ্চর্য! কি পরমাশ্চর্য! সুরঞ্জনা আসছে! ছটকুন কি যেন বলেছিল? বড় বউদি কি যেন দেখেছিল? সুরঞ্জনা তো অবিকল তেমনি আছে! মাথার ওপর কালপুরুষ, পায়ের তলায় দিবারাত্রির গতিভঙ্গে ঘূর্ণিত হচ্ছে পৃথিবী, আলোকলতার আকর্ষের মতো বাহু দুলছে, ফুলন্ত ডালের মতো বঙ্কিম ঠামের বাঙ্ময় চলনভঙ্গি, সর্পিল বেণী সেই বহু বছর আগেকার কুমারী নদীর ভঙ্গিতে গ্রীবার পাশ দিয়ে পথ কেটে বুকের কমনীয় অববাহিকায় শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ছড়িয়ে পড়েছে। দেখলুম উনিশ বছরের তরুণী সুরঞ্জনা অর্বুদার্বুদ আলোকবর্ষ দূরের কোন ছায়াপথ থেকে ম্যারাথন যাত্রা করে অর্বুদার্বুদ আলোকবর্ষ দূরের কোন জ্যোতির্লোকের দিকে অন্তহীন চলেছে। ত্বরাহীন। আত্মমগ্ন। প্রেক্ষাপটের প্রান্তে আমাকে ও দেখতে পাচ্ছে না। আমি যে স্থাবর। আর এই মহাস্থবির ও ওই চিরপ্রচলার মাঝখানে শুধু আপূর্যমাণ, অচলপ্রতিষ্ঠ মহাশূন্য, মহাকাল।

উত্তর পক্ষ

গল্পটা নাজমা চৌধুরীর।

যে নাজমা চৌধুরী মফস্বল শহরের রাত সাড়ে সাতটার প্ল্যাটফর্মে দু ভাঁজ করোগেটেড শেডের তলায় বিদেশি পারফিউমের মৃদু সুগন্ধ ছড়িয়ে ব্যস্তভাবে ঘড়ি দেখতে দেখতে এইমাত্র এসে দাঁড়ালেন। নেভি-ব্লু রঙের জমকালো বাংলাদেশি ঢাকাই পরেছেন। সাদা কাজ। সাদা শালের ওপর শলমার কাজ করা পঞ্চো। কানে ছোট ছোট দুটো স্বচ্ছ পাথর। ডান হাতের অনামিকায় একটা অনুরূপ বড় পাথর। সাঙ্ঘাতিক ঝলসাচ্ছে।

নাজমা চৌধুরীই পূর্বপক্ষে।

শীতকালের সন্ধে। তার ওপর অসময়ের টিপির টিপির বৃষ্টি। স্বাভাবিক নিয়মেই স্টেশন জনশূন্য। একটা কুলি কি রেলকর্মীর চেহারা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। ফিরিঅলাগুলোও লোপাট। করোগেটেড শেডের ওপর বৃষ্টির টুং-টাং মোটেই কানে জলতরঙ্গ বাজাচ্ছে না। রেডিওর রোমাঞ্চ-নাটকের গা শিরশিরে আবহসঙ্গীতের মতো শোনাচ্ছে বরং। ফ্লোরেসেন্ট বাতির মৃদু ঠেলায় অন্ধকার সামান্য হঠে গিয়ে বেহায়া বেড়ালের মতো ওত পেতে আছে। ওরা বলে গেছিল কুলিদের জিজ্ঞেস করলেই লেডিজ কামরার সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে বটে, কিন্তু এতো রাতে লেডিজে না ওঠাই নিরাপদ। ওরা মানে অবশ্য বহুবচন নয়, একবচনই। লিলির মাসতুত দাদা না কে, যে অত্যুৎসাহী ব্যক্তি বিয়ে-বাড়ির শতকাজ তুচ্ছ করে নাজমা চৌধুরীকে আড়াই-তিন মাইল দূরের স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে তো গেছেনই, নিতান্ত চক্ষুলজ্জাবশত আরও বেশি দূরে গিয়ে উঠতে পারেননি। পৌঁছে দেবার ভার নিয়ে ভদ্রলোক যখন স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ডের কোনদিকের পাল্লাটা খুলবেন ইতস্তত করছিলেন, অভদ্রতা হবে জেনেও নাজমা মৃদু টানে পেছনের পাল্লাটা খুলে ফেলেছিলেন।

গায়ে-পড়া পুরুষমানুষ কোনদিন বরদাস্ত করতে পারেন না নাজমা। শিভ্যালরি বলে একটা মেয়ে-ঠকানো শব্দ আছে বটে। কিন্তু সত্যিকারের দায়িত্ববোধ ও গায়ে-পড়া স্বভাবের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। অনভিজ্ঞ মেয়েরা ধরতে পারে না। নাজমা সতের বছর বয়স থেকে সমাজসেবামূলক কাজের সুবাদে সভা-সমিতি-মিছিল-বক্তৃতা ইত্যাদি করে করে হরেক মুখোশের মোকাবিলায় অভ্যস্ত। কোন মেঘ তাতমেঘা আর কোন মেঘে বৃষ্টি হবে দেখবামাত্র বলে দিতে পারেন। ফুলদানিতে কাগজের ফুলের মতো নিষ্প্রাণ একটা শালীন হাসি ঠোঁটে সাজিয়ে রাখেন। অভদ্র কেউ বলতে পারবে না, কিন্তু সেই হাসির মধ্যে একটা তাপমাত্রার ব্যাপার আছে। লিলির মাসতুত দাদার বেলায় হাসিটা হিমাঙ্কর কাছাকাছি ছিল।

ফিরতি টিকিটটা ভাগ্যিস নেমেই কিনে নিয়েছিলেন। বাঙালি জাত সত্যিই বড় দায়িত্বজ্ঞানহীন। নিজেদের খেয়াল চরিতার্থ করা বা ভদ্রতা করা যে নামেই ডাকা যাক না কেন আজ ওরা যেটা করল তার নাম জবরদস্তি। ফলটা ওদের নয়, তাঁকেই ভোগ করতে হবে।

তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবেন বলেই কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে চারটেয় বিয়ে-বাড়ি পৌঁছনো। দু ঘণ্টার জার্নি। এসেছেনও সেন্টারের বার্ষিক হিসেব-নিকেশের কাজ আধা-খেঁচড়া ফেলে রেখে। এদিকে পরের মাসেই অডিট। পাঁচটা পঁয়ত্রিশের ট্রেন ধরে ভেবেছিলেন সাড়ে সাতটা-আটটা নাগাদ হাওড়া পৌঁছে যাবেন, সেখান থেকে পার্ক সার্কাস আধ ঘণ্টা, কেননা অফিস টাইম পার। কোথায় কি ? লিলিদের বাড়ি যখন পৌঁছলেন তখন কনে অর্থাৎ লিলি দু-তিন জন বন্ধু নিয়ে বিউটি স্লিপ দিচ্ছে। মা মাসিমা শ্রেণীর গিন্নি-বান্নিরা পান চিবোতে চিবোতে ঝিমোচ্ছেন। পুরুষমানুষরা বোধহয় সবাই রান্না ও ডেকোরেশনের তদারকিতে। বিয়ের লগ্ন নাকি রাত একটায়। আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে যাবার কথা শুনে সব যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'নাজমাদি, তুমি বলতে পারলে কথাটা ? ভগবান না করুন, বিয়ে তো আর বার বার করছি না ! আর সেই আমার একমাত্র বরের সঙ্গে একমাত্র বিয়েতে এসে তোমা হেন লোক কিছু মুখে না দিয়ে চলে যাবে ?'

'বা রে, আর আমার ফেরা ? ট্রেনে নিয়ারলি দু ঘণ্টার পথ, তারপর বাস, সে খেয়াল আছে ? স্টেশন থেকে তোমাদের বাড়ি আসতেও তো তিন সাড়ে তিন মাইল মনে হল।'

'আজকে তো থেকে যেতে পারো নাজমাদি, থেকে যাও প্লীজ। হিন্দু বিয়ে তো তুমি অ্যাট ক্লোজ-কোয়ার্টার্সি দেখোনি !'

নাজমা মনে মনে বললেন, 'দেখে আর কাজ নেই। গোহাটায় সস্তা দরে বিকিয়েছ। এবার ঘটা করে তোমায় দাগানো হবে। তারপর ঈদের উটের মতো জবাই। থ্রি-ফোর্থ গলাকাটা, ওয়ান-ফোর্থ দিয়ে বাকি জীবন পরিত্রাহি চেঁচিও। দেখার আর আছেটা কি ?' মুখে বললেন 'আসছে কাল বারুইপুরে ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর প্রোগ্রাম আছে না ? তুমি না হয় উদ্বাহর জন্য ছাড়া পেলে, আমাদের বেলাও কি সে একসকিউজ খাটবে ?'

'আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছতে গাড়ি তো যাবেই। ছটা পঞ্চান্নর লোক্যালটা ঠিক ধরিয়ে দেব। কি রে সুকান্তদা, পারবি না ?'

সুকান্তদা, যিনি আলাপ হয়ে পর্যন্ত 'কি রে লিলি, ডাকছিলি ?' বলে অন্তত পাঁচ-ছবার ঘরের মধ্যে আসা-যাওয়া করলেন, আকর্ণ হেসে জানালেন, শুধু স্টেশন কেন ? দরকার হলে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসতেও রাজি আছেন। তবে তাতে করে কনের পিঁড়িটা হয়ত আর ধরা হয়ে উঠবে না। নাজমা তাঁর হাসির তাপাঙ্ক এই সময়েই ঝটিতি কমিয়ে ফেলেছিলেন। যেসব বাদশাজাদারা মোগলাই আমলে কেল্লার প্রাচীর থেকে রুমাল ছুড়ে ছুড়ে নর্মসঙ্গিনী যোগাড় করত, কয়েক জেনারেশন পর এখন তারাই সুকান্তদা, প্রশান্তদা, রফিকদা, জলিলদা হয়ে পকেটের রুমাল মোচড়াতে মোচড়াতে আনাচে কানাচে সুযোগের অপেক্ষায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এ বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

এর পরেই লিলি সাজতে বসে গিয়েছিল, এবং সাজতে বসলে যুবতী তো যুবতী, প্রৌঢ়াদেরই হুঁশ থাকে না। মেকাপ, গ্লীমার, আই-শ্যাডো, ব্রাশ-অন, লিপস্টিক, লিপগ্লসের অরণ্যে বিলকুল গায়েব। লিলি মায়ের একমাত্র মেয়ে। তিনি ব্যস্ত। সবারই দেখা গেল কাছাখোলা অবস্থা। নাজমা দু-তিনবার সবার অলক্ষ্যে টুক করে কেটে পড়বার

চেষ্টা করে ছিলেন। প্রত্যেকবারই কারো না কারো চোখে পড়ে গ্রেপ্তার হয়ে ফিরে এসেছেন। খাওয়াই হল সাড়ে ছটায়। কনের ঘরে আলাদা করে যেটুকু রান্না হয়েছে তুলে আনা, এবং সারাক্ষণ লিলির মাসিমা জোড়হস্ত। 'বড্ড দেরি করিয়ে দিলুম, দরকার হলে সুকান্ত আপনাকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দেবে, ভাববেন না।'

লিলি বলল, 'ভাবনা ? নাজমাদির ? ভয়-ভাবনা কাকে বলে জানলে নাজমাদিকে আর শক্তি সেন্টারের সেক্রেটারি হতে হত না মাসি। তোমাদের মতো কেবলু পার্টি না কি ?'

নাজমা মৃদু হেসে সায় দিয়েছিলেন, 'ভয়ের কথা হচ্ছে না, কিন্তু সুবিধে-অসুবিধেও তো আছে ?'

—'তেমন তেমন বুঝলে না-হয় থেকেই যান না ? না কি গরিবের বাড়ি থাকতে খুব কষ্ট হবে ?'

থেকে-টেকে যেতে নাজমার খুব আপত্তি। চেনেন না, শোনেন না, বিয়েবাড়ির পাঁচ-মিশালি ভিড়, তার ওপর নিশ্চয়ই সারাটা রাত বর-কনেকে নিয়ে যত রকমের নাক-কান-কাটা ইডিয়টিক রসিকতা চলবে। এর মধ্যে রাত কাটাবার কথা চিন্তাই করতে পারেন না। সংক্ষেপে বললে 'বাবাকে বলা নেই।'

'তুমিও বাবাকে বলার ভয়ে ঘাবড়াবে নাজমাদি ?' ভ্রূ ভঙ্গি করে বলেছিল লিলি। স্বাধীনতা আর খামখেয়াল যে এক বস্তু নয় হাজার চেষ্টাতেও সেকথা এদের এখনও বোঝানো গেল না ! না-ফেরার হলে অবশ্যই তিনি আলিসাহেবকে বলে বেরোন।

এখন প্ল্যাটফর্মের টিমটিমে আলোর ওধারে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির জাফরির দিকে তাকিয়ে মনে হল থেকে যাওয়াই বোধহয় উচিত ছিল। কতবার কত অজানা, অপরিচিত জায়গায় রাত কাটাতে হয়েছে। বিহারের ভাঙ্গি পল্লীতে, পিলখানার দরিদ্র মুসলমান পাড়ায়। আনাজের খোসা, পেঁয়াজ-রসুনের তীব্র গন্ধ, শূয়োরের নাদি, পেচ্ছাপ-পায়খানার মধ্যে। সমাজসেবিকার আবার স্থান-কালের বিচার। আসল কথা, মন নিজের অজ্ঞাতেই কাজ আর সামাজিকতার মাঝখানে একটা দেয়াল তুলে দেয়।

সাতটা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন। কোনও মানে হয় ? যত সময় যায় লোক্যালের সংখ্যা ততই কমিয়ে দেয় এরা। ছটা পঞ্চান্নর পর এই সাতটা পঁয়তাল্লিশ। মাঝখানে কিচ্ছু নেই। লিলির সুকান্তদা অবশ্য ট্রেনে তুলে দিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু বরফের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে গেছে। দূর থেকে ট্রেনের আলো দেখতে পেয়ে তৎপর হলেন নাজমা। লেডিজ কামরাটা পরক্ষণেই সামনে দিয়ে শটাশট চলে গেল। একেবারে ফাঁকা। এখন অবশ্য আর বিচারের সময় নেই। সামনে যেটা পেলেন সেটাতেই উঠে পড়লেন নাজমা। মন্দ ভিড় নয়। তবে জায়গা হল দুই ভদ্রলোকের মাঝখানে, একধারে সরে গিয়ে মহিলাকে পাশটা ছেড়ে দেবার ভদ্রতাও যাঁদের নেই।

জ্ঞান হয়ে থেকে আজ অবধি যা দেখলেন তাতে করে নাজমা বুঝে গেছেন এই পুরুষ জাতটার মতো পাজির পাঝাড়া আর নেই। আইন-শৃঙ্খলা এবং গুটিকয় সামাজিক বাধ্য-বাধকতার চাপে পড়ে আনরুলি আদিম থাবা চারটি কোনমতে গুটিয়ে-সুটিয়ে রেখেছে। সুযোগ পেলেই সুযোগ নেবে। দু পাশে শীতসন্ধ্যার আলকাতরা অন্ধকার চিরে পাগলের মতো ছুটে চলেছে ট্রেনটা। সাত থেকে বত্রিশ এই দীর্ঘ সময় নাজমাও এই রকম একটা নিকষ অন্ধকার চিরে প্রাণপণে ছুটে চলেছেন। কত শত ডিসট্যান্ট সিগন্যালের রক্তচক্ষু হুঁশিয়ারি, নাজমা ভ্রূক্ষেপও করছেন না। কোনও উটকো জায়গায় থেমে অমূল্য জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করতে চান না তিনি। তাঁর লক্ষ্য পরিপূর্ণ মুক্তি।

সেই মুক্তি যার প্রথম ধাপ স্বাধীনতা এবং যা কোনক্রমেই কারো উপহার দেবার জিনিস নয়। পরিপূর্ণ আত্মনির্ভরতা কাকে বলে নাজমা প্রায় জেনে ফেলেছেন এবং সম্ভব হলে এই আত্মনির্ভরতার শিক্ষা তিনি অন্তত তাঁর নাগালের মধ্যে যেসব মেয়ে আছে তাদের দিয়ে যেতে চান। তা, সে চৈতন্য থাকলে তো ! তিনি নিজে মাত্র সাড়ে আট বছর বয়সে পাড়ার মাদ্রাসা থেকে পালিয়ে মিশনারি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন নানীর প্রেরণায়। মাদার মেরিয়নের কাছে স্বাধীনতার শিক্ষায় হাতেখড়ি তাঁর। মুর্শিদাবাদের চাষী-গ্রামের নবাবগৃহের লোহার পর্দা ছিঁড়ে মাকে নিয়ে বাবার কাছে তাঁর কর্মস্থলে চলে আসবার যুদ্ধটা তো প্রায় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শামিল ! কারণ, সাড়ে দশ বছরের নাতনি দুর্দান্ত তেজী রাগী দাদু নওশের সাহেবের হাত কামড়ে ধরেছিলেন। হঠাৎ হেসে ফেলে রাগী মানুষটি বলেছিলেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা যা। দেখি তোর দৌড় কোন মসজিদ পর্যন্ত। বাপের নিকাহ্ ঠেকাতে পারিস তো যা।'

তা ঠেকিয়েছিলেন নাজমা। মা যা পারেননি, মেয়ে তা পেরেছিল। তাই-ই মনে হয় নিজেদের উদ্যোগ, নিজেদের চৈতন্য দরকার। তা নয়ত অবলাবান্ধব তো মন্দ এলেন না গেলেন না। তা সত্ত্বেও এই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বউ-পোড়ানো এবং খোমেইনি ! বাইরের চেহারাটা বদলানো ছাড়া আর কিই বা হয়েছে ? বোরখা খসলেই যদি ভেতরের পর্দা খসত ! তা ছাড়া এখন তো ক্রীতদাসীদের হাতে-পায়ে আর একখানা বাড়তি শেকল। রোজগার করতে বেরোচ্ছ তো কি ? তোমার সংসারের খুঁটিনাটি কি মিঞা-বাবু দেখবেন ? লেখাপড়া শিখেছ ? বহোত আচ্ছা ! ছেলেমেয়েদের শেখাও। ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ার পবিত্র দায়িত্ব নিতেই তো তোমার জন্ম, তোমার শিক্ষা-দীক্ষা। গৃহকর্ম তুমি করবে না তো কি পুরুষরা করবে ? ছিঃ ! পৌরুষ থাকবে তা হলে ? বেরোচ্ছই যখন বাজারটা কম-সম টাকায় বুদ্ধি করে কিনে আনো। ইলেকট্রিকের বিল ? ওতো অফিসের পথেই পড়ে। কেরোসিনের লাইন, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, ডাক্তার, তাই বা বাদ যায় কেন ? ইত্যবসরে তোমার গর্দানে আরামকেদারা পেতে খাটাখাটনিতে ক্লান্ত পয়গম্বরগুলি একটু বাড়তি নিদ্রা দিয়ে নিন। নারী-স্বাধীনতা। হুঃ !

আরেক দল আছেন যাঁরা ব্রা ছিঁড়ে, লিভিং টুগেদারের নব্য ইজমে দীক্ষিত হয়ে শার্ট পেন্টুলুন পরে উইমেনস লিবে শামিল হয়েছেন। জীনস নাজমাকেও পরতে হয়, কিন্তু সেটা নিতান্তই কাজের পোশাক। রাজদ্বারে, উৎসবে, গোরস্থানে সর্বত্র ব্লু জীনস আর টাইট ভেস্ট পরে চুলছাঁটা। যেসব মহিলা লিবের পতাকা উড়িয়ে ঘুরে বেড়ায় তারা হল সত্যিকারের প্রবলেম এই নারী-স্বাধীনতা যুগের। শক্তি সেন্টারের সেমিনার সিম্পোজিয়ামগুলোতে এসব নিয়ে খুব দক্ষ এবং শৃঙ্খলাসম্মত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন নাজমা। মুক্তির সংজ্ঞা কি ? সমান অধিকার বলতে কি বোঝায় ? নারীর অস্তিত্বের বায়োলজিক্যাল তাৎপর্য ছাড়া আর কোনও স্বতন্ত্র মূল্য আছে কি না। সে কি সত্যিই দ্বিতীয় লিঙ্গ ? দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক এই পৃথিবী গ্রহে ?

এই ধরনের সিমপোজিয়ামে সিরাজ সব সময় উপস্থিত থাকে। টাকাকড়ির জোরে একজিকিউটিভ কমিটির মেম্বার তো হয়েছে ! নারী-মুক্তি না হলে যেন আর ঘুম হচ্ছে না ! সিগারের মতন আবার মুখে ঝোলে বক্র হাসি। বোদ্ধার মত আবার মন্তব্যও করা চাই 'উইমেন নীড প্রোটেকশন নাজমা, অ্যান্ড দে নীড ম্যানস লাভ।' জনান্তিকে মুখ ঝামটা দ্যান নাজমা 'হোয়াট ডু ইউ মীন ? এই সেন্টারে আমি প্রতিটি মেয়েকে জুডো, কারাটে, লাঠিখেলা, ছোরা খেলা শেখাচ্ছি, তা জানো ? আর ওই লভ বস্তুটা কি ? অন হুইচ

উইমেন আর সাপোজড্ টু থ্রাইভ ? কত পার্সেন্ট ওর সেক্স ? কত পার্সেন্ট ব্লাস্টেড ওয়ান সাইডেড, সোশ্যাল কনট্রাক্ট ? আর কত পার্সেন্ট নির্ভেজাল, নির্লজ্জ সুবিধেবাদ ?' সিরাজ তখনও হাসে, বলে 'আই ক্যান ডেমনস্ট্রেট, ইফ ইউ অ্যালাউ নাজমা, বস্তুটা ঠিক কি এক্সপ্লেন করতে তো পারব না। মুরুক্ষু সুরুক্ষু মানুষ !'

ঘড়ির কাঁটায় চোখ পাতলেন নাজমা। মোটে সাড়ে আট। অনেকগুলো স্টেশন পেরিয়ে গেছে। কামরার ভিড় এখন পাতলা। দুপাশে দুই কলাগাছের মতো অভদ্র ভদ্রলোকদ্বয় কখন নেমে গেছেন। জানলার ধারে সরে গিয়ে কাচটা তুলে দিলেন নাজমা। দু-একটা জলের ফোঁটা কনুয়ের ওপর পড়তে গা শিরশির করে উঠল। কনুইটা সরিয়ে নিলেও কাচটা বন্ধ করলেন না তিনি। বাইরের হাওয়া এসে ভেতরের ঘাম-দুর্গন্ধি-অলা বাতাস শুদ্ধ করে দিয়ে যাক। হাওয়ার ঝাপটায় চুলগুলো এলোমেলো হয়ে কপালের ওপর, নাকের ওপর সুড়সুড়ি দিচ্ছে। ভারী মনোরম একটা অনুভূতি। আপাতত দিগন্তজোড়া ধানক্ষেত পার হচ্ছে ট্রেনটা। অন্ধকারেও বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। ঝোপঝাড়ের গায়ে গায়ে থোকা থোকা জোনাকি আটকে আছে। আঁকাবাঁকা খেজুরগাছগুলো কোমরভাঙা বৃদ্ধার মতো নিরাসক্ত দৃষ্টিতে অপস্রিয়মাণ ট্রেনটাকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। প্রকৃতির সঙ্গে সব সময়েই একটা একাত্মতা অনুভব করেন নাজমা। প্রকৃতি কি শুধুই প্রসবিত্রী ? গভীর, বিরাট, সুন্দর, রহস্যময়, অনন্ত শক্তির রোমহর্ষকারী খেলার পটভূমি এই প্রকৃতি স্বরূপত কি ? নারীই বা স্বরূপত কি ? কোন বিশেষ প্রয়োজনে সে ভিন্ন হল ? শুধু জৈব প্রয়োজন ? কে জানে ! মন সায় দেয় না যেন। কিন্তু সে যা-ই হোক না কেন। রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ পরিমিতিবোধ এগুলো যে নারীনামক রহস্যময় আধারের শাশ্বত আধেয় এতে বোধহয় কোনও সন্দেহ নেই।

সেন্টারে এক মহিলা আসেন তাঁর পশ্চাদ্দেশ বেখাপ্পা রকমের বিপুল। সেক্রেটারি হিসেবে তাঁকে বলা ভালো মনে করেছিলেন নাজমা, 'মিসেস বিশ্বাস, আপনি কিন্তু শাড়ি পরলেই বুদ্ধিমতীর কাজ করবেন।'

'কেন ?'

'শাড়িই আপনার ফিগারে বেশি মানাবে।'

'ও। কিন্তু এই ফিগারের ছেলেরা কি অফিস যাবার সময় পেন্টুলুন পরে না ?'

'অবশ্যই পরে। কিন্তু আপনার বিশেষ সুবিধে এই যে আপনার বিকল্প রয়েছে।'

'বিকল্পটা গ্রহণ করব কেন ? আর একটু সুন্দর দেখাবার জন্য ?' যাতে চারপাশের পুরুষগুলো একটু বেশি ডিগ্রিতে চোখের আরাম পায় ? যদিও প্যান্টেই আমি কাজের সময় বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি ?'

অকাট্য যুক্তি। এর উত্তরে নাজমা কিছু বলতে পারেননি। বলতে পারেননি—'নারী মুক্তি মানে নারীত্ব বিসর্জন দেওয়া নয়।' বলতে পারেননি—'মিসেস বিশ্বাস, আপনি শোভন হন শুধু পুরুষের চোখের আরামের জন্য নয়, আমাদের, মানে মেয়েদেরও চোখের কথা ভেবে। মেয়েরা সুন্দর হয় শুধু সুন্দর হবার জন্যই।'

আসলে সমস্ত ব্যাপারটা খুব জটিল। এই ধরনের ভুল প্রতিক্রিয়া খুব স্বাভাবিক। কঠিন, খুবই কঠিন সমস্যাটা। একদিকে উপযোগবাদ আর একদিকে সাম্যবাদ। দুয়ে মিলে সৌন্দর্যবোধের মাথা খেয়েছে।

কামরার মধ্যে চোখ ফেরালেন নাজমা। কেমন একটা অসোয়াস্তি। কিসের ? যেন বাইরের প্রকৃতি সমেত নাজমার ভাবনার জগৎ আর এই কামরার ভেতরটা দুটো পৃথক গ্রহ

এবং এই গ্রহ অতি বিপজ্জনক বিষ বাষ্পে ভরা। কেন এমন মনে হচ্ছে বোঝবার জন্য শিক্ষিত শিকারী কুকুরীর মতো নাক উঁচু করে কামরার বাতাস ফুসফুসে টেনে নিলেন নাজমা। তারপরেই বুঝতে পারলেন। দু-এক বেঞ্চি দূরে, সামনের দিকে, তাঁর ঠিক কোণাকুনি একটা লোক বসে। রুক্ষ, রূঢ় চেহারা, ছড়ানো চোয়াল, গালের ওপর বাসি দাড়ি এবং দু-চারটে মাংসের ডুমকি উঠে আছে। চেক-চেক একটা সস্তার শার্ট এবং টেরিকটের আধ ময়লা প্যান্ট পরনে। গায়ের ওপর একটা পাটকিলে রঙের চাদর ফেলা। লোকটা তীক্ষ্ণ, চোরা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। খোলা ছুরির মতো দৃষ্টিটা তাঁকে বিঁধছে। দৃষ্টিটা অনুসরণ করে নিজের ডান হাতের অনামিকায় পৌঁছলেন নাজমা। এইটাই ওর চাঁদমারি মনে হচ্ছে। নাজমার ডান হাতের অনামিকায় সাড়ে আট রতির অতি নিপুণ কাটিং-এর একটি হীরে, হোয়াইট-গোল্ডের ওপর সেট করা। 'এই হীরের এখনকার বাজারে কত দাম হতে পারে আন্দাজ নেই নাজমার। বুড়ি নানী নুরাতুন বেগমের মৃত্যুশয্যায় আদরের নাতনির আঙুলে স্থানান্তরিত হয়েছিল এই ফ্যামিলি এয়ারলুম। সে আজ নয় নয় করে দশ বচ্ছর তো হবেই। নানীর অনেক দুঃখের সাথী, ব্যথার ব্যথী ছিলেন তরুণী নাজমা। সৈয়দ বংশের মেয়ে, সৈয়দ বংশে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু নানার তিন বিবি। সতীন এবং সতীন পুত্রকন্যাদের বিষ কণ্ঠে ধারণ করে দেহে-মনে বড় কম জ্বালা ছিল না নানীর। এ আংটি নাকি আর্জুমন্দ বানু বেগমের, কোন মীনাবাজারে যুবরাজ খুর্‌রামের গোপন প্রণয়োপহার। স্বামীর প্রেমের ধাক্কায় অবশ্য বছর বছর সন্তানধারণ করে স্রেফ রক্তশূন্যতা রোগেই মারা গেলেন তিনি সারা হিন্দুস্থানের অধিশ্বরী হয়ে। অবশ্যই তাজমহল নামক বিশ্ববিশ্রুত স্থাপত্যের উপলক্ষ গড়ে দিতে। নানীর নির্বন্ধে কখনও আংটি হাত থেকে না খোলবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নাজমা। তখনও দিনকাল এতো খারাপ ছিল না। হাত বাড়িয়ে বাসের জানলা দিয়ে হার ছিনতাই, কি রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিনদুপুরে কান থেকে দুল খুলে নেওয়া এ ধরনের অরাজকতা এ রকম ব্যাপকভাবে শুরু হয়নি। অনায়াসেই প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন তিনি। আসলে ইতিহাসের টান নয়। এ আংটি তাঁর নানীর ভালোবাসার প্রতীক। এ অঙ্গুরী তাঁর লড়াইয়েরও প্রতীক। মায়ের লড়াই, দিদিমার লড়াই, মমতাজের লড়াই। অনেক বদখৎ জায়গায় কর্মসূত্রে যেতে হয়েছে, আংটিটা কখনও হাত থেকে খোলেননি নাজমা। আজও একজন বলেছিলেন—'ট্রেনে যাচ্ছো, ফিরতে সন্ধে পেরিয়ে যাবে, আংটিটা খুলে অন্তত ব্যাগে নিয়ে নিও নাজমা।' নাজমা কান দেননি। অদূরের কোণে বসা লোকটার লোভাতুর দৃষ্টি এখন সেই আংটির ওপর চক্রধর সাপের মতো ছোবল মারছে।

কড়ে আঙুলের চাপ দিয়ে আস্তে আস্তে আংটিটাকে ঘোরাতে লাগলেন নাজমা। মুঠোর মধ্যে এখন হীরেটা। হাতের পাতায় চাপ লাগছে। হাতটা মুঠো করে পঞ্চোর মধ্যে ধীরে ধীরে ঢুকিয়ে নিলেন। যেন এমনিই করছেন শীত করছে বলে। পঞ্চোটাকে গুটিয়ে-সুটিয়ে নড়েচড়ে বসলেন। লোকটার দিকে একবারও তাকালেন না। যেন লক্ষ্যই করেননি। কিন্তু লক্ষ্য না করলেও বুঝলেন লোকটা মারাত্মক রকম উত্তেজিত হয়ে আছে। পা দুটো বেগে দোলাচ্ছে। হাঁটুতে হাঁটু লেগে যাচ্ছে। হাতগুলো কোথায় রাখবে ভেবে পাচ্ছে না। একবার হাঁটুর ওপর, তারপর বুক-পকেটে, তারপর মুখে বুলিয়ে নিল, কাঁধের চাদরটা ঠিকঠাক করে নিল। বিড়িতে ঘনঘন ফুঁ দিচ্ছে। খালি ওস্তাদ তীরন্দাজের মতো দৃষ্টি লক্ষ্যে স্থির। লোকটা বোধহয় কোন কারখানার শ্রমিক-ট্রমিক হবে। প্রচণ্ড পেশল চেহারা। দাগী গুণ্ডা বদমাস বোধহয় নয়। নাজমা নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করলেন।

কামরায় এখন সবশুদ্ধ পাঁচজন লোক। এক বুড়ি, চালের পুঁটলি কোলে তাঁর পাশে বসে ঢুলছে। ওই লোকটা, তিনি, আর দুটি গ্রাম্য লোক পেছনের দিকের বেঞ্চে বসে বিড়ি খেতে খেতে গল্প করছে। ওরা নেমে যাবে না তো? একবার মনে হল ওদিককার লোক দুটির কাছে গিয়ে সাহায্য চান। কিন্তু ও লোক দুটিই কি স্বাভাবিক? সাহায্য চাইতে গেলে অপমান করে বসতে পারে। দ্বিগুণ বিপদে পড়তে হতে পারে। কানের পাথর দুটো আজকালকার বাজার-চলতি আমেরিকান ডায়মন্ড। এই রকম অতিকায় একটা হীরে পরে প্রকাশ্য রাস্তায় এখন লোকে চলাফেরাও করে না। এটাকেও ঝুটো ধরে নিতে আপত্তি কি? সেইরকম একটা হেলাফেলার ভাব দেখিয়ে ধাপ্পা দেওয়া যায় না?... এখনও কি তাকিয়ে আছে লোকটা? মতলব আঁটছে মনে মনে? না, তবে হার্ডনড় ক্রিমিন্যাল নয়, হলে এখনই ঝাঁপিয়ে পড়ত। লোহাপেটা শরীর, অস্ত্রশস্ত্রও ওদের কাছে থাকে, আজকাল ট্রেন-ডাকাতি হলে সহযাত্রীরা বাধা দেয় না। ... আসলে লোভের জিনিস চোখের সামনে দেখে ভেতরের লালসা গর্জে উঠেছে। স্বভাব-ক্রিমিন্যালের ধরন-ধারণ নয়। আড়চোখে একবার চাইলেন নাজমা। চেয়েই শিউরে উঠলেন। লোকটার দৃষ্টি এখন খানিকটা পিছলে গেছে। লোভ আর রিরংসার কি বিকট চেহারা! হঠাৎ বুকের ভেতরটা ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেল। শিরদাঁড়া বেয়ে বরফজল নামছে। ও কি শুধু হীরেটাই চায়?

রাত নটা। শাঁখ বাজিয়ে ট্রেনটা একটা শূন্য প্ল্যাটফর্মের বুড়ি ছুঁল। পাশের বৃদ্ধা পুঁটলি-কোলে উঠে দাঁড়িয়েছে। ওদিক থেকে একটা লোক শশব্যস্তে বিড়িটা পায়ে মাড়িয়ে নেমে গেল। এখন আততায়ী আর তিনি ছাড়া শুধু একটি নিম্নশ্রেণীর লোক। নতুন কোনও যাত্রী উঠল না। সেই সময় মাথায় খেলল চিন্তাটা। যেন অন্যমনস্ক ছিলেন স্টেশনের নাম খেয়াল করেননি, এই স্টেশনেই নামবার কথা এই রকম একটা ভাব করে তীরের মতো ছুটে গিয়ে নেমে পড়লেন নাজমা। তিন চারটে কামরা বাদ দিয়ে উঠে পড়লেন। এটাতে এখনও বেশ কয়েকজন রয়েছে। জানলার ধারে বসে কাচ নামিয়ে দিলেন। যাক। বিপদের সময় বুদ্ধি হারালে চলে? বুদ্ধিনাশই বেশির ভাগ সময় প্রাণনাশের কারণ হয়ে থাকে। সেন্টারের মেয়েদের শারীব শিক্ষার ক্লাসে তিনি বহুবার জীবনধারণে উপস্থিতবুদ্ধির ভূমিকার কথা বলেছেন! নাজমা হঠাৎ জমে গেলেন। লোকটাও উঠে এসেছে। ওদিককার জানলার ধারে বসে খুব নিশ্চিন্তে একটা বিড়ি ধরাচ্ছে। দেশলাইয়ের কাঠিটা জ্বেলে মুখ নিচু করে বিড়ি ধরাবার মুহূর্তে চট করে একবার দেখে নিল এদিকে। দেশলাইয়ের আগুনের লাল আভায় নাকের পাশের ডুমকিগুলো দেখাচ্ছে রাক্ষসের দাঁতের মতো। না, কোনও ভুল নেই। উদ্দেশ্য স্পষ্ট।

প্রত্যেক স্টেশনে দুজন তিনজন করে লোক নেমে যাচ্ছে। সিমলাগড়... পাণ্ডুয়া... মগরা। কি করবেন নাজমা? নেমে পড়বেন? সন্দেহ নেই লোকটাও নেমে পড়বে এবং হাওড়ার জনাকীর্ণ প্ল্যাটফর্মে যে সুবিধে পেত না, মফঃস্বল শহরের শীত-বৃষ্টির ঝিমধরা রাস্তাঘাটে ওর সে সুবিধে হয়ে যাবে। নাজমার গলা শুকিয়ে কাঠ। আর একটা মাত্র লোক। সেই লোকটা আরও দুটো বেঞ্চি এগিয়ে এলো। শ্রীরামপুর। শেষ লোকটি টুপ করে খসে গেল। ট্রেন এখনও থেমে রয়েছে। নাজমা বুঝলেন নেমে যাওয়ার ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। হাওড়া আর মাত্র কয়েকটা স্টপ। একটু সাহস করে কাটিয়ে দিতে পারলেই ফাঁড়াটা কেটে যায়।

চলতে আরম্ভ করেছে ট্রেন। লোকটা আরও দুটো বেঞ্চি এগিয়ে এলো। অপাঙ্গে তাঁকে লক্ষ্য করে যাচ্ছে। ট্রেনের আলো অর্ধেক নেই। কামরার ছাদটা বসন্তে

ক্ষত-বিক্ষত মুখের মতো ভয়াবহ দেখাচ্ছে। যে কটা আলো আছে এই বিপুল ভয়ার্ত অন্ধকারে তারা বুড়োটে ঘোলাটে চোখে চেয়ে আছে। বাহাত্তুরে-ধরা নির্লিপ্ত নিঃসাড় চোখ। কণ্টকিত হয়ে নাজমা দেখলেন লোকটা প্রত্যেক বেঞ্চে লাফিয়ে লাফিয়ে বসছে। ডাইনে-বাঁয়ে সর্বত্র। কি এক রহস্যজনক ইন্দ্রজালে অ্যামিবার বাইনারি ফিশনের মতো দু ভাগ হল, চার, তারপর আট, ষোল, বত্রিশ। বিস্ফারিত চোখে নাজমা দেখলেন কামরাময় ছড়িয়ে পড়ছে লোকটার চেক-শার্ট, ঘেমো টেরিকটের প্যান্ট, পাটকিলে চাদর, থ্যাবড়া আঙুলের মাথায় জ্বলন্ত বিড়ি। জোড়া জোড়া শ্যেনচক্ষু তাঁর দিকে নির্মম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মুখ ভরা ব্রন, মাংসের ডুমো কামরাময় ছড়াচ্ছে, গড়াচ্ছে। এ বেঞ্চি থেকে ও বেঞ্চি, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। ঘৃণ্য, পিচ্ছিল পোকার মতো উঠে আসছে সর্বাঙ্গে। লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে। কি ভয়ঙ্কর! রুক্ষ, রূঢ় মুখে বাসি দাড়ি, কণ্ঠমণিটা উঠছে, নামছে। গরিলার মতো রোমশ ভয়াল হাত উদ্যত হল। ভয়ে জমে যাওয়া দু হাত সমস্ত শক্তি দিয়ে শূন্যে ছুঁড়লেন নাজমা। স্বপ্নে-ছোঁড়া হাতের মতো তাতে বিন্দুমাত্র জোর ছিল না। এতদিন ধরে যা শিখেছেন, শিখিয়েছেন আত্মরক্ষার সেই-সব করণকৌশল সব স্বপ্নলব্ধ জ্ঞান, স্বপ্নেই মিলিয়ে গেছে। কামরার দুটো আলোর একটা হঠাৎ নিভে গেল। কোন্ স্টেশনের কাছ দিয়ে যাচ্ছে ট্রেনটা? গাড়ি যেন মন্থর হয়ে এলো? বিপুল ভয়ে জ্ঞান হারাবার আগের মুহূর্তে নাজমা আবছা দেখলেন চলন্ত কামরায় যেন জাদুমন্ত্রে লাফিয়ে উঠল সিরাজ। কালাকাল ভুল হয়ে গেল নাজমার। ধোঁয়াটে মস্তিষ্কে এলোমেলো চিন্তাগুলো ভেসে গেল...-সিরাজ কি তবে ছায়ার মতো তাঁর পিছু নিয়েছিল? এভাবেই কি ও...? এ কি শুধু আজই? না, অনেককাল থেকে? অনেক কাল... কতকাল? ওর সেই পেট থিয়োরি... উইমেন নীড প্রোটেকশন... অ্যান্ড... দে...।

সংবিত ফিরে আসবার পরও সিরাজের শক্তিশালী মুঠোর মধ্যে থরথর করে কাঁপছিলেন নাজমা আর বলছিলেন—'সভ্যতা যতদিন জঙ্গল, মানুষ ততদিন জানোয়ার। সর্বাত্মক মুক্তি কোথাও নেই। কি ইজ্জৎ কি জহরত, কোনটাই নিজের চেষ্টায় রক্ষা করতে পারিনি, স্বীকার করছি সিরাজ। তোমার লাখ টাকার দেন মোহর আমার চাই না। দুটি স্বাধীনতার নিঃশর্ত মিলনে যে বিবাহ শুধু সেই বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমার জীবনভর সংগ্রামের মান বাঁচাও।' বলছিলেন বটে নাজমা, কিন্তু তাঁর ঠোঁটই বোধহয় শুধু নড়ছিল, কথা ফুটছিল না। কারণ সিরাজ এই সময়ে ব্যস্ত হয়ে বলল—'শুনছেন, শুনছেন, এতো ঘাবড়ে গেলে চলবে কেন দিদি? চেয়ে দেখুন, বদমাশটা নেমে গেছে। মেয়েদের ওপর যারা হামলা করে সে পুরুষগুলো কিন্তু আসলে এক নম্বরের কাওয়ার্ড। প্ল্যাটফর্ম থেকে লোকটাকে আপনার ওপর ঝুঁকে পড়তে দেখেই...'

আশ্চর্য হয়ে নাজমা তাকিয়ে দেখলেন একমুখ সুসজ্জিত গোঁফদাড়ি এবং চেহারার আদল সিরাজের মতো হলেও ছেলেটি আদৌ সিরাজ নয়। খুব ছেলেমানুষ। খুব সম্ভব কলেজে-টলেজে পড়ে। এবং শরীরচর্চা করে।

গল্পটা নাজমা চৌধুরীদের।

মিসেস গুপ্তরা

বিকেল সাড়ে তিনটে। গ্রীষ্ম দুপুরের বিশ্রাম-কাম-স্বাস্থ্য-কাম সৌন্দর্য ঘুম সেরে উঠে টি ভি-র ঢাকনাটার ওপর ট্যাটিং-এর ফুলগুলো বসাচ্ছিলেন মিসেস গুপ্ত। মিসেস গুপ্তর পুরো নাম লীনা গুপ্ত। কিন্তু আপনার আমার মতো অপরিচিত বা আধা-পরিচিত যাদের স্ট্যাটাস বা জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা নেই তারা যদি ওঁকে লীনা বউদি-টউদি ডেকে আদিখ্যেতা দেখায় তা হলে উনি অসন্তুষ্ট হবেন। কারণ ওঁর স্বামী বিখ্যাত বহুজাতিক-সংস্থা বা মালটিন্যাশনালের মাঝারি এগজিকিউটিভ। এই অভিজাত অঞ্চলে বহুদিন আগে জলের দরে কেনা সাড়ে তিন কাঠা জমিতে উনি মাত্র সেদিন সুদৃশ্য দোতলা বাড়িখানা তুললেন। দোতলায় নিজেরা থাকেন, একতলায় চলতি ফ্যাশন মতো অবাঙালি ভাড়াটে। ওঁর ছেলেমেয়ে সকালে রোয়িং, বিকেলে সাঁতার বা সকালে সাঁতার বিকেলে রোয়িং এবং শনি রবিবারে নাচ-গান-ছবি আঁকা ইত্যাদি যা যা শিক্ষণীয় সব শেখে, পড়াশোনার ব্যাপারেও কলকাতার সবচেয়ে ফ্যাশনদুরস্ত স্কুলে প্রথম দশজনের মধ্যে যাতে থাকতে পারে তার জন্য সাড়ে তিনশ' চারশ' দক্ষিণার টিউটর তো বটেই, মিসেস লীনা গুপ্তরও কম ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা নেই। তাঁদের সকালবেলাকার লেবু-রস, ব্রেকফাস্টে স্ক্র্যাম্বলড় এন-অন-টোস্ট, দুধ-কর্নফ্লেক্স, দুই স্কুলে দুই আলাদা টিফিন ক্যারিয়ারে মাপা প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট-ভিটামিন সমৃদ্ধ কিছু রাফেজ-সহ ড্রাই লাঞ্চ তিনি যথাযথ যুগিয়ে যান। বেশ ভিটামিন-মিনারল সচেতন জননী তিনি। তা ছাড়া, নিজের অবসর সময়কেও বৃথা যেতে দিতে আদৌ রাজি নন এই কর্মী মহিলা। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে প্রত্যহ মিসেস গুপ্তর কাজ হল 'শিঙার' নামের নিকটবর্তী বুটিক-কাম-বিউটি সেলুনে হাজিরা দেওয়া। সন্তান-সন্ততি উঁচু ক্লাসে উঠে গেলে এবং স্বামীরা কেরিয়ার-পর্বতে চড়তে চড়তে উপত্যকাসদৃশ একটা উচ্চমার্গীয় স্থিতাবস্থায় পৌঁছলে কিছু কিছু মহিলার জীবনে একটা উপভোগ্য অবসরকাল আসে। এই রকম কয়েকজন অবসরপ্রাপ্তা, আলোকপ্রাপ্তা জননী-জায়া মিলে 'শিঙার' ব্যাপারটা দাঁড় করিয়েছেন। কলকাতার নাগরিকরা আজকাল খুব সৌন্দর্যসচেতন হয়ে উঠেছে, তারই সুযোগে এই 'শিঙার'। কত রকমের মহিলা যে সময়ের সঙ্গে তাল মেলাবার জন্য এখানে ভুরু না থাকলেও ভুরু তুলতে, চুল না থাকলেও চুল ছাঁটতে, আবার লম্বা চুল কেটে ফেলে নকল চুলে খোঁপা বাঁধতে, কেমিক্যালের সাহায্যে গাত্রবর্ণ ধোলাই করতে, সোজা চুল কোঁকড়াতে আবার কোঁকড়া চুল সোজা করতে ক্লান্তিহীন ভাবে যাতায়াত করে থাকেন তা একটা পুরো দিন খরচ করে বসে দেখার জিনিস।

বিউটি সেলুনের পাশেই বুটিক। তাঁতের শাড়ির ওপর এমব্রয়ডারির ফুল তোলা

ডুপ্লিকেটহীন শাড়ি, বনেদি ঘরানার সেরামিকস্, র' সিল্কের বাতি-শেড, দেয়ালে টাঙাবার তিব্বতি স্ক্রোল, কস্ট্যুম জুয়েলারি ইত্যাদি ইত্যাদি। এই কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়ালে মিসেস গুপ্তর হাসি দেখতে পাবেন। এবং ভদ্রতা। সহজাত সেলিং স্ট্রাটেজির অন্তর্গত তৌল করা হাসি, এবং ভদ্রতা। উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ব্যবহার্য। স্বাভাবিক ভারি গলাকে আলজিভের কাছ থেকে আলতো করে ছেড়ে দিয়ে মিহি মোলায়েম স্বরে মিসেস গুপ্ত আপনাকে জিগ্‌গেস করবেন—কিভাবে তিনি আপনাকে সাহায্য করতে পারেন। যেন আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সের রিসেপশনিস্ট, কিংবা জনসংযোগ আধিকারিক। এই সময়ে তিনি ঘাড়টাকে সামান্য কাত্‌ করে খুব বড় বড় চোখে আপনার দিকে তাকাবেন। বালিকার মত নিষ্কলুষ অথচ জহুরীর মত সমর্থ সে দৃষ্টি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি সওদা সেরে নিতে পারবেন ওই চাহনির অভিভাবকতায়। কারণ আপনি সহজেই বুঝে যাবেন কোন্ পণ্যটি খরিদ করলে ফ্যাশনলোকের শীর্ষবিন্দুচারিণী বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে পারবেন, কোন্‌টা কিনলে অভিজাত সুরুচির জন্য অভিনন্দিত হবার সম্ভাবনা, কোন্‌টা...। কিন্তু একটা কথা। এই 'শিঙার' বুটিকের বাইরে যদি কোনদিন মিসেস গুপ্তর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় আপনি যেন ফট্ করে 'এই যে কেমন আছেন'-টাছেন জাতীয় কিছু বলে বসবেন না। কারণ, বুটিকের চেনাটা ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্কজনিত, নৈর্ব্যক্তিক। সেই মুখচেনার ওপর নির্ভর করে কোনও সুরুচিসম্পন্ন ভদ্রমহিলার সঙ্গে পথে-ঘাটে আলাপ করা অত্যন্ত ব্যাড ফর্ম। মিসেস গুপ্ত আপনাকে চিনতে পারবেন না, আপনার কথার জবাব দেবেন না। তা ছাড়া আপনি আবার সেই বোকাদের একজন নন তো যাঁরা বিপণিমাত্রকেই দোকান এবং কাউন্টারের ওধারে দেখা মহিলামাত্রকেই নিছক সেলস্ গার্ল ভেবে নিয়ে থাকেন। এই ধরনের প্রগতি-পরিপন্থী মূঢ়দের চেনা দিতে আর যে ই হোক মিসেস গুপ্ত বিন্দুমাত্র আগ্রহী নন।

হ্যাঁ। মিসেস গুপ্ত ট্যাটিং-এর ফুলগুলো বসাচ্ছিলেন। ফিকে গোলাপির ওপর সাদা-সাদা ফুল। তাঁর ড্রয়িং রুমের জন্য তিনি আপাতত গোলাপির শেড ব্যবহার করছেন। পর্দা গোলাপী, টেবিল-ঢাকা গোলাপি, কুশন-কভার, বাতির শেড সব গোলাপির রকমফের। ভারি তোষামুদে রঙ। অতিথির চোখে গৃহকর্ত্রীকে, গৃহকর্ত্রীর চোখে অতিথিকে রমণীয় করে। এমন সময় বাড়ির বেলটা তারস্বরে বেজে উঠল। বেল শুনে মিসেস গুপ্ত তাঁর সহজাত ভারি গলায় (কেন না অসময়ে ঘণ্টি শুনে তাঁর মেজাজ খারাপ হয়েছে) ছেলেকে বললেন—'দ্যাখো তো বাবুয়া, কে।' ছেলে তখন একটি ভয়ঙ্কর মেরুপ্রদেশীয় হাঙরের বীভৎস কার্যকলাপের বিবরণে আকণ্ঠ মগ্ন। সাড়া দিল না। সুতরাং মেয়ে। মা বললেন, 'শুস্তা. আগে ম্যাজিক আই দিয়ে দেখবে, চেনা-জানা হলেও আমাকে না বলে খুলবে না।' তেমন কেউ চেনাশোনা হলে মিসেস গুপ্তকে আপ্যায়ন করতেই হবে, তার আগে হাউজ-কোট পাল্টানো, চুল বাঁধা, প্রসাধন ইত্যাদির প্রস্তুতি আছে। ম্যাজিক-আইয়ে শুস্তার চোখ পৌঁছয় না। সে একটা ছোট মোড়া টেনে নিয়ে তবে ম্যাজিক-আইয়ের নাগাল পেল। তারপরেই ছুটতে ছুটতে শোবার ঘরে এসে সোৎসাহে ঘোষণা করল—'বড় পিসি এসেছে।'

মিসেস গুপ্তর কপালের চামড়া সর পড়া দুধের মত কুঁচকে গেল। তিনি চোখ সরু করে বললেন—'কে বললি? বড় পিসি? একা?'

—'না, রাজাদাদা সোনাদিদি আছে।'

—'আর?'

—'আর কেউ না।'

তবু ভালো। ততক্ষণে বেলটা আবার বেজেছে। এরা জানে না, বাড়িতে কেউ থাকলে একবার বাজালেই শুনতে পাওয়া যায়, না থাকলে হাজারবার বাজালেও দরজা খুলবে না।

—'যাও, খুলে দিয়ে এসো।' অনুমতি দিয়ে আবার সূচীকর্মে মনোযোগ দিলেন মিসেস গুপ্ত।

একটা বড় আকারের মিষ্টির বাক্স আর প্লাস্টিকের ঝুড়িসমেত ঘরে ঢুকলো শুস্তাদের বড় পিসি। মুখে একগাল হাসি।

—'কি গো বউদি। আছো কেমন?'

প্ল্যাস্টিকের ঝুড়িটার দিকে আড়চোখে তাকালেন মিসেস গুপ্ত। খেয়েছে, থাকবে নাকি? কুশল প্রশ্নের জবাব দিলেন না। শয্যার দিকে তাকিয়ে গলা উঁচু করে বললেন—'বকুল এসেছে।'

ঘুমের মধ্যে মিঃ গুপ্ত বা বিমানবাবুর মুখটা ঈষৎ হাঁ হয়ে ছিল এবং হাঁ মুখ দিয়ে ফড়িং ওড়ার মতো একটা ফড়ফড়ে শব্দ বার হচ্ছিল যা এ পল্লী নিবাসী বুটিক পরিচালিকা স্ত্রীর স্বামী, মাল্টিন্যাশনাল একজিকিউটিভের মুখ দিয়ে আদৌ বার হওয়া উচিত নয়। কিন্তু মধ্যবয়সী দিবানিদ্রা কেরাণী-অফিসারে তফাৎ করে না। আকস্মিক আহ্বানে তিনি ঘোঁৎ-মতো বেয়াড়া এবং পুনরপি তাঁর পদমর্যাদার অযোগ্য একটা শব্দ করলেন, তারপর লাল লাল চোখে উঠে বসলেন।

বকুল বলল—'আহা, বড্ড ঘুমোচ্ছিলি রে দাদা। সারা হপ্তার খাটুনি। না ডাকলেই পারতে বউদি। আমরা তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না।'

বউদি শঙ্কিত হলেন। 'পালিয়ে যাচ্ছি না' প্লাস প্লাসটিকের ঝুড়ি, আজ এখানেই অবস্থান না কি? এই সময়ে ননদ হাত বাড়িয়ে বাক্সটা দিল।

—'সাতগেছের মাথা সন্দেশ। খুব সরেস, খেয়ে দেখো। উনি সাতগেছেয় বদলি হবার পর তো আর আসা হয়নি। গত পুজোতেও তোমরা ছিলে না। বোধহয় এক বছর পর এলুম, নয়?'

মিসেস গুপ্ত একটা শুষ্ক হাসি হাসলেন। এক বছর পুরো পার হয়ে গেছে বুঝি? তাঁর তো মনে হচ্ছে বকুল এই কালই এসেছিল, মাঝে মাঝেই এসেছে। রোজই আসে।

এই ননদের স্বামী পোস্টমাস্টার। যত অজ পাড়াগাঁয়ে ঘুরে ঘুরে কাজ। ছেলেমেয়েরা গ্রামের স্কুলেই পড়ে। বকুলের পরনে হালকা নীল রঙের তাঁতের শাড়ি। মেয়ে বড় হয়েছে, সুতরাং বয়স বেশি না হলেও ও খুব হালকা রঙ ছাড়া পরে না, খুব সম্ভব শীগগিরই সাদা ধরে ফেলবে। ব্লাউজ গলা থেকে কোমর অবধি। এক চিলতে পেট দেখার উপায় নেই। মাথায় অনেক চুল, হাত খোঁপা করা। বড় বড় চোখ। দেখতে খারাপ নয়। বরং ভালোই। কিন্তু ওই পর্যন্তই। মেয়ে বড়। দেখা যাচ্ছে ষোল পার হতে না হতেই শাড়ি ধরে ফেলেছে। ডগমগে ছাপা শাড়ি, হাতে একগাছা করে সোনার চুড়ি। ছেলে হাফ-প্যান্ট এবং ডোরা-কাটা হাফ-শার্ট। গ্রাম্য দর্জির হাতের কাজ। তিনজনেরই মুখময় গ্রামীণ জীবনযাত্রাজনিত নিবিড় মৃত্তিকাময়তা।

মিসেস গুপ্ত দেখলেন শুস্তা তার পিসতুত দিদির হাত ধরে সাভিমানে টানাটানি করছে। একটা মানভঞ্জনের পালা চলেছে সেখানে। সোনা অর্থাৎ ননদের মেয়ে মিটিমিটি হাসতে হাসতে বলছে—'আমি তো তবু আসি। তুই তো একেবারেই যাস না।

থাকবো কেন ? আমাদের এ বাড়িটার পেছনে একটা লিচু পেয়ারার বাগান আছে, ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া আসে, জানিস... ।'

শঙ্কা ঘনীভূত হল। মূর্খ মেয়েটা দিদির কাছে আজকের দিনটা থেকে যাবার বায়না ধরেছে।

শুস্তা তখনও বলছে—'থাকো না সোনাদিদি, অন গড় বলছি, আমি গ্রীষ্মের ছুটিতে গিয়ে থাকবো।'

অস্বাস্থ্যকর ঘনিষ্ঠতা। মিসেস গুপ্ত চটপট সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলেন। গম্ভীর গলায় বললেন—'শুস্তা রেডি হও। নাচের স্কুল আছে না!'

—'আজ যাব না। আজ সোনাদিদিরা এসেছে!' শুস্তা আদুরে গলায় বলল। শুস্তার বয়সে নতুন-বড়-হওয়া তুতো দিদিদের আকর্ষণ কাটিয়ে ওঠা দুষ্কর।

—'বাজে বোকো না।'

বকুল ভাইঝির হয়ে ওকালতি করতে যাচ্ছিল। খুব সময়মত মনে পড়ে গেল এ ধরনের সালিশি দাদা-বউদিদি ছেলে-মেয়ে মানুষ করার ব্যাপারে তৃতীয় ব্যক্তির অবাঞ্ছিত নাসিকাক্ষেপ জ্ঞান করেন। সোনা খুব অবাক হয়ে মামীমার থমথমে মুখের দিকে তাকিয়েছিল। অনেক দিন আগে যখন ওরা রানাঘাটে ছিল, বাবা মস্ত কোয়াটার্স পেয়েছিলেন তখন সেই একবারই মাত্র মামারা গিয়েছিলেন। তিন দিন আটকে রেখেছিল মামাদের, স্কুলে যায়নি, পুকুরে জাল ফেলিয়ে মাছ ধরানো হয়েছিল, সে কি হই হই মজা! দাদা-দিদি এলে আবার কেউ স্কুলে যেতে পারে না কি! তাও আবার নাচ-স্কুল। কিন্তু শুস্তা তার মায়ের মুড বিলক্ষণ চেনে। যদিও কার্য-করণ এখনও ভালো বুঝে উঠতে পারে না। সে শুকনো মুখে পোশাকি জামা-কাপড় নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল। বকুল দেখল বাবুয়া—অর্থাৎ তার ভাইপো এখনও নিবিষ্টচিত্তে পড়ে যাচ্ছে। রাজা অনেকক্ষণ তার আশেপাশে ঘুরঘুর করে মনোযোগ আকর্ষণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে এখন খুব আত্মবিশ্বাসহীনভাবে বসে আছে। বাবুয়াদাদা যে নাকি জীনস এবং আঁটো হাতা ভেস্ট ছাড়া পরে না, বর্গ-গাভাসকর-মহম্মদ আলি বিষয়ে বড়দের মতো মতামত দিয়ে থাকে; গাভাসকরকে যে গাওস্কর বলে সে হীরো নয় তো কি? তার সেই স্বপ্নলোকের রাজপুত্তুর দাদা আজ তাকে পাত্তাই দিল না। বালকটি তাই ম্রিয়মাণ।

বিমানবাবু বললেন—'ও। তোমরা এখন সাতগাছিয়ায় আছো! হুঁ। বসো। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

বকুল এখন নিশ্চিন্তভাবে ঘাবড়ে গেছে। সে কোথায় বসবে বুঝতে না পেরে পেছু হটতে হটতে ড্রয়িংরুমে এসে পৌঁছল এবং একটা মোড়াতে ধাক্কা খেয়ে টাল সামলাতে না পেরে পড়ল একটা ছোটখাটো, সুদৃশ্য বুককেসের ওপর যার মাথায় ছিল একটা চ্যাপ্টা আকৃতির পুষ্প সংরক্ষণী। জিনিসটা খুব সময়ে ধরে ফেলেছিল সোনা। নয়তো অপ্রস্তুতের একশেষ হতে হত।

মিসেস গুপ্ত বললেন—'দাও। ওটা আমার হাতে দাও।' তিনি ওটা এবং আরও ডজনখানেক নানান সাইজের পুতুল-টুতুল যেগুলো ইতি-উতি সাজানো ছিল সেগুলো তুলে নিয়ে শোবার ঘরে রেখে এলেন। বকুলদের উপস্থিতিতে এই সমস্ত শিল্পসম্মত সাজসজ্জা স্পষ্টই নিরাপদ নয়। বকুল খুব অপদস্থ মুখে বসে থাকল।

বউদি উদার গলায় বললেন—'শরদিন্দুবাবু ভালো আছেন তো?' বকুল খুব উৎসাহের সঙ্গে জানাল—'শরীরটা খুব ভালো নেই। প্রেশারটা বেড়েছে।' কিন্তু এ প্রসঙ্গের

ওখানেই ইতি হয়ে গেল। স্বামীর প্রেশারের সূত্র ধরেও বকুল কোথাও পৌছতে পারল না।

বউদি বললেন—'আমাদের আবার এদিকে ছটায় কলামন্দিরে ফাংশন। না গেলেই নয়। বাবুয়া, তুমি আর একটু পরেই রেডি হবে, টেনিস আছে।'

বকুল বড় বড় চোখ করে বলল—'তাই না কি ? তবে তো খুব মুশকিল !'

মিসেস গুপ্ত মনে মনে বললেন, 'মুশকিল বইকি ! তবে তোমার নয়, আমার।' মুখে বললেন—'মুশকিল আর কি ? এখন সবে পৌনে চার। আমাদের বেরোতে এখনও ঘণ্টা দেড়েক দেরি আছে।' বকুল ভাবলো—সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় যে তাদের আসতেই লেগেছে।

মিসেস গুপ্ত বাবুয়াকে বললেন—'তুমি যাবার আগে কমলাকে বলে যাও, ওদিকের দোকান থেকে একটু কচুরি-মিষ্টি কিনে দিয়ে যাবে।'

শুস্তা সেজেগুজে বেরিয়ে এসেছিল, বলল—'বা রে, আমাদের যে খেতে দাও না, বলো অসুখ করবে। আজ বুঝি পিসিদের জন্যে। আমিও খাবো।'

এই সব অবোধ বালিকাদের সফিস্টিকেটেড, কালচার্ড পরিশীলিত, মার্জিত, যুবতী বানাতে যে কি পরিমাণ হতাশা-মিশ্রিত মেহনত ! ভাবলেন মিসেস গুপ্ত। বিমানবাবু তখন থেকে ধূমপান করে যাচ্ছেন। মুখটা ঈষৎ লালচে।

পিতার মৃত্যুর ছ মাসের মধ্যে স্ত্রীর পৌরোহিত্যে বড় বোন বকুলকে মফস্বলী পোস্টমাস্টারে পাত্রস্থ করেছিলেন। পরের বোনটি লেখাপড়ায় দারুণ চৌখস। বিয়ে-থা করতে চায়নি। বহুদিন ইংলন্ড প্রবাসী। পরের ভাইও বোম্বাইয়ে থাকে। কাছাকাছি বলতে এই বড় ভাই আর বড় বোন। কিন্তু প্রচুর হিসেবপত্র করে না চললে আর আজকালকার দিনে চাকরি করে বাড়ি তোলাও সম্ভব নয়, ছেলেমেয়েকে মনের মতো মানুষ করাও অসম্ভব। আত্মীয়স্বজন পরিহার না করলে আর...। তা ছাড়া লীনা। লীনা হচ্ছে তার সময়োচিত রোড বাম্পার। এই ধ্রুবতারাটির অমোঘ সব সংকেতের দিকে স্থির লক্ষ্য রেখে চলে চলেই না তিনি আজ এতো সম্পন্ন !

সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কচুরি মিষ্টি খেয়ে বকুল রাজা সোনা এবং কলামন্দিরগামী দম্পতি একই সঙ্গে বেরোলেন। বাসে উঠে রাজা বিরক্ত গলায় বলল—'এই তো এলাম। একটু খেলতে পেলাম না। কিছু না ! বাবুদাদা সারাক্ষণ বই পড়তে লাগল। আমাকে আর কক্ষনো মামার বাড়ি আসতে বলবে না।' সোনা বাসের জানলা দিয়ে এই শহরে তার একমাত্র পরিচিত লম্বা লম্বা গাছগুলোর হলুদ মাথার দিকে চেয়ে রইল। খুব হাওয়া দিচ্ছে। কিন্তু বকুলের মুখ ঘর্মাক্ত। স্বামীকে বলা আছে—'রান্নাবান্না রেডি রইল। তুমি আজকের দিনটা কষ্ট করে গরম করে নিও। আমাদের দেরি হলে জানবে রয়ে গেছি।' আগাম অনুমতিপত্র ছাড়া অবশ্য দাদার বাড়ি থাকবার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সাতগাছিয়া থেকে মেমারি, মেমারি থেকে হাওড়া, হাওড়া থেকে প্রত্যন্ত দক্ষিণ। এই দীর্ঘ যাত্রা এত কম সময়ের মধ্যে দু বার !

লেকের ধারে একটা বেঞ্চিতে সন্তর্পণে বসে পড়লেন মিসেস গুপ্ত। পাশে মিস্টার।

বিমানবাবু বললেন—'বসলে যে ! ওদিকে তো তোমার যামিনী কৃষ্ণমূর্তি আরম্ভ হয়ে যাবে ? কবে টিকিট কিনলে ? বলোনি তো !'

তেরছা চোখে চেয়ে মিসেস গুপ্ত বললেন—'কিনিইনি। তার জানাবটা কি !'

—'তবে ?' বলেই বিমানবাবু চুপ করে গেলেন।

—মিসেস গুপ্ত আত্মগত বললেন—'গেস্ট খাতে আজ নিয়ারলি টেন।'

বিমানবাবু বললেন—'হুঁ।'

—'তা ছাড়া বাবু-শুস্তার ক্যারামেল পুডিংটা খাওয়া হল না।'

—'রাতে দিও।'

বেশ একটু অন্ধকার হতে, খানিক বেড়িয়ে-টেড়িয়ে বাড়ির পথ ধরলেন উচ্চাভিলাষী দম্পতি। আজ আবার ইনস্টিট্যুট অফ কালচারে প্রধানমন্ত্রী এসেছেন। গড়িয়াহাটা রোড, সাদার্ন অ্যাভেনিউ সব লোকে লোকারণ্য। ভিড়ের পাশ কাটিয়ে খুব সুখী, তৃপ্ত মনে বাড়ি ফিরলেন দম্পতি। জটিল অঙ্ক নিজস্ব বুদ্ধিতে সমাধান হওয়ায় প্রফুল্ল, প্রসন্ন মন। রোববারের সন্ধেটা বকুলের দৌলতে খোলা হাওয়ায় কাটল।

ছেলেমেয়ে অনেকক্ষণ এসে গেছে। শুস্তা ঘুমে ঢুলছে। বাবুরও বড় বড় হাই উঠছে। ওদের তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিয়ে মিসেস গুপ্ত কমলাকে বললেন নিজেদের জন্য টেবিল লাগাতে। রাত নটা। ঠিক ডিনারটাইম। বেল বেজে উঠল। অ্যাতো রাতে? অসময়ে গেস্ট আসার কি আজ হিড়িক পড়েছে? সারা মুখে বিরক্তির হিজিবিজি নিয়ে মিসেস গুপ্ত নিজেই দরজার ফুটোয় চোখ লাগালেন। পরক্ষণেই তাঁর চেহারা-চলন-বাচনে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিল। তড়িৎগতিতে দরজা খুলে দিয়ে হল্লা করে উঠলেন তিনি, গিটকিরি দিয়ে গমকে গমকে হাসি।—'আরে আরে, হোয়াট এ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ! আসবার সময় হল তা হলে? বিমান, শুনছ! বাবু, শুস্তা দেখে যাও, কুইক, কে এসেছে!'

বাইরে একটি সাহেবি চেহারার প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। সঙ্গে খাটো রুপোলি চুল, শাড়ি পরা বিদেশিনী মহিলা, পাশে হিন্দুস্থানী আয়ার হাত ধরে একটি ফুটফুটে বালিকা, এঁরা মিসেস গুপ্তর মাসতুত দাদা, জার্মান বউদিদি এবং তাঁদের প্রৌঢ় বয়সের একমাত্র সন্তান শ্রীরাধা। দাদা আই এফ এস। ফরেন সার্ভিসে যারপরনাই উঁচু পোস্টে আছেন। বিদেশেই থাকেন। দেশে কখনও সখনও ফিরলেও আসবার সময় সুযোগ করে উঠতে পারেন না। সবাই ভেতরে ঢুকে এলেন।

ড্রয়িং রুমের গোলাপি বাতির সম্মোহন জ্বলে উঠল। লীনা গুপ্ত বললেন—'মোটে কিন্তু ন'টা। এক্ষুনি যাই-যাই করলে চলবে না। একবার যখন পেয়েছি ডিনার খাইয়ে তবে ছাড়ব। গতবার শুস্তার বার্থডে পার্টিতে তো আসব বলে এলে না—।' শেষের দিকে মিসেস গুপ্তর ঠোঁট সামান্য ফুলল।

বিমানবাবু এয়ার-ইন্ডিয়ার মহারাজার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে দু কান ছোঁয়া হাসি। বাবু শুস্তার চোখ থেকে ঘুম পালিয়েছে। কিন্তু মিঃ শুভরূপ মজুমদার বা তাঁর প্ল্যাটিনাম ব্লনড় স্ত্রী হিল্‌ডা মোটে বসছেনই না; এঁদের সাড়ম্বর অভ্যর্থনারও কোন জবাব নেই। কিরকম একটা আড়ষ্ট নীরবতা। হিন্দুস্থানী আয়াটির মুখ একবার লাল একবার নীল হচ্ছে লক্ষ্য করে অবশেষে মিঃ মজুমদার একটু মরিয়া এবং রূঢ়ভাবেই বলে উঠলেন—'উই আর ইন আ হারি লীনা। ইন ফ্যাক্ট ভীষণ জ্যামে পড়ে গেছি। গাড়ি একদম মুভ করছে না। এদিকে প্রবলেম হয়েছে...এই পদমা মানে রাধার আয়া...মানে ইন ফ্যাক্ট ও একটু তোমাদের টয়লেটটা ইয়ুজ করবে।'

মড়া

বড় কৌটোর মধ্যে মেজ কৌটো, তার মধ্যে সেজ কৌটো, তার মধ্যে ন', তারও মধ্যে কোণে সেই এক রকমের এক ম্যাজিক চীনে কৌটো আছে না ? খুলতে খুলতে খুলতে খুলতে শেষমেশ এক ফোঁটা এক কৌটো বেরোয় তার ঢাকনি খোলে কি খোলে না, যদি বা খোলে তার মধ্যে কিছু আছে কি নেই, শুধু চোখে ঠাহর হয় না। ঠিক তেমনি কাসুন্দের মাঠ, মাঠের মধ্যে বাগান, বাগানের মধ্যে বাড়ি, বাড়ির মধ্যে ঘর, ঘরের মধ্যে লাবণ্য, লাবণ্যর বুকের মধ্যে কুঠরি। কুঠরির মধ্যে সত্যিকার লাবণ্য থাকে কি থাকে না লাবণ্য নিজেই জানে না। দরকার মতো ভেতর থেকে মরা সোনার জোড়াচুড়ি পরা নীল শিরা ওঠা সাদা সাদা দুখানা হাত বেরিয়ে আসে। কাজ সারা হলে হাত দুখানি গুটিয়ে-সুটিয়ে আবার কুঠরি সই হয়।

বাইরের দিক দিয়ে একটি ছেলে একটি বউ আর একতখানিক এক বাচ্চা আসা-যাওয়া যাওয়া-আসা করে। ছেলেটিকে আপিসের ভাত দেয় বউ, দিয়ে নিজে খায়, বাচ্চাটিকে খাওয়ায়। তারপর ওইদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। সাইকেল রিকশায় বাচ্চাকে স্কুলে নামিয়ে উভয়ে ইস্টিশানের পথ ধরে। অনেকখানি রাস্তা।

দিনমান শুনসান। মাঠের মধ্যে কত্তকালের বাগানবাড়ি। জন নেই, মনিষ্যি নেই, কে-ই বা আসবে আর কেনই বা আসবে ? কারোই তো এদানি দরকার পড়ে না বিয়েতে ছিরি গড়বার কি পিঁড়ে আলপনা দেবার মচ্ছবের লাফরা বাঁধবার কি ষোড়শের দান সাজাবার ! নেই কাজ তো খই ভাজ এ-হেন লোকই বা কই যে কেউ একজন যে-কেউ একমুখ আহ্লাদে হাসি হেসে ভেতর দালানে এসে উঠবে, লৌকিকতার সন্দেশটি খেয়ে গেলাসের জল নিজ হাতে গড়িয়ে নিতে হবে, এঁটো রেকাবি গেলাস দাওয়ার তলায় নিজ হাতে নামিয়ে রাখতে হবে একথা জেনেও ? লাবণ্য তো এঁটোকাঁটা কুঁজোয় হাত দেবে না, লৌকিকতার থালা গেলাসগুলি ছুঁলেও অবেলায় চান করে মরতে হবে। সুতরাং দিনমান শনশনে হাওয়ায় দরজা নড়ে, জানলা নড়ে, পুরনো কবজায় তেল না দেওয়া গরুর গাড়ির চাকার আওয়াজ ওঠে। গরমের দিনে মাঠের বুক থেকে ভাপ ওঠে, ধুলোর ঝড় ওঠে, কুঠরির চারপাশে পেতনির কান্নার মতো শব্দ করে করে ঘোরে। শীতের দিনে রুখুরুখু উত্তুরে বাতাস দেয়। বাড়ির ঝনকাঠটার সুদ্ধু চোখ শুকোয়, মুখ শুকোয়, ঠোঁট ফাটে, বুক ফাটে। আওয়াজে ভয় পেয়ে কোণের ঘর থেকে একটি রুগীমানুষ জড়ানো গলায় ডাক পাড়তে থাকে, ডাকতে ডাকতে গাল পাড়ে। গালিগালাজে জীবনভর অভ্যেস, গালিতে এযাত্রা আর কুলুবে না বুঝে শেষে গুঙিয়ে গুঙিয়ে কাঁদে। ঘরের মধ্যে থেকে একচোখ ঠাণ্ডা চাউনি দিয়ে লাবণ্য রুগীর শয্যাটুকু দেখে। হাত বাড়িয়ে উত্তুরে

জানলাগুলি বন্ধ করে দেয়। দেওয়া হলে হাত দুটি গুটিয়ে-সুটিয়ে আবার যেখানকার জিনিস সেখানে।

মাঠের এপারে যদি বাড়ি তো ওপারে পেছন বাগে দেখো এক পড়ো পাঁচিল। পাঁচিলের ওধারে কাদের জমি। দেখেও না, শোনেও না, আসা-আসির তত্ত্বতালাশির বালাই নেই। জমি ভরে শনশনিয়ে চিরণ গাছ, গাব গাছ, মহানিম, কদম্ব, পুটুস ঝাড়। শেয়ালকাঁটা, পাথরকুচি। গাছে গাছ, লতায় পাতায় গাছে আগাছায় জড়াজড়ি। রাজ্যির আবর্জনা সাতখানা পাড়ার লোক এইখানে বে-ওয়ারিশ জমি পেয়ে ফেলে যায়। ফুটো হাঁড়ি, মেটে-কলসী, ডেও-ঢাকনা, ল্যাজামুড়ো ভাঙা কল। উলুরিধুলুরি কাঁথা মাদুর, কহতব্য নয় এতো জঞ্জাল। সব জঞ্জালই শেষে মাটিতে টেনে নেয়। নিয়ে তার ওপরে এটা ওটা সেটার চারা বানায়। কিসের চারা ? দেশঘরের লোকজন দু-বেলা তাদের নিয়ে ঘর করলেও নাম-ধাম জানে না, ধার ধারে না। উদ্ভিদবিদ্যার লোক পাতা দেখে, ফুল ছিঁড়ে, ফল চিরে, বিদঘুটে এক বিদেশি নামের নামতা হাঁকতে পারে, তাতে কার দরকার ? ভাঙা পাঁচিলের একধারে রিকশা ভাগাড়, আর একদিকে গুটিকয় গোটা রিকশার আস্তাবল। খান দু-চার হোগলার ঘর গেরস্তি। নি-মালিক ভাঙা পাঁচিলে বছর ভর ঘুঁটে ভট্‌ভট্ করে। গোবরের সঙ্গে মাটি, তার সঙ্গে বিচালি মিশিয়ে খাস্তা খাস্তা নানখাটাই সদৃশ ঘুঁটে গড়ে পাঁচ আঙুলের ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া থাবায় রামধনিয়াব বউ জান্‌কি বাই। আপাতত জান্‌কিও নেই। বাইও নেই। ঘুঁটেউলি। এক পা গোবর, এক হাত খাড়ু, লাল-নীল-বেগনি-সবুজ ছাপের কাপড় খালি গায়ে জড়িয়ে, গলায় ইয়ামোটা রুপোর হাঁসুলি, বহু সেই ডাকেই বহুত খুশি আছে। হাঁ ! তার রুখুসুখু লাল চুলের খাঁজে খাঁজে ধুলো, মোটাসোটা মুখের ভাঁজে হাসি ধরে না.

খুব ভোরে বরফ-ঠাণ্ডা পাতকোর জলে চান সেরে নেয় লাবণ্য। ধোপাবাড়ির কাচা কস্তাপেড়ে শাড়িখানা ঘরের কলে জলকাচা করে কুঁচিয়ে আলনায় রাখা থাকে। ভিজে কাপড়ে শানের মেঝেতে গোটা গোটা পায়ের জলছাপ ফেলতে ফেলতে ঘরে গিয়ে সেই শাড়িখান আদুল গায়ে জড়ায়, পুব আকাশে রঙছোপ লাগবার আগেই ফুলতোলাটি সারতে হবে নইলে ফুলের ওপর শিশির শুকিয়ে যাবে, আকাশের জলে ধোয়া ফুল ব্যাভার না করা মানে আধোয়া, অশুদ্ধ ফুলে পুজো করা। অমন পুজো কি না কল্লেই নয় ? তা ছাড়া মোটাসোটা লাটিমের মতো এক ন্যাদশ বাচ্চা আছে। উঠলেই খলখলিয়ে গাছ ছোঁবে, ফুল ছোঁবে। লাবণ্যর কাপড়চোপড় হাত-পা, হাড়-চামড়া, বাগানের মাটি, ঘরের শান, সবসুদ্ধ এড়া বাসি হয়ে যাবে। তাই এই পাখ ডাকার আগে উষা ভোরে ফুল কটি পেতলের সাজিতে তুলে ফেলা। লাবণ্যর পুজোর সময় ঠাকুর ঘরের আগল দেয়া থাকে। সারা বাড়ি তোলপাড় করে এই সময়ে জাম্বো, এত্তখানি বাচ্চাটা। করে-টরে ঠাকুরঘরের দরজায় কান পেতে হাসে। এত শয়তান ! 'মা শোনো, বাবা শোনো, ঠাকুম পুজো করছে না হাতি করছে। কার সঙ্গে ঝগড়া করছে দ্যাখো।' বউটি বকে। বকে-টকে কূল না পেলে শেষে কুতূহলী হয়, দরজায় কান পেতে সেও দাঁড়িয়ে পড়ে। বাস্তবিক ! কথা পস্ট বোঝা যায় না। কিন্তু যে লাবণ্যর সারাদিন মুখে রা থাকে না ঠাকুরঘরের মাঝ-মধ্যিখানে সে যেন কার-না-কার সঙ্গে ধুন্ধুমার ঝগড়া লাগিয়েছে। এ তো আর সেকাল নয় যে, বউ বিশ্বাস করে বসবে যে ঠাকুরঘরের বালগোপাল কি রক্ষেকালী জ্যান্ত হয়েছেন, আর তাঁরই সঙ্গে মানুষটির ভাবের বচসা !

'পরন্তপ ! পরন্তপ !' ফল-বাতাসা নিতে সরু গলায় ডাক দেয় লাবণ্য সারা দিনের মধ্যে

এই একটিবার। ভেতরবাড়ি থেকে বারবাড়িতে সে ডাক পৌঁছুতে সময় লাগে। রাঁধতে রাঁধতে বউটি এসে দাঁড়ায়। জাম্বো এসে চট করে পা ছুঁতে যায়। —'ছুঁসনে, ছুঁসনে, যাঃ। ছুঁলি তো ? কি বেয়াড়া ছেলের রীত বাবা, বাসি হেগো মানবে না, চোপর দিন আগাড়ে-ভাগাড়ে ঘুরছে।' গজগজানি ক্রমে বেড়ে যেতে থাকলে বউটি বলবে—'আপনার পুজো তো সারাই মা, চান করে ছুঁয়েছে বই তো নয়, আর ছোঁয়াও তো নয়, পেসাদ খেয়ে পেন্নাম। ওরও তো সাধ যায় !'

লাবণ্য রাগের গলায় বলে—'চান করা তো কি ! বাসি কাপড়ে আলনা থেকে জামা-কাপড় নিয়ে কলঘরে যায়নি ?'

বউ বলে—'না তো মা, আমিই তো কাচা-কাপড়ে দিয়ে এলুম।'

—'তোমার ঘরে বিছানা পাতা আছে না ? যে ঘরে চোপর দিন বাসি বিছানা, ছাড়া-কাপড়, সিগ্রেটের এঁটো ছাইদান সে ঘরের কাচা কাপড় কি আদপেই কাচা কাপড় বউমা ! সে যাক। ছুঁয়েছে তো ছুঁয়েছে এখন আর পেসাদ খাবো না।'

বউটি বলে—'কোন ভোরে উঠেছেন মা, এখুনি তো আবার রুগী নিয়ে পড়তে হবে। কিছু মুখে দেবেন না ? ছি, ছি জাম্বো, কি করলি বল তো ?'

উদাস গলায় লাবণ্য বলে—'বকো না ছেলেমানুষ। একটা দিন একটু বেলা করে খেলে আমার পেট ক্ষয়ে যাবে না। যাও, কাজে যাও।'

বললে পেত্যয় যাবে না। রোগা হাড়ে ওই অতখানি রুগীটিকে লাবণ্য একলা সামলায়। মানুষটি রোগে ভোগে এখন ঝরে গেছে, সেকথা ঠিক। কিন্তু হাড়ের কাঠামোখানা যাবে কোথায় ? আড়ে দীঘে সে তো পেল্লাই ? তার ওপর অঙ্গ পড়ে গিয়ে কবজায় কবজায় জং ধরে গেছে। অঙ্গগুলির মধ্যে সাড় যেমন নেই তেমন প্রাণটিও তো নেই ! মরা হাত-পায়ের ওজন কি কম ? লোকটির মা এই ক' বছর আগেও বেঁচেছিল। ডাক্তারের ঘরের মেয়ে, লাবণ্যকে বুঝ দিত 'ভয় কি বউ ? বাঁ অঙ্গ গেলে বাঁচে না, পৈতে কাটার মতো বাঁড়ে ডাইনে পড়লে ক' ঘণ্টাতেই রুগী সাবাড়, কিন্তু ডান অঙ্গ পড়লে তোমার রুগী টিকবে বছরের পর বছর, বছরের পর বছর। কতো পুণ্যি করবে, করো না।'

তা সেই পুণ্যিই আজ এগার বচ্ছর করছে লাবণ্য। পুজোটি সেরে রুগীর ঘরে ঢোকে। এককালের তাপের দাপের মানুষটি তখন হাঁ করে বাঁ কাতে ঘুমোচ্ছে, মুখের দু কষ বেয়ে লাল গড়িয়ে গড়িয়ে বালিশ আধভিজে। তার ওপর ভিন ভিন করছে পুঁয়ো মাছি। বেড়প্যান, চান করার গামলা, গরম জলের বালতি, বোরিকের পাউডার, ফতুয়া, লুঙি—সব যোগাড়-যন্তর সারা হলে লাবণ্য গলা খাঁকারি দেয়। তারপর মানুষটিকে চাগিয়ে ধরে কাজকর্ম সারে। এ সময়ে তার মুখের ভাব পাথরের ঠাকুরের মতো হয়ে যায়।

সাতকোশ আটকোশ রিক্‌শা চালিয়ে এসে গরমের দিনে গামছাখানা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খাচ্ছে রামধনিয়া।

—'বহু, এ বহু, রুটি গড়বি নাই ? ডাল পাকাবি নাই ?'

জান্‌কি তখন মনের সুখে ঘুঁটে দেওয়া শেষ করে গুল দিচ্ছে। আশপাশের বাড়ির অর্ডারি গুল। কয়লার ঘেঁস, পড়ো জমির মাটি, ঘন থকথকে ফ্যান, মেখে মেখে ছোট্ট ছোট্ট গুল। ধাঁই ধাঁই করে আঁচ উঠবে, সাঁই সাঁই করে রুটি ফুলবে। হাজার গুলে পাঁচ টাকা রেট। জান্‌কির খানা-পাকানোয় মন নেই। যত গুল দেবে তত টাকা, যত ঘুঁটে দেবে তত টাকা, তত খাড়ু, তত ছাপের কাপড়, তত কাচের চুড়ি। দেশে ঘরে জোওয়ার

আছে, ড়হর আছে, মকাই আছে, খাও না। রামধনিয়া বেশি গালিগালাজ করলে এক সময় জান্‌কি বোম্বাই ফজলির মতো মুখখানা ঘুরিয়ে হাতের কয়লা, গোবর পাছ্‌-কাপড়ে মুছে টিউকলে হাত ধোয়, মুখ ধোয়, চুলের খাঁজ থেকে চারটি উকুন বার করে টিপ করে ধরে মারে। তারপর কানা-উঁচু কলাইয়ের সানকিতে ছাতু মাখতে বসে।

ঠিক দুপুরবেলা লাবণ্যর তিনবারের চান সারা। সকালে পুজোর আগে একবার, রুগী চান করানোর পর গু-মুতের ছোঁয়া দেহখানিকে ঝামা দিয়ে ঘষে ঘষে দুবার, ভাত খাওয়া সকড়ি কাপড়টি ছাড়ার পর তিনবার। সেরে লাবণ্য যখন ঘরে ওঠে তখন মাথার ওপর তিনটি-চারটি চিল ঘোরে, ঘুরে ঘুরে কিসের নেশায় অনেক ওপরে উঠে যায়, লাবণ্যর লম্বা গরাদের জানলার ফ্রেমে কাটাকুটি খেলতে থাকে, চিলের হ্রেষা অনেক মিটার উঁচু শূন্যের পাহাড় থেকে ঝাঁপ খায়, ভাসতে ভাসতে সোজা পৌঁছে যায়, লাবণ্যর বুকের কুঠরিখানিতে। লাবণ্য একখানা রাক্ষুসে-ঢেউ সুমুদ্দুরে কলার ডোঙার মত ওলট-পালট খায়। ভাসতে ভাসতে কোত্থেকে কোথায় চলে যায়, সে কি জন্মের আগের দেশ ? না মরণের পরের ? অ্যাত্তো বড় সুমুদ্দুরে হায় এইটুকুনি প্রাণ ! ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ? সাদার• ওপর হলুদ টিপ টিপ খুকু-ফ্রক, পাঁকের মতো নরম, ঠাণ্ডা, আস্তে আস্তে শক্ত কাঠ হয়ে যায়, ভাসতে ভাসতে অকুল সমুদ্দুরে কোথায় যে চলে যায় এলোচুল আধপোড়া শিশুর মড়া এক ! শীতদুপুরের ঘুমের চটকা মাছির ভ্যানভ্যানানিতে ভেঙে যায়। লাবণ্যর শুকনো চোয়ালে চোখের জলের নুনটুকু শুকিয়ে আছে, তারই ওপর মাছির লালচ। তারই জন্য লাবণ্যর সমুদ্দুরের শেষটুকু দেখা হল না। উঁচু হাড়ে চাপড় মেরে ভুরু কুঁচকে লাবণ্য বলে 'মর মর, শুয়োর বেটা মর।' পরক্ষণেই আকাশমুখো হয়ে বলে ওঠে—'ষাট, ষাট, ষাটের বাছা-ষাট !'

যে ছেলেটির ঘরে বিছানা থাকায়, ছাইদানি থাকায় ঘরটি চিরজন্মের মতো বাসি এঁটো হয়ে গেছে সেটি লাবণ্যরই সন্তান। তবে অভ্যাসের সন্তান। সন্তান বস্তুত অনেক প্রকার। বিস্ময়ের, আনন্দ-আকাঙ্ক্ষার, আগ্রহ ও বাঞ্ছার, তারপর অভ্যাসের, উদাসীনতার। পরন্তপ তাই তার বাপ-মা'র অভ্যাসের সন্তান। কিন্তু যতই হোক পুরুষ ছেলে তাই সাতটির পর আটটিতেও পরন্তপের ঠাকুমা পুজো দিয়ে ঘটাপটার অন্নপ্রাশন করলে। মা-ঠাকুমার দু-তিন আলমারি কাপড়-চোপর, তিন চারখানা বিছানা বালিশ ওইটুকু ছেলে তার দাদাদেরই মতো হুলুট থুলুট করতে থাকায় লাবণ্য, তখন উত্তর-তিরিশ ধমকালে, ছেলের বাবার কাছ থেকে চোপ্, ঠাকুমার কাছ থেকে চোখ রাঙানি খেয়ে-টেয়ে ভুরু কুঁচকে ঘর ঝাড় দিতে চলে গেল।

চার-পাঁচটি ছেলে-মেয়ে উড়ো খইয়ের মতো দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে আছে, কে কোথায়, কমনে অতশত লাবণ্যর আজকাল হুঁশ থাকে না। তাদের বাপের, তাদের ঠাকুমার থাকুক গিয়ে। ঠিকুজি, কুলুজি, জ্ঞাত-গোত্তর, আর পারি না বাবা ! মাঝে মাঝে এসে সব হাঁকডাক করে নিজেদেরই গরজে। ছেলে ক'টির হাঁকডাকে লাবণ্য আজকাল খাবড়ায় না, বাড়িটি তার স্ত্রীধন এবং সে কাগজ আলমারির ভেতর খোপে ভেলভেট বাক্সয় তোলা আছে এইটুকু বুঝে। মেয়েগুলি বলে, 'মা আমাদের দেখতে পারে না।' আরও বলে তাদের দারুণ জামাইরা, বৌরাও 'অমন মা জন্মে দেখিনি।' লাবণ্যর কানে এসব কথা যায় কি না যায় বলা যায় না। কারণ তার ভেতর বাড়ির নিরমিষ্যি হেঁসেলে সে প্রাণ গেলেও কারুকে ঢুকতে দেবে না। এসো, থাকো, খাও, মাখো। সব ওদিকে। এদিক পানে ঘেঁষতে এসো না। মেজ মেয়ে অন্নপূর্ণা বলে--'মা আমি চান করে, খেঁটের কাপড় পরে

আজ তোমার রান্নাটা করে দিই' ? মা শুধু ভুরু কুঁচকে তাকায়। মনে মনে বলে—'মরি মরি ! এতো ভাগ্যি আমার কোথায় ছিল মা এতগুলি দিন ! বলি খেঁটের কাপড় যে পরবে, তোমার শরীরের কাঠামোখানি শুদ্ধু যে অশুদ্ধু ম্লেচ্ছসঙ্গ করে করে সে কথা কি মনে রেখেছ মা ? মেজ জামাই, যার সুটপরা গায়ে গোবরগোলা গঙ্গাজল ঢেলে দিয়েছিল লাবণ্য মুরগী খেয়ে আসায়, সে আসে না যদিও।

বর্ষার বিকেলে কাসুন্দের মাঠ যখন জটাইবুড়ি হচ্ছে ধীরে, সন্ধে যেন ঘোলা জল, বাতাস যেন ধোঁয়া, মাটি থেকে আঁশ গন্ধ, যখন জান্‌কি হাঁকে—'মায়ি, হে মায়ি। ঘুঁটে লিবি নাই ? সুখা ঘুঁটে !' কুঠরি থেকে লাবণ্য কচ্ছপের মতন মুখ বাড়িয়ে দেখল পরন্তপের বউ এখনও আপিস করে ফেরেনি। ঘুঁটেউলি ঘুঁটে সাজাতে আরম্ভ করে দিয়েছে—'গিনতি করে লিন মা। দো...চার...ছে... আঠ...।'

জানকির কোমরের কাছে এক কন্যে।

—'অ বউ, তোর কোমরের কাছে ঘুনশির মতো ওটা কে রে ?'

—'হমার নাৎনি আছে মা'

—'তোর আবার মেয়ে কবে হল যে নাতনি ?'

—'হাঁ মা। দেহাতে থাকে, ঢোলিসাকারা, মন্‌হরপট্টিয়া, মায়ি। খরা হল, হাঁতিয়া হল না, ঘঁনুয়া ধান ভি উঠল না-ই। গরমেন্টের ডোল ভি মিলল নাই। পাঁচটা, ছোটা আন্ডা বাচ্চা, ইটাকে হমার পাস ভেজ দিয়েছে। হাঁ !

—'কি নাম রে ?'

—'হ্যাঁরে, নাম বোল্ না তেরি। এ মায়ি বহুত্ দোয়া আছে।'

কন্যেটি ক্রমশই জান্‌কির বিশাল কোমরের পেছনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে থাকে।

—'ও নুকুচ্ছে কেন রে বউ ? থাক বাবা, নাম জিজ্ঞেস করব না আর, নুকুস নি।'

জান্‌কির কোমরের পেছন থেকে মিহি গলায় আওয়াজ আসে --'সোনবত্তিয়া'

—'কি বললি ? কি পাতিয়া ?'

—'সোনবত্তিয়া, সোনাবাতি হুজুর,' জান্‌কির হাসি রুপোর হাঁসুলি অব্দি ছড়িয়ে যাচ্ছে, 'বাপে কালো, মায়ে কালো, বিটিয়া গোরী মায়ি, ইসলিয়ে সোনাবাত্তি।'

দুপুর দুটোর সময় খিড়কির দুয়ারে, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে বাঁকারির মতো পলকা পিঠখানা উঁচু করে অতঃপর লাবণ্য ডাকে—'সোনাবাতি ! এই সোনাবাতি !' ...'সোনবত্তিয়া রে-এ-এ !' জান্‌কির বাজখাঁই গলার ডাক লাবণ্যর মিহি ডাকের সঙ্গে মিলেমিশে যায়, ঠিক যেন মাঝদুপুরে নি-হাওয়ার দেশ থেকে চিলের ডাক ঝাঁপ খেয়ে পড়ছে কাসুন্দের মাঠে। ক্রমেই জোরালো হচ্ছে, গাছ-পালায় ধাক্কা খেতে খেতে ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে' ছড়িয়ে যাচ্ছে দূরে-দূরান্তরে। আনাচ-কানাচ সব ভরে যাচ্ছে। সোনবত্তিয়া... সোনাবাত্তি রে-এ-এ-। হাওয়ার সমুদ্র থেকে জলের সমুদ্র, বহু দুঃখের জল যা স্বপ্নের ফেরে বারংবার দেখা যায়, সেই জলের উথাল ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে একখানি ছোট্ট ডিঙি শেষ পর্যন্ত ডাঙায় এসে লাগে। ছোট্ট লাফ লাফিয়ে নামে একটি এক বুক আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা ও ভালোবাসার সন্তান।

ঘুঁটেউলির গোরী নাতনী ফণিমনসার বিপজ্জনক ঝোপের আড়াল থেকে মুখটা একবার বাড়ায় একবার লুকোয়, একবার বাড়ায় একবার লুকোয়। তারপর খিলখিল হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে। কলাইয়ের থালায় লাবণ্য তার নিবমিষ্যি হেঁসেলের যাবতীয় রান্না ধরে দিয়েছে। ডালের সঙ্গে চচ্চড়ি তার সঙ্গে ঘণ্ট তার সঙ্গে তেঁতুলের টক মেখে তাগাড়

করে ফেলে সোনাবাতি, ছোট ছোট মুঠিতে তুলে কব্জির কাছ থেকে খায়। কিছুক্ষণ হাঁ করে দেখে লাবণ্য। মাথার ওপর মাটিমাখা চুল দেখে। ময়লা মাখা টিকটিকে মুখখানি দেখে, পিঠ ছেঁড়া ফ্রকটি দেখে আগাগোড়া। তারপর কি জানি কি মনে করে খিড়কির কপাট তুলে দিয়ে ফিরে যায়। মানুষটি বোধহয় হাতের কাছে ঘণ্টি টিপে ডাকছে।

ছুটি কাটাতে এসে বড় তিনটি ছেলে বউ, দুটি মেয়ে, একটি জামাই, তাদের ছেলে-মেয়েরা দূর থেকে গড় করল, কারণ লাবণ্যর পা গাড়ির কাপড়ে ছুঁতে মানা। চিবুক ছুঁয়ে লাবণ্য বলল—'আহা থাক, থাক ভালো আছো তো সব? তোমাদেরই ঘর, তোমাদেরই বাড়ি, তোমরাই দেখে-শুনে করে কম্মে নাও গে।' ছেলে-মেয়ে-বউরা এ ওর মুখে চায়, ও এর মুখে চায়। লাবণ্যর গালের হাড়ে এবার মাস লেগেছে, কণ্ঠা ঢাকে ঢাকে। মেয়ে বউদের করে-কম্মে নিতে বললেও লাবণ্য বড়ি দেয়, আচার মাখে, পিঠে-পুলির নারকেল কোরে, কিসের সঙ্গে কি মিশিয়ে অদ্ভুত সোয়াদের সব দিশি রান্না রাঁধে, তার গন্ধে নাতি-নাতনিদের লাল ঝরে, কাসুন্দের মাঠ দিয়ে পথচলতি লোক চমকে চমকে বাতাস শোঁকে, হাত পাখার হাওয়া দিয়ে দিয়ে রুগী মানুষের বিছানা থেকে লাবণ্য মাছি তাড়ায়। মেয়েরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, ছেলেগুলি নিশ্চিন্তে পায়ের ওপর পা দিয়ে কেউ পান চিবোতে চিবোতে, কেউ সিগরেট ফুঁকতে ফুঁকতে, যার যে রকম নেশা, দুপুর ঘুম ঘুমোয়।

ধাক্কা দেওয়া শান্তিপুরী শাড়ি পরেছে লাবণ্য অনেকদিন পর। মুখে জর্দাপান দিয়ে দুপুরের জানলায় এসে দাঁড়িয়েছে। ছোট ছোট ধুলোর ঘূর্ণি উঠছে মাঠে, পাঁচিলের খুঁটের ওপর ধুলোর সর, তিড়িংবিড়িং বিড়িং নাচছে শালিখ, একটা দুটো তিনটে চারটে। নোদল গোদল হেঁটে বেড়াচ্ছে গোলা পায়রা। কি খুঁটে খাচ্ছে তা সে-ই জানে, গাছের ডালে ঘুঘুর গলায় রামধনু চিকমিক করছে, ওপর ডালে দুপুর কাক, সহসা ডাকছে না, মাঝে মধ্যে আকাশপানে গলা তুলে হাঁ এর মধ্যের টুকটুকে লাল রং বার করে বলে উঠছে খ্যা খ্যা, খ্যা-অ্যা। গলা দিব্যি সুরে বলছে। ধুলোর মধ্যে সবুজ কাচের চুড়ি দুলিয়ে, ছেঁড়া ফ্রক ঘুরিয়ে খেলা করে বেড়াচ্ছে সোনাবাতি। পিঠে বোতাম নেই। সোনারঙের পিঠের ওপর অনেকদিনের নোংরার জালি। সোনারঙের জট পাকানো চুলগুলি কিলবিল করছে মাথাময়। পান চিবোতে চিবোতে জর্দার রসে নেশা ধরে। ডলপুতুল নিয়ে লাবণ্য কখনও বুকে আঁকড়ায়, কখনও বালিশে শোয়ায়, রান্নাবাটি নিয়ে সারা দুপুর খেলে, আবার মাথার চুল সামনে ঝুলিয়ে হাতের ওপর চাবির গোছা নিয়ে এতোল বেতোল, তামাক তে তোল করে। লাবণ্যর চারপাশে খেলে বেড়ায় সাদা ফ্রক, হলুদ টিপ-ছাপ, ছোট ছোট চুলে হলুদ কিলিপ, খিলখিলিয়ে হাসে। লাবণ্য ঘুমচোখে আলমারি খুলে সেই ফ্রকটি বার করে, সেই পুতুলটি বার করে, করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। সোনাবাতি প্রথম হেমন্তের দিনে সে বছর গোটাগুটি একটি ফ্রক পায়। একটি পুতুল পায়। একটি নীল গলাবন্ধ সোয়েটারসুদ্ধু পেয়ে যায়।

কাসুন্দের মাঠের দিন এ শীতে অন্য রকম। রাতও তেমন রাত নয়। গভীর রাত পর্যন্ত তাসখেলা চলে। এই সেদিন সত্যনারায়ণের শিন্নি হল। চরণামিত্তির খেয়ে, শান্তির জল নিয়ে লাবণ্য নিজের হাতে কাঠের হাতায় শিন্নি ঘুঁটল। দুপুরবেলা বাপের ঘরে বসে গপ্প করছে বৌ-ঝি'রা। মানুষটি কথা বলতে পারে না, চেয়ে চেয়ে দেখে। চোখের কোলে খুশি। লাবণ্য কুঠরি থেকে বেরিয়ে এসেছে। সারাদিন দৌড়ঝাঁপ করে কাজ, নাতি-নাতনিদের গপ্প বলা... 'দত্যি ছিল সত্যি সত্যি!'

'—রাক্ষসে আর দৈত্যে কি তফাৎ দিদুম ?'

'—বাপরে ! কি একটা তফাৎ ? রাক্ষসের দাঁত দু পাশ থেকে হাতির মতন বেরিয়ে থাকে। দত্যির দাঁত মুখের মধ্যে নুকুনো। রাক্ষসের মাথায় দুটো শিং। দত্যির মাথায় একটা। শিং ঢাকতে দত্যি কান মাথা ঢাকা টুপি করে, মানুষের মধ্যে বড়সড় মানুষটা সেজে ঘুরে বেড়ায়।

—'ও ঠাকুম, রাক্কসের গায়ে বেশি জোর না খোক্কসের ?'

—'বলা কঠিন বাপু, তবে খোক্কসের পা ছিনে-পড়া, রাক্ষসের পা গোদা গোদা, ভীমের গদার মতো, এখন বুঝে দ্যাখো।'

বহুদিন আগেকার হাওয়া-খাওয়া পোর্সিলেনের মেমপুতুল, কুকুর নিয়ে বেড়াতে যাওয়া সাহেবপুতুল ক্রুসের ওপর যিশুপুতুল, কাচের টাঙাগাড়ি, পুতুলের জুতো, যক্ষির ধন সব লাবণ্য বার করে দেয়। মায়েরা বলে—'সাবধানে খেলো, মায়ের যত্নুকের জিনিস সব।' কোন কোন মা আবার ছেলেমেয়ের অনেক আপত্তি ও কান্নাকাটি সত্ত্বেও সে-সব পুতুল তোয়ালে মুড়ে সুটকেসে তুলে রাখে। এসব জিনিস আর আজকাল পাওয়া যায় না। অ্যান্টিক হয়ে গেছে। জামাইরা বোদ্ধার গলায় বলাবলি করে। কে কি বলল, কার জিনিস কম্‌নে রাখল, লাবণ্যর আর হুঁশ নেই। কদ্দিন আর জিনিস তাংড়াবে ? জিনিস বলতে এক আলমারি দুর্মূল্য সেকালের কাচ পাথরের পুতুল, কাঠের, লোহার খেলনা সব, ন্যাপথলিন কালো জিরে-শুকনো লংকা দিয়ে জিইয়ে-রাখা ছোট ছোট কাপড়জামা। লেপ কাঁথা, তা ছাড়া আলমারির গুপ্ত খোপে ছোট ছোট চুড়ি-বালা-মটরমালা-আংটি মাদুলি। যার জিনিস তার ছাড়া কারও অঙ্গে ওঠেনি। খাওয়া-দাওয়ার পর সকড়ি-কাপড় ছাড়ার হাঙ্গামা লাবণ্য এদানি করছে না। দুপুরঘুমের স্বপ্নটুকু লেপে পুঁছে একাকার। দরজার হুড়কো তুলে দিয়েই জানলার কপাট খুলে দেয়। ছিট ছিট ফ্রক। নীল সোয়েটার ভাঙা রিক্‌শার খোঁদলে পুতুলের সংসার পেতেছে। রামধনিয়া ডাকে—এ সোনাবাত্তি, পানি দি'বি নাই ?' জান্‌কি হাঁকে—'সোনাবাত্তিযো-আ আটা ডল্‌বি নাই ?' সাড়া মেলে না। কেমন নিবিড় নিশ্চিন্দি খেলা দেখো ! খাওয়া নেই দাওয়া নেই। সারা দিন গুলি খেলা-ঘুড়ি খেলা...পুতুল খেলা। পুতুলের বালিশ-বিছানা, তোষক মশারি সুদ্ধু মায়ির সাবেকি আলমারির গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসেছে। এ মায়ি বহুত দোয়া আছে। হাঁ ! টই-টই করে শীতের মাঠ চষে বেড়ায় দুখানি পাতলা পাতলা খালি পা। খালিপায়ে ঘুন্টি দেওয়া লাল জুতুয়া দেখতে সাধ যায়। গোলাপি মোজা। গোলাপি টুপি, কান-ঢাকা, ডগা উঁচু, কানাঅলা, কতরকম, কত্তরকম দেখতে সাধ যায়। লাবণ্য জানলার গরাদ ধরে সারা দুপুর একবার পরায়, একবার খোলে। একবার খোলে, একবার পরায়। তার গলা ধরে মিষ্টি মিষ্টি দুটি হাত সারা দুপুর দোল খায়, শুকনো গালে, কপালে, চিবুকে মিটি দেয়। লাবণ্য স্বপ্নহীন অঘোর ঘুমে ঢলে পড়ে, ঠোঁটের কোণা চিকমিক করে।

হিম ক্রমেই জমাট হচ্ছে। মাঠের মাঝে মাঝে জমাট হিমের হিমপাহাড়। অনেক বেলা করে রোদ উঠছে। বড়ি শুকোতে চায় না, আচার ভটভট করে, জামা-কাপড়ে স্যাঁতা লেগে যায়, বর্ষার দিনের মতো জুতোয় ছাতা ধরে যায়, এতো আঠা হাওয়ায়। ঘরের মধ্যে মালসা-আগুন, তবু রুগী নাকের জলে চোখের জলে। রুগীর আর দোষ কি। তার ধাইটিই তো জ্বরে কাবু। জবুথবু। ভোরের চানে ঠাণ্ডা লেগে বুকে সর্দি। ঘঙ্ ঘঙ্ খক্ খক্। রুগীটি বুঝি দেখাশোনার অভাবে বুড়ো গাছের শেষ পাতাটির মতো ঝরে খসে গেল। ডাক্তার এসে লাবণ্যর বুকে নল বসাচ্ছে। লাব্ ডুপ্ লাব ডুপ্ দিব্যি উঠছিল।

ঘোং ঘোং হাঁৎ হাঁৎ খাঁস্ করে কেমনতরো একটা বেখাপ্পা আওয়াজ উঠছে। মুড়ি-সুড়ি দিয়ে কড়া কড়া ওষুধ গিলে কাঠের মতো পড়ে থাকে লাবণ্য। দুবেলা গরম গরম সুরুয়া খায় চুপচাপ। জামাই চলে গেছে। ছেলেগুলিও গেছে। মেয়ে বউগুলি সব যায়নি। বাড়িতে দুটি রুগী। পরন্তপের বউ একলা ক'দিক সামলায় ? তার ওপর আবার চাকুরে মানুষ !

তা শীতের বুড়ির মাথার খেয়াল ! মাথার পোকা নড়ল তো ঝপ্ করে কাঁথা কম্বল নামিয়ে দেবে, আবার পোকা ঘুমোল তো মিঠে আঁচে সেঁকে সেঁকে তুলবে মাটির তাওয়ায় মাঠের মাটি। তাই একদিন বাদুলে কাঁদুনে ঠাণ্ডার জলো পর্দাখান টান মেরে সরিয়ে ঝকঝকে নীল আকাশ লম্ফ দিয়ে নামে। ঘাসের শিশিরে ফুরফুরে সব হালকা মেঘের ছায়া পড়ে। গায়ের ব্যথা মরেছে, কাশি ধরেছে, জ্বর নেমেছে। লাবণ্য বুঝি এবারের ধাক্কা সামলে নিল।

—'পায়ের দিকের জানলাটুকু খুলে দাও তো মা...'

'—উত্তুরে জানলা যে মা, হাড়অব্দি হিম হয়ে যাবে...।'

—'তা হোক দাও গে একবার, ঘরে কদ্দিনের স্যাঁতা...।'

জানলার কপাট খুলতেই ভলকে ভলকে রোদ এসে ঘর ভাসিয়ে নিয়ে যায়, হাউ-হাউ আওয়াজ ঢোকে পিছু পিছু। কিন্তু রোদের তেজে তার বঁটিতে আর শান নেই। টলর টলর্ পায়ে লাবণ্য গরাদ ধরে দাঁড়ায়। চিরণ গাছের মাথায় একটা বাদামি চিল, গোদা লোমশ পায়ের থাবা থেকে সদ্য-মারা মেঠে ইঁদুর ঝুলছে। ফেলে-যাওয়া কাকের বাসাখান দোল খাচ্ছে পাতাঝরা নিমের শুকনো-শাকনা ডালে। পড়ো পাঁচিলের গায়ে জানকি দেখো একমনে থাবড়া থাবড়া গোবর মেরে যাচ্ছে। রামধনিয়ার মুখে চুট্টা। কাঁধে গামছা। জাড়ের দিনে ধূপে বসে আয়েস করছে দুপুরবেলা। এখন সোয়ারি লিবে নাই। আপিস-টাইমে ঠিকঠাক টিশনে হাজিরা দিবে। ওই তো জান্‌কি উঠল, মাথায় বিঁড়ে, তার ওপর ঝাঁকা, তার ওপর থাক থাক ঘুঁটে। চালির ওপর টাল করে রাখবে আপাতত। আষ্টেপিষ্টে শুখা হোক এখন। ধাঁইধাঁই করে আঁচ উঠবে, শাঁই শাঁই করে রুটি হোবে। ইদিক-উদিক তাকিয়ে অসুখে ভাঙা সরু গলায় লাবণ্য ডাকে—'সোনাবাতি, সোনাবাতি রে-এ-এ—।' জান্‌কির মাকড়ি-পরা চওড়া-চওড়া কানে মায়ির ডাক ঠিকঠাক পৌঁছে গেছে। ঝাঁকা সামনে দোতলার জানলার দিকে এক চোখ তুলছে দ্যাখো। —'সোনাবাত্তি চলি গেলো হুজুর। ই মওশুম মকাই হঁলো, বুঁট হঁলো, খেতিতে কাম করবে মায়ি। ইন্ডাসে ঢেঁকুলে পানি ঢালবে, মকাই কাটবে, মসুরি কাটবে, সাঁড়ি হোবে, চুঁড়ি হোবে। বাপে এলো, চলি গেলো...ঘুঁটিয়া লিবি মায়ি ? হেই মা আ !'

জানলার গরাদ থেকে মরাসোনাপরা নীলশির-ওঠা রোগা রোগা হাত দুখানি শীতের শেষ পাতার মতো ঝরে যায়। টলর-টলর পায়ের বিছানায় এসে বসে লাবণ্য।

আট ভাজাসমেত চায়ের বাটিটি বিকেলে পরন্তপের বউ নিয়ে এলে নিম্নরূপ কথোপকথন হয়—

'চায়ের বাটি মাজলো কে ?'

—'ঝি !'

—'সেই বাগ্‌দি বেটি ? ক'মাস আগে যে বাউনের ছেলের সঙ্গে বেরিয়ে গিছল ?'

—'সেই তো আছে মা এখনও !'

—'বাগ্‌দি-বেটির মাজা বাটি কি আদপেই মাজা বাটি বউমা ? তাতে কি শুদ্ধু জল দিয়ে

হেঁসেলে তুলতে মনে ছিলো ?'

বউ চুপ।

—'রোগে মানুষ অদড় হলে তবে তাকে ছত্তিশ জাতের ছোঁয়া-ন্যাপা নিয়ে জয়-জয় করতে হবে ? এ কি অসৈরন কাণ্ড মা !'

আওয়াজ পেয়ে মেয়ে, দুটি বউ এসে দাঁড়ায়, দুপুর-শো-এ তারা কাছের হলে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল।

—রাস্তার কাপড়েই সব ভেতরে এসে ডাঁড়ালে ? কেন, দোরে ডাঁড়াতে কি হয়েছিল ?'

গনগনে মুখে লাবণ্য কুলুঙ্গিতে গঙ্গাজলের ঘটি খোঁজে, গোবরমেশানো শুদ্ধির জল খোঁজে, কোষার মধ্যে বিল্বপত্র ডোবায়। শীতের আসন্ন সন্ধ্যায় সমস্ত মানুষজন, বিছানা বালিশ, চালিতে তোলা অতিরিক্ত লেপ-কম্বল, চেয়ার-টেবিল, আলমারি-খাট, মায় বাড়ির দরজা-জানলা, দেয়াল-মেঝে, কড়ি-বরগা সব কিছুর ওপর সে ডিঙি মেরে মেরে গঙ্গাজল ছিটোতে থাকে। 'নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়, এ কি অসৈরন কাণ্ড মা ?' ছিটিয়ে-টিটিয়ে লাবণ্য হাত গুটোয়, পা গুটোয়, মাথাটি শুদ্ধু কাছিমের মতো গুটিয়ে নেয়, তারপর হাত-পা, মুণ্ডহীন একখানা সৃষ্টিছাড়া ধড় অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকে তার বুকের ভেতরের, ভেতরের ভেতরের কুঠরিখানিতে যেখানেও আবার সত্যিকার লাবণ্য থাকবে কি থাকবে না সে কথা স্বয়ং ঈশ্বরও জানেন না।

পথিকবন্ধু

গাঢ় নীল আকাশ। মেঘলেশহীন। কালোর নানান শেড দিয়ে আঁকা একখানা অতিকায় বোল্ডার। তিনটি বাজ গাছ পেছনে। সারি সারি দাঁড়িয়ে তিনজন। হলুদ-কালো সিল্কের শাড়ি পরে একটু ঘাড় বেঁকিয়ে হাসছে মা। পাশে বাবা। অর্ধেকটাই মায়ের পেছনে ঢাকা পড়ে গেছে। সদ্য-কেনা জমকালো স্লিপ-ওভারটা কি চমৎকার এসেছে! বাবার মুখে হোল্ডারে সাদা কাঠি। ঠোঁট চাপা। চোখ দুটো চশমার আড়ালে হাসি-চকচক। বাবা একেবারে পার্ফেক্ট টি. ডি. এইচ। টল, ডার্ক, হ্যান্ডসাম। বাবার হাত ধরে তার স্বাভাবিক ভীষণ আহ্লাদী ভঙ্গিতে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে এণা। নীল জিনস, ভীষণ চওড়া ফ্যাশনেবল্ বেল্ট, মাস্কাট থেকে সেজজেঠুমণি এনে দিয়েছিল। বেল্টের সামনের কারুকাজগুলো পর্যন্ত নিখুঁত উঠেছে। সরু সরু ঝকমকে দাঁত বার করে গলে গিয়ে হাসছে এণা। ভীষণ ভী-ষণ খুশি। কানের দু পাশ থেকে ঝুলে থাকা খোলা চুলের মধ্যে দিয়ে জাফরির মতো দেখা যাচ্ছে লাল টপটার নকশা।

ডান হাতে ছবিটা নিয়ে তারিফের ভঙ্গিতে হাতটা সামনে প্রসারিত করল বাবা।

—'বাঃ, চমৎকার তুলেছে তো ছোকরা! একেবারে প্রোফেশন্যাল হাত। আমাদেরগুলো অত ভালো হয়নি। রঙিন বলেই উতরে গেছে।'

মা বলল—'তোমার হাতে ছবি এসেছে এই ঢের! মনে নেই বিয়ের পর ডিলাইয়ায় কি কীর্তি করেছিলে? নতুন নতুন শাড়িগুলো পরে কত রকম পোজ দিয়ে ছবি তুললুম। সব ব্ল্যাঙ্ক! জানিস এণু, কোনটাতে আবার ঝুমকো পরা, আধ-খাবলা গালসুদ্ধু একটা কান, কোনটাতে ভেলভেট জর্জেটপরা ধড়! উঃ, তোমার জন্যে আমার সবচেয়ে রোম্যান্টিক সময়টার কোন দলিল রইল না।'

—'আহাহা! তুমি এখন তার চেয়েও কত রোম্যান্টিক হয়ে উঠেছো নিজেই জানো না, দুঃখু করছো কেন!'

বাবা-মার কথা শুনতে শুনতে কুলকুল করে হাসছিল এণা।

তারপরেই হঠাৎ এণার বুকের মধ্যে জমাট পাথর। বাবা মেলে ধরেছে সেই ছবিটা। গ্র্যানাইটের উটের পিঠ উঁচু হয়ে রয়েছে। নীল আকাশের ক্যানভাসে মস্ত দেওদার সহিস পাশে নিয়ে একটি বলবান সাদা ঘোড়া। লাগাম হাতে, বিশাল সানগ্লাস চোখে বিশুদ্ধ কিশোরী হাসি হাসছে এণাক্ষী।

'এক্সেলেন্ট' বাবা বলল—'আগেরটার নাম যদি দাও "থ্রি ইন ওয়ান" তো এটার নাম হওয়া উচিত "দা উইনার্স।"

এই দুটোই ওদের রোলিফ্লেক্সে তুলে দিয়েছিল ও।

বাবার চেম্বারে যাবার সময় হল। মায়ের ফোন এসেছে। নতুন অ্যালবামটা এণার কোলের ওপর ফেলে দিল মা—'নে, সাজিয়ে ফ্যাল, পেছনে তারিখ-টারিখগুলো যেন দিতে ভুলিস না এণু।'

ছবি এবং অ্যালবাম কোলে ডিভানের ওপর বসেই থাকে, বসেই থাকে এণা। বিস্বাদ সব। কেন ও জানে না। কি একটা মূল্যবান জিনিস যেন হারিয়ে গেছে, মা-বাবা যেন হঠাৎ ওকে না বলে কয়ে কোথায় চলে গেছে। কবে আসবে জানে না। অন্যান্যবার বেড়াতে গিয়ে যেসব ছবি তোলা হয় সেগুলো নিয়ে হুলুস্থূল বাধিয়ে দেয় সে। বন্ধুদের দেখাতে হবে, শমীদি রাজাদা মৌ তুলতুল...কার কোনটা পছন্দ কপি করাও, দফায় দফায়। আরেকবার তাসের মতো ছবিগুলো সাজিয়ে ফেলল সে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। না, একটাতেও নেই! একটাতেও ওর একটা প্রোফাইল পর্যন্ত নেই। হারিয়ে গেল ? পুরোপুরিই হারিয়ে গেল তা হলে ? প্রথম দিকের গুলোতে তো থাকবেই না। কিন্তু গানহিলের ওপর সেই ঝড়ো সন্ধ্যায় ? গাইডদের মধ্যে পেশাদার ফটোগ্রাফার ছিল. তাকেই তো তুলতে বলা হয়েছিল ! তা হলে কেন...। ওরা বলছিল—'শীগগিরই ঘরে ঢুকুন। বাতাসে উল্টে ফেলে দেবে...'। ও বলছিল—'একটু, আর একটুখানি দাঁড়িয়ে যাই, শুনতে পাবো মেঘ বলছে দত্ত দয়ধ্বম্, দাম্যত, দাও, দয়া করো, দমন করো। একজন ইংরেজ কবি শুনতে পেলেন আর আমরা মেঘের দেশের মানুষ হয়ে দৈববাণী শুনবো না ?' কেম্পটিতে বোল্ডারে বোল্ডারে লাফ দেবার সময়ে বাবা তোলেনি ? কাঠের রিকশায় ওরা যাচ্ছে, পাশে বড় বড় পা ফেলতে ফেলতে ও, 'চল চল রে নওজোয়ান', গান গাইছে আবার, বাবার ফরমাশ অবশ্য। রিকশায় ওঠার কথা বলতে বলল—'এই বাইসেপ্‌স্ আর এই ছাতি নিয়ে আমি উঠব ওই দুবলা বৈজলালের কাঁধে ? শেম ! শেম !' একেবারে খেয়াল হয়নি কারো যে ওর ছবি থাকছে না একটাতেও ? অথচ এণাদের রোলিফ্লেক্সে, তা ছাড়া নিজের ভীষণ দামী কি যেন জার্মান ক্যামেরায় কত ছবি তুলল ও। বারবার মনে মনে ও-ও বলে এণা যেন কেমন লজ্জা পেলো। 'ও' তো মা-রা বাবাদের বলে। শুধরে নিয়ে মনে মনে সে বলল—শফিদা। শফি।

এ ক'মাসে অন্তত ছখানা চিঠি সবসুদ্ধ জে. এন. ইউতে পাঠিয়েছে এণা। একটারও জবাব আসেনি। খুবই আশ্চর্য। ইউনিভার্সিটির ঠিকানায় পাঠালে কি চিঠি যথাস্থানে বিলি হয় না ? এই তো ওর মামাতো দিদি নবনীতা যাদবপুর ইউনিভার্সিটির হোস্টেলে এসে উঠেছে সম্প্রতি। 'গার্লস হোস্টেল' বলে আন্দাজে একটা চিঠি ছেড়ে দিয়েছিল সে। দেরি হলেও পেয়ে গেছে তো ঠিক ! কে জানে ! জে. এন. ইউ তো বিশাল ব্যাপার হোস্টেলের নাম-ঠিকানা, রুম নম্বর-টম্বরগুলো কেন যে জেনে নেওয়া হলো না ! কিন্তু ও ? ও-ও তো লিখতে পারে। ওর কাছে রয়েছে এণাক্ষীদের বাড়ির ঠিকানা ডিরেকশন সব। বাবা-মা কতবার করে আসতে বলেছে ওকে। খুবই আশ্চর্য ! মা বাবাকে বলতে আজকাল কেমন বাধোবাধো ঠেকে। বন্ধুদেরও ! কেন এণা জানে না। কেন যে এণার জগতে প্রাইভেসি বলে বিচ্ছিরি অচেনা একটা ব্যাপার ঢুকল ! কিছুদিন আগেও এটা ছিল না।

কিন্তু মুখ শুকনো দেখলেই এখনও মা জিজ্ঞেস করবে—'কি হয়েছে রে এণু ?' মাকে এড়ানো মুশকিল। 'কি আবার হবে, কিচ্ছু না !' মাকে কেন যেন বলা যায় না প্রথম বাহারি চিঠিগুলোর জবাব না পেয়ে রাগ করে শেষে একটা অন্তর্দেশীয় পত্র ছেড়েছিল সে, প্রেরকের জায়গায় নাম-ঠিকানা দিয়ে দিয়েছিল নিজের। ফেরত এসেছে সেটা। কথাটা

কাউকে বলতে পারেনি সে। অন্তরা, লায়লী, পিউ, কাউকে না। এমনিতেই তো ওরা খেপায়—'কোথায় গেল রে তোর বয়-ফ্রেন্ড ? উবে গেল না কি ? সাবলিমেশন ?' শুনলেও রাগ ধরে। আর ওই এক হয়েছে বয়-ফ্রেন্ড বয়-ফ্রেন্ড ! ও তো শফিদা ! অন্তরার সেই সম্রাট রায়ের মতো নাকি ! ডিস্কো নাচে। কি রকম গাড়ি-বারান্দা-অলা-চুল ! কি বিচ্ছিরি তাকায় ! অন্তরার আড়ালে আবার ওর সঙ্গে কি রকম গদগদ গলায় কথা কয় ! বয়-ফ্রেন্ড ! দূর। কিন্তু কোথায় যেন একটা অপমানবোধ জমে। প্রত্যাশা পূরণ হয়নি পনের বছরের জীবনে এমনটা আর কখনও হয়নি যে ! ইস্‌স্‌ ! ওকি আবারও ঘুরতে চলে গেল ? ঘোরাই তো ওর হবি। বলেছিল—'পারলে পেঙ্গুইন আর নীল তিমিদের সঙ্গেও মোলাকাত করে আসবো আইসবার্গের পিঠে চড়ে।' জে. এন. ইউ কি ছেড়ে দিল ? কেমন একটু খেয়ালিও যেন ও। আবার ও ? এণাক্ষী জিভ কাটল। শফিয়ুজ্জামান। শফি।

বিছানার ওপর ছড়িয়ে রয়েছে তেত্রিশখানা মুসৌরি। যেন পোস্টার-কালারে আঁকা। অফ সীজনের কি সুন্দর নিরিবিলি হোটেলটা ! কি সস্তায় পুরো একটা স্যুইট ! ঘরের সামনে চওড়া গোল বারান্দা। খাদের ওপর ঝুলে আছে। গোল গোল ঝুড়ি চেয়ারে নরম কুশনে পিঠ দিয়ে বসলেই কাচের ওপারে পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে অদ্ভুত আলো-আঁধারি। বড় বড় মেঘের ছায়া বিশাল হয়ে বিছিয়ে রয়েছে তলায়। ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে ওই মেঘের ছাতার তলায় দাঁড়াতে। পাক খুলতে খুলতে চকচকে রাস্তাটা নেমে গেছে কত দূর। গোছা গোছা গ্রামের গাছপালা ঘরবাড়ির মধ্যে থেকে একটা একবগগা পাহাড়ি নদীর মতো মনে হয় রাস্তাটাকে। রাত্তিরে অনেক নিচে অর্ধবৃত্তাকার আলোর নকশা। শফি বলত—'কালো চোলিতে জরির বুটির মতো চমকাচ্ছে দেখো দুন ভ্যালি। উর্বশী মেনকা কোই হবে, নাইট-ড্রেস পরেছে কালো, দারুণ না ? বম্বের কুইন্স নেকলেসটা এবার গলায় ঝুলিয়ে দিলেই হয়।'

গত বছর দার্জিলিঙে এণাদের একদম ভালো লাগেনি। ঠিক ম্যালের ওপর একটা ভীষণ পশ হোটেল ছিল সেটা। দোতলায় রাস্তার ওপর ঘর। সারা দিনরাত আশপাশের রেস্তোরাঁ থেকে ঝমাঝ্‌ঝম্‌ বাজনা। আনারস আর খোয়া ক্ষীর দিয়ে কি সাঙ্ঘাতিক মাংস রান্না করত একটা ! খেয়ে সব্বার পেট খারাপ। বাবা বলেছিল—'কান-মাথা পেট আপসেট করবার জন্যে এক্সট্রা পয়সা দিতে হয় জানা ছিল না আমার।' ম্যালের ওপর কি অসংখ্য মানুষের ভিড়। রোগা রোগা ঘোড়ার পিঠে মোটা-মোটা মহিলা। বেনারসী। হাই-হিল। গড়িয়াহাটের মোড়ের সঙ্গে কোনও তফাত নেই। তার ওপর আবার তখন মে'র শেষ। সারাক্ষণ মেঘ, সারাক্ষণ বৃষ্টি, কুয়াশা আড়াল করে রইল গোটা হিমালয়। কাঞ্চনজঙ্ঘা মেঘের আড়ালেই ছুটি কাটালেন। একদিন বেঞ্চের বাঁ দিকটা একটু উঁকি দিয়েছিল, তাইতে মন আরও খারাপ। ভিজে, স্যাঁতসেঁতে, ঘিঞ্জি, নোংরা গোলমাল, একদম বাজে !

এপ্রিলের শেষ। বাবা বলল, 'যাবি নাকি ? একটু স্কুল কামাই হবে।' কি আর করা যাবে। স্কুল কামাই না করলে কি আর দেখা যেতো স্নো পীকস ? লালটিব্বার দূরবীনে চোখ লাগিয়ে সারি সারি সাদা টুপি পাহাড়ের ছবি ? ওসব মে জুন এমন কি অক্টোবরেও না কি দেখতে পাওয়া যায় না। কি ঝলমলে আবহাওয়া ! সব সময়ে যেন হালকা হলুদ রঙের একটা চুন্নি দুলছে চোখের সামনে। মিষ্টি-মিষ্টি আইস ক্রিম-ঠাণ্ডা রোদ। চুপচাপ চারদিক। রাসবিহারীর ঠিক মাঝ মধ্যিখানে এণাদের বাড়িটা। ঢং ঢঙে ট্রাম, শাঁ শাঁ বাস,

ধড়ফড় করতে করতে লরি-ট্রাক-টেম্পো সবই চলছে। মা বলে, 'বাবা রে বাবা! ঝালাপালা করে দিল কান!'

এখানে মে-জুন মাসে উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, পাঞ্জাব থেকে দারুণ গরমের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে কিছু কিছু লোক ছুটে আসে ঠিকই। কিন্তু এখনও সে ছুট পুরোপুরি আরম্ভ হয়নি। শহর একরকম ফাঁকাই। চওড়া, কালো রাস্তাগুলো সারাদিন পড়ে পড়ে অতিকায় ময়ালের মতো রোদ পোহায়। গাছেব মধ্যে থেকে কি-সব পাহাড়ি পাখি অদ্ভুত স্বরে ডাকতে থাকে। নির্জনতা যেন আরও বেড়ে যায় তাতে। উৎরাই ভাঙতে ভাঙতে গ্র্যানাইটের দেয়ালে চার পাপড়ির হলদে গোলাপ। মা বাবা খালি বলছিল—'তুই যা দুরন্ত, ছটফটে, ঠিক দেড় দিন পরেই বলবি, "বোরড হয়ে গেলুম"।' জাঠতুত দিদি মীনাক্ষীকে অনেক সাধাসাধি করেছিল আসতে। হায়ার সেকেন্ডারি ফাইন্যাল ইয়ার। সায়েন্স নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। স্কুল কামাই করতে সাহস পেল না। সারা বছর রোগীর ভিড় ঠেলতে হয় যে মানুষটাকে, সারা বছর শব্দ দূষণে ভুগছেন যে মহিলা তাঁদের কাছে নির্জনতা আশীর্বাদ এবং নিরাময় মনে হতে পারে। কিন্তু এণা!

সারাদিন বাবা মা হোটেলের ঢাকা বারান্দায় দূরের দিকে চেয়ে যেন সংসার-টংসার ত্যাগ করে বুদ্ধদেব হয়ে গেছে একেবারে। কোলের ওপর রোদের রিবন। আধঘন্টাটাক এই কাচের কৌটোর মধ্যে খুশি মনে ঘোরে এণা। পাহাড়ের ঢালে বেওয়ারিশ গরু চরছে এবং ল্যাজের ঝাপটায় মাছি তাড়াচ্ছে এই ছ হাজার ফুট উঁচু শৈল-শহরেও। পাকদণ্ডী বেয়ে গিরগিটির মতো উঠে গেল দুটো গাড়োয়ালি বাচ্চা। বড়টা আবার ছোটটাকে পিঠে নিয়েছে। নিচে বাস রাস্তায় বাস এবং ল্যান্ডরোভার কটা লুকোচুরি খেলছে। খেলনার গাড়ির খেলা। বারান্দার এদিক ওদিক থেকে সমস্ত দৃশ্যটাই বারবার দেখা হয়ে গেল। চারদিকে শুধু বাজ আর বাজ। স্থানীয় লোকেরা মিষ্টি করে বলে বাঞ্জ। বুনো এপ্রিকটে কাঁচা ফল ঝুলছে। দেওদারগুলোর প্রসারিত ডানা থেকে ঘন শ্যাওলার মত কি একটা পর্দা দুলছে। ব্যাস। আর পারে না এণা।

—বেরোও না বাবা একটু! কতক্ষণ তো বসে বসে কুমীরের মতো রোদ খেলে।'

—'দাঁড়া দাঁড়া, তোর মা কবিতা-টবিতা লিখবে নাকি ভাবছে আমি যদি মিল-টিল সাপ্লাই দিতে পারি...।'

মা বলে, 'কবিতা আর আমার এ জন্মে হবে না। তা বলে এই রোদ্দুরে হটর হটর করে ঘোরা আমার কম্মো না। আমি একটু বিশ্রাম করছি, বুঝলি? যেতে হয় বাবাকে নিয়ে যা।'

বাবা তখন মৌজ করে সিগারেটে টান দিচ্ছে। পাজামার ওপর এলিয়ে আছে গায়ের চাদর। কি কুঁড়ে! কি কুঁড়ে! জেঠু বলে তামসিক। সেই তামসিকতার চূড়ান্ত। কবিতা না আরও কিছু। এণার কথা যেন শুনতেই পাচ্ছে না।

--'তা হলে তোমরা থাকো। আমিই একটু রাইড দিয়ে আসি।'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই যা', মা বলল, 'বেশি দূর যাসনি যেন।'

--'সাবধানে চড়বে, এখানকার ঘোড়াগুলো অশ্বই, তর নয় কিন্তু', বাবা হেঁকে উঠল। ততক্ষণে এণা পায়ে কেড্‌স্ এঁটে চুল দোলাতে দোলাতে ছুট। অপেক্ষা করলে যদি বাবা-মার মত বদলে যায়!

সবে স্কুলবাসের খবরদারি থেকে রেহাই পেয়েছে এণা। এখন খাবার টেবিলে বসে বাসের হর্ন শোনে নিশ্চিন্ত মনে। পাশের বাড়ির পুঁচকিগুলোর ফার্স্ট ট্রিপ। ও এখন

হেলতে দুলতে পিউয়ের সঙ্গে একা একা রাস্তা পার হয়। ট্রামে ওঠে, হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্কুলে চলে যায়। এক-একদিন বাবা হাসপাতালে যায় ওর স্কুলের সময়ে। সেদিন গাড়িতে উঠতে হয়। পেছনের সীটে বসে ফিসফিস করে গুলতানি করে ও আর পিউ : সুনীতা লাস্ট বেঞ্চে বসে জিওগ্রাফির মিসের কার্টুন আঁকে, শিরীন ওর বয়-ফ্রেন্ডকে দিয়ে সমস্ত হোম-টাস্ক করায়...এই সব। দুজনে দুজনকে খোঁচা মারে আর ফিসফিস করে হাসে, বাবা যেন শুনতে না পায়।

এই প্রথম একা একা মুসৌরির রাস্তায় এণা। বেশ মুরুব্বি চালে দরাদরি করছে—'এই, ঠিকসে বাতাও তো কেত্‌না লেগা ?'

—'দশ রুপেয়াসে কুলরি ঘুমাকে লায়েগা। চড়িয়ে না—মেমসাব।'

মেমসাব ! আবার চড়িয়ে ! ঘোড়াঅলাটা এণারই মতন অবশ্য। সাদা ঘোড়ার সওয়ার হয়ে বীরদর্পে কুলরির দিকে চলে যাচ্ছে এণা। মা নেই, বাবা নেই, কেউ নেই, কেউ নেই। ঝাঁক ঝাঁক ঘোড়া। উজ্জ্বল বাদামি, সাদা, কালো, দু রঙের মিশেল। পায়ের তলায় পাথুরে জমিতে খটাখট। গান হিল থেকে কুলরি অবধি সারা ম্যাল রোড জুড়ে, রাস্তার ধারে ধারে ভুটিয়াদের পসরা। রঙিন গরম জামা আর পাথরের মালা-টালায় ঝলমল করছে রাস্তা। আকাশ থেকে আলো, পায়ের নিচে আলো, রঙ, নকশা। শূন্যের ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছে এণা। ঘোড়ার বাঁকা পিঠের বেয়াড়া দুলুনিটা না থাকলে তো স্রেফ পরীর দেশের রাস্তা। ঘোড়াঅলাটা বলেছিল—'আপ তো বহোৎ অচ্ছী চড়নেবালী হ্যাঁয়। ঔর পাঁচ রুপেয়া দিজিয়ে না, ক্যামেলস ব্যাক ভি ঘুমায় গা।'

পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর প্রাণী হল ঘোড়া। আগে আগে এণার ধারণা ছিল কুকুরই মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই যে এখন ওর পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছে স্পিৎজ খোকাটা ! সাদা সাদা ঝুলঝুলে লোমের মধ্যে গুলগুলে চোখ, বাড়িতে কারো ঢোকবার জো নেই, সরু গলায় প্রাণপণে চেঁচাবে অমনি কৌ কৌ কৌ। কিন্তু ওই পর্যন্তই। ধমক খেলেই জুজু। হয় এক লাফে এণার কোলে উঠে ফ্রকের কলার চিবোতে থাকবে, নয়তো সোজা খাটের তলায়। পারমিতাদের ডবারম্যানটা অবশ্য আরেকটু মান্যগণ্য। অ্যালসেশিয়ানদের ধরনধারণও অনেক দেখা গেছে। কিন্তু কুকুরেরা আসলে হল চাকরের জাত। বড় জোর পুঁচকে বাচ্চু। কিন্তু ঘোড়া ? সওয়ার বইলে কি হবে ! আকাশের দিকে মুখ তুলে, কেশর ঝেড়ে যখন হ্রেষাধ্বনি করে ? কি দারুণ ম্যানলি। ক্যামেলস ব্যাকে ঢুকে কি বেকায়দাই না ফেলে দিয়েছিল এণাকে। ·খানা খন্দে ভরা নির্জন রাস্তা। পাইন আর দেওদারে কালো হয়ে আছে, সকাল বলে মনে হয় না। কিছুটা যায়, আর খাদের ধারে গিয়ে আগাছা খেতে শুরু করে। খাওয়াটাও উপলক্ষ। যেন কিছু খুঁজছে। মালকিনকে যেন জানিয়েও দিচ্ছে তোমার মর্জিমাফিক আমি চলব মনেও করো না।

মেয়ে গেছে বহুক্ষণ। কমলেশবাবু বললেন, 'মেয়েটাকে একলা পাঠাতে তুমি যেরকম ব্যস্ত হয়ে পড়লে...'

সুস্মিতা বললেন, 'বা রে তুমি যেন পড়োনি ! কবিতা ভাবছ, শুধু অশ্ব, তর তম নয়, কত কি জপালে ! সব দোষ আমার এখন, না !'

'দোষ কার জানি না। তবে ইটস এভিডেন্ট বাই নাউ যে কাজটা ভালো হয়নি। নির্জন অচেনা শহরের রাস্তায় একটা বিপদ হতে কতক্ষণ ? আর বিপদ কি আজকাল এক রকম ?'

শিউরে উঠে দাঁড়ালেন সুস্মিতা। কমলেশবাবু অনেকক্ষণ থেকেই কাচের ওপর চোখ

পেতে দাঁড়িয়েছিলেন। উৎরাইয়ে নামছেন দুজন। গান্ধী চৌকের দিকে। ঘোড়াঅলা, রিকশাঅলারা অনেকেই খুব চেনা হয়ে গিয়েছিল। রিকশাঅলা বৈজলাল বললে, 'ডরিয়ে মৎ সাব। বেবি আ যায়গী' বলল বটে, কিন্তু কার ঘোড়ায় এণা চাপল, কোন দিকে গেল, কিছুই বলতে পারল না। মোড়ের মাথায় দুজনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে। ভাবনার ব্যারোমিটারে পারার অবস্থা বিপজ্জনক।

সুস্মিতা বললেন, 'চলো, বৈজলালকে নিয়ে খুঁজতে বেরোই।'

'কোন দিকে যাবে? তিন দিকে তিনটে রাস্তা বেরিয়ে গেছে।'

'তা বলে তো আর চুপ করে বসে থাকা যায় না।'

'ছোটাছুটিটা তুমিই করো তা হলে, আমি এখান থেকে এক পা ও নড়ছি না।'

'হুয়া ক্যা?' বৈজলাল, কমলেশবাবু এবং প্রায় সাশ্রুনেত্র সুস্মিতার সামনে যে ছেলেটি দাঁড়িয়ে, স্পাইকঅলা ট্রেকিং শ্যু পরে দুদিকে দু পা সটান, ট্রেবিউলের চেক চেক ট্রাউজার্সের পকেটে হাত, বয়স বেশি না হলেও বোঝা যায় বেশ অভিজ্ঞ সে। যে কোনও পরিস্থিতির প্রভু। কমলেশ-সুস্মিতা দুজনেই বেশ ভরসা পেয়ে গেছেন। খুব সম্ভব পাঞ্জাবি-টাঞ্জাবি হবে, পাশ কাটিয়ে চলে গেল না তো! ওঁদের বক্তব্য শেষ হতে না হতেই সামান্য টান-অলা উচ্চারণে বলল, 'আহা! দিস গার্ল! সফেদ ঘোড়ার পিঠে একেই আমি ধুমতে দেখেছি ক্যামেলস ব্যাকে। সোচছিলাম কি লোক্যাল মেয়ে, নইলে বারণ করতাম। দাঁড়ান, আমি দেখছি। ঘাবড়াইয়ে মৎ।'

কমলেশ আর সুস্মিতা তখন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছেন না। দুজনে দুজনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে।

এণার ঘোড়া খাদের বিপজ্জনক ঢালে। নাক বাড়িয়ে নিচে কি খুঁজছে সেই জানে। পিঠ থেকে নামানো ঘাড় পর্যন্ত একটা বিচ্ছিরি বাঁক। হড়কে হড়কে নেমে আসছে এণা। রাশ আঁকড়ে প্রাণপণে শুয়ে পড়েছে ঘোড়ার পিঠে। ছোকরা ঘোড়াঅলাটা সমানে হ্যাট হ্যাট করে চলেছে। এণা কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না। খালি নিচে খাদ, পাহাড়ি কুঁড়ে ঘর। ওরই একটার চালে সে ঝপাং করে পড়বে। তারপর গড়াতে গড়াতে গড়াতে... শেষ। হাত পা-ভাঙা দ হয়ে বেঁচে না থাকাই তো ভালো! মায়ের মুখটা মনে পড়ছে। আছাড়ি-পিছাড়ি করে কাঁদছে। বাবা? পাথর। সামনে একটা শক্ত থাবা দেখতে পেলো এণা। ঘোড়ার মুখের কাছে লাগামটা ধরেছে। তারপর এক ঝটকায় তার সাদা ঘোড়া ঘুরে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ করে ডাক দিয়ে উঠল। এণা দেখল বাদামি ঘোড়ার পিঠে চেক-চেক ট্রাউজার্স চকোলেট উইন্ডচীটার, সবল কাঁধ, দেবদূত?

'আপনার মা-বাবা কান্নাকাটি লাগিয়েছেন। জলদি চলুন।'

ঘোড়াঅলাটাকে সাঙ্ঘাতিক ধমক।

এই প্রথম এণাকে কেউ আপনি বলল।

কি রাগারাগি! বকাবকি! এণার সঙ্গে মা-র। ঘোড়াঅলা ছেলেটার সঙ্গে বাবার। উদ্ধারকর্তা হেসে বলল, 'বকাঝকা করে ফায়দা কি অ্যান্টিজী? ঘুমতে গেলে এরকম কিছু কিছু হবেই, নেই হোনেসে ঘুমবার চার্ম থোড়াই আছে। জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার...ইয়ে এক বাত হ্যায় না?

সুস্মিতা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুমি খুব বাংলা বলতে পারো তো! কিছু মনে করো না... পাঞ্জাবি... না!'

'উহুঁ। গুজরাটি মুসলিম। মাদার ল্যাঙ্গোয়েজ সাপোজড টু বি উর্দু। জানি না।

পশ্চিমবঙ্গে মানুষ। স্কুলে সেকেন্ড ল্যাঙ্গোয়েজ বাংলা ছিল। বাংলা বলতে আমার কিছু অসুবিধা নেই।'

মা বলল, 'পশ্চিমবঙ্গে দু-তিন পুরুষ কাটিয়েও তো অবাঙালিরা ভালো বাংলা বলতে পারে না। তোমাকে উৎসাহী বলতে হবে।'

'বললাম না, সেকেন্ড ল্যাঙ্গোয়েজ বাংলা ছিল। আমি তো রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সবই অরিজিন্যালে পড়েছি। যতো ভালো পড়ি, তত ভালো বলি না। আরও অনেক প্রোবাদ-সুভাষিত জানি অ্যান্টিজী। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট, নাচ নেই জানে তো উঠানকাই গলতি হ্যায়, ঠিক কি না?'

মিটি-মিটি হেসে সুস্মিতা বললেন, 'কলকাতার কোথায় থাকো তোমরা?'

'থাকি না, থাকতাম। ওয়েলিংটন। এখনও আস্তানা আছে সেখানে। লেবার-প্রোবলেমের জন্য বাবাও ব্যবসা গুটিয়ে দিল্লি গেলেন। আমাকেও ওখানে জে. এন. য়ুতে ঢুকতে হলো।'

'কিসের ব্যবসা তোমাদের?'

'আমাদের কি? বাবার। কেমিক্যালসের। ক্যা চীজ মুঝে মালুম নেই, আন্টিজী। ইন্টারেস্ট নেই। ডক্টরেট করবো। বাইরে যাবো। ব্যবসা ছোট ভাই দেখতে হয় দেখবে। ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস নিয়ে পড়ছি।'

—'ঠিক নাম যেন বললে তোমার?'

'সৈয়দ শফিয়ুজ্জামান। শফি বলবেন।'

হোটেলে ফিরতে ফিরতে বাবা বলেছিলো, 'বেশ ছেলেটি'।

মা বলেছিল, 'বাংলা সম্পর্কে মমতা আছে এরকম অবাঙালিদের ওপব তোমার বরাবরের দুর্বলতা।'

উঠে দাঁড়াল এণা। কেমন অস্থির অস্থির লাগছে। ভেতরে যেন ফিউজটা জ্বলে গেছে। সব অন্ধকার। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। স্বর্ণদি বলল, 'আঙুরগুলান খাইতে ভুলছস এণু? বরফে রাখি? খাস। বকা খাইবি নইলে...'

ক্যাশমিলনের এই মেরুন কার্ডিগ্যানটার জন্য পঁচানব্বুই প্রায় দিয়েই দিয়েছিল মা। শফি বলল, করছেন এ কি? সোয়েটারবালী, সোচা সব নাদান, ক্যা?'

আশাতীত কম দামে ভালো ভালো জিনিস কিনেছিল ওরা। শফি বলেছিল, 'চোখে লাগলে কিনে নিন, আন্টিজী। অন্য হিল স্টেশনে এরকম ফ্যাশনেবল্ জিনিস পাচ্ছেন না।' কোন কোন সময় আবার বলত, 'দিয়েই দিন যা চায়। আফট্রল পভার্টিলাইনের নিচে তো। জ্বালানির জন্যে তামাম পাইনবন সাফ করে দিলে। এৎনা ডিফরেস্টেশন হোনে সে ক্যা হোগা ফিউচার মে, মালুম?'

—'আপনি বুঝি মার্কেট রিসার্চ করেন? স্ট্যাটিসটিক্স্ নেন ঘুরে ঘুরে?' ওর দরাদরির বহর দেখে এণা বলেছিল।

—'তা বলতে পারেন। ডালহৌসি বাদ সব হিল স্টেশন ঘোরা কিনা। ভুটিয়ালোগদের হালচাল সব জানা। আপনার মতন তো এক মাদার নেই আমার যে প্যার সে বানিয়ে দেবেন, নিজের দেখভাল নিজেরই করতে হয়, নিজে নিজেই কিনে নিতে হয় কিনা সব!'

বাবা বলল—'এণুকে তুমি আপনি বলছ? হাসালে! এখনও রোজ রাত্তিতে আমার কোলে বসে পুরো এক গ্লাস দুধ খেয়ে তবে শুতে যায়। শী ইজ ফোর্টিন, গোয়িং অন

ফিফটিন।'

—'ভালো হচ্ছে না কিন্তু বাবা,' এণা প্রতিবাদ করল লজ্জায়, রাগে।

সুস্মিতা বললেন—'এই শুরু হল। দুজনে যত ভাব তত ঝগড়া। না শফি। এণা মোটেই অমন করে না। তবে বড্ড ভূতের ভয় কিনা! তাই মাঝ রাত্তিতে হঠাৎ লম্ফ মেরে মা-বাবার মধ্যিখানে সেঁটে যায়। যদি ভূতে হাত বাড়ায়।'

এণার খুব রাগ হচ্ছিল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল—'তোমরা যা খুশি বলতে থাকো, আমিও যা খুশি করতে থাকি। ওই কা ফল না কি যেন বিক্রি করছে লোকটা, ওইগুলো আমি খাচ্ছিই খাচ্ছি।'

শফি খুব হাসছিল। ডানদিকে একটা গজদাঁত। হাসলে দেখা যায়।

কমলেশবাবু মোটেই করিৎকর্মা নন সুস্মিতার মতে, সুস্মিতা ভীষণ খরচে কমলেশবাবুর মতে, বাবা-মা সঙ্গী হিসেবে একেবারে হোপলেস, এণার মতে। এণা ইজ টু মাচ বাবা-মার মতে। বাবা বলেছিল—'একলা একলা তোমাদের এই ইমপেচ্যুয়াস ইমপিরিয়াল মেজাজের পেয়ারকে সামলানো একটা সুপারহিউম্যান টাস্ক। যা দেখবে তাই কিনতে হবে! আর কি শেমলেস দরাদরি। একশ টাকার জিনিসটাকে বেমালুম বলে দিলে পাঁচ টাকা! আমার পক্ষে যাই বলো মোস্ট হিউমিলিয়েটিং এক্সপিরিয়েন্স!'

বাবারই সবচেয়ে বেশি জিনিস কেনা হয়েছিল কিন্তু। মা রাগ করে বলেছিল—'ঠিক আছে। শুধু শুধুই যখন কিনছি তখন বিলিয়ে দোব। জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকীর নেমন্তন্ন তো কম হয় না। তোমার বন্ধুরা—পরিতোষ ভৌমিক, অসীমাংশু চট্টোপাধ্যায় সব পরবে এখন...'

তেগবাহাদুরের একটা আলাদা, একক ছবি নিয়েছে এণা। এই যে।

ওদের প্রিয় সাদা ঘোড়াটার নাম তেগবাহাদুর। কেন কে জানে? বারান্দা ছেড়ে আবার ঘরে এসে বসেছে এণা। তেগবাহাদুরের ছবিটা ব্রততীর কাকাকে দিতে হবে, অয়েলে একটা এঁকে দিতে বলবে: ওর এই ডিভানের ঠিক পায়ের দিকে থাকবে। ওর প্রিয় ভঙ্গিই ছিল কেশর ঝেড়ে আকাশের দিকে মুখখানাকে তোলা। ছুঁচলো মুখটা দিয়ে যেন আকাশটাকেই বিদ্ধ করবে ও। শফি বলত—'করবে না কেন? ও তো আসলে পিকাসোর ঘোড়া। ঘোড়াদের ভগবানের কাছে দিনরাৎ প্রে করছে—"ও লর্ড, পরের জন্মে যেন এসব সওয়ার ঔর সইস লোগ ঘোড়া হয়, আর আমি যেন মানুষ হই, এ জন্মে ওরা আমার পিঠে চড়ল তো সে জন্মে হম ভি ওদের ওপর চড়ে যাবো। শোধ বোধ!'

ব্রেকফাস্টের পর ও রোজ এণাকে তেগবাহাদুরের পিঠে চড়তে নিয়ে যাবেই। প্রথম দিনের সেই অভিজ্ঞতার পর এণা ভয় পেত। শফি বলত—'ঝান্সী কী রাণী বনবার এমন চান্স কভী মিলবে না। ডরবে না একদম। ঠিক পেরে যাবে। মঞ্জিলকে লিয়ে দো গম চলু তো মঞ্জিল সামনে আ জায়ে। তোমার মঞ্জিল মুন ভি হোতে পারে।' সত্যিই! পিয়ালি শুটিং ক্লাবে যায়, রত্না পাল ক্রিকেট খেলে, স্বাতী মিত্র রোয়িং করে কত প্রাইজ এনেছে, এণার মা বাবা ওকে খেলাধুলো কিচ্ছু করতে দেবে না। কেন? ক'দিনেই মন্দ শেখেনি কিন্তু। জকিদের ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়েও পড়ত মাঝে মাঝে মাঝে। তখনই ও বলত—'দা মোস্ট বিউটিফুল অ্যানিমল ইন দা ওয়ার্ল্ড। হোয়াট গ্রেস! পোয়েটিক! হিরোইক!'

ময়দানে মাউন্টেড পুলিশগুলোকে দেখলেই মন খারাপ হয়ে যায় এখন। কি ভাগ্যবান লোকগুলো! দাবা খেলার সময়েও ওই ঘোড়ার চালেই বেশির ভাগ ওকে মাত করত

শফি, বলত—'দেখছো তো, ঘোড়াদের সঙ্গে আমার কি পার্ফেক্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং ! অ্যান্ড দেয়ার আর মোর থিংস ইন হর্সেস দ্যান আর ড্রেম্‌ট্ অফ ইন ইয়োর বুকস অন চেস !'

এই ছবিটা কেম্পটির পথে, বাবা তুলেছে। কত নিচে ফলস। ওপর থেকে মানুষগুলোকে ছোট নাইলনের ডলের মতো দেখাচ্ছে। দুটো রুপোলি ধারায় নেমে গেছে প্রপাত।

শাড়ি ভিজে যাবে বলে মা নামল না কিছুতেই। বাবা তো কুঁড়ের বেহদ্দ। অন্তত দশ হাত দূরে ক্যামেরা কাঁধে দাঁড়িয়ে। বোল্ডারগুলোর ওপর নাচতে নাচতে এগিয়ে যাচ্ছিল এণা। ধা ধিনা, না তি না, তেরে কেটে ধুন, কৎ, তে, ধাগে...।

—'কি মজা না ? আপনি আগে কটা ফলস দেখেছেন ?'

—'কতো ! হুড্রু, উস্রি, ভিক্টোরিয়া, নর্মদা ফলস, যোগ এখনও বাদ আছে কেদার যেতে কতো ঝর্না, ফলস, র‍্যাপিডস, ক্যাটার‍্যাক্টস !'

—'উস্রি আমিও দেখেছি, ছোটবেলায়। এটা একদম অন্যরকম, না ?'

—'নেচারে তো কভী ডুপ্লিকেট পাবে না। অর্ডারি চীজ নেই তো! মানুষ ভি ডুপ্লিকেট হয় না। আমরা সব অলগ্ অলগ্ ফলস আছি।'

—'উরি বাবা ! কবি না ফিলসফার ?'

—'স্ট্যান্ড ক্লোজ টু দা সাবলাইম, অ্যান্ড ইউ আর বাউন্ড টু বি বোথ।'

—'আচ্ছা আচ্ছা। তা আপনি কি রকমের ফলস সাব ?'

—'আমি ? অফ কোর্স নায়াগ্রার মতো ! দুর্দান্ত আওয়াজ। টপ স্পিডে ঝরে যাচ্ছি। লেকেন উইনটার আনে দো। থেমে যাবো অচানক। ঝটসে জ়িরো ডিগ্রির নিচে যাবে টেম্পারেচার। বাস। অ্যাবসল্যুট সাইলেন্স।'

—'ভীষণ অহঙ্কারী তো দেখছি।'

সুস্মিতা বললেন, —'কি এতো বলাবলি করছে গো ওরা ? অত কিসের হাসি ?'

কমলেশ মুখ থেকে সিগারেটটা না সরিয়েই জবাব দেন, 'যাই বলুক না কেন ? তাতে তোমার কি ?'

—'আমার কি ? বেশ বলছ তো ! আমার মেয়ে নয় ?'

—'তুমিও একদিন পঞ্চদশী ছিলে। মুগ্ধ যুবকদের সঙ্গে অনেক অর্থহীন প্রলাপ বকেছ। অনেক অর্থহীন হাসি হেসেছো। ও কিছু না !'

—'প্রলাপ বকেছি ? হায় রে ! আমাদের বাগবাজারের বাড়ির বারান্দায় সাবেকি চিকটা এখনো ঝোলানো আছে, ভুলে গেছো বুঝি ?'

—'তা। পাশের বাড়ির ছেলের সঙ্গে প্রেম করতে পারোনি বলে এখন হিংসেয় মেয়ের ওপর টিকটিকিগিরি করছ, এই তো !'

সুস্মিতা রাগ করে এগিয়ে গিয়েছিলেন। মিটিমিটি হাসতে হাসতে কমলেশবাবু ক্যামেরা তুলে নিয়েছিলেন। তেরো নম্বর ছবিতে মায়ের রাগত প্রোফাইল। কেন রাগত এণা জানে না।

নামার সময়ে ওরা স্বচ্ছন্দে নেমে গিয়েছিল। ওঠার সময়েই হল বিপদ। বিশেষ করে সুস্মিতার। বাবা-মা ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছে। ওরা দুজন টকাটক এ পাথরে ও পাথরে পা রেখে উঠে যাচ্ছে। কি সুন্দর মিহি রোদের দিন। পরিশ্রমে ছোট্ট ছোট্ট দানার মতো ঘাম ফুটছে কপালে।

—'অত জোরে দৌড়য় না' শফি বলেছিল, 'হঠাৎ লেগে যেতে পারে। আনন্যাচারাল

ব্রিদিং হতে লাগছে তো !'

হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছিল এণা—'আনন্যাচারাল ব্রিদিং না হাতি। আমি আরও জোরে দৌড়তে পারি। নিজে আর পারছেন না তাই বলুন।'

—'আমি পারছি না। হাউ ডেয়ার য়ু! জানো কতবার ট্রেকিং-এ গেছি! ফালুট, সান্দাকফু, রূপকুণ্ড, পাহাড়ে চড়ার কতকগুলো নিয়ম আছে বেবি, সেগুলো ফলো করতে হয়।'

নববিবাহিত দম্পতি এসেছে প্রচুর। বোধহয় হনিমুনে। অস্বস্তিকর দৃশ্য চোখে পড়ছে মাঝে মাঝে। অস্বস্তি কাটাতে শফি বলেছিল—'দাঁড়াও তোমার একটা ছবি তুলি। ওই উঁচু পাথরটার ওপর ডান পাটা তুলে দাঁড়াও তো !'

—'বাঘের মৃতদেহের ওপর পা রেখে শিকারীরা যেমন দাঁড়ায় ? তা আমার রাইফেল কই ?'

—'বাঃ, আচ্ছা বলেছ তো! অরিজিন্যালিটি হ্যায়। লেকেন অরিজিন্যালিটি ইজ সিম্পলি এ পেয়ার অফ ফ্রেশ আইজ।'

কোথা থেকে একটা গাছের ডাল যোগাড় করে হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল—'এই নাও, এবার আর ছবিটাতে তাল কাটছে না। দিস মাস্ট বি এ পিস অফ মিউজিক।'

—'পাঠাতে মনে থাকবে তো ? ঠিকানা দিয়েছি কিন্তু কাল। আর কলকাতায় গেলেই আগে আমাদের বাড়ি।'

—'জরুর। তবে ছবিগুলোই আসল হেডেক কিনা। মেয়েরা ছবি বিষয়ে বেদম লোভী আছে।'

—'সত্যি বলছি। শুধু ছবিগুলোর জন্যে মোটেই নয়। একলা একলা বাড়িতে বোরড লাগে আমার। দারুণ দারুণ বিদেশি ইনডোর গেম আছে। ভালো সঙ্গী না হলে খেলা হয় ? মজার মজার বন্ধু আছে। আলাপ করিয়ে দোব। রুম্পাদের রুফ গার্ডেনে মুনলাইট পিকনিক করা যাবে।'

—'শুধু ফটোগুলোর জন্যে নয়, ঠিক ? তিন সত্যি লাগাও !'

—'বাবা বাবা ! করলুম তিন সত্যি। তিন সত্যিও জানেন ? কি ভীষণ সুপারস্টিশাস ! গাঁইয়া একেবারে।'

—'ও, আমার বেলা সুপারস্টিশাস ! কাল তা হলে—এক শালিক দেখে অমনি কালো মুখ হল কেন ?'

—'মোটেই না।'

—'মোটেই হ্যাঁ।'

—'আজ্ঞে না। আমি আসলে ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম। মুসৌরিতে শালিক দেখে অবাক হবো না ! মনে হচ্ছিল ওটা আমাদের পার্কের শালিকটাই। রোজ যেটা রাধাচূড়ার ডালে বসে কটর কটর করে !'

—'হতেই পারে। দোস্ত তো ! তোমার ট্রেনটার সাথ্ সাথ্ উড়েছে বেচারা।'

ছবিগুলো একমনে দেখছে এণা। কখনও চলে যাচ্ছে মিউনিসিপ্যাল গার্ডেন, কখনও গান হিল। বিদ্যুৎবর্ষী আকাশের তলায়, দেওদার বীথিকার পথে পথে বহু দূর। পায়ের তলায় ঘোড়ার নালে শব্দ উঠছে। ফুলকি বেরোচ্ছে। ছোটাও। ঘোড়া ছোটাও। জোরে আরো জোরে ! কী বিস্ময়কর বাঁক নিয়ে পথ নেমে গেছে লালবাহাদুর শাস্ত্রী ইনস্টিট্যুটের দিকে। রঙবেরঙের মোমের ফুলের মতো বিরাট বিরাট গ্ল্যাডিওলাস ফুটে

আছে ঝাড়ে ঝাড়ে। আলো হয়ে আছে কাচঘর। রবারের বোট ভাসছে লেকের জলে। সবুজ দোপাট্টা উড়ছে বোটবিহারিণীর। শফি বলেছিল—ওদের নিয়ে গোমুখ যাবে। পথ যেমনি দুর্গম। তেমনি সুন্দর। ওয়াইল্ড বিউটি। জ্যোৎস্নারাতে গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার যা দেখায় না!

আসবার আগের দিন ঠিক সাড়ে সাতটায় হাজির। সেই চেক চেক গরম প্যান্ট। চকোলেট উইন্ডচীটার। তখনও প্রচণ্ড শীতের কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে হোটেল। এণা বলেছিল—'বেডটির লোভটাও বুঝি ছাড়তে পারলেন না? বাবা! বাবা! অ্যাত্তো সকালে কেউ কাউকে ঘুম থেকে তোলে? তুললে পাপ হয়।'

বাবা বলল—'ঘুমো না তুই কত ঘুমোবি। তবে মনে রাখিস, আগামীকাল এরকম সময় আমরা দেরাদুনগামী বাসে চড়বার জন্যে রেডি হচ্ছি। শেষবারের মতো যা দেখবার দেখে নে।'

হোটেল থেকে বেরিয়েই মা বলল—'আমাদের একটা ফ্যামিলি গ্রুপ তুলে দাও তো শফি! ও একটাতেও থাকছে না।'

রাস্তার বাঁকে সেই ছবি। মা-বাবার বুকের কাছে হারের লকেটের মতো দুলছে এণা। ঝকঝকে হাসি। তারপরই বাবার ক্যামেরাটা নিয়ে দুজনে ক্যামেলস ব্যাক। বাবা-মা রেস্তোরাঁর সামনে কালভার্টের ওপর বসে রইল। তেগবাহাদুরের পিঠে ওরা দুজন। সেই প্রথম দিনকার স্পটটাতে এসে রোলিফ্লেক্স তুলে নিল শফি। পেছনে আকাশ, দেওদার, নীল, কালচে সবুজ।

—'প্রথম দেখা যেখানে, শেষ দেখাও সেখানেই হোক, কি বলো এণা! লাস্ট রাইড টুগেদার...'

এণার মনটা হঠাৎ বড্ড বড্ড খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

—'কেন? আজ তো সারাদিনই আমাদের সঙ্গে থাকবার কথা। বেশ তো!'

—'সহী বাত। কিন্তু তোমার সঙ্গে এই শেষ দেখা, ঠিক কিনা?' 'তোমার' শব্দটার ওপর অস্বাভাবিক জোর। চোখে চোখ। এণা চুপ। 'তোমার' শব্দটা ঘিরে তৈরি হচ্ছে অজানা, নিবিড় একটা অদ্ভুত গোপন অনুভূতির অবয়ব। সানগ্লাসের কুয়াশার আড়ালে এই প্রথম আরেক রকম শিশির জমছে।

—'ভালো করে হাসো! বাঃ!'—ক্লিক।

এখন সেই ছবিটাই দেখছে এণা। দেরাদুনের মামার কাছে পড়েছিল। কয়েকটা ফিল্ম বাদ ছিল, সেগুলো মামাই তুলল, তারপর বলল—'আমি ওয়াশ-টোয়াশ করে পাঠিয়ে দোব কমলেশদা।' বাবাও যেমন, বলল—'ঠিক আছে, ঠিক আছে!' এত কুঁড়ে মামা যে ছবি পাঠাতে যুগ কাবার করে দিলে। অক্টোবরের আকাশ আজ তেমনি মুসৌরি নীল, দুপুরে মাঝ দুপুরের মুসৌরি ওম, তেমনি পাহাড়ি সবুজই বুঝি ফলে আছে রাসবিহারীর গাছগাছালিতে। বিকেল তিনটের নির্জনতায় চিঁউ চিঁউ করে কি একটা পাখি ডেকে যাচ্ছে ক্রমাগত, সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা জোড়া ট্রাফিক সত্ত্বেও ছড়িয়ে যাচ্ছে ক্রোশ ক্রোশ মন-কেমন-করা নির্জনতা। এণার বুকের মাঝখানটায় সেই গোপন বালির বিন্দুটাকে ঘিরে ঘিরে কেমন একটা অব্যক্ত কান্না শরীর নেয়। শুক্তির মধ্যে মুক্তো। অন্যমনস্কভাবে একটা ঢোঁক গিলে ঘুঙুরের ব্যাগটা তুলে নেয় এণাক্ষী। আনমনেই পার হয় রাস্তা। নাচের স্কুল আছে। অন্তরা, লায়লী, কে, সাবিত্রী, উষা,... ধা... ক্রেধা...ধিনতা কৎ, ধিনা নানাধা, ধিনা নানাধা, ধিনা। ভীষণ ভিড় বাসটায়। আনমনে বাসে উঠল, টিকিট

কাটল। রোববারেও এতো ভিড়। হাজরার মোড়। হঠাৎ ভীষণ চমকে উঠল এণা। স্টপে তিন-চারটি ছেলে খুব হাত-মুখ নেড়ে কথা বলছে। ওদের মধ্যে শফি না ?—'শফিদা ! শফিদা ! এই শফি !'

ও দেখতে পাচ্ছে না কেন ? শুনতে পাচ্ছে না কেন ? এতো ভিড় টের পাচ্ছে না তো এণা ! মাঝখানে তো কেউ নেই ! একবার যেন তাকাল এদিকে ! চোখাচোখি হয়েও হল না। কে হবে ও ছাড়া ! পাকা পেয়ারার মতো মুখের রং ! সোনালি সোনালি গোঁফ ! একগাল কোঁকড়া দাড়ি, চওড়া কাঁধের ওপর সেই অশান্ত চুল। বাসটাতে উঠেও উঠল না যে ! এণা নামতে চাইল, পারল না। সামনে জমাট মানুষের দেয়াল। যা ছেড়ে দিল। ঠিক সেই সময়ে চোখে চোখ পড়ল।

—'কি হল রে ? ছেড়ে দিলি যে বাসটা ? আচ্ছা আহাম্মক তো !' শ্যামলের কথার কোনও জবাব দিল না কল্যাণ। সে শুনেছে। মাইল মাইল জনজঙ্গলের নির্জনতার মধ্যে থেকে শরবিদ্ধ পক্ষিশাবকের চড়া সুরের আর্ত ডাক—'শফিদা ! শফিদা ! এই শফি !' হৃদয়জোড়া বিভ্রান্তির মধ্যে দেখতেও পেয়েছে। দেখতে পেয়েছে একটি অপাপবিদ্ধ কিশোরী মুখে স্তম্ভিত বিস্ময়। অভিমান ? আশাভঙ্গ। অপমানে নীল মুখখানা।

কিন্তু কি করবে সে ? পথের আলাপ ঘরে টেনে আনার কোন উপায় নেই যে তার। কি করবে সে একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত দীন পরিচয়ের মধ্যে আটকে থাকতে যদি না চায় মন ? প্রবাসে তাই তো সে সব সময়ে অজ্ঞাতনামা, গরঠিকানা। কখনও বাঙালি ক্রিশ্চান অ্যালফ্রেড বিকাশ মণ্ডল—মুখে শেকসপীয়র, এলিয়ট, হুইটম্যানের ফুলঝুরি, কখনও অমলজ্যোতি সিংহরায় রাঢ় বঙ্গের জমিদারবংশের শেষ কুলপ্রদীপ, প্রাচীন জলসাঘরের স্মৃতি কাফি ঠুংরি, বাগেশ্রী তারানার টুকরা হয়ে গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে। কখনও এমনি গুজরাতি মুসলিম সৈয়দ শফিযুজ্জমান। প্রতারক ? শহরতলির স্টুডিওতে তালা ঝুলিয়ে যখন সে একা একা বেরিয়ে পড়ে তখন তো গৃহত্যাগী বৈরাগীর মতোই ফেলে দিয়ে যায় এখানকার পরিচয়। সন্ন্যাসীরা অন্য নাম নেন না ? সেও তো একরকম পরিচয় বদলের নেশা ! এক পরিচয়ে যে বড় ক্লান্তি ! পথের ঝুলি বেদিয়ার আলখাল্লা আবার পথেই নামিয়ে দিয়ে আসে মফঃস্বলের ফটোগ্রাফার কল্যাণময় বিশ্বাস। ঘনিষ্ঠতা, বিশেষত কলকাতার লোকের সঙ্গে, সাধারণত এড়িয়ে চলে সে। এবার বড় ভুল হয়ে গিয়েছিল। উৎরাই ভাঙতে ভাঙতে গ্র্যানাইটের দেয়ালে ফুটে ছিল হলুদ গোলাপ। চার পাপড়ির ছোট্ট ফুল ! ছেঁড়েনি ছোঁয়নি। শুধু চোখ মেলে চেয়ে দেখেছে। অ্যালবামের পাতায় বন্দী হয়ে থাক দু পাথরে দুই পা, পাহাড়ি গাছের ডাল হাতে পঞ্চদশী সেই ভ্রমণসঙ্গিনী। স্রোতের পাথর কি চার দেয়ালের মধ্যে কুড়িয়ে আনতে আছে ? জলের তলায় জেগে জেগে ওরা দূর আকাশের স্বপ্ন দেখে। জাগরস্বপ্ন ভাঙাতে নেই।

প্রমিতার সঙ্গে

আমি প্রমিতাকে বিয়ে করেছি। আশ্চর্য! বিয়ে করে ফেলেছি আমি, প্রমিতাকে। এইমাত্র রেজিস্ট্রি অফিস থেকে আসছি। অনুষ্ঠান করে বিয়ে-থা প্রমিতা পছন্দ করে না। আমিও না। মাথায় টোপর, গলায় মালা, কপালে চন্দন-টন্দন পরে বর সাজলে কিরকম বর্বর দেখাবে কল্পনা করতেও আমাদের হাসি পায়। যাই হোক, আনুষ্ঠানিক বিয়ে আর পুরুত-নাপিত-এয়ো না হলেও রিসেপশন হবে। গ্রেট ইস্টার্ন বা রিৎজের মতো কায়দার জায়গায় না হলেও সোমনাথ হলে হবে। আমার বন্ধুবান্ধব, প্রমিতার বন্ধুবান্ধব, আমাদের কমন ফ্রেন্ডস্, আমার আত্মীয়স্বজন, প্রমিতার আত্মীয়স্বজন—সব্বাই আসবে। জাঁকজমক কিছু কম হবে না। খালি প্রমিতা বলে দিয়েছে ও কনে-টনে সেজে ডেকোরেটরের সাজানো সিংহাসনে পটের পুতুলটি হয়ে বসতে-টসতে পারবে না। আমার দেওয়া শকিং পিংক রঙের বালুচরীটি পরে ও আমার পাশে পাশে ঘুরবে। হল থেকে দালান, দালান থেকে প্যাসেজ, প্যাসেজ থেকে আবার হলে। আমি আর প্রমি। প্রমি আর আমি। সবাই দেখতে পাবে। কিছুদিন আগেও যারা অবিশ্বাস করেছিল তারাও দেখতে পাবে ভালো করেই, এবং আশা করি বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে ব্যাপারটা। জানি না, ঠিক বলতে পারি না, তবে ছোট্ট একটু কাঁটা তাদের অনেকেরই বুকের মধ্যে বোধ হয় হুলের মতো ফুটবে। জ্বালা-জ্বালা করবে সেখানটায়। তো আমি কি করতে পারি! আমি তো বরাবরই বলে এসেছি আমি প্রমিতাকে বিয়ে করব। প্রমিতা আমাকে বিয়ে করবে।

দুজনে গাড়িতে উঠলাম। আমার মা-বাবা নেই। দিদি আর জামাইবাবু। প্রমিতারও মা-বাবা নেই। দাদা-বৌদিদি। এই ক'জন মিলে কোয়ালিটিতে গিয়ে সামান্য একটু সেলিব্রেট করা গেল। তারপর আবার গাড়ি। এবার আমরা আমাদের নতুন কেনা সল্ট লেকের ফ্ল্যাটে যাবো। সেখানে গত ছ মাস ধরে সব দেখেশুনে কেনা-কাটা হয়েছে। প্রমিতা বলে গেছে। আমি কিনে কিনে গেছি। আমি বলে বলে গেছি, প্রমিতা কিনে কিনে গেছে। আলমারি, সুটকেস, খাবার টেবিল, সোফা-কৌচ, বাসন-পত্র, গ্যাস-স্টোভ, ফ্রিজ, বইয়ের আলমারি, র‍্যাক, কালীঘাটের পট, দক্ষিণ ভারতের নটরাজ, পেপার ম্যাশের বুদ্ধ। সব আমার সারা জীবনের সঞ্চয় থেকে কেনা। আমি বরাবর অল্প খরচে, হিসেবী মানুষ। বন্ধুরা বলে কৃপণ। এখন তারা দেখুক আমি কি করেছি, কি কিনেছি প্রমিতার জন্যে। কোথাও কিপটেমি করেছি কি না। আর দু-চার দিন পর যে রিসেপশন দেওয়া হবে, যেখানে মোগলাই বিরিয়ানি থেকে ভায়া স্মোক্‌ড হিলসা, চিকেন বাটার মসালা, কাশ্মীরী গ্রীল্‌ড় মাটন, ফিশ তন্দুরি হয়ে পেস্তা চকোলেট আইসক্রিমে মসৃণভাবে পৌঁছে যাবার আয়োজন হয়েছে, সেখানেই বা কোনও কিপটেমি দেখানো হয়েছে কিনা। আরে

বাবা ! খরচ করো বললেই কি করা যায়। ওদের মতো প্যাকেট প্যাকেট সিগ্রেট উড়িয়ে, বোতল বোতল হুইস্কি গড়িয়ে, যখন-তখন ট্যাকসি, যখন-তখন হোটেল-বার-রেস্তোরাঁ ! ছিঃ। সত্যিকার খরচ করবার সময় আসতে দাও, নিশ্চয় করব, নির্দ্বিধায় করব,যেমন এখন !

পেশায় আমি গবেষক। আর প্রমিতা ? প্রমিতারও একটা পেশা আছে। অবশ্য সেটাকে পেশা না বলে নেশা বলাই ভালো। প্রমিতার আগে লেখার বাতিক ছিল। সেই বাতিকের ফলেই আজ ও লেখিকা। নবতম, বিস্ময়কর, সাড়া-জাগানো লেখিকা। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে আমাদের দেশের সমস্ত পুরনো কনভেনশন ভেঙে যুবতী প্রমিতা রাতারাতি অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেলো, বিশেষ করে বারাঙ্গনাদের নিয়ে লেখা ওর দুর্ধর্ষ উপন্যাস 'নগরীর নটী'র জন্যে।

পুরস্কার বিতরণী সভার অনুষ্ঠানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম প্রমিতা ইলেকট্রিক ব্লু শাড়ি গায়ে জড়িয়ে স্মার্টলি এগিয়ে গেল। গোল্ড ফ্রেমের চশমায় বিদ্যুৎ ঝলকালো। তীক্ষ্ণ নাক, তীক্ষ্ণ চিবুক, চোখের কোণা থেকেও যেন তীক্ষ্ণতা বর্শার ছোট ছোট ফলার মতো চতুর্দিকে ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে। প্রতিটি স্টেপে জিনিয়াসের স্বাক্ষর। যেভাবে পায়ে পায়ে স্টেজে এগিয়ে গেল, হাই-পাওয়ার চশমা, সামান্য হোঁচট খেয়ে যেভাবে সামলে নিলো, রাজ্যপালের হাত থেকে নম্র, সম্ভ্রান্ত, তীক্ষ্ণ হাসি হেসে পুরস্কারটা নিলো, মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে বাও করল। অদ্ভুত ! এরকম আমি আর দেখিনি। কেউ দেখেছে বলেও জানি না।

সেই প্রমিতাকে নিয়ে নিজের ঘরে চলেছি। সুখের বাসায়, ভালোবাসায়। আমি অবশ্য সংস্কৃত জানি না। তবু ওই শ্লোকটা শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে। মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। আমি অতশত জানি না। কিন্তু প্রমিতা সব জানে। ওর বইয়ের ফরমাশ মেটাতে মেটাতে আমি পাগল হয়ে গেছি। পাগল মানে অবশ্য মোটেই পাগল নয়, মাতাল-মাতাল পাগল, সুধায় মাতাল, আনন্দে পাগল। কতো যে ডিক্শনারী, এনসাইক্লোপিডিয়া, পুরাণ, কাব্য সংকলন, উপন্যাস, ছোট গল্প সংগ্রহ, কতো যে দর্শন, শাস্ত্র সমালোচনাগ্রন্থ ওর সংগ্রহে ছিল এবং যোগাড় করল তার সীমাসংখ্যা নেই। সে এক এলাহি ব্যাপার। প্রমিতা বলেছে, আমিও নাকি ওর একখণ্ড চলন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া। বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি ও আমার কাছ থেকে বুঝে নেবে। নিচ্ছেও। ফিজিক্স, অ্যাসট্রোনমি, অ্যানাটমি। ব্ল্যাকহোলের বৃত্তান্ত শুনে সেদিন বলছিল, 'কাঞ্চন আমার নতুন, সম্ভবত সব চেয়ে অ্যামবিশাস উপন্যাস হবে তোমার এই কৃষ্ণ গহ্বরের ওপর। নাম দিচ্ছি "অ্যান্ড্রোমিডা।" একটা পুরো গ্যালাক্সি জোড়া বিশাল সভ্যতার ধ্বংসের শেষ দিন। অদ্ভুত ! কি কল্পনাশক্তি ! কি দুর্ধর্ষ দৃষ্টি। বাপরে বাপ। ছাপোষা বিজ্ঞানের মাস্টার আমি। কাজই বা কি আমার অত কথায়। বললেই হল স্ত্রৈণ, নিজের স্ত্রীর ঢাক নিজেই পেটাচ্ছে। বললেই হল ! চিনি তো সব্বাইকেই।

গাড়িটা থামতে দুজনে নামলাম। প্রথমে আমি, দরজা খুলে একপাশে দাঁড়ালাম, তারপর রক্তাম্বরা প্রমিতা। বাকি চারজন আগেই নেমে গেছেন, বলে গেছেন—'আমাদের যাবার দরকার নেই। আমাদের কাজ আগেই সেরে রেখেছি।'

দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। দোতলার ফ্ল্যাট, দক্ষিণ খোলা। সামনে ডিনার-টেবিলের ওপর একটি ভারি সুন্দর আধারে একটি ভারি সুন্দর বাতি জ্বলছে। সাদায়-মেকনে-হলুদে-গোলাপিতে ঢেউ তোলা তোলা একটি ফুট দেড়েক ভেনাস।

শোবার ঘরের দরজা খুলতেই রাশি রাশি দস্যি ছেলের মতো আমাদের গায়ে, মুখে, মাথায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ফুলের গন্ধ। দেখলাম বিছানা ভর্তি খালি ফুল, ফুল আর ফুল। রজনীগন্ধা, বকুল, গন্ধরাজ, যুঁই, চাঁপা, বেল। আমাদের সবুজ শয্যা একেবারে বাগান হয়ে আছে। ড্রেসিং টেবিলের ফুলদানে আবার মস্ত বড় একটা কেতকী। মরি ! মরি ! কী গন্ধই ছড়াচ্ছে !

প্রমিতা দরজায় পা দিয়েই স্থির হয়ে গিয়েছিল। চোখে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি। মুখে একটা অদ্ভুত হাসি। বলল—'কাঞ্চন দেখো, আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে !'

আমি বললাম, 'সত্যিই ! নিশ্চয় যখন আমরা নীচে গাড়িতে ওয়েট করছিলাম তখনই কোন ফাঁকে দিদি আর বউদিদি এই কাণ্ড করেছেন ! কিন্তু কী সুন্দর কাণ্ড !'

প্রমিতা আমার দিকে অলৌকিক দৃষ্টিতে চাইল। ওর হাতে একটা মস্ত ব্যাগ। চট করে তার ভেতর থেকে একটা মোটা ডায়েরি আর একটা পাতলা কলম বার হয়ে এলো। খাটের রাশি রাশি ছড়ানো ফুলের পাপড়ির ওপর আরো একটি ফুল খুব সম্ভব ম্যাগনোলিয়ার (যদিও আমি এ ফুল দেখিনি) মতো বসে পড়ে বলল, 'কাঞ্চন, অদ্ভুত একটা প্লট মাথায় এসে গেল হঠাৎ। মাল্টি-কালার্ড ভেনাস দ্যাখো অর্ধেক পুড়ে গলে আছে, হাত আগেই গেছে, আজ ওর মাথাও গেল, তবু ও আছে, ও থাকবে। ঘরে ঢুকতেই দ্যাখো ফুলের গন্ধ কিভাবে আমাদের আক্রমণ করল। তোমার ওই মন্তব্যটা –কি সুন্দর কাণ্ড—রেমিনিসেন্ট অফ দা রামায়ণ ! সমস্তই অদ্ভুত ! লিখে ফেলি হ্যাঁ ?'

মিষ্টি হাসল প্রমিতা। হাসলে ওর ঠোঁটের কোণাদুটো কিরকম মোচড় খেয়ে ওপর দিকে বেঁকে যায়। কোনও লেখিকা যে এরকম হাসি হাসতে পারে তাও আমি এই প্রথম দেখলাম। কিন্তু আজকে আমি স্বামী, আমি প্রভু। ডায়েরির ওপর হাত চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে বললাম, 'কিন্তু প্রমি, আজ আমাদের বাসর-কাম-ফুলশয্যার রাত। জীবনে কোনদিন আর ফিরে আসবে না। আজকের প্লটটা না-হয় দু চার লাইনে সিনপসিস করে রাখো। পরে হবে।'

প্রমিতা ঘাড় নেড়ে বলল, 'য়ু আর রাইট দেয়ার কাঞ্চন, অ্যাজ য়ু অলওয়েজ আর। আমি একটা সিনপ্সিসই করে রাখি বরং।'

নতুন বালিশ বুকে নিয়ে উপুড় হয়ে পড়ল প্রমিতা। শন শন করে চলতে থাকল কলম। পিঁপড়ের মতো খুদে-খুদে অক্ষর ঝরঝর করে বেরিয়ে আসতে লাগল জাপানি পাইলটের সূচীমুখ দিয়ে। প্রমিতার লাল-লাল ঠোঁট দুটো মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে। বোধহয় গল্পের পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গে ও-ও সংলাপ বলছে, বলে বলে বলাচ্ছে তাদের।

লিখতে লিখতে প্রমিতার পা থেকে লাল-শাড়ি উঠে গেল খানিকটা। লালের পাশে আরও ফর্সা দেখাচ্ছে গোল গোল পায়ের গোছ। কাঁধ থেকে আঁচল খসে পড়ল। মণিবন্ধে মোটা সোনার বালা, কাঁপছে। সোনার হাতে সোনার কাঁকন, কে কার অলঙ্কার সত্যিই বলা মুশকিল। বাইরে খালপাড় থেকে হুতোমপ্যাঁচা ডাকতে লাগল। কম্পিত, স্বেদাক্ত, রোমাঞ্চিত কলেবরে প্রায় সমস্ত রাত প্রমিতার সিনপ্সিস শেষ হওয়ার প্রতীক্ষায় বসে রইলাম। ঠিক ভোরের পাখি ডাকার মুহূর্তে ঘুমে রক্তাভ চোখ মেলে অনেক দূরের পথিকের মতো আমার দিকে চাইল প্রমিতা। তারপর তার হাত নুয়ে পড়ল, কলম খসে পড়ল আঙুল থেকে, ডায়েরির পাতা ভোরের হাওয়ায় ফরফর করে উড়তে লাগল। বালিশের ওপর কাত হয়ে কত্তকালের ঘুম ঘুমোতে লাগল বেচারি প্রমিতা।

রিসেপশনে আমায় অভিনন্দন জানাল অনেকেই। ওকে তো কেউ জানাল না !

বউকে কংগ্র্যাচুলেট করাটা কি শিষ্টাচারসম্মত নয় ? ঠিক মনে না করলেও আমার সামান্য খারাপ লাগল। জিনিয়াস না হতে পারি, কিন্তু নিজ মুখেই বলছি, আর কে-ই বা বলছে, থার্মোডাইনামিক্স্-এর সেকেন্ড ল'-এর ওপর আমার থিসিস কিন্তু খুব প্রশংসা পেয়েছিল। গাইড হিসেবেও আমার দুর্দান্ত সুনাম। উচ্চারণে একটু বাঙাল টান আছে বলে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথম প্রথম আড়ালে একটু হাসাহাসি করে। আমি ওসব পাত্তা দিই না। তার পরেই স্যার, স্যার, স্যার। আমার দেওয়া একটা স্কীমের ওপর এখন একটা ফুল ব্যাচ রিসার্চ করছে। জিনিয়াস নই, কিন্তু আমি পরিশ্রমী, সৎ, উদার, কর্তব্যপরায়ণ, নেশা করি না, সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করি, সচ্চরিত্র। চেহারা ? আমি ফর্সা নই, কালো, জেট ব্ল্যাক। প্রমিতা বলে পুরুষমানুষ ফর্সা হলেই তার অর্ধেক চার্ম নষ্ট। ওর উপন্যাসের হিরোরা সব কালো, সাইড-হিরোরা কেউ কেউ ফর্সা। পুষ্ট, সযত্নলালিত একজোড়া মিলিটারি গোঁফ আছে আমার। মাথার চুল ক্রোজ-ক্রপ। আমি পুরোপুরি একটি হী-ম্যান। তবে ? প্রমিতাকে কংগ্র্যাচুলেট করতে এদের বাধা কোথায় ?

খেয়ে সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। এই বাজারে সব চেয়ে দামী কেটারারের সব চেয়ে দামী মেনু। ধন্য ধন্য করবে এ আর বেশি কথা কি ? এ আমার উপছে-পড়া আনন্দের প্রকাশ। পঞ্চাশ টাকা প্লেট না ষাট টাকা এসব নিয়ে মাথা ঘামাইনি।

পেস্তা-আইসক্রিম মুখে নিয়ে আমার দিকে চুপিচুপি একবার চাইল প্রমিতা। ওর স্পেশ্যাল ফেভারিট। মুখে দিলেই গলে যায়। ও বলে ফুলের সৌরভের মতন দেহ-মন সব একসঙ্গে ভরে দেয়। এখন ওর চোখে-মুখে সেই স্নিগ্ধ সুগন্ধের আবেশ। আইসক্রিমের মতো একটা নিতান্ত জৈব খাদ্যবস্তু মানুষের জিহ্বা অর্থাৎ একটি কর্মেন্দ্রিয়র আশ্রয়কে স্পর্শ এবং তুষ্ট করবার পর কি করে যে আত্মায় প্রবেশ করতে পারে তা এক প্রমিতাকে দেখেই বুঝেছি। ও বলে সাহিত্যের মধ্যে যেমন কবিতা, খাদ্যের মধ্যে তেমন আইসক্রিম।

আমাদের সংক্ষিপ্ত সংসারে রান্না-বান্নার জন্য ষণ্ডা-গণ্ডা চেহারার একটি মহিলা কর্মী রেখে দিয়েছি। নাম শিবু। অন্যান্য ফাই ফরমাস খাটবার জন্য আছে একটা হিন্দুস্তানী বাচ্চা। নাম মুন্না। ইনস্টিট্যুট থেকে ফিরতে প্রথম দিন শিবু বললে, 'কি জলখাবার দেবো গো বাবু ?'

—'কেন বউদিদি নেই ?'

—'ছিলেন তো সারা দুপুর। বিকেলের দিকে একটা ফোন এলো। ভীষণ ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন। কিছু তো বলে গেলেন না !'

আমি বললাম, 'যা হয় করো !'

তা শিবু যত্ন করেই দিলে। চিঁড়ে ভাজা, তার সঙ্গে কুচো কুচো আলুভাজা, বাদামভাজা, মরিচগুঁড়ো, সঙ্গে কফি। খেয়ে একটা তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলছি, শিবু আবার এসে দাঁড়াল—'রাত্তিরে কি হবে গো বাবু ?'

—'যাচ্চলে, আমি তার কি জানি ?'

—'বউদি তো কিছু বলে গেলেন না !'

—'তোমার যা প্রাণ চায় করো।'

—'আপনি কী খান রাত্তিরে ?'

আমি ? ভাবতে লাগলাম তাই তো কী খাই ? কী খাই রাত্তিরে ? খাওয়া-দাওয়া নিয়ে তো কোনদিন মাথা ঘামাইনি ! মেসের ঠাকুর ব্যাটা যেদিন যা ছাই-পাঁশ ধরে দিত, তাই-ই

খেয়ে এসেছি। ভেবেচিন্তে বললাম, 'রুটি বানাও। বেগুনভাজা বানাও। আর কি ? সকালের মাছ আর আছে ?'

—'না তো বাবু, সে তো সকালেই সব খেয়ে নিলেন !'

—'তা হলে ?' 'আলু-ফালুর চচ্চড়ি বানাও তা হলে ?'

শিবু ওই একদিনই জিজ্ঞেস করেছিল। তাইতেই আমার দৌড়, প্রমিতার দৌড় বুঝে ফেলেছে। আর জিজ্ঞেস করে না। নিজেই বাজার করে, নিজেই রান্না করে, নিজেই দেয় থোয়, মুন্নাটাকেও কাজে লাগায়।

কিন্তু প্রমিতার সেদিন ফিরতে রাত প্রায় নটা হল। ভীষণ উত্তেজিত। পাবলিশার ফোন করেছিল। অমুক ফিলম-ডিরেক্টর ডেকেছে। 'নগরীর নটী' ছবি হবে। সেই সব কথাবার্তা আলোচনা হতে হতেই এতো রাত।

ফিলম ডিরেক্টর শুনে আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, 'এর পর এসব জায়গায় একলা একলা একদম যেও না প্রমি, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেও।'

প্রমিতা হাসল। সেই ঠোঁটের কানা-তোলা অদ্ভুত হাসি।

—'নিশ্চয়ই ! কিন্তু এরকম বিনা নোটিসে তলব এলে ? তখন ?' বলতে বলতে প্রমিতা আমার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো। রাত্রে কিছু খেলো না। ফিলম ডিরেক্টর অনেক খাইয়েছে। খিদে নেই। একাই খেলাম। আমি খেলাম, শিবু খেলো, মুন্না খেলো। মুন্না প্রমিতার ভাগটাও খেয়ে নিল। ব্যাটার পেট ইল্যাসটিকের মতো, বাড়ালেই বাড়ে।

রবিবার। বেড়াতে যাবো ঠিক করি। সারা সপ্তাহ খালি কাজ আর কাজ আর কাজ। শনিবারেও তো রেহাই নেই আমার। এক দঙ্গল ছেলের সঙ্গে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে হয় ল্যাবরেটরিতে। ট্রামে বাসে ঝুলতে ঝুলতে বাড়ি ফেরা। খোলা হাওয়ার সাধ্য কি আমাদের ছোঁয়। ভিকটোরিয়া মেমোরিয়্যালের বাগানটি বেশ। ঘুরে ঘুরে বেড়াই। কতো পুরনো স্মৃতি। বেশি পুরনোও তো নয়। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে জলের ধারে বসি। জলের মধ্যে প্রমিতার ছায়া, ভাঙছে চুরছে আধুনিক ভাস্কর্যের মতো। পাশে আমার ছায়া, কাঁপছে। অন্ধকার ঘন হয়। বেশ সুগন্ধি অন্ধকার। আমি ওর ডান হাতটা মুঠোর মধ্যে তুলে নিই। প্রমিতা শিউরে ওঠে।

—'কি হলো ?'

—প্রমিতার দুই ভুরু মাঝে খুব ছোট্ট একটা রেখা উঠেই মিলিয়ে যায়।

—'কিছু না। কনসেনট্রেশানটা নষ্ট হয়ে গেল।'

খুব অপ্রস্তত হয়ে পড়ি। তারপর দুজনে আবার বেড়াতে থাকি। দক্ষিণ থেকে উত্তরে। উত্তর থেকে পুবে, পুব থেকে পশ্চিমে। প্রমিতা খুব অস্থির। ছটফট করতে করতে বেড়াচ্ছে। আমি ওর অবস্থাটা ঠিকই বুঝি। খুব দুঃখিত গলায় বলি—'আয়্যাম সরি প্রমি।' ও আবার ভয়ানক শিউরে ওঠে—'কাঞ্চন, ওই তোমার বড্ড দোষ, বড্ড অসময়ে কথা বলো। চিন্তাটাকে সবে গুছিয়ে এনেছিলুম। দিলে তো সব এলোমেলো করে !'

প্রমিতা ঘোরে ফেরে ওর মাথার মধ্যে পুষ্পবৃষ্টির মতো ধ্বনি বৃষ্টি হয়, শব্দ-বৃষ্টি হয়। আইডিয়া-বৃষ্টি হয়। এক হিসেবে অসম্ভব টেনশন বেচারির।

দিন যায়। রাত হয়। ভোর আসে। কাজ করি। বাড়ি ফিরি। দুটি মুখ দেখি এসে। নতুন কাটানো শিলের মতো শিবুর মুখখানা, নোড়ার মতো লম্বা মুন্নার মাথাটা। শিবু রাঁধে, মুন্না বাড়ে। খাই-দাই। মাঝরাতে ঘুম ভাঙে। হাত বাড়াই। পাশে প্রমি।

হাতটা আস্তে নামিয়ে দেয় ও। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসে—'আজ সারাদিন ধরে পড়েছি, কাঞ্চন, মাথা টনটন, সারা বিকেল গল্পের জট ছাড়িয়েছি, সারা সন্ধে লিখেছি, হাত কনকন ! কি ঘুম পাচ্ছে। কি ঘুম ! কি ঘুম ! ঘুমের মধ্যে অসহায়ের মতো তলিয়ে যেতে থাকে প্রমিতা।

(২)

বছর ঘুরে গেছে। আবার এসেছে সেই দিন। সেই বৈশাখী পূর্ণিমা। সকাল থেকে ছুটোছুটি করে বাজার করেছি। বাগদা-চিংড়ি, মুরগী, খুঁজে পেতে ভেড়ির ভেটকি। অসময়ের ফুলকপি, কড়াইশুঁটি, কাজুবাদাম, কিসমিস। আর মস্ত বড় স্ল্যাব চকোলেট আইসক্রিম। কিনে আগে থেকে ফ্রিজে ভরে রেখেছি। দশ জনে খেতে পারে এতো বড়। কি জানি হয়ত প্রমিতা মাছ-টাছ সরিয়ে রেখে দেবে, মুরগী ছোঁবে না, পোলাও ঠেলে দেবে। বলবে—'আজ আমায় আইসক্রিম দাও। সুদ্ধু আইসক্রিম।' তাই অনেকটা কিনেছি। সারাদিন ধরে একটু একটু করে যত খুশি খাক না প্রমিতা।

আজ কাউকে ডাকিনি। কাউকে না। আমাদের দুজনের ছোট্ট সংসারে বড্ড ভিড়। আমার বন্ধুবান্ধব, প্রমিতার বন্ধুবান্ধব, প্রায় রোজ। পাবলিশার, উঠতি লেখক, পড়তি লেখক, গুণমুগ্ধ, আজকাল আবার ফিলমের হিরো-হিরোইনরাও কিছু কিছু আসতে লেগেছে। একটা সন্ধেও দুজনে একা হতে পাই না। হয় ওরা আসে, নয় আমাদের যেতে হয়। আজকে তাই কাউকে বলিনি। স্বার্থপরতা ? না। একালষেঁড়েমি ? না। আজকের দিনটা শুধু আমাদের। গভীর গোপন বিজন নীরব। আজ আর কেউ না।

শিবু এক্সপার্ট লোক। রান্না সেরে ফেলেছে। তার আজ খুব আনন্দ। বউদিদি হাত লাগিয়েছে। দাদাবাবু বাজার করেছে। চড়ুইভাতি হচ্ছে যেন। মুন্নাটা আহ্লাদে চরকির মতো পাক খাচ্ছে। ভালো ভালো রান্নার খোশবাই ছেড়েছে। পেট ভরে রাজকীয় খাদ্যাখাদ্য খাবে, ব্যাটা যেন হাওয়ায় উড়ছে।

একটা। বেল বাজল। দরজা খুলে দিতে আমিই এগোলাম। প্রথমে ঢুকলেন 'নগরীর নটী'র প্রোডিউসার মিঃ বনশিলাল বাজোরিয়া। পেছনে অদ্ভুত চেহারার এক যুবক। বিরাট লম্বা। আমার থেকে অন্তত দেড় হাত উঁচু। মাথার ওপর যেন বোম্বাই সামোসা শোভা পাচ্ছে। ঠোঁট দুটোতে কি লিপস্টিক লাগিয়েছে ? আঙুলগুলো কি রে বাবা। যেন রসে টুপটুপ করছে। আমার মুখ হাঁ। বনশিলাল আমার ভ্যাবাচ্যাকা ভাব দেখে খুব খুশি হয়ে বললেন, 'বোম্বে থেকে সাজ্জাদ আজাদীকেই নিয়ে আসলুম। বুঝলেন কি না মিঃ মুকার্জী। ও ওরূপকুমার-টুমারকে দিয়ে 'নোগোরের নটী'র হিরো হোবে না।'

ওরা ভেতরে ঢুকল। কিন্তু বাইরে ও কিসের গোলমাল ? পেছনে ও কি ? দেখি পিলপিল পিলপিল করে কাতারে কাতারে আসছে মানুষ। পাড়া-বেপাড়া দূরপাড়া যেখানে যত ছেলে-মেয়ে, যুবা-যুবী, এমনকি প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া ছিল, কোথা থেকে টের পেয়েছে জানি না, সব বিনা অনুমতিতে, বিনা দ্বিধায়, গর্জন করতে করতে আমার সাতশ পঞ্চাশ বর্গফুটের ছোট্ট ফ্ল্যাটটায় ঢুকে পড়তে লাগল। সাজ্জাদ আজাদী ! সাজ্জাদ আজাদী ! সাজ্জাদ ! সাজ্জাদ ! শেষকালে শুধু হাজার হাজার ভিমরুলের গর্জনের মতো একটা সজজজ্‌জ্‌ আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। প্রতি মিনিটে সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ওরা ঢুকে পড়ছে আমার প্যাসেজে, ডাইনিং স্পেসে, শোবার ঘরে, বারান্দায়, পড়ার ঘরে। ঠেলাঠেলি

করছে, মারামারি করছে, খিস্তি করছে। প্রথমে হাতজোড় করে বাইরে যেতে বললাম। তারপর বেগতিক দেখে হাত পা চালালাম। মুন্না, শিবু, আমি আর বনশিলাল। কিল, চড়, ঘুষি, লাথি। সাজ্জাদ বাথরুমে ঢুকে পড়ল, প্রমিতা স্টোরে। বনশিলাল ঘুষি চালাতে চালাতে চেঁচাতে লাগলেন—'হাপনার তো একটা বোন্দুক ভি আছে মিঃ মুকার্জী, লিয়ে আসুন, লিয়ে আসুন জলদি।' একটা লিকলিকে রোগা মেয়ে হঠাৎ মেঝের ওপর সটান শুয়ে পড়ে খুব সরু গলায় চিৎকার করতে লাগল—'আমার ওপর দিয়ে একবার হেঁটে যাক সাজ্জাদ, মাত্র একবার, যেমন 'রাত কি চিঁড়িয়া'য় অঞ্জনার ওপর দিয়ে হেঁটেছিল...' সাজ্জাদ হাঁটল না। কিন্তু আরও অনেকে হাঁটল, দৌড়োলো। তারপর ? ফোন, হাসপাতাল, থানা, অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ, দমকল...।

সব শেষ করে ঝামেলা চুকিয়ে যখন বনশিলাল, প্রমিতা আর সাজ্জাদ নামে ফিলম স্টারটিকে নিয়ে খেতে বসতে পারলাম তখন রাত্তির দশটা। ঠেলাঠেলি আর মারামারিতে আমার ঠোঁটটা কেটে ফুলে উঠেছে। সারা ফ্ল্যাটে ভাঙা ফার্নিচার আর কাচের টুকরো ছড়ানো। কাদায় কাদা। শোবার ঘরে বিছানার ওপর পর্যন্ত রাশি রাশি কাদামাখা পায়ের ছাপ। শিবু আর মুন্না মিলে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করেছে। আমরাও হাত লাগিয়েছি। বিবাহবার্ষিকীর খাদ্যাখাদ্যগুলোর সদ্ব্যবহারই হল। আইসক্রিমটা ভাগ্যিস বেশি করে এনেছিলাম। মিঃ বাজোরিয়া আবার ভেজিটেরিয়ান তো ! তিনিই খেলেন বেশি। বাইরে পুলিশভ্যান অপেক্ষা করছিল। ওদের এসকর্ট করে নিয়ে গেল।

এখন রাত বারোটা। পড়ার ঘরে ডিভানের ওপর কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে প্রমিতা। বাড়ি নিঝঝুম। সারাদিনের হল্লার পর যেন অস্বাভাবিক লাগছে এই নীরবতা। বাড়িটা যেন হানাবাড়ি। আমি একটা চেয়ারে একা বসে আছি। ভূতের মতো। সিগারেট ধরালাম। নেশা নেই। খাই না সাধারণত। এটা বনশিলাল ফেলে গেছেন। এক্সপার্ট স্মোকারদের মতো ধোঁয়া ছাড়ছি, ধোঁয়া গিলছি। গলাটা বেশ গরম গরম, তেতো-তেতো লাগছে। ধোঁয়ার রিং ছুঁড়ে যাচ্ছি ওপর দিকে। নীল নীল রিং। একটার পর একটা। একটার পর একটা। স্প্রিং-এর মতো পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে রিংগুলো। আহ্ কি আরাম। নিচের ঠোঁটটা সর্বরি কলার মতো ফুলে উঠেছে। গা গতর ব্যথা। মদ্যজাতীয় কিছু একটা পেলে হত। সাজ্জাদ একটা চ্যাপটা বোতল ফেলে গেছে। হিপ পকেটে ছিল। সে কি বস্তু জানি না। একটু বরফজল মিশিয়ে খেলাম কয়েক ঢোঁক। শিবু ঘুমোচ্ছে। মুন্না ঘুমোচ্ছে। প্রমিতা ঘুমোচ্ছে। খালি আমিই প্যাঁট-প্যাঁট করে জেগে আছি। চোখে ঘুম, মাথায় ঘুম নেই। বোতলটার অর্ধেকও শেষ করতে পারলাম না। কড়া জিনিস। ভালোও। বোধহয় জার্মানি-টার্মানি হবে। এবার মাথাটা হালকা হয়ে আসছে। চিন্তা করতে পারছি পরিষ্কার, আলমারির ভেতর থেকে কিছু টাকা বার করলাম। ওভারনাইট ব্যাগটা। শার্ট, প্যান্ট, গেঞ্জি, রুমাল। দু একখানা বই আর ফাইল। ব্যাগের ভেতর সব ঠেসে ঠেসে পুরলাম। চাবির থলোটা টেবিলের ওপর রাখলাম প্রমিতার সামনে। চিঠি-চাপাটি কিছু লিখব না কি ? নাহ। দরকার নেই। বেচারি প্রমি ! হয়ত আমার অনুপস্থিতি টেরই পাবে না। আজ যা ভুলকালাম হল তারপর কাল থেকে ওর একটা উপন্যাস শুরু করাই সম্ভব। বেচারি ! কিন্তু আমিই বা কি করি ! কিই বা করার আছে আমার ! ছাপোষা বিজ্ঞানের মাস্টার বই তো নই !

এইবার আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছি। বাড়ি ঘর দোর, কিছু কিছু অভগ্ন আসবাব, বাসন-কোশন, টাকাকড়ি, শিবু, মুন্না, পার্বলিশার, বনশিলাল, সাজ্জাদ সব রইল। আশা

করি অসুবিধে হবে না বেচারির। পা টিপে টিপে বেরিয়ে এসেছি। কারো ঘুম না ভেঙে যায়। দরজাটা আস্তে টেনে দিয়েছি। ভোর হয়ে এসেছে। ফুরফুর করে ভারি সুন্দর একটা গা-জুড়োনো হাওয়া দিচ্ছে। আ-হ্ !

আত্মজন

বাড়িতে আদ্যিকালের দেয়ালঘড়িখানায় ট্যাং ট্যাট্যাং ট্যাং করতে করতে বেলা তিনটেও বাজল, ডাক্তারবাবুরাও সব একত্তরে যেন সাঁট করে রুগীর ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। মুখগুলোয় সব থম ধরেছে। কেউ কারও পানে চাইতে পারছেন না সোজাসুজি। মোটা টাকার ফি গ্যাঁটস্থ হয়েছে, সারাদিন এলাহি খাওয়া-দাওয়া, কিন্তু সুরাহা কিচ্ছুটি হল না। তা ছাড়াও, মানুষগুলির বিদ্যে-সিদ্যে সব যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। বড়বাবুও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছেন। শুধু মেজবাবু এখনও ভেতরে। মুখময় খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি, পালঙ্কের ইদিক-উদিক দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে ঘুরে ঘুরে মরছেন।

শহর থেকে গলা-কাটা-দাম-দিয়ে-আনা ডাক্তারগুলি সব যে যার গাড়ি করে হুস্ করে গেল। বাড়ির বদ্যি গুহ ডাক্তারই শুধু জালে আটকা পড়ে ধাড়ি কাতলার মতো খাবি খাচ্ছেন। বড়বাবু তাঁর কনুইয়ের কাছটা ক্যাঁক করে ধরে আছেন। কোনমতেই ছাড়ছেন না। নজর মাটির পানে রেখে গুহ বদ্যি মাথাটা নাড়লেন, ডাইনে বাঁয়ে। বড়বাবু বললেন—'সে কি?' কথার ভাবে মনে হল অত বড় মানুষটি এক্ষুনি ভ্যাঁ করে ফেলবেন। গুহ নিচু গলায় বললেন—'ব্যাপার তো ভুতুড়ে কিনা বড়বাবু! রক্তে চিনি নেই কো, হার্ট প্রেশার সব ঠিক ঠাক, ইনফেকশন নেই। আঘাত-টাঘাত কিছু না। খামোখা মানুষটার এমনিধারা অবস্থা যাকে কিনা আমাদের শাস্তরে বলে 'কোমা'। আপনি তো দেখতেই পেলেন বড়বাবু ওনারা সব বলছেন হাসপাতালে নিলেও সুবিধে বিশেষ কিছু হবে বলে মনে হয় না। আর, হাসপাতালের ব্যবস্থা তো এখানেই সব করেছি—গ্যাসকে গ্যাস! স্যালাইন কে স্যালাইন। চব্বিশ ঘণ্টা নার্স মোতায়েন। ত্রুটি তো কিচ্ছুটি রাখেননি বড়বাবু!'

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে। মেজমণিকে শহরের বড় ডাক্তারেও জবাব দিয়ে গেছে। কবরেজ, হাকিম, হোমিওপ্যাথিক, জড়িবুটি সব রকমই হচ্ছিল। এখন শেষমেষ ভারি শহরের ভারি ডাক্তার, বুকের ছবি, পেটের ছবি, হ্যান একজামিন, ত্যান একজামিন, এক কাঁড়ি করে টাকা খর্চা, তা তেনারাও সব যে যার মতো মাথা নেড়ে নেড়ে জবাব দিয়ে গেলেন।

ছোট গ্রাম। গঞ্জর কাছেই। টাউন-শহরও দূর-দূরান্তে। তা সেই গাঁয়ের যে যেখানে আছে আজ এতোগুলিন দিন একবার করে অন্তত বড় বাড়িতে হাজরে দিয়ে আসছে। জমিদার-বাড়ি নয়, হাকিম না হুকুম না, তবু বড় বাড়ি বড় বাড়িই। গাঁয়ের ছেলে ছোকরার, ঝি-বউয়ের বিয়ে-বউভাতে ওই বড় বাড়ির উঠোনেই শামিয়ানা পড়ে,

পালা-গান, যাত্রা, অষ্টপ্রহর সব ওইখানেই।

কিছুর মধ্যে কিছু না বড়বাড়ির মেজমণি অজ্ঞান হয়ে আছেন আজ মাস ফুরুতে চলল। অমন লম্বা চওড়া জগদ্ধাত্রীর মতো শরীরটি ছোট্ট হয়ে বিছানার সঙ্গে মিশে আছে। সোনাহেন বর্ণ কালি-ঢালা। চোখ-মুখ সব যেন গর্তে ঢুকে আছে।

ঘটনাটা যে রোববার ঘটল, তখন দুপুরবেলা। সিরাজুলের মা অন্দরে বসা। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণখানা সে ইতিমধ্যেই যেখানে পেরেছে চাউর করে ফেলেছে। বাড়িটিতে মানুষ তো আর কম নয়! শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে ষেটের বাছা এই এতগুলি। সব যে যার তালে। বড়মণি পুজোর ঘরে। বেরোতেই কোন না একটা দুটো বেজে যাবে। তিরিশ রকম ঠাকুর-দেবতাকে ফুল-জল দেওয়া তো আর চাট্টিখানি কথা নয়! বড় ভক্তিমানী মানুষটি বড়মণি। এতটি বেলা পর্যন্ত সুদ্ধু এক ঘটি চা খেয়ে ঠাকুর দেবতাদের সব জল-পান দিচ্ছেন। ছোটমণি তখন টেবিল ঢাকায় ফুল কাটছেন ফুট ফুট। সূঁচ ঢুকছে, সূঁচ বেরুচ্ছে, আর কত রঙবেরঙের কারুকাজ—দোপাটি ফুল, বেড়ালছানা, শিবলিঙ্গ জড়িয়ে কালসাপ—সব সিলসিল সিলসিল করতে করতে ঢাকার ওপর আঁকা হয়ে যাচ্ছে। ছোটবাবু তখন আড্ডাঘরে, তাস পিটছেন, ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে গুলতান খুব জমেছে। ওদিকে বড়বাবুতে মেজবাবুতে তক্কো চলেছে। ইনি বলছেন সাংখ্য হলেন গিয়ে আদি সংখ্যার আখ্যান-বাখ্যান, সাংখ্যই সবচেয়ে বড়, উনি বলছেন বেদান্ত হচ্ছেন সব বিদ্যের অন্ত বাপধন! কে বড় কে ছোট এখন আপনি বোঝ।

পেল্লাই ভাতের হাঁড়িখানি নামিয়ে মেজমণি বললেন—'আর একটু সবুর কর সিরাজুলের মা, বেলাবেলি দুধটুকু জ্বাল দিয়ে নিই। একরাশ কচুর ডাঁটা কাটতে আমার সৈরভীর দুধটুকু জ্বাল দেওয়া হয়নিকো এখনও।'

'বসতেই তো এয়েচি তোমার ঠেঁয়ে'—সিরাজুলের মা গাছের আম জাম কোঁচড়ে নিয়ে অপেক্ষা করে। দুধ জ্বাল দিয়ে, উনুনে রাশ রাশ কয়লা ঢাললেন মেজমণি। উনুন দুখানা কী! রাই খাই না রাবণ খাই। কয়লা দিয়ে-টিয়ে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে দাওয়ায় এসে বসলেন মেজমণি। মেজমণিও বসলেন সিরাজুলের মা-ও নিষ্পলকে দেখতে থাকল। দুগগা ঠাকুরের মতো এই টানা টানা চোখ, ভুরু কান ছুঁয়েছে, এই থাক দোয়া দোয়া চুল! এতক্ষণ হাতখোঁপা করে বেঁধে রেখেছিলেন রসুইঘরে ছিলেন বলে, এখন খুলে দিতেই শাঁত্ করে পিঠময় ছড়িয়ে দাওয়ার ওপর বিলি কাটতে লাগল! কি রাশ! বাব্বাঃ! ডিবিসি বাঁধের বন্যের মতন।

হাত দিয়ে চুলের গোড়ার কাছটি খেলাতে খেলাতে মেজমণি বললেন—'আম ক'খানি তুই নিয়ে যা দিকিনি। তোর সিরাজুল খাবে। বচ্ছরকার জিনিস। একটি তো মোটে তোর গাছ, তা থেকে বিকোবি, বিলোবি, তবে আর খাবি কি বাছা। চাল তোর থলিতে আমি ভরে দিয়েছি। দেখিস কাগজের ঠোঙায় মুড়ে আলাদা করে একটুখানি কামিনী দিলুম, পায়েস করে মায়ে-পোয়ে খাস।'

বেশ গপ্প করছিল সিরাজুলের মা গেজেটবুড়ি, গাঁয়ের গপ্প, গঞ্জের গপ্প, টাউন-শহর থেকে যা-যা তথ্য-সংবাদ কুড়িয়ে বাড়িয়ে আনতে পেরেছে তা-ও। গপ্প করছিল আর ভেবে মরছিল—'এই মানুষের আবার অংখার! লোকে দেখেই বা কি আর বলেই বা কি! পাড়া বেড়াবে কি মানুষটা, মরবার সময়টুকু থাকলে তো!'

হঠাৎ মেজমণি কেমন অস্থির হয়ে বললেন—'মা, শরীরটা আমার কেমন আনচান করছে, আমি একটুক ঘরে যাই।'

যেতে যেতেই মেজমণি টলতে লাগলেন, সিরাজুলের মা না ধরলে বোধ করি পড়েই যেতেন। পালঙ্কে কোনমতে কাত করে দিয়ে সিরাজুলের মা অন্দরের অন্য দিকে ছুটল—'ও বড়মণি গো, ও ছোটমণি গো দেখে যাও তোমাদের মেজমণি কেমন করতেছে!' বড়মণি ঠাকুরঘরে, শুনতে পেল না। ছোটমণি সিলোতে সিলোতে সুতোটুকু দাঁত দিয়ে কাটছিল, তা দাঁতের সুতো দাঁতেই রয়ে গেল, ছোটমণি দৌড়ে এসে বললে—'মেজদি-ই-ই।' আর মেজদি ; মেজদি তখন ঘোরে কি বেঘোরে।

বড়বাবু এলো ধমধম করে, মেজবাবু এলো কাছা কোঁচা সামলাতে সামলাতে, ছোটবাবু এলো বাঁটা তাসক'টা হাতে ধরে, শেষকালে গুহবদ্যি এলো তার চামড়ার থসথসে ব্যাগটি নিয়ে, গলায় ইস্টেথো ঝুলিয়ে। ক্রমে গাঁ গঞ্জের মানুষগুলি আড়ালে-আবডালে উঁকিঝুঁকি মারতে মারতে বড় বাড়ির পেল্লাই বার-উঠোনে, ভেতরবাড়ির দরদালানে, দোলমঞ্চের ফাটা ফোটা থামগুলির আশেপাশে ভেঙে পড়ল। কি হয়েছে গো মেজমণির? কি হল হঠাৎ মেজমণির? আগে তো কখনও কিছু শুনিনিকো বাতিকের ব্যামো আছে বলে? কি হয়েছে না কি হয়েছে! সেই যে মেজমণি চোখ বুজেছেন আজ নিয়ে পুরো সাতাশটি দিন কাবার হয়ে গেল, মানুষের আর চোখ মেলবার নামটি নেই।

জমিদারি কবেই উঠে গেছে। তারও আগে থেকে গেছে বড়বাড়ির ঝাড়বাতি, বোলবোলাও, লোক-লস্কর। বলতে লাগে না, পাঁচিলের গায়ে বড় বড় বট অশত্থ, ডুমুরের বাড়বাড়ন্ত দেখলে কথাটি আপনি বোঝে যে জন বুঝদার। যে ক' বিঘে ধান জমি, পুকুর, বাগান, গোধন আছে, তল্লাটের সব মানুষ জানে তা দিয়ে বড়বাড়ির জলখাবার টুকুনিও হয় কি না হয়। বড়বাবু দেবভক্ত সাত্ত্বিক মানুষ, জীবনে কখনও রোজগারের টাকা ছুঁয়ে দেখেননি। ভাত পাতে তেতো থেকে মিষ্টান্ন অব্দি কুটি কুটি সব রকম না পেলে রোচে না। ক্ষীর কদ্দূর ঘন হল ঢালা-উপুড় করে দেখতে হয় রোজ। কোঁচা লুটুবে একহাত। ঝাড়া বাহান্ন ইঞ্চি, কল্কাপাড়ের দিশি কাপড় নিবারণের কুঁচিয়ে দেওয়া নইলে বড়বাবু পরেন না। মেজকর্তার তক্কো বাতিক। যেখানেই চাকরি করতে যান তক্কো করে সেসব খুইয়ে-টুইয়ে দু'দিন পরেই বাড়ি এসে বসেন। আপিসে লোক রাখে কাজের জন্যে, খামোখা তক্কো করলে তারা শুনবে কেন বাপু? ছোট কত্তার অতসব ভাববার চিন্তোবার সময় নেই। ছেলেবেলা থেকেই নানান শখ। তাসের শখ, যাত্রা-থিয়েটারের শখ, মেডেলের শখ। কিছুর মধ্যে কিছু না ছোট কত্তা হঠাৎ মেডেল হেঁকে বসেন। তালদিঘি, পাড়ুইপুর, কন্নাট এই তিনখানা গ্রাম যে সবচেয়ে আগে বড় বেড় দিয়ে আসতে পারবে সে সোনার মেডেল পাবে। ছোট কত্তার মুখ থেকে কথা বেরুনো আর রামচন্দ্রের ধনুক থেকে তীর বেরুনো মোটের ওপর একই কথা। ওরে এই বাজারে সোনার মেডেল কোথায় পাবো রে? পাত দিয়ে মুড়ে দিতে হলেও হাজার দু-হাজারের ধাক্কা! ওরে অমন হাঁকা হাঁকলি কেন? আর কেন! ছোট কত্তা মাথায় নতুন গামছা চাপিয়ে গোঁজ হয়ে বসে থাকে। ভাত খাবে না, ঘুমোবে না, কথা কও তার জবাব দেবে না। চোখের জলে নাকের জলে হয়ে সদর-অন্দর সদর-অন্দর করতে করতে অবশেষে ছোটমণি রসুইঘরে গিয়ে দড়াম করে আছড়ায়—'অ মেজদি, কি হবে গো, মানুষটা যে শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী হতে চলেছে।'

মেজমণি হেসে বলে—'আচ্ছা সে আমি দেখছি'খন।' মেজমণি দেখচি বলল তো হিল্লে হয়ে গেল। আর ভাবনা নেই, চিন্তা নেই। এখন যে যার ঘরে বসে শিবের মাথায় বিল্ব-চন্দনই দাও, কি কাঁথাই সিলোও, তাসই পেটো কি বিদ্যের জাহাজ ভাসিয়ে তক্কাতক্কিই

করো। যা করো বাপু নিশ্চিন্দে করো গে। মেজমণি বলে দিয়েছে—'সে আমি দেখছি'খন।'

বড়বাড়ির এই হল গিয়ে বৃত্তান্ত। ননদিনীরা আসেন, যান। শহর বাজারের মস্ত মস্ত সব জামাই। গো-গাড়ি, সাইকেল রিকশা, কি জগঝম্প মটর গাড়ির ভেঁপু বাজাতে বাজাতে এসে পড়েন। তখন বড়বাড়িতে যেন রসুনচৌকি বসে। জামাই শালা ভাজ ননদাই নিয়ে সে বড় আদিখ্যেতার রোশনাই। বড় বউর ঘরে বসে হাত-পা ছড়িয়ে গাল-গল্প করতে করতে বড় ননদ বলেন—'পানে বেশ করে কেয়ার খয়ের দিয়ে সেজো গো মেজ বউ।' মেজমণি বলে—'আচ্ছা !'

মেজননদ বলে—'ছেলে দুটো আমার কেন যে অমন খ্যাংরা কাঠির জ্ঞাত-গোত্তর বুঝি না ভাই মেজ বউদি।'

মেজমণি বলে—ওষুধ আছে। মেজদি তুমি ঘুম যাও।'

মেজদি গিয়ে ছোটমণির ঘরে এ কেলেচ্ছা ও কেলেচ্ছা করতে করতে ঘুমিয়ে যায়।

সেজননদ বলে—'তোমার ননদাই বলছে কষে জলসা বসাও গিয়ে একদিন গাঁয়ে। গাইয়ে-বাজিয়ে বাজাবার দায় তাঁর, রাখবার দায় তোমার। উনি সারারাত ঠায় তবলায় বসে থাকবেন।

মেজমণি বলে 'বেশ তো।'

ছোট ননদ বলে—'পুজোর কাপড় চোপড়গুলি দেখে শুনে নাও গো বউদিরা। ফুল কাটাটি ছোট বউর, দাঁত দেওয়া মেট্রোপাড়খানা বড় বউর, ছেয়ে রঙটি নয় মেজ বউদি নিও।'

নিজে নিজেই উল্টে পাল্টে দেখে ননদ তেমন সরেস হল না এটি। না ই হোক। অনেক আছে মেজর। অনেক, অনেক।

ছেলে পিলেরা সারাটা দিন মেজমণির পায়ে বাজছে। মেজমণি না খাওয়ালে ভাতের পাত শুধু ঠোকরাবে। মেজমণি রূপকথা না বললে দুপুর রাত পর্যন্ত চোখ সব টেনে টেনে খুলে রাখবে, বলবে—'ঘুম আমাদের পায়নি গো। ঘুম পায় না।' এমনি বজ্জাত সব।

ছোট কত্তার ছেলের মুখে-ভাত হবে। কত্তারা সব মেজর ঘরে শলা নিতে গেছেন। কোথা থেকে দই আসবে ? মেজমণি বললেন—'অনন্ত ঘোষেরটাই ভালো।' কোন পুকুরের মাছ উঠবে ? মেজমণি বললেন—'কেন ? তেলি পুকুরের ! থই থই করছে এখন রুই কাতলায় !' নেমন্তন্নের লিস্টি মেলাও, গুষ্টি জ্ঞাতি বর্গের কেউ যেন আবার বাদ না যায়। তদারক করো, তদবির করো।

মেজমণি শশব্যস্তে বলেন—'বড়দি, তোমার পুজো হয়েচে তো ভাতের হাঁড়িটা একটু নামিও, নবাই এয়েচে, মাছের কথাটা ঠিকঠাক করে আসি গে।'

বড়মণি চোখ কপালে তুলে বলেন—'এই সেদিন যে বুকের ব্যামো ধরা পড়ল রে মেজ, ভুলে গেলি ? ওমা ! আমি যাবো কোথা।'

মেজমণি বলেন—'কি সব্বোনাশ, তাই তো ! ছোট কোথায় গেলি ? ছোটকে ডাকো, নবাই বড্ড ব্যস্ত হচ্চে।'

ছোট ফিসফিস করে বলে—'খোকার আমার ঘুমটা সবে ধরেছে গো মেজদি ! চাঁদের কপালে চাঁদ আহা ! নইলে তোমার ভাতের হাঁড়ি কেন গোটা হেঁসেলখানাই নামিয়ে দিয়ে আসতুম গিয়ে।'

গভীর রাত্তিরে সব ঘুমিয়ে-জুমিয়ে পড়লে মেজকত্তা আড়ে আড়ে দেখে মেজমণি গদির তলা থেকে চাবি বার করল, ঘরের কোণে আঁধার বরণ সিন্দুকের চাবি ঘোরাল ঝনাৎ করে, সিন্দুকের ভেতর রুমঝুম, টাকায় মোহরে গাঁদি লেগেছে, সব মেজমণির ইস্ত্রীধন। তা থেকে মেজমণি সংসারের সার খরচ-খর্চা যেটুকু যা দরকার, অন্নপ্রাশনের মোচ্ছবের টাকা গুণে গেঁথে সব তুলে নিল। মেজকত্তা পাশ ফিরে নিশ্চিন্দে ঘুম গেল।

এইভাবে বড়বাড়ির বড় সংসার—তার দৈনন্দিন, তার পাল পার্বণ, তার মোচ্ছব সব চলে। সেই মেজমণি আজ সাতাশটা দিন জ্ঞান নেই, ঘোরের মধ্যে পড়ে। চলে ?

কি করবে ! বড়কত্তা গোবিন্দ বসাক গদিওয়ালার কাছে কর্জ করে আসেন। মেজ বউ উঠলে পরে শোধ যাবে। মেজকত্তা গদি-টদি হাতড়ে চাবি-টাবি কই কিচ্ছু পায় না। সিন্দুকের ডালা যেমন ভারি হয়ে বসে থাকে তেমনি। দেয়ালের তাক হাতড়ে আলমারির খোপ হাতড়ে অবিশ্যি টাকাকড়ির পুঁজি মন্দ মেলে না। মেজকত্তা সেইগুলি দিয়ে বড়দাদার সঙ্গে শলা করে বড় শহর থেকে ভারি ডাক্তার আনায়। গোটা সংসারের মুখ শুকিয়ে এতটুকু। ছেলে-পিলেগুলি সময়ে আহার না পেয়ে খিদেয় কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ে, রসুইঘর ছমছম করছে, কোনমতে দুটি ভাতে-ভাত নামিয়ে বড়মণি ছোটমণি এ-ওর মুখে চায়। কি হবে গো ? কি হবে ? কত্তাদের মুখে খাবার রুচছে না। বড় মেজর তো হুঁশই নেই। এদিকে তিন তিরিক্ষে তেত্রিশ রকম পরীক্ষার পর বড় শহরের ভারি ডাক্তার কিনা বড় আশায় ছাই দিয়ে জবাব দিয়ে গেল ?

তে-তল্লাটে মেজমণির বাপের বাড়ির কেউ নেই। খবর দেবে কাকে ? একটি মাত্তর মেয়েকে টাকার পুঁটুলি সুদ্ধ শ্বশুরঘর সই করে দিয়ে বাপ-মা চোখ বুজে নিশ্চিন্দি হয়েছেন। ননদিনীরা সব আসেন। চোখে আঁচল দিয়ে বড়র ঘরে, ছোটর ঘরে খানা দিয়ে বসে থাকেন। যদি কোনও সুখবর হয়। তা বসে থাকাই সার হয়। মন কারুর ভাল নেইকো। মেজকত্তা একবার বলেছিল শহরের নার্সিং-হোমে নিলে কি হয় ? বড়কত্তা জবাব দেন—'বড়বাড়ির ইজ্জতটুকুও তালে বড় শহরে রেখে এসো গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে।' ছোটকত্তা জবাব দেয়—'তা ছাড়া ঠাঁই নাড়া করতে তো ডাক্তার মানাই করে গেল মেজদা, কান পেতে শোননিকো ?' মেজকত্তা কাঁচুমাচু মুখে সরে যায়। আঁদাড়ে পাঁদাড়ে ঘোরে, ফকির দরবেশ, সাধু সন্ত কেউ যদি কিছু সুলুক-সন্ধান দিতে পারে। আশা ছাড়তে পারছে কই ?

এমন দিনে ভোর রাতে স্বপন দেখে উঠে বসল মেজকত্তা। ঘুমের ঘোরেই জড়িত গলায় বলল—'দাদা, সন্নিসি ঠাকুর এয়েচেন, দোলতলায় দাঁড়িয়ে।' বড়কত্তা কোমরে লুঙ্গি কষতে কষতে আসছিলেন, দোরগোড়া থেকে বললেন 'আমিও তাই বলছিলুম।'

ওদিক থেকে দৌড়তে দৌড়তে ছোটকত্তা এসে বলল 'শেষ রাতে মাঠ সারতে গিয়ে দেখি পেল্লায় এক চিমটেধারী ব্রহ্মচারী দাদা—ওই যে দোলতলায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন।'

সারা বাড়ি দেখতে দেখতে জেগে উঠল। বড়মণি যে বড়মণি ধূলিশয্যায় ছিলেন, বুকে বড় ব্যথা মা। সারা রাত জপ করেছেন মেজমণির জন্যে, এখনও কুঁড়োজালির মধ্যে আঙুল নড়চে, উঠে বসে আঁচল সামলে মুখে চোখে জল দিলেন। ছোটমণি ঘুম ভেঙে খুঁক খুঁক করে কাঁদছিলেন—চোখ মুছে বাইরে এলেন। কপাট খুলে ওঁরাও সব দাঁড়িয়ে গেছেন—ননদিনী, ননদাই। ছেলেপিলেগুলি দলবদ্ধ হয়ে গোঁজ দাঁড়িয়ে সন্নিসিঠাকুর দেখছে।

দোলতলায় প্রায় কার্নিশ সমান উঁচু এক পাহাড়ের মতো সন্ন্যাসী। জটাজুট গোড়ালি

ঢেকে লুটুচ্ছে একেবারে। গোঁফসুদ্ধু দাঁড়ি বুক অব্দি নেমে পড়েছে। হাতে ইয়া কমণ্ডলু, চিমটে। কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা, একটার পর একটা ভুঁড়ির কাছে দুলছে। ভস্মলিপ্ত। দারুণ, করুণ সুন্দর, ভরাট ভরসা-জাগানো মুখখানি।

সন্নিসির পায়ের তলায় সব এক-একখানা কাটা মাছের মতো শুয়ে পড়লেন। বড়, মেজ, ছোটকর্তা, বড়মণি, ছোটমণি, ননদিনীরা চারজনা। তিনটি ননদাই, একজন এখনও এসে উঠতে পারেননি। ছেলেরা সব খাড়া দাঁড়িয়েছিল। সর্দার ছেলেটি যেমনি বড়দের দেখাদেখি উপুড় হল বাকি ছেলেগুলিও অমনি তার দেখাদেখি সব মাজা ঘটিবাটির মতন উপুড় হয়ে পড়ল।

'দয়া করো বাবা।'

'রক্ষা করো।'

'বিপদভঞ্জন মধুসূদন, রাখো ঠাকুর রাখো।'

শেষরাত্তিরে ঝিমঝিম করে আঁধার বৃষ্টি হচ্ছে, জনপ্রাণীর সাড়া নেই, শব্দগুলি ভারি-ভর্তি হয়ে যেন রাতের চাতালে বিঁড়ে-পেতে সব মাটির কলস, পেতলের কলস যে যার ঠাঁই বসে গেল। জল চলকাতে লাগল বেশ কিছুক্ষণ। গমগম করছে শেষ রাত্তিরের বড়বাড়ি মেজবউটির জন্য প্রার্থনায়—দয়া করো বাবা, রক্ষা করো, বিপদভঞ্জন মধুসূদন হে, রাখো ঠাকুর, রাখো।'

রেশটুকু যেন ধূপের ধোঁয়া, মিলিয়ে গেল ক্রমে। সন্নিসি বললেন—'কিসের দয়া ? কার রক্ষা ? কাকে রাখবেন, ঠাকুর ?'

গলা নয়কো মৃদঙ্গ। ভাষা নয়কো সুর।

মেজমণির ঘরে দীপ জ্বলছে, সেদিকে তাকিয়ে সন্নিসি বললেন—'শিখাটি ক্ষীণ। কিন্তু আলোটি তো দেখছি দিব্যি পরিষ্কার। তোরা এতগুলি প্রাণী তার জন্যে আহার নিদ্রা ছেড়েছিস আর আলোটি নিভে যাবে ? তা-ও কি হয় ? আধারখানি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করো গে যাও বাছারা। আর হোমের যোগাড় দেখো গে। শুদ্ধ কাপড় অত চাই না মা। শুদ্ধ মনে করো, এখুনি। মহাপ্রাণী কি বলেন, দেখছি।'

ভাণ্ডার থেকে মাসের জমা গব্যঘৃত বার করে দিলেন বড়মণি। চন্দন কাঠ নিয়ে এলেন ছোটকত্তা, দিঘির মাটি নতুন সরায় করে এনে হাজির করলেন মেজকর্তা। ছেলেরা সব নদীর পাড় থেকে হোমের বালি বের করল। বড়কর্তা দোলতলায় গিয়ে আসন করে বসলেন, দেব-দ্বিজে শুদ্ধা ভক্তি কত্তার। যজ্ঞস্থলে নাম করবেন। সন্নিসি বললেন—'আর কিছু চাই না। কাউকে চাই না। নির্জন ঘরে একলা হোম করব বাবারা। না হলে আদেশ পাওয়া শক্ত।'

তা—তাই হল। ঠাকুরঘরে ঠাঁই করে দেওয়া হল। ঘরের দরজায় কড়া পাহারা, বন্ধ ঘরে তিন প্রহর নির্জনে হোম করলেন সন্ন্যাসী। দরজার ফাঁকটুকু দিয়ে সারাটা সকাল হু হু করে চন্দনের গন্ধ, গব্যঘৃতের গন্ধ। দুগ্ধ, মধু...সন্ন্যাসী হোম করছেন। হোম করছেন। গন্ধের সঙ্গে মিলেমিশে শব্দ আসছে—আহুতি দেবার চড়বড় শব্দ, অং বং মন্ত্র পড়ার শব্দ। তারপর সব চুপ। সারা দুপুর, সারা বিকেল নিঃশব্দ রইল হোমঘর, ঠাকুরঘর।

॥ ২ ॥

সন্ধ্যা আসন্ন হইলে সশব্দে দরজা খুলিয়া গেল। কবাটবক্ষ বিরাট সন্ন্যাসী হোমগৃহের চৌকাঠে দাঁড়াইয়া উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—'উপায় মিলিয়াছে। বধূমাতার প্রিয়জন যে স্থানে এতগুলি, সে স্থানে তাঁহার প্রাণরক্ষা এমন কঠিন কর্ম কিছু না। স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া, পবিত্র ও পরিতুষ্ট হইয়া একে একে এ ঘরে আইস, রক্ষার উপায় আমি করিয়া দিই।'

প্রথম প্রবেশ করিলেন বড়বাবু। গরদের ধুতি ও পিরান পরনে, দিনান্তে মার্জনার ফলে গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল রক্তাভ, যুক্ত করে জোড়াসনে বসিয়া বড়বাবু ভক্তিভরে বলিলেন—'আদেশ করুন প্রভু।'

সন্ন্যাসী বলিলেন—'বৎস বধূমাতার রক্ষার একমাত্র উপায় কিঞ্চিৎ প্রতিদান। দান সাতিশয় পুণ্য কর্ম ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সংসারী ব্যক্তি বিশেষত রমণীর অন্তরাত্মার গঠন বড় বিচিত্র। ডান হস্ত দান করিল, বামহস্ত জানিতে পারিল না এই শাস্ত্রোক্ত বিধান উহাদের ক্ষেত্রে খাটে না। উহারা স্বীকৃতি চায়। অবিশ্রান্ত দান করিয়া করিয়া মাতার মহাপ্রাণী বড় ক্লান্ত দেখিতেছি। অঞ্জলি পাতিয়া করুণ নয়নে চাহিয়া আছেন। আমি যাহা বলি তাহা যদি উঁহাকে সমর্পণ করিতে পারো তো রক্ষা হইবে, অন্যথায়...'

বড়কর্তা বলিলেন—'আমি ত্রিদিবশরণ দেবশর্মা বলিতেছি প্রভু। ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী ব্যতীত জল পান করি না, ত্রিলোকে এমন দেব-দেবী নাই যিনি আমার হস্তের তুলসী-চন্দন নিত্যসেবা করেন না। মোক্ষ ব্যতীত আমার নিজের জন্য দ্বিতীয় প্রার্থনা নাই। আদেশ করিতে আজ্ঞা হয়, মেজবধূমাতাকে আমার অদেয় কিছুই নাই।'

সন্ন্যাসী শান্তকণ্ঠে বলিলেন—'বাস। এই অহঙ্কারটুকু ওই নির্বাপিত হোমকুণ্ডে আহুতি দিয়া চলিয়া যাও। দেবতায় তোমার ভক্তির অহঙ্কার। সাত্ত্বিক জীবনযাপনের অহঙ্কার। এই মাত্র। ভাবিয়া-চিন্তিয়া দিবে, ঘর মন্ত্রসিদ্ধ। দিলাম বলিলেই দেওয়া হইবে না। দান পূর্ণ হইলে হোমকুণ্ড আবার জ্বলিবে।'

বলিয়া সন্ন্যাসী একমনে মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। দণ্ডকাল পরে চক্ষু তুলিয়া দেখিলেন সম্মুখের আসন শূন্য। হোমকুণ্ড জ্বলে নাই।

ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন বড়বধূ। লাল পাড় শুদ্ধ বস্ত্রের প্রান্ত কণ্ঠে জড়াইয়া অবগুণ্ঠনবতী ভক্তি ভরে প্রণাম করিলে সন্ন্যাসী বলিলেন—'অধিক সময় লইব না মা, দক্ষিণ হস্তে কোষা হইতে বিল্বপত্র তুলিয়া বাম হস্তের মুষ্টিতে স্থাপন করো। ঈর্ষার বিষে মেজবধূর দেহ নীলবর্ণ হইয়াছে। কেহ জানিবে না মা, তোমার এই গোপন ঈর্ষাটুকু হোমকুণ্ডে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাও, তাহা হইলেই উনি আরাম হইবেন। বিল্বপত্রে ঈর্ষা আকর্ষণ করো। দেখিও মা, মন্ত্রসিদ্ধ ঘর, দিব বলিলেই দেওয়া না-ও হইতে পারে।'

সন্ন্যাসী জানিতেও পারিলেন না, কখন বড়বধূ নির্গত হইয়া গিয়াছেন। আসনে মেজকর্তা, যজ্ঞকুণ্ডে সামান্যতম ধূমও আর নাই। মেজকর্তা গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন—'আদেশ করুন প্রভো।'

সন্ন্যাসী মৃদুস্বরে কহিলেন—দারাপুত্র পরিবারসম্পন্ন গৃহস্থ মানুষের কোনও দায়িত্ব অস্বীকার করিলে চলে না বৎস। আচমন করিয়া বসো। উদাসীনতা হোমকুণ্ডে বিসর্জন দিয়া একটি কাষ্ঠখণ্ড দায়িত্ব স্বীকারের প্রতীক স্বরূপ যজ্ঞকুণ্ড হইতে তুলিয়া লইয়া পীড়িতা পত্নীর বক্ষে স্থাপন করো গে। উনি রক্ষা পাইবেন।'

মেজকর্তা কিছুক্ষণ প্রাণপণে কাষ্ঠখণ্ড তুলিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে শুষ্ক মুখে, ঘর্মাক্ত কলেবরে বাহির হইয়া গেলেন। মনে হইল এইবার সন্ন্যাসীর ধৈর্যচ্যুতি হইতেছে। মুখমণ্ডলে প্রশান্ত শিবভাব অন্তর্হিত হইয়াছে, ধীরে ধীরে যেন চক্ষে, গণ্ডদ্বয়ে, ওষ্ঠাধরে রুদ্রভাব প্রকাশ পাইতেছে। সেই মেঘগম্ভীর মুখমণ্ডল দেখিয়া ভয়ে ছোটকর্তা ও ছোটবধূর প্রাণ উড়িয়া গেল। সন্ন্যাসীর আদেশে তাঁহারা একত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বজ্রকণ্ঠে সন্ন্যাসী বলিলেন—'স্বার্থপরতা ত্যাগ করিতে পারিবে?' মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় দুলিতে দুলিতে দম্পতি বলিল—'না।' দীপ্ত চক্ষে সন্ন্যাসী বলিলেন—'তবে দূর হইয়া যাও।'

আসন ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হোমঘরের কপাট খুলিয়া দাঁড়াইলেন। যেন মূর্তিধারী কালভৈরব। দীপ্ত চক্ষু, কণ্ঠে বজ্র—বলিলেন—'আর তিন দণ্ড কালমাত্র বাকি আছে ইহার মধ্যে মাতার প্রাণ রক্ষা করিতে হইলে তোরা কেউ শীঘ্র কিছু দে।' ননদিনীদের কাহাকেও বলিলেন—'লোভ দে', কাহাকেও বলিলেন—'মিথ্যায় মুগ্ধ হইয়া আছিস, মোহটুকু দে', কাহাকেও বলিলেন—'একদেশদর্শিতা বিসর্জন দে' সন্ন্যাসীর মন্ত্রের ক্রিয়ায় সকলে সত্যবদ্ধ। কেহই প্রার্থিত বস্তু দিতে পারিল না।

অবশেষে সন্ন্যাসী বালক-বালিকাদিগের প্রতি চাহিয়া মৃদু, কোমল কণ্ঠে বলিলেন—'ওঁ তৎসৎ। বৎস, তোরা শুচি, নিষ্কলঙ্ক, অকপট তোরাই তাঁহার শেষ আশ্রয়। বল, বাছারা মেজমাতাকে ভালোবাসিস?'

'হ্যাঁ।' সমবেত কণ্ঠে উত্তর আসিল।

'কেন?'

'মেজমণি পুতুল কিনিয়া দেয়, লাটিম কিনিয়া দেয়?'

'বল কিনিয়া দেয়', 'মেজমণি খাবার করে', 'গল্প বলে।'

'যদি তিনি আর কিছু কিনিয়া না দেন, আহার্য প্রস্তুত না করেন, যদি রূপকথা আর না বলিতে পারেন?'

বালক-বালিকার দল মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী খড়মের শব্দ তুলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। প্রথমে দরদালান, তাহার পর বাহির প্রাঙ্গণ, তাহার পর বিরাট মানুষটিকে আর দেখা গেল না।

॥৩॥

হোমঘরে চন্দন কাঠ, গব্যঘৃত, ধুনো গুগগুলের গন্ধ কেমন তীব্র কটু হয়ে উঠেছে। বড়বাবু রোষকষায়িত লোচনে বললেন—'ভণ্ডামিগুলো টান মেরে ফেলে দে। নিবারণ, বিশু কে কোথায় আছিস।'

সিরাজুলের মা বুক চাপড়াতে চাপড়াতে এসে বলল—'সব্বোনাশ হয়ে গেল গো। মেজমণিমা আমার আর নেই যে গো! টিমটিম করে পিদ্দিমটি জ্বলছিল, আগলে-বাগলে রেখেছিনু, তা মাকে আর ধরে রাখা গেলনি।'

—মেজমণির ঘরে দীপ জ্বলেনি। বড়কর্তা বললেন—'মেজ, চাবি দে।'

মেজ বললেন—'চাবি নেই।'

ছোটকর্তা বললে—'ইয়ার্কি মেরো না দাদা। চাবিটা দিয়ে ফেলো। চাবি হলে সব হবে।'

বড়মণি বললেন—'চাবি হলে সব হবে?'

ছোটমণি বললেন—'সব হবে।'

ননদিনীরা বললেন—'হবে, হবে, সব হবে।'

গদীর তলায় হাত দিয়ে মেজকর্তা অবাক হয়ে দেখলেন—ওমা এই তো চাবি। শেষ-সম্বলটুকু দাদার হাতে তুলে দিতে দিতে মেজকর্তা ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

চাবি একবার ঘোরাতেই সিন্দুকের ডালা ফাঁক হয়ে গেল। অভ্যন্তর শূন্য। মেজমণির স্ত্রীধন মেজমণির দেহান্তের সঙ্গে অন্তর্ধান করেছে।

বন্ধু

হাওড়ার ফ্যাক্টরি থেকে সোজা গেছি আমহার্স্ট স্ট্রীটে। সেখান থেকে ভবানীপুর। রবিন আজ ছুটিতে। আমিই ড্রাইভ করেছি সবটা। দোতলার দালান পর্যন্ত পোঁছতে আজ আমার দম বেরিয়ে গেল। পায়ে যেন জোর নেই। দালান অবধি পোঁছতেই কালোমাণিক গুড়গুড় গুড়গুড় করতে করতে এগিয়ে এলো। পায়ের কাছটায় ফোঁস ফোঁস করছে, যেন প্রণাম করছে। আজ মন-মেজাজ এতোই খারাপ যে পাটা ছুঁড়তে গিয়েছিলাম। সামলে নিলাম। ড্যাসুনটার কী দোষ! ও তো আমায় ছেড়ে যায়নি, যাবেও না ওর আয়ুষ্কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত। জানোয়ার মানুষের চেয়ে অনেক বিশ্বস্ত, অনেক বৎসল। উঃ, টুকটুক যে কোথায় গেল! ওর বোঝা উচিত গাড়ির শব্দ পাওয়া গেছে, অতএব আমি এসেছি। কোথায় কি এমন রাজকর্মটা করছে! ঠিক আছে। করো তুমি তোমার রাজকর্ম। আমিও কিচ্ছুটি বলব না। জুতো খুললাম না। জামা-কাপড়, ধড়াচুড়ো যা পরা ছিল, রইল। দালানের সোফায় গা এলিয়ে দিলাম। পাখাটা চলছে ফুল স্পীডে। তবু ঘামছি।

অমিতের ব্যবহার বরাবরই বড় শীতল। একেক সময় মনে হত ওর বোধশক্তি হয় নেই, নয় ভোঁতা। অথচ ও যে আমাকে কী টানে টেনেছিল! চিরকালই আমার অনুভূতি তীক্ষ্ণ, তীব্র। অমির পেট ব্যথা করলে, মাসিমা অনেক সময়ে কাকে ওষুধ খাওয়াবেন ঠিক করতে পারতেন না। হয়ত এতো অনুভূতিপ্রবণ বলেই আমি মানুষটা লোকের চোখে মেয়েলি বলে প্রতিভাত হই। অনুভূতি-টুতি সব নারীজাতির একচেটিয়া কি না! যারা এসব মনে করে তারা অবশ্য ইচ্ছে হলে টুকটুককে দেখে যেতে পারে। যাই হোক, মেয়েলি বলুক, বাড়াবাড়ি বলুক, আদিখ্যেতা বলুক, সব সহ্য করতে রাজি আছি, কিন্তু 'ন্যাকামি' বললে মেনে নিতে পারব না। 'ন্যাকা' শব্দটার মধ্যে একটা হিপক্রিসির ব্যাপার আছে। আমার আর অমির সম্পর্কের মধ্যে কোনও খাদ নেই। অমির আদ্যন্ত নির্লিপ্ততা সত্ত্বেও এই দুর্লভ বন্ধুত্ব টিকে আছে, আমি সে কথা হাজার মুখে বলব, অমি অবশ্য বলবে না, হাসবে। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া যদি করাও যায়, অমিকে পিটিয়ে তার মুখ থেকে কথা বার করা সহজ নয়। প্রচণ্ড মুখচোরা। ওই হাসিটাই ওর জবাব। ওর মতামত।

পাখা চলছে। তবু ঘামছি অস্বাভাবিক। দোষ নেই। যত জীবন এগোচ্ছে ততই বুঝতে পারছি প্রয়াত সেই কবির কথাই ঠিক, চতুর্দিকে মুখোশ, শুধু মুখোশ। তুমি কথা বলো, অপরপক্ষের ঠোঁট নড়বে হৃদয় নড়বে না, তুমি কিছু শোনালে কানগুলো শুনবে, কিন্তু মর্মে পৌঁছবে না। হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব—এ একেবারে কাব্যকথা। কবি-বাক্যে বিশ্বাস করে সারাটা জীবন একটার পর একটা ভুল জায়গায় নিজেকে সমর্পণ করে

পেছনে একটা শব্দ হল। নিশ্চয় টুকটুক। পনের মিনিট কেটে গেল, এতক্ষণে বাবুর আসবার সময় হয়েছে। পেছন থেকে সামনে এলো। একটা সবুজ সিল্কের রাজস্থানী পোশাক পরেছে। ভারী সিল্কের ওপর দিয়ে হাওয়া কাটলে একটা অদ্ভুত আকর্ষক শব্দ হয়। সেই শব্দটাই আমি শুনতে পেয়েছিলুম। টুকটুকের জামা কাপড়ের শখ ভীষণ, কত রকমের যে পোশাক করায়। পরে, বাড়িতেও পরে থাকে!

—'কতক্ষণ এসেছো?' একেবারে অলস ট্ দা পাওয়ার ইনফিনিটি। হাতটা পড়ে রয়েছে সোফার হাতলে। নখগুলো লাল, হাতের পাতায় কোথাও কোনও শিরা জেগে নেই। যেন নেতিয়ে পড়া কেয়াফুলের স্তবক। বাপের বাড়ির হতদরিদ্র ঘরে টুকটুক এমন হাত টিকিয়ে রেখেছিল কি করে—এটা একটা লাখ টাকার প্রশ্ন। আমি যে জবাব দিলাম না, আমার মেজাজটা যে একটু অন্যরকম, ভঙ্গিতে বিষাদসিক্ত এসব টুকটুক লক্ষই করল না। আপন মনে নিজের আঙুল দেখছে। হাতের কাঁকন দেখছে। পা তুলে একবার সোনালি চটি নাকি তার অভ্যন্তরে নিজের সাদা মসৃণ পায়ের পাতা দেখল। নার্সিসাস!

—'খাবে? নাকি বাইরে খেয়েছো?' —আমার খাওয়া না খাওয়া ওর কাছে সমান। এবারেও উত্তর না পেয়ে বোধ হয় মেমসাহেবের বোধোদয় হল। বললো —'কি ব্যাপার? কথা বলছো না যে! কিছু হয়েছে?'

জবাব দিলাম না। টুকটুক এবার উঠে পড়ল। আমার কাছে চলে এলো। নিচু হয়ে সোফার পেছনে দু হাত রাখল, আবারও বলল—'কিছু হয়েছে?'

—'অমিত অস্ট্রেলিয়া চলল ফর গুড'—আমি অনেক কষ্টে শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারলাম।

—'তো কি?' বুকের ওপর দু হাত আড়াআড়ি রেখে চূড়ান্ত নির্বেদের সঙ্গে টুকটুক বলল।

আমি উঠে দাঁড়িয়েছি। প্রায় কাঁপছি এত উত্তেজনা। বলছি—"টুকটুক তুমি বলছ কি? অমিত অস্ট্রেলিয়া চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে বরাবরের মতো আমাকে ছেড়ে। আর তুমি বলছ,—'তো কি?' তো তুমি কি?"

টুকটুক আড়াআড়ি হাতদুটো নামাল। ঝট করে পেছন ফিরল, ওদিকের ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ ঘাড়টা ফেরাল, তারপর মুখটা সামান্য বেঁকিয়ে আমাকে আমূল কাঁপিয়ে দিয়ে বলল, —'ন্যাকা'।

এই অসহ্য রকমের ঘৃণ্য শব্দটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিল আমার স্ত্রী যাকে আমি কাদা থেকে তুলে এনে রাজসিংহাসনে বসিয়েছি, প্রতিদিন যার সাংস্কৃতিক শিক্ষা-দীক্ষা এবং বিলাসের খাতে আমার আয়ের অঙ্কে রীতিমত একটা বিয়োগ হয়। যার বাবা-মা, দুটি ছোট ভাইবোনের দায়ও আমি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছি। কোনরকম প্রার্থনা, অনুরোধ, উপরোধ বা প্রত্যাশার দায় মেটাতে নয়। এটাই আমার পক্ষে সবচেয়ে স্বাভাবিক, এটাই সবচেয়ে মানবিক বলে। আমাদের নিজেদের মানুষ বলে পরিচয় দিতে হবে তো!

এই মনুষ্যত্ব রক্ষার তাগিদেই না অমির কাঁধে হাত রেখেছিলাম! তখন বাল্য পেরিয়ে কাঁচা কৈশোর। বই আনেনি এই অপরাধে ভূগোলের ক্লাসে সেবারের সেকেন্ড বয় সাঙ্ঘাতিক মার খেল। ভূগোলের মাস্টারমশাই প্রফুল্লবাবু বড় নিষ্ঠুর স্বভাবের ছিলেন। মেরে-ধরে ছেলেটিকে আধমরা করে উগ্রচণ্ডা দুর্বাসার মতো বেরিয়ে গেলেন প্রফুল্লবাবু,

আমি বললাম—'চল, আমরা হেড সারের কাছে কমপ্লেন করতে যাই।' কয়েকজন ছেলে সঙ্গে সঙ্গে তৈরি। অমিত অর্থাৎ মার-খাওয়া ছেলেটি বলল—'না।'

—'যাবো না ? সে কি ? কেন ?'

—'সত্যিই তো, গতকাল উনি বারবার করে আনতে বলেছিলেন টেক্সট্‌টা।'

—'ঠিক আছে, কিন্তু এই সামান্য ভুলের জন্য ওই রকম মার ? অমিত তোমার যে পিঠ লাল হয়ে গেছে। কানের পাশ দিয়ে রক্ত পড়ছে।'

—'ও কিছু না। ওঁর বাড়ি থেকে চলে গেলেই উনি আর মারবেন না।'

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসায় জানলাম—অমিত এবং তার মা প্রফুল্লবাবুর বাড়ির নিচের তলায় ভাড়া থাকেন। —ওর বাবা বছরখানেক হল হঠাৎ মারা যাওয়ায় ওরা একেবারে অকূলে পড়েছে। ভাড়া দিতে পারছে না মাসছয়েক হল। প্রফুল্লবাবুর মারের পেছনের আসল ইতিহাস এই।

অত সহজে, অন্যান্য ছেলেদের সামনে অবশ্য অমি এত কথা বলেনি। আস্তে আস্তে টিফিন পিরিয়ডে মাঠে বেড়াতে বেড়াতে গাছতলায় বসে মুড়ি চিবোতে চিবোতে অনেক জেরার পর একটু একটু করে বেরিয়েছে কথাগুলো অমির পেট থেকে।

আমি বললাম—'আজ ছুটির পর অমিত আমাদের বাড়ি চলো প্লীজ।'

—'আজ নয়।'

—'তবে কাল।'

—'ঠিক আছে দেখা যাক।'

—'দেখা যাক নয়, কাল আসছই।'

বাড়ি গিয়ে বাবাকে সব কথা বললাম। আমার মা নেই। বাবা অত্যন্ত উদার-চরিত্রের মানুষ। বললেন—'আমাদের একতলার দক্ষিণ দিকে দুখানা ঘর তো এমনিই পড়ে রয়েছে, ওঁদের আসতে বলে দাও। —আমি বারান্দাটা ঘেরার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

পরের দিন অমিকে বাড়িতে আনলাম, বাবা কারখানা থেকে ফিরে ওকে দেখলেন, আদর করে বললেন,—'বাঃ, বেশ ব্রাইট ছেলে মনে হচ্ছে!'

কিন্তু আমাদের বাড়ির একতলায় থাকার কথায় অমিত ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়ল। খালি গোঁয়ারের মতো ঘাড় বেঁকিয়ে থাকে। শেষে ওদের বাড়িতে গিয়ে ওর মার কাছে কথাটা পাড়লাম। উনি বললেন,—'প্রফুল্লবাবুর ছ'মাসের বাকি ভাড়া না দিয়ে কি ভাবে যাই বলো! তা ছাড়া তোমাদের বাড়ির ভাড়াও তো অনেক হওয়ার কথা।'

আমি ছেলেমানুষ। মায়ের মতো এক মহিলার মুখের ওপর আর কি বলব। বাড়ি চলে এলাম। বাড়ি ভাড়ার পরিমাণ পাঁচ শ চল্লিশ টাকা। আমার হাত খরচের টাকা জমেছিল হাজারের সামান্য ওপরে। তার থেকে পাঁচ শ চল্লিশ প্রফুল্লবাবুর হাতে দিয়ে রসিদ নিয়ে অমির মার কাছে গেলাম। হাত ধরে বললাম—'চলুন না মাসিমা, আমার মা নেই। কেউ আমাকে দেখে না।'

এই শেষের তীরটাই বোধ হয় অব্যর্থ হয়ে থাকবে। তাই ওদের বাড়িতে আনতে পারলাম। অমির মা আমার নিজের মায়ের মতো হলেন। ওঁদের একতলার ঘরই হল বলতে গেলে আমার আসল বাসস্থান। রাজশয্যা ছেড়ে ধূলিশয্যা, অনেকেই বলল। —মাসিমার সেলাই-মেশিন এবং অমির কাগজ বিক্রি চলতে লাগল আড়ালে আমাদের বাড়ির ভাড়া এবং আমার পাঁচ শ চল্লিশ টাকার ঋণ মেটাবার জন্যে। এবং কোনক্রমেই আমি অমিকে আমার খাবার টেবিল বা শয্যার ভাগ দিতে পারলাম না, একমাত্র কোনও

জন্মদিন-টিনের মতো বিশেষ উৎসবের দিন ছাড়া। এবং মাসিমাও কোনও দিন তাঁর ভাড়া-করা দুখানা ঘর-বারান্দার সীমা অতিক্রম করলেন না।

টুকটুক এসে বলল—'যদি খেয়ে এসে না থাকো, তো চলো খাবার দিতে বলেছি। আমি নিজে রেঁধেছি আজ।'

এটা নতুন। রান্না করতে টুকটুক খুব ভালোই পারে। কিন্তু একদম ভালোবাসে না কাজটা করতে। বললে বলে—'ভালো রাঁধতে পারি, তো কি? তুমি কি রান্নার জন্যে আমায় বিয়ে করেছিলে? তা হলে আমার মাকে বিয়ে করলেই পারতে, মা আরও অনেক অনেক ভালো রাঁধে।'

—'টুকটুক! কি অসভ্যতা! কি বিশ্রী!'

—'আমার যদি দিনরাত শুয়ে থাকতে, কি গল্পের বই পড়তে, কি টি ভি দেখতে ভালো লাগে আমি তা করতে পাবো না! এরকম তো কথা ছিল না!'

কথা কি ছিল তা অবশ্য আমি আদৌ জানি না। কিন্তু টুকটুক যখন পরম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এই প্রশ্নটা উচ্চারণ করে আমি প্রাণ ধরে পাল্টা বলতে পারি না—"কী-কথা ছিল?" আমার খারাপ লাগে। আমি বুঝতে পারি টুকটুক রান্না করতে করতে, রান্না করতে করতে হাঁপিয়ে গেছে। এখন ওর তাই রাঁধতে আর ভালো লাগে না। জীবনে কোনদিন লাগবেও না। আর আমি এতো হ্যাংলা নই যে রান্নায় বীতস্পৃহ স্ত্রীকে দিবারাত্র 'এটা করো' 'ওটা করো' বলে নাজেহাল করে তুলব। এমন কি আমাদের আদ্যিকালের বামুনঠাকুরের রান্না খেয়ে টুকটুক যখন নাক কুঁচকে বলে—'তোমরা ঘটিরা সব তাতে এতো মিষ্টি খাও। তোমাদের বামুনঠাকুর কি মাছের ঝোলেও চিনি দেয়?' তখনও আমি বলি না—'নিজে রাঁধলেই তো পারো, কিংবা নিজের পছন্দটা দেখিয়ে দিলেও তো পারো!' কোনও কথা ছিল অথবা ছিল না বলে যে একথা আমি বলতে পারি না তা নয়। আসলে এ ভাবে বলা আমার স্বভাবে নেই। বিশেষত যখন টুকটুকের ব্যাপারটা আমি আগাগোড়াই বুঝতে পারি।

তো সেই টুকটুক আজ রান্না করেছে। জামা-কাপড় বদলে, হাত-মুখ ধুয়ে নিতে হল। অমি অস্ট্রেলিয়া চলে যাচ্ছে, সেই খবর বুকের ভেতর নিয়ে আজ আমি টুকটুকের রান্না পোলাও, চিতল মাছের কোপ্তা খাচ্ছি, ঠিক সেই দিনেই. এ কেমন নিষ্করুণ কাকতালীয়? আমাকে অন্যমনস্ক দেখে টুকটুক দু আঙুল জিভ দিয়ে চেটেচুটে নিয়ে বলল—'কেমন, ভালো হয়নি বুঝি?'

আমি বললাম—'ভালো হয়নি মানে? দারুণ হয়েছে, সাঙ্ঘাতিক হয়েছে। শুধু তোমার এই একটি গুণের জন্যও আমি পত্নীগর্বে গর্বিত হতে পারি।'

—'থাক'—টুকটুক বলল—'তো বন্ধুকে একদিন ডাকো. খাইয়ে দাও।' টুকটুক কি অমিকে ডাকবার প্রসঙ্গ তুলতেই আজ নিজে হাতে রান্না করেছে। ও কি জানে না, অমিকে নিয়ে আমি প্রায়ই বাইরে খাই, কিন্তু বাড়িতে না। বাড়িতে ডেকে অমিকে কোনও কষ্ট বা অপ্রিয় পরিস্থিতির মধ্যে ফেলবার নিষ্ঠুরতা আমি কেমন করে করব?

—'কি প্রস্তাবটা পছন্দ হল না বুঝি?'—টুকটুকের কাটা কাটা কথা। অমিকে যেমন বাঁচিয়ে চলি, টুকটুককেও তেমনি সত্যি কথাটা বলতে পারি না। আজকে বলে ফেললাম—'তুমি তো জানো অমি আজকাল আর আমার বাড়ি একেবারে আসতে চায় না। তা ছাড়া ও তো কালই চলে যাচ্ছে।'

উত্তরে টুকটুক একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করল। এই বিচিত্র মুখভঙ্গির মানে কি বোঝবার

চেষ্টা করতে করতে আমি খাওয়া শেষ করলাম। হাত মুখ ধুয়ে, সিগারেট ধরিয়ে জানলার পাশে দোলনা চেয়ারে বসলাম। এক হতে পারে—বয়েই গেল। অমি যদি আসতে না চায় ওর জন্যেই নিশ্চয় চাইছে না, সেটা ওর পক্ষে যথেষ্ট অপমানকর। তাই সেটাকে ও উড়িয়ে দিতে চাইছে। আসবে না তো বয়েই গেল। দ্বিতীয় হতে পারে আমার কথা ও বিশ্বাস করেনি। অর্থাৎ অমিকে আমি আসতে বলেছি অথচ সে আসতে চাইছে না। এটা আমার রচনা। টুকটুকের মধ্যে অবিশ্বাসের শেকড় খুব গভীর। আমার এখনও পর্যন্ত সাধ্যে কুলোয়নি যে তাকে উপড়োই। আস্তে আস্তে হবে। আমি অপেক্ষা করতে পারি। তাড়াহুড়োয় কি লাভ?

অমির জন্যেও তো আমায় অপেক্ষা করতে হয়েছে। কত দিন, কত মাস, কত বছর। তবু ওর মনের তল পেয়েছি কি কোনদিন? বড্ড চাপা স্বভাব। একমাত্র যখন আমার বসন্ত হল, তখন, সেই ভয়ঙ্কর সময়টায় অমি আমার ঘরে শুয়েছিল। এক মশারিতে আমি, আরেক মশারিতে ও। কষ্টে ছটফট করছি, ঘুম আসছে না। অমি উঠে এসেছে, নীল আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে, মশারি সামান্য তুলে অমির সেই মৃদু গলার প্রশ্ন এখনও আমার কানে বাজে—'বড্ড কষ্ট হচ্ছে না রে গোপাল? শোন, একদম চুলকোবি না। আমি আস্তে আস্তে ফুঁ দিয়ে দিচ্ছি।' এইভাবে ফুঁ দিয়ে দিয়ে, মৃদু গলায় গল্প করে, গান করে আমায় অন্যমনস্ক রাখত, ঘুম পাড়াত অমি। সে বছর ঠিক তিন নম্বরের তফাতে আমি সেকেন্ড হয়ে গেলাম। মাস্টারমশাইরা প্রকাশ্যেই বললেন—'প্রশংসনীয় প্রতিযোগিতা। তবে কিছুতেই অমিতকে এর চেয়ে কম মার্কস দেওয়া গেল না। গোপাল তুমি ইচ্ছে করলে খাতাগুলো দেখতে পারো।' খাতা দেখেছিলাম। সেই বয়সেই মনে হয়েছিল অসাধারণ। সেদিনটা আমার রাস্তায় রাস্তায় কেটে গেল একা, ভাবটি অমিটা কি সাঙ্ঘাতিক মেধা লুকিয়ে রেখেছিল। ওর জন্য অনেক বড় কিছু অপেক্ষা করছে। আমাদের স্কুল কলকাতার গর্ব। আমিও অহঙ্কার করছি না, যা-তা ছেলে নই। সেই আমার এতদিনের রেকর্ড ভেঙে যে বেরিয়ে যেতে পারে তাকে তো শাবাশ জানাতেই হয়।

সে রাত্রে আর মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারিনি, পরদিন স্কুল যাবার আগে গিয়ে প্রণাম করতে মাসিমা কেঁদে ফেললেন, বললেন,—'কাল আসিসনি কেন রে গোপাল, দুঃখ হয়েছিল খুব, না রে?'

আমি বললাম—'সে কি? দুঃখ হতে যাবে কেন? আমার আসলে ভীষণ...'

—'না, না, আমি ঠিক জানি এতো দিনের ফার্স্টবয় তুই, মন দিয়ে লেখাপড়া করিস, ফাঁকি তো দিস না, তোর দুঃখ হয়েছে কি না তুই না বুঝলেও আমি বুঝি রে : মাত্র তো তিনটে নম্বর, পার হতে পারবি না!' এতো ভালোবাসতেন আমাকে মাসিমা।

মাসিমার প্রেরণাতেই আর কোনদিন আমার সেকেন্ড হতে হয়নি। কিন্তু আমি তাতে খুশি হতে পারিনি। অমি ঠিক আমার পেছন-পেছন এসেছে। বরাবর। নয় কি দশ নম্বর পেছনে, যেন পা টিপে টিপে। এই ধরে ফেলল, এই ধরে ফেলল। কিন্তু ধরতে পারছে না। তাতে ওর কোনও বিকারও নেই। যতই বলি না কেন—'অমি, বাক আপ ম্যান, কেন পারছিস না? এরকম কমপিটিশন আমার ভালো লাগে না। আমার মাস্টারমশাইদের কাছে পড়।'

অমি নরম করে হাসে—'না পারলে কি করব বল গোপাল! আর কি-ই বা এসে যায় এতে।' সত্যিই ওর মতো বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা।

অনেকক্ষণ বসে আছি। উঠলাম। জল খেলাম। পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরে গেছে—'টুকটুক, টুকটুক !'

শিবুদা এসে ধরল। এইসা ঝিঁঝিঁ ধরেছে যে নড়তে পারছি না। শিবুদা বলল—'বাঁ পা দিয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল এমনি করে চেপে ধরো।'

—'দু পা-ই ধরে গেছে যে !'

—শিবুদা তখন নিচু হয়ে আস্তে আস্তে পা মালিশ করে দিতে লাগল। একটু পরে ঝিনঝিনে হাসি শুনে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি টুকটুক। হেসে গড়িয়ে পড়ছে একেবারে।

বললাম—'কি হল ?'

—'শিবুদা তোমার পায়ে ধরে অত সাধছে কেন ?'

—'পায়ে ধরতে যাবে কেন ? আচ্ছা তো ! ওই জন্যেই তো তোমাকে ডাকছিলাম, তা তোমার পাত্তা পেলে তো !'

—'কেন ডাকছিলে ! পায়ে ধরে সাধতে ? এরপর কি সকালবেলা বুড়ো আঙুল ধোয়া জল খেতেও ডাকবে ?' টুকটুকের হাসি বেড়েই যাচ্ছে।

বিরক্ত হয়ে বললাম—'ঝিঁঝিঁ ধরেছে প্রচণ্ড। কী যে বাজে কথা বলো।'

—'উঃ। কত ন্যাকামিই যে জানো !' টুকটুকের প্রস্থান। ওকে সাবধান করে দিতে হবে এই কথাটা ও যেন আর ব্যবহার না করে। আমার অ্যালার্জি হয়ে যাচ্ছে কথাটায়। টুকটুক যেন মনে না করে ওকে যে আমি বিয়ে করেছি এটা একটা ফেরানো-যায় না গোছের ব্যাপার। আজকালকার দিনে হতে পারে না। এটা ওর জানা উচিত। অমিকেও কয়েকদিন আগেই বলছিলাম—'টুকটুকের বাইরের রূপ-গুণ দেখে আকৃষ্ট হওয়াটা বোকামি কি বল ! ভেতরের মানুষটা ঠিক।...'

অমিত চুপ করে রইল। আমি হেসে বললাম—'তুই আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। অলটার ইগো বলতে গেলে। তুই এ বিষয়ে মতামত দিলে আমি কিছু মনে করব না।'

অমিত বলল—'না...মানে...ঠিক...।'

—'না...মানে...ঠিক... ? তুই ইয়ার্কি পেয়েছিস ! তুই নিজে ওর মধ্যে কি দেখেছিলি ?'

অমিত বলল—'দূর, তুইও যেমন ! ছাড় তো !'

ব্যাস। বিষয় পরিবর্তন। আর একটি কথাও ওকে দিয়ে বলাতে পারিনি।

অমি আমাদের বাড়ির একতলা ছাড়ল মাসিমার মৃত্যুর পর। সে এক মর্মান্তিক ব্যাপার। মনে করলে এখনও আমার গা শিউরে ওঠে। মানুষকে ক্ষমা করতে পারি না। মাসিমা কোনদিন নিজেদের ঘরের সীমানার বাইরে পা বাড়াতেন না, কিন্তু আমার বাবা নানা প্রয়োজনে মাঝে-মধ্যেই যেতেন। এই নিয়ে আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী মহলে একটা চাপা গুজগুজ আরম্ভ হল। আমাদের তখন ফাইনাল ইয়ার। রটনা শুনে রাগে আগুন হয়ে গেলাম। আমারই মাথায় আগুন জ্বলছে, তা হলে ওদের না জানি কি হচ্ছে ! ঘরে গিয়ে দেখি মাসিমা যেমন অবিশ্রান্ত সেলাই করে যান তেমনি করছেন, অমিত ছাত্র পড়াবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। অমিকে ঝাঁকিয়ে বললাম—'তোর কি দেহে মাছের রক্ত, এইসব রটনা শুনেও তুই নির্বিবাদে ছাত্র পড়াতে যাচ্ছিস ?'

মাসিমার মুখটা লাল হয়ে গেল। অমির মুখটা একেবারে নীলবর্ণ। আমি টেবিলে চাপড় মেরে বললাম। 'এইসব জঘন্য শয়তানির উচিত জবাব কি জানিস ?—বাবার সঙ্গে মাসিমার বিয়ে দিয়ে দেওয়া।'

—মাসিমার সেলাই-কল দুম করে বন্ধ হয়ে গেল। তিনি যেন একটা উদ্গত চিৎকার

চাপলেন। অমিত উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'গোপাল তুমি বলছো কি, ছিঃ। এসব কথা চিন্তা করলেও ওদের নোংরা ধারণাকে মেনে নেওয়া হয়। বোঝো না?'

আমি বললাম—'ভুল। ভুল। সমাজ চিরকাল একভাবে চলবে না অমিত চলতে দেবো না, সমাজের মুখে থাবড়া দেব, এ আমি করেই ছাড়ব। আজই বাবাকে বলছি।'

অমিত বলল—'হঠকারীর মতো কথা বলো না, হঠকারীর মতো কাজ কোরো না। যাও তো এখন এখান থেকে, যাও।'

একরকম ঠেলে আমাকে নিজেরই বাড়ির ঘর থেকে বার করে দিল অমিত। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। মা-ছেলের মধ্যে কি কথা হয়েছিল জানি না। পরদিন এক বীভৎস দৃশ্য দেখা গেল। আমাদের পরমপূজ্য মাসিমার কুসুমকোমল শরীরটা সিলিং থেকে...।

অমিত ঘরের কোণে বসেছিল। আছড়ে পড়ে বললাম—'এ কি করলেন মাসিমা, এ কি করলি অমি? কী বলেছিলি মাসিমাকে?...'

অমিত ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মাসিমার শেষ কাজ হয়ে যাবার পর আমাকে বা বাবাকে একটা কথাও না জানিয়ে বাড়ি ছেড়ে গেল অমিত। একদিন ভোররাতে উঠে শুধু দেখলাম, দালানে শ্বেতপাথরের টেবিলে সে মাসের ভাড়ার টাকাটা, ঘরের চাবির তলায় চাপা দেওয়া রয়েছে। একটা চিঠি না, কিচ্ছু না।

টুকটুক বলল, 'শুতে চলো। অনেক রাত হয়েছে।'

সত্যিই রাত হয়ে গেছে। শুয়ে পড়লাম। কিন্তু সত্যিই ঘুম আসছে না। সামনের জানলার পর্দা সরানো দু পাশে। চাঁদটা একেবারে ঠিক চোখের ওপর। টুকটুক বলল—'একটা জিনিস করেছি, দেখবে?'

—'এখন? এই এত রাতে?'

—'ঘুমোচ্ছ না বলে বলছি।'

টুকটুক উঠল, আলো জ্বালল, আলমারি খুলল। ভেতর থেকে দুটো প্যাকেট টেনে বের করল। একটা প্যাকেটে হাত-কাটা খুব সুন্দর একটা স্লিপোভার, ধবধবে সাদা। আর একটা প্যাকেটে ঠিক ওইরকম আরেকটা স্লিপোভার, কুচকুচে কালো।

টুকটুক বলল—'তুমি ফর্সা, তোমাকে কালোটা মানাবে, আর তোমার বন্ধু কালো, ওকে সাদাটা...।'

হেসে বললাম—'তোমার কালার-ম্যাচিং সম্পর্কে ধারণা খুব পুরনো টুকটুক। এখন সবাই জানে ফর্সা রঙে সাদা পরতে হয়। যাই হোক ওটা একটা ব্যাপারই না। বেশ সুন্দর হয়েছে।'

টুকটুক বলল—'অস্ট্রেলিয়া যাবার আগে এটা তোমার বন্ধুকে দিয়ে দিও।'

—'বাঃ, তুমি উপহার দিচ্ছো, তুমিই দেবে, আমি দিতে যাবো কেন?' আমি পাশ ফিরে শুলাম। টুকটুক তা হলে এখনও অমির জন্য ভাবে। আশ্চর্য!

অমিকে সেবার খুঁজে বার করলাম ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে। পেছন থেকে কাঁধে হাত রাখতেই চমকে উঠল। বললাম—'ভূত দেখলি নাকি?'

ফিকে হাসল। বললাম—'ও বাড়িতে থাকতে আর না-ই যাস। আমাকে তোর ঠিকানাটা অন্তত দে। আমি যে তোকে ছেড়ে খেতে শুতে পারি না, একথাটা তো এতদিনে জানিসই!'

ঠিকানাটা খসখস করে লিখে দিল। আমহার্স্ট স্ট্রীটের একটা মেসের ঠিকানা। এরপর

আমাদের জীবন, আলাপ, অন্তরঙ্গতা সব একেবারেই লেখাপড়া-কেন্দ্রিক হয়ে উঠল। মাস্টারমশাইরা অর্থাৎ সায়েন্স কলেজের মাস্টারমশাইরা নিত্য আসতেন বাড়িতে। ওঁরা বলতেন কে যে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবে আর কে যে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড হবে বোঝা যাচ্ছে না। আমি বলতাম—'অমিত হবে,' অমি বলত—'গোপাল হবে।' পাঁচ নম্বর, মাত্র পাঁচ নম্বরের জন্য সেকেন্ড হয়ে গেল অমিত।

সেইজন্যেই মনোদুঃখে কি না জানি না অমি একটা চাকরি নিয়ে বসল। ভালো চাকরি, কিন্তু গবেষণার সুযোগ নেই। শুধু সেলস। অনেক বোঝালাম, শেষে ইনস্টিট্যুটে যোগ দিতে ও রাজি হল। তারপর আমাদের যুগ্ম গবেষক-জীবনের শুরু। কি পরিশ্রম করছে অমি, আমি বুঝতে পারছি ও এবার কিছু করবে। করবেই। প্রাণপণে ওকে সাহায্য করে যাচ্ছি। ওর নির্দেশমতো চলছি। পেপার বার হচ্ছে আমাদের উভয়ের নামে। তারপর? তারপর ভাগ্যের সেই অদ্ভুত খেলা। জেনেটিক এঞ্জিনিয়ারিং-এর সেই আবিষ্কার যা অদ্ভুতভাবে শেষ পর্যন্ত আমার হাত দিয়েই হল। নেশায় পেয়ে বসেছিল আমাকে। রাতে সবাই চলে যাবার পর আবার গেলাম ল্যাবে। দারোয়ানকে দিয়ে চাবি খুলিয়ে, সারারাত কাজ করছি, খুঁজছি, তারপর হঠাৎ আলোর ঝলক। পর দিন সকালে চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেল খবর। প্রেস কনফারেন্স ডাকলেন ডক্টর বর্মা, আমি জোর করেছিলাম আমাদের দুজনের নামই থাক। অমি রাজি হল না। রিসার্চ ছাড়ল অমি। অবশ্য ছাড়ল বলা ঠিক না। চাকরি তো রিসার্চেরই। কিন্তু ওর সেইসব মূল্যবান গবেষণা তো আর ওর ব্যক্তিগত থাকবে না। অনেক বারণ করেছিলাম। কিছুতেই শুনল না। ওর নাকি টাকার দরকার। আমারও আর ভালো লাগল না। ছেড়ে দিলাম ইনস্টিটিউট। সেই সময়ে বাবা মারা গেলেন, আমাকে হাল ধরতে হল বাবার ব্যবসার। মনে অশান্তি নিজের পছন্দমতো কাজ পাচ্ছি না। বাবার ইলেকট্রিক্যাল পার্টস-এর ব্যবসা, বাঁধা খদ্দের সরকার, কাজের মধ্যে রস পাই না। একদিন এসপ্লানেডে গাড়ি থেমে আছে ট্রাফিক সিগন্যালে, দেখলাম ওদের দুজনকে। অমি তখনও পুরনো মেস ছাড়েনি, বলে—'বেশ তো আছি, নিজস্ব বাড়ি মানেই নানান ঝামেলা।' মনে মনে হাসলাম, ও এইজন্য তোমার টাকার দরকার। এইবার তুমি বাড়ির ঝামেলায় যাবে। গাড়ি ঘুরিয়ে তুলে নিলাম। পরিচয় হল। হেসে বললাম—'রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবি কেন? আমার বাড়িটা কি তোর নয়?'

পরের রবিবারই ডাকলাম ওদের দুজনকে। আলোয় ফুলে ভরে দিলাম বাড়ি। ইনটিরিয়র ডেকোরেটর ডেকে ঘর সাজালাম। ওরা এলো। সারাটা মুগ্ধ সম্মোহিত সন্ধ্যা খালি গান আর গল্প, গল্প আর ছবি, যেখানে যা ভালো খাদ্য আছে, অমি যা ভালোবাসে, যা ওর পক্ষে ভালোবাসা সম্ভব—সবই জড়ো করেছিলাম।

চিকমিকে সব জরির ঝালর। টুংটাং ঘণ্টার মধ্যে দিয়ে বড় বড় চোখ কপালে তুলে টুকটুক বলছিল—'এতো বড়, এতো সুন্দর বাড়ি, এই বিশাল গাড়ি, এতো সম্পদ সব আপনার একার?—কোনও দ্বিতীয় ভাগীদার নেই?'

আমি হেসে বলছিলাম—'আর এই সব রোশনি, এই খুশবু, এই সমস্ত আপ্যায়ন আয়োজন আপনার। আপনার একার। কোনও ভাগীদার নেই।'

স্বপ্নালু চোখে টুকটুক বলছিল—'কথা বলাও কি আপনি মাস্টারমশাই রেখে শিখেছিলেন?'

আমি বলছিলাম—'চলতে ফিরতে হাসতে যদি আপনি মাস্টারমশাই রেখে শিখে না থাকেন, তা হলে কথা বলতে শিখতেও আমার মাস্টারের দরকার হয়নি।'

আমার বাড়ি ওদের জন্যে খোলা রইল। চাবি দিয়ে দিলাম একটা—অমির হাতে। অমি সেটা টুকটুকের হাতে চালান করে দিল।

দু-তিন দিন পর টুকটুক এলো একা একা। অমি নাকি কাজে ব্যস্ত। আরও কয়েক দিন পর টুকটুক আবার এলো একা, অমি ট্যুরে গেছে। আরও কয়েকদিন পর টুকটুক আমার দেওয়া চাবিটা ব্যবহার করল। অর্থাৎ আমি বাড়ি এসে দেখলাম টুকটুক—দালান আলো করে সোফায় এলিয়ে আছে। তারপর একদিন টুকটুক এসে কান্নায় ভেঙে পড়ল। অমি নাকি বিয়ে করতে চাইছে না।--'প্রায় দু বছর এতো মেলামেশার পর...আমি মুখ দেখাতে পারব না বাড়িতে', টুকটুক দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছিল। অমির অফিসে গেলাম। খুব উত্তপ্ত হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন। ওর ঘরে আরও দুজন কর্মী বসে। গ্রাহ্য করলাম না। যা বলার বললাম। অমি বলল—'আমি ওর সঙ্গে বন্ধুর মতো মেলামেশা করেছি, বিয়ে করব কথা দিইনি তো!'

—'বাঃ চমৎকার। তুই যে এত বড় স্কাউন্ড্রেল তা আমার জানা ছিল না। কথা দিসনি তো ও ভাবল কি করে?' এই সময়ে সহকর্মী দুটি উঠে বাইরে চলে গেল।

অমিত মৃদু হেসে বলল—'তাই তো? ভাবল কেন? আমার বাঁধা পড়বার ইচ্ছে নেই, কাজ অনেক কাজ, আচ্ছা গোপাল, দ্যাখ না ও যদি তোকে বিয়ে করতে রাজি হয়!'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—'ওকে যখন এভাবে পরিত্যাগ করেছ, তখন ও এরপর কাকে বিয়ে করতে রাজি হবে সে কথা ভেবে আর নাই মাথা ঘামালে!'

যাক গে, সে সব দিনও গত হয়ে গেছে। গত মাস কয়েক ধরেই আমার নতুন পরিকল্পনা নিয়ে দুজনের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। আমার এই লোহা-লক্কড় আর ভালো লাগছে না, ওটা আছে থাক। ওষুধের ফ্যাকটরি করব। অমি অনেক প্ল্যান-ট্যান ছকে দিল, এসবে ওর মাথা তো পরিষ্কার! আমি বললাম, 'তোকে কিন্তু আসতে হবে আমার সঙ্গে।'

—'কিভাবে?'

—'কেন? তুই ওয়ার্কিং পার্টনার, ল্যাবরেটরির ভার তোর ওপর।'

অমিত যেন কি ভাবছে। অনেকক্ষণ পরে বলল—'দেখা যাক।'

তারপর কালকে ওই ঘোষণা। আগে থেকে কোনও খবর না, কিছু না। দুম করে—'কাল আমি মেলবোর্ন যাচ্ছি। হ্যাঁ ওখানেই চাকরি নিয়েছি। কবে ফিরব ঠিক নেই। খুব সম্ভব কোনদিন না।'

ভোর হয়ে গেছে। সারা রাত এক ফোঁটাও ঘুমোতে পারিনি।

বলেছিলাম—'আমার ওষুধের কারখানার কি হবে?'

—'তুই একটা ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ডি এস সি বায়োকেমিস্ট গোপাল, তোর ভাবনা হওয়া উচিত নয়।' অমিত আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল।

বোধহয় আধ ঘণ্টার মতো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। টুকটুক জাগিয়ে দিল। —'রেডি হবে না? প্লেন তো ন'টায়।'

—'ঠিক। তা তুমিও যাচ্ছো নাকি?'

—'বাঃ, তুমিই তো বললে উপহার নাকি আমার নিজে গিয়ে দিতে হবে।'

—'এই ফ্যান্সি ড্রেসটা পরেই?'

—টুকটুক গোঁয়ারের মতো বলল, 'হ্যাঁ।'

কালকের সেই রাজস্থানী পোশাকটা পরেছে ও, এটা পরলে ওকে রাণা প্রতাপ সিংহের

যুগের রাজপুতানী সুন্দরীদের মতো দেখায়। দারুণ সেজেছে টুকটুক। আপাদমস্তক রঙিন। ম্যাচিং গয়না ঝকমক করছে। পারফ্যুমের গন্ধে ঘর ভরে যাচ্ছে।

আমি উঠে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলাম। ইচ্ছে ছিল, অমির সঙ্গে দিল্লি পর্যন্ত গিয়ে সী-অফ করবার। কিন্তু এত দেরিতে খবরটা জানায় সেটা সম্ভব হল না। টুকটুকের হাতে মস্ত ব্যাগের মধ্যে প্যাকেট। আমি মনে করিয়ে দিয়েছিলাম একবার। কিন্তু টুকটুকের ভুল হয়নি। খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল ও কোনটা দিচ্ছে অমিকে। সাদাটা না কালোটা। ব্যাগ ফাঁক করে দেখাল টুকটুক। গোঁয়ারের মতো মুখ। সাদাটাই। ওই সাদাটার সুতোয় সুতোয় ও বোধকরি অমি সংক্রান্ত ভাবনাগুলো বুনে রেখেছে।

অমিটা স্টেট্‌স থেকে ঘুরে আসতে পারত। জার্মানি। ফ্রান্স কিংবা ইউ কে হলেও কিছু বলার ছিল না। ওর কোম্পানি না পাঠাক, আমি পাঠাতাম। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া! ওকি চীজ-রুটি, আর ভেড়ার মাংস, কিংবা ক্রিকেট-ট্রিকেটের লোভে অস্ট্রেলিয়া চলল নাকি? কথাটা মনে করে হাসি পেল আমার। কিন্তু এয়ারপোর্ট যতই এগিয়ে আসছে, হাসি মুছে যাচ্ছে, আমার মন থেকে। মুখ থেকে। অমি চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে, আমি কেমন করে বাঁচব? আর দুজনে পাশাপাশি কাজ করতে পাবো না। আর হবে না সেইসব আড্ডা, তর্ক, গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যেগুলো আমার জীবনে অপরিহার্য ছিল, আমার ধারণা অমিতের জীবনেও ছিল। এখন সে ধারণা আমি পরম অভিমানে পাল্টে নিতে বাধ্য হচ্ছি। একা একা অমি মেলবোর্ন চলল। এখনও ভীষণ মুখচোরা। প্রয়োজনের কথা কাউকে বলতে পারে না। বিদেশি শহরে ওর একাকিত্ব যেন আমার।

ওই তো অমি। লাউঞ্জে ঢুকেই দেখতে পেলাম অমি একটা দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে। সব ওর সহকর্মী সহকর্মিণী। আমাদের দেখতে পেয়ে হাসল। টুকটুক বলল—'পালিয়ে যাচ্ছেন বেশ! বাঃ!'

অমি হেসে বলল—'যঃ পলায়তি স জীবতি মিসেস সেন।' ওর অফিসের কলীগরা দেখলাম খুব বিচলিত, একটি অল্পবয়সী উৎসাহী ছেলে বলল—'এখনও ভেবে দেখুন অমিতদা। আপনি না থাকলে আমাদের পুরো টিমটাই কানা হয়ে যাবে।'

অমি তার পিঠে হাত রেখে বলল—'কথাটা ঠিক বললে না অরূপ। কারো জন্য কিছু পড়ে থাকে না। নেচার অ্যাভর্স আ ভ্যাকুয়াম, জানো না!'

—'যতই প্রবাদ প্রবচন বলুন, আমাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা হল যে স্থান একবার শূন্য হয় তা আর কখনও পোরে না।'

—'বিশ্বাস করো এ ছাড়া আমার উপায় ছিল না।' এই অবিশ্বাস্য কথাটা আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে অমি হঠাৎ একটি সহকর্মিণীর দিকে এগিয়ে গেল ; চলতে চলতে হঠাৎ পেছন ফিরে বলল—'গোপাল, মিসেস সেন আলাপ করানো হয়নি। এই আমার স্ত্রী অর্পিতা।' মেয়েটি দু'হাত জড়ো করে ফিরে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ করছিলাম—এখন ভালো করে দেখলাম স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ বুদ্ধির শ্রী মেয়েটির মুখে। ঝকঝকে দাঁতে নির্মল হাসি। ধবধবে সাদা একটা দেশী সিল্ক পরেছে, ছোট চুল পেছনে গোছা করে বাঁধা। তার পাশে কটকটে দিনের আলোয় টুকটুক যেন যাত্রাদলের রঙ মাখা সঙ।

আমাদের বিমূঢ় রেখে ওরা দুজন এগিয়ে গেল। এরোড্রোমের টারম্যাকের উপর দিয়ে ওরা হাঁটছে। প্লেনের সিঁড়ি থেকে একবার হাত তুলে বিদায় জানাল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সিঁড়ি ফিরে আসছে। প্লেন গতি নিল বলে।

পেছন ফিরে দেখি টুকটুক দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে। অমি কবে বিয়ে করল?

অস্ট্রেলিয়া যাবার ব্যবস্থার মতো বিয়ের ব্যাপারটাও চুপিচুপি সেরেছে। কেন ? আমাকে জানায়নি কেন ? কয়েকটা বিদ্যুৎ নির্মমভাবে ঝলকাচ্ছে। আমি অমিকে মেঘের মধ্যে একবার দেখতে পাচ্ছি, একবার পাচ্ছি না। ও কি আমাকে ভয় পেয়েছে ? কেন ? ও কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেনি ? কত কাল ? ও কি আমাকে কোন দিনই... !

মোহানা

সুরম্য ঘোষাল এবার বড়দিনের পর বহু নববর্ষের চিঠির মধ্যে একটা চিঠি পেলেন সেটা একটু অন্যরকম। গতানুগতিক কার্ড নয়, প্রীতি শুভেচ্ছা নমস্কার ইত্যাদিও নেই। আছে আই আই টি খড়্গপুরের কনভোকেশন উপলক্ষে একটি ছাপানো নিমন্ত্রণপত্র। সেই সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একটি লাইন বাংলায়—'সুরম্য, এলে স্বভাবতই তুই আমার এখানেই থাকবি।' ঠিকানা রয়েছে একটি এ-টাইপ কোয়ার্টার্সের, সই ডক্টর কান্তিময় উপাধ্যায়ের। চিনতে খুব দেরি হল না। দেরি হবার কথা নয়। কারণ আই আই টি জীবনে কান্তি বা কান্তিময়ই ছিল সুরম্য ঘোষালের সবচেয়ে সহৃদয়, সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। যদিও আই আই টি ছাড়ার বছরখানেকের মধ্যেই দুজনের কে কোথায় ছিটকে পড়েছিলেন তার ঠিক নেই। বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখা, দেখা-শোনা তো দূরের কথা, সামান্যতম যোগাযোগ পর্যন্ত ছিল না।

এতদিন পর এই নিমন্ত্রণপত্র এবং এক লাইনের চিঠি সুরম্যকে খুবই বিধুর এবং বিব্রত করল। বিধুর কেননা, মনে পড়ে যায়, সব মনে পড়ে যায়। বিব্রত কেননা, জানুয়ারি মাসের যে সময়ে কান্তি তার নিমন্ত্রণটা পাঠিয়েছে সে সময়ে তাঁর বম্বে যাওয়ার কথা। ডিরেক্টার্স-মিটিং। তাঁকে কাগজপত্র নিয়ে হাজির থাকতে হবে। তিনি যদি না যান বোসকে পাঠাতে হবে, তার জন্য বোসকে এখন থেকেই ব্রীফিং করা দরকার। কান্তি যথেষ্ট বুদ্ধি ধরে, অভিজ্ঞতা এবং কাণ্ডজ্ঞান আছে তাই বেশ খানিকটা সময় হাতে রেখে নিমন্ত্রণটা পাঠিয়েছে। কিন্তু ঠিকানাটা পেলো কি করে? গত তিরিশ বছরে তো স্থান-বদল মন্দ হয়নি। তেত্রিশের এক কম্পাস রোড কলকাতা থেকে, মহাত্মা গান্ধী রোড বাঙ্গালোর, চিন্তামননগর পুনা, জওহরলাল নেহরু মার্গ ভুবনেশ্বর হয়ে এখন কোশি রোড জামসেদপুর।

সত্যি, দিনগুলো কিভাবে উড়ে যায়! না উবে যায়! সামান্য একটু গন্ধ রেখে। সুরম্য চিঠিটা পেয়েছিলেন দুপুরে খাওয়ার সময়ে বাড়ি এসে, স্ত্রী-ই ধরিয়ে দিয়েছিলেন খামটা। তখন লনের ছায়া-পড়া দিকটায় কাঁটালগাছের তলায়, স্টীল ফ্রেমের ইজি-চেয়ার পেতে সুরম্য দু মিনিটের জন্য চোখ বুজেছেন কি বোজেননি। এই সময়টা আজকাল বড়ো ঘুম পায়। ঘুমটা দশ মিনিটের মধ্যে বন্দী থাকলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তা থাকছে না। দশ ছাড়িয়ে পনের, পনের ছাড়িয়ে কুড়ি মিনিট। আধ ঘণ্টার দিকে ঝুঁকছে। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্নর মতো যা আধ ঘণ্টা তাই এক ঘণ্টা হয়ে যাবেই একটু সাবধান না হলে। মাঝে মাঝে নিজের নাক-ডাকা নিজেই শুনে চমকে জেগে ওঠেন সুরম্য। আজ মনে করলেন স্ত্রীকে বলবেন দুপুরেও রুটিই দিতে। এই ভাত-ঘুম বন্ধ করতেই হবে। কল্যাণী এসে চিঠিটা হাতে দিতে অর্ধ-নিমীলিত চোখ পুরো খুলে মনের বাসনাটা ব্যক্ত করলেন সুরম্য।

ভুরু কুঁচকে উল বোনা থামিয়ে কল্যাণী বললেন—'কেন ? ভাত-ঘুম বন্ধ করবে কেন ?'

—'সে কী ! ভাত-ঘুম ভালো ? চালিয়ে যাবো ?'

—'পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছ, সারাদিন কোম্পানি অস্থি মজ্জা শুষছে। দুপুরে এক ঘণ্টা ঘুমোলে কি বড়সাহেব খুবই রাগ করবেন ?'

—'ওঃ তুমি যে একেক সময়ে কী বলো ! বড়সাহেবের রাগ-অনুরাগের ওপর আমার জীবনযাত্রা নির্ভর করছে নাকি ?'

—'তা ছাড়া আর কি ? আজ তোমার ঘুম নির্ভর করছে, কাল তোমার খাওয়া-দাওয়া শোওয়া-বসাগুলোও করবে। অমন চাকরি আর এ বয়সে না-ই করলে ?'

—'ভুঁড়ি হয়ে যাবে কল্যাণী, বোঝো না ?'

স্ত্রী যেমন স্বামীর দুর্বল স্থানে আঘাত করতে জানেন, স্বামীও তেমনি স্ত্রীর দুর্বল স্থানটির খোঁজ রাখতে ভোলেন না। এবং সে স্থান হল ভুঁড়ি। কল্যাণী নিজে যোগ-ব্যায়াম করে চেহারাটি মোটের ওপর একহারা রাখতে পেরেছেন। ভুঁড়িয়াল স্বামী তাঁর দু চক্ষের বিষ। কিন্তু সুরম্যকে অবাক করে দিয়ে কল্যাণী বললেন—'এমন করছ যেন ভুঁড়ি হতে আর বাকি আছে ! আর এই বয়সে একটু-আধটু ভুঁড়ি ভালোই দেখায়। যে সময়ের যা। প্রধানমন্ত্রীকে আজকাল টাকে কেমন সুন্দর মানিয়ে যাচ্ছে দেখছ না ?'

সুরম্য অবাক হতে হতে চিঠিটা পড়ছিলেন। চিঠিটা পড়তে পড়তে অবাক হচ্ছিলেন। আই আই টি খড়্গপুর। কোথায় সে ? কখন ? দেশকালের কোন বিন্দুতে ? ছেলেকে শান্তিনিকেতনে ভাস্কর্য শিখতে পাঠানো হয়েছিল। বাবা-মার অনেক ইচ্ছা সত্ত্বেও সে মহাজন পন্থা অনুসরণ করেনি। এখন কাঁথা সেলাইয়ের পাঞ্জাবি পরে ললিতকলা আকাদমি ও কলাভবনের মধ্যে যাতায়াত করে। তার সঙ্গেই সম্পর্ক কমে আসছে, আর আই আই টি খড়্গপুর ! তারপরে আবার ক্ষুদ্র এক লাইনের অন্তরঙ্গ বাংলা—'এলে তুই স্বভাবতই আমার এখানেই থাকবি—কান্তি।'

ঘাস থেকে রোদ্দুর আরও সরে গেছে। উলকাঁটার থলি সংগ্রহ করে কল্যাণী ভেতরে চলে গেছেন। সম্ভবত দুপুর ঘুম ঘুমোতে। সুরম্য জেগে উঠেছেন। খুবই জাগ্রত। হাতে চিঠি ধরা। চোখ খুলে, চোখ বুজে সুরম্য দেখছেন, দেখছেন, দেখছেন।

একদল হিংস্রমুখ ছেলে। অল্প বয়স। শাণিত বুদ্ধি। কিন্তু সামান্যতম সুযোগে ভেতরের রাক্ষসগুলো বেরিয়ে এসেছে। সুতরাং একদল ছেলে নয়। একদল রাক্ষস আসলে।

—'কী হল ? একশবার ওঠ-বোস করতে বললুম করলে না ?'

—'করলুম তো ?'

—'করলে ? মাত্র পঁচিশবার করে বলছ একশ ? শটকে জানো না এঞ্জিনিয়ার হতে এয়েচ, অ্যাঁ ? করো বলছি আরও পঁচাত্তর বার।'

'আমি গুনে গুনে একশবার করেছি।'

—'দেখেছিস সৌমিত্র, তখনই বলেছিলুম ছেলেটা ত্যাঁদড়। অঙ্কের ওপর দিয়ে ছেড়ে দেবো ভেবেছিলুম। এই ব্লাডি বাস্টার্ড, পাঁচশবার কর।'

সুরম্য অন্ধের মতো দৌড়ে গিয়ে বড় রাক্ষসের মুখ খিমচে দিয়েছে। তিনজন তিন পাশ থেকে ছুটে এসে তাকে ছাড়িয়ে নিল। বড় রাক্ষস রাগে কাঁপছে।

—'এতো সাহস ! অ্যাত্তো সাহস ! এই তোরা ওকে নিয়ে যা। ওর ফাঁসির হুকুম হয়ে

গেল।’

সতের বছরের পেটের অসুখে ভোগা, মাদুলি-তাবিজ পরা, মা-বাপের একমাত্র আদুরে রোগা-পাতলা ছেলে ঠক ঠক করে কাঁপছে। সুদ্ধু একটা জাঙিয়া পরে।

সবাই মিলে তিনতলার ছাদে নিয়ে গেল ঠেলেঠুলে। বৃষ্টির জলের পাইপ দু’হাতে ধরিয়ে দিল।

—‘নাও। এবার কত বড় বাপের ব্যাটা তুমি দেখি, এই পাইপ বেয়ে নিচে মাটিতে নামতে হবে, তবে বুঝব শালা তোর বাপ আছে।’

পাইপটা দু’হাতে শক্ত করে ধরে সুরম্য ছাদের কোণে উপুড় হয়ে রয়েছে। দেহে সাড় নেই। মুখ ফ্যাকাশে। নিচে নিশ্চিত নিষ্ঠুর মৃত্যু।

কে একজন বলল—‘ও নিজে যাবে না। পা ধরে হ্যাঁচকা মেরে ঝুলিয়ে দে।’

দৌড়ে ছুটে আসছে ওরা।

‘না।’ তীব্রস্বরে একটা চিৎকার। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়িয়েছে। কালো। ষণ্ডামার্কা। সুরম্য গতকালই ওকে দেখেছে। ওর পাশের বেড। এসেছে বীরভূম না বর্ধমানের গ্রামাঞ্চল থেকে।

—‘আরে এটা তো সেই জংলিটা না ? কি চাঁদ, তোমার দাওয়াই তো আগেই হয়ে গিয়েছে, আবার এয়েচ কেন ? ব্যাধি বেড়েচে ?’

—‘ওকে পাইপ ধরে নামতে বলছেন, যদি পড়ে যায় ? যদি কেন ? ও যাবেই পড়ে, তখন ?’

—‘যাব্বাবা, পড়ে যাবার জন্যেই তো ওকে নামাচ্ছি।’

—‘বা চমৎকার ! এই আপনাদের শহুরে কালচার ? আমি এক্ষুনি থানায় যাচ্ছি।’

—‘যাও, যাও, প্রাণ যদি তাই চায় তো যাও।’

—‘তার মানে ? আপনাদের প্রাণে ভয়-ডরও নেই ?’

‘ভয় কিসের ? নিজেই চড়ল ছাদে। কত করে বললুম ন্যাড়া ছাদ, এখনও পাঁচিল ওঠেনি। উঠিসনি, উঠিসনি। শুনল না। চড়ে নিজে নিজেই শূন্যে ঝাঁপ খেল। পাখি হতে সাধ গিয়েছিল বোধহয়। পাখি হয়ে কলকাতাতে যে কচি প্রিয়াকে ফেলে এয়েচে তারই কাছে যেতে যাচ্ছিল বেচারা। কেস একেবারে সিধে সরল। যাকে জিজ্ঞেস করবে সাক্ষী দিয়ে দেবে। —খুদ খুশি কর লিয়া হ্যায় ইয়ে বেচারা।’

—‘কি করলে ছাড়বেন ওকে ?’ বলতে বলতে ছেলেটি এসে হ্যাঁচকা টানে সুরম্যকে ছাদের কোণ থেকে রাক্ষসগুলোর মাঝখানে ফেলে দিল। সুরম্যর পুরোপুরি জ্ঞান নেই। স্বপ্নে দেখার মতো দেখল রেনওয়াটার পাইপ বেয়ে দেখতে দেখতে ছেলেটা অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েকজন রাক্ষস নিচে ছুটেছে—‘আশিস আশিস, কি ডেঞ্জারাস ছেলে ! তোরা শিগগিরই দোতলার বারান্দায় পজিশন নে।’

—‘প্রিয়াঙ্কুর তুমি তেতলায় চলে যাও। আর কেউ নেই জোরালো চেহারার ?’ রাক্ষসের দলে ভীষণ চঞ্চলতা, ত্রাস, সাড়া পড়ে গেছে।

প্রায় মাঝ রাত্তির, তারা জ্বলজ্বল করছে কালো কুচকুচে আকাশে। হস্টেলের পেছনে ঘাসের ওপর বহাল তবিয়তে দণ্ডায়মান সেই ছেলেটি কান্তিময়। তাকে ঘিরে সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ারের দাদারা।

‘আরে বাস। শাবাশ ভাই। শাব্বাশ। ফর দা অ্যাক্ট অ্যান্ড দা স্পিরিট !’

—‘আমাদের একটু সময় দিলে না ভাই ! কী যেন নাম বললে ? কান্তি ? এই, কান্তিতে

একটা ট্রীট দে। সুরম্যকেও ইনক্লুড কর। সুরম্য, লেটস বী ফ্রেন্ডস। শেক হ্যান্ডস। থ্রী চিয়ার্স ফর কান্তি উপাধ্যায় হিপ হিপ হুররে। থ্রী চিয়ার্স ফর সুরম্য ঘোষাল হিপ হিপ হুর রে।

প্রোসেশন করে ডর্মে নিয়ে আসা হল কান্তি আর সুরম্যকে। সুরম্যর পরনে তখনও খালি জাঙিয়া। প্রিয়াঙ্কুরদা বলল—'ছি ছি সুরম্য, তুমি না বালিগঞ্জে মানুষ! এতগুলি দাদার মাঝখানে এই বেশে দেখা দিতে লজ্জা করল না তোমার? ছি, ছি ভাই। শত ধিক্কার তোমাকে।'

জনকদা বলল—'ধরো আমরা যদি কেউ মেয়ে হতাম? ওমা, কী লজ্জা গো!' বেডকভারের খুঁট মাথায় চাপিয়ে মুহূর্তে জনকদা ঘোমটা-দেওয়া-বউ হয়ে পেছন ফিরে দাঁড়াল ত্রিভঙ্গ হয়ে।

চারদিক থেকে অমনি জামা-কাপড় বর্ষণ হতে লাগল সুরম্যর মাথায়। বর্ষণ হয় আর দাদারা বলে—'পরে নে সুরম্য, দেরি করলেই চাঁটা।' মিনিট পাঁচেক পরে সুরম্যর সাজগোজ শেষ হল। প্যান্ট ফোর্থ ইয়ারের নিমাইদার যার কোমরের মাপ জলহস্তীর, শার্ট গিদওয়ানিদার, হাতাগুলো সুরম্যর হাত থেকে আরও এক ফুট মতো ঝুলছে, জুতো প্রিয়াঙ্কুরদার, সাইজ এগারো, সবাই বলে ইয়েতির পা, মোজাও তথৈবচ, তার ওপরে কোথা থেকে এক খুন-খারাপি রঙের টাই আর খোকাবাবুর মাপের স্ট্র-হ্যাটও হাজির হল।

মাঝরাতের ডিনারটা ভালোই হল। বাসমতীর ভাতের মধ্যে রুটির কুচো, লুচির কুচো, কড়াইশুঁটি, আলু গাজর, বাঁধাকপি, পালংশাক, স্কোয়াশ, টোম্যাটো স-ব। মুখে তুলতে তুলতে জনকদা বললে—'হরি হে মা-ধব, চান করব না গা ধোব? কে রেঁধেছ মানিক, ছুপকে ছুপকে না থেকে আমার নাকের গোড়ায় একটু এসে দাঁড়াও না বাবা, এ যে বিশ্বরূপের খাদ্য সংস্করণ রে শালা।'

গিদওয়ানিদা ভাঙা ভাঙা গলায় বলল—'শালা, বাঞ্চোৎ, হুজ্জোৎ, ইজ্জৎ, কেলো, ব্যাটাচ্ছেলে, শুয়ার কী বাচ্চা, খচ্চর, গিদ্‌ধড় আউর কুছ্ বাংলা গালি আছে?'

'আছে বই কি রে। একখানা আস্ত গালাগালাই যে বাকি রেখে দিলি ব্রাদার—'এলাটিং, বেলাটিং সই লো, কী খবর আইল, রাজা একটি বালক চাইল' বলতে বলতে সুরম্যকে নিয়ে মাঝরাতে সে কী হুজ্জোতি রে বাবা!

সুরম্য চিঠিখানাকে যথাযথ ভাঁজ করে লেফাফায় পুরলেন। তিরিশ বছর আগেকার উত্তেজনায়, উষ্ণতায়, বন্ধুত্বে হাত থরথর করে কাঁপছে। হরিহরাত্মা। তিনি হরি, কান্তি হর। তিনি ক্ষীণকটি, গৌরাঙ্গ, শ্রীমান। কান্তি লম্বা, চওড়া, কালো। মুখে নিখাদ প্রশান্তি, বুদ্ধি, ভালোমানুষি। ভালো মানুষ। কান্তিময় উপাধ্যায়। না তিনি যাবেন। অবশ্যই যাবেন।

তখন ওঁরা বলতেন হিজলি। হিজলি জেলে কয়েকজন রাজবন্দীকে গুলি করে মারা হয়েছিল। প্রতিবাদে আরও কিছু রাজবন্দী অনশন আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। সেই হিজলি জেলভবনই খড়্গপুরের প্রথম ইন্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অফ টেকনলজি। দূর থেকে টাওয়ারটা দেখা যেত। খড়্গপুর রেল কলোনি পেছনে ফেলে হিজলি যেতে কখনও পথের ডাইনে, কখনও বাঁয়ে, কখনও দু দিকেই বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে খোয়াই। লাল লাল হাঁ করা খোঁদল। গাছপালা ছেড়ে তৃণ পর্যন্ত নেই একটুকরোও। জায়গাটার একটা ভীষণ সৌন্দর্য আছে। সূর্যাস্তের রঙের সঙ্গে খোয়াইয়ের রঙ মিলে গেছে। এমনিতে সূর্যাস্তের রঙে যে রাঙা, গোলাপি, কমলা আভা

থেকে তাকে নম্র, পেলব রকমের সুন্দর করে এই খোয়াইয়ের সংস্পর্শে এসে সে রঙ কেমন পালটে গেছে। যেন যুদ্ধক্ষেত্র, শোণিতস্রোত। কলিঙ্গ যুদ্ধ হয়ে গেছে। শবদেহগুলি এই সব খোঁদলের আশ্রয়ে লুকিয়েছে। ধৌলিশৃঙ্গ থেকে অশোক দেখছেন রক্ত রক্ত রক্ত। সব রক্ত এখন শুকিয়ে কালচে হয়ে আসছে। সাইকেল রিকশায় করে বাবার সঙ্গে সেই পথ দিয়ে স্বপ্নে দেখা উচ্চাশামহল খড়্গপুর আই আই টি-তে আসা হয়েছিল। সেই স্মৃতির হাত ধরে যাবেন বলে কান্তিকে টেলিগ্রাম করেননি। একা যাবেন। একা একা।

বাবা বলছেন—'কি রে খোকা, এখনও ভেবে দ্যাখ, থাকতে পারবি তো ? না হলে এখনও বল ফিরে যাই। ন্যাশনাল মেডিকেলে অ্যাডমিশন নিয়ে নিবি। বাড়ি থেকে কলেজ যাবি আসবি। তোর মাও নিশ্চিন্ত। তুইও।'

—'আমি যাবো বাবা। আই আই টি-তে পড়ব। মেডিক্যাল পড়ব না। ডেডবডিতে সেকশন করতে হবে ভাবলে আমার ভীষণ গা গুলোয় বাবা।'

—'সে তো জানি। ওসব সয়ে যায় রে। সয়ে যায়।'

—'না আমি এঞ্জিনিয়ার হবো।'

—'সে তো অনেক দিন ধরে শুনছি। টিকতে পারবি তো ? শুনেছি ভীষণ র‍্যাগিং করে। সইতে না পেরে ফিরে এলে খুব অসুবিধে হবে রে!'

ভাবলে এখনও হাসি পায়। কেউ আদেশ করেনি। সুরম্য নিজে নিজেই বাবাকে চিঠি লিখেছিল—'শ্রীচরণেষু বাবা, তুমি মিথ্যে ভয় পেয়েছিলে। শীতের রাত্তিরে খালি গায়ে দাঁড় করিয়ে রাখা ছাড়া আর কোনরকম অত্যাচার ওরা করেনি। উপরন্তু আমার সিনিয়র ছেলেদের সবার সঙ্গে এতো ভাব হয়ে গেছে যে মনে হচ্ছে পড়াশোনার জন্য সব ক্লাসে না গেলেও চলবে। অবশ্য তুমি ভেবো না আমি লেকচার ফাঁকি দেবো। ওয়ার্কশপ খুব ভালো লাগছে। বাঁবা, এবার তুমি এলে কান্তিময়ের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেবো। আমার বিশেষ বন্ধু।'

কান্তিময়, কান্তিময়, কান্তি : মুখে সিগার, ঢিলে-ঢালা একটা পায়জামা আর ধবধবে পাঞ্জাবি পরা দশাসই চেহারার কান্তি এগিয়ে আসছে লনের মাঝখানে সিঁথির মতো পথটা দিয়ে। পথের পাশে মেহেদির বেড়া, দূরে ঝাউয়ের সারি। কান্তি আসছে। চুলে সামান্য সাদা ছোপ, চোখে সেই ভাবালু দৃষ্টি, সেই তীরের মতো হাঁটা।

রিকশা থেকে নামছেন সুরম্য। স্যুটকেস ঠিক নয়, ওভারনাইট ব্যাগের মতো তাঁর লাগেজটা কান্তি রিকশাওয়ালার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নিচ্ছেন। অন্য হাতে ঠোঁট থেকে সিগার নামিয়ে কান্তি অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন। এক সেকেন্ড। পরক্ষণেই মুখ ফেটে যাচ্ছে, চৌচির হয়ে যাচ্ছে হাসিতে।

—'সুরম্য, সুরম্য পাগলাটা! এসে গেছিস! আমাকে তো জানালি না কিছু। ভাবছিলুম হয়ত আসবিই না। ভারি অবাক করে দিলি তো। ভারি দুষ্টু হয়ে গেছিস তো আজকাল!'

—'জানাবার কী আছে ? আছেটা কী ? এক আধবুড়ো আর এক আধবুড়োর কাছে আসছে। এঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির ডীনের বাড়ি বললে কেউ চিনিয়ে দিতে পারবে না ? ঠিকানা মিলিয়ে না হয় না-ই আসতে পারলুম।'

—'আরে ঠিক আছে। ঠিক আছে। বেশ করেছিস। আয়, আয়। যুগল! এই যুগল, ইধর আও। মেরা দোস্ত। বুঝলি ? জিগরি দোস্ত। দুজনের লাঞ্চ দিবি ব্যাটা।

ঠেসে পুর ভরবি তোর টোম্যাটোর দোরমায়। ঠেসে ঠেসে। হ্যাঁরে সুরম্য। সেই পাতলা পাগলা-পাগলা ভাবটা তো তোর একদম নেই! পাঁচ ছটা বছর টিকিয়ে রাখতে পারলি, আর...।'

—'তুই কি এখনও ডন বৈঠক দিস নাকি? মুগুর-টুগুর ভাঁজিস?' একটু হাঁপ ধরে আজকাল সুরম্যর। সাবধানে থেমে থেমে বললেন।

—'মুগুর না ভাঁজলে এই সব হাড়-বিচ্ছু আই আই টি-র মালদের সামলানো যায়? তু-ই বল না, তোর তো এক্সপিরিয়েন্স আছে। কারিয়া পিরেত বা হয়ে যাচ্ছিলি তো আরেকটু হলে...'

দুজনেই হাসতে থাকলেন।

কান্তিময় বিয়ে করেননি। এমন সুন্দর বাড়িখানাকে তছনছ করে রেখেছে যুগলকিশোর আর তার মনিব। বড় হলঘর ভর্তি কান্তিময়ের কম্প্যুটারের কাণ্ডকারখানা, কম্প্যুটার-বাগিং তিনি নাকি বন্ধ করবেনই। শোবার ঘরে বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবল। কাচে সূক্ষ্ম লাল ধুলোর আস্তর। তার ওপর ফাইলের পাহাড়। বইয়ের পাহাড়, খোলা পেন, ব্লটারে প্রচুর কালি শুকিয়ে রয়েছে। বিছানার চাদর পালটানো হয়নি কতদিন, তার ওপরও বই, ম্যাগাজিন, কান্তির কোট, প্যান্ট পাতলুন।

ঘরে ঢুকে কান্তি এক হাড়-কাঁপানো ডাক দিলেন—'যোগলো। এই ব্যাটা যুগলকিশোর!'

—'কি সাহেব', যুগলকিশোর এসে দাঁড়িয়েছে।

—'আবার সা-হেব! না রে সুরম্য আমি ওকে মোটেই সাহেব-টাহেব ডাকতে শেখাইনি। নিজে-নিজেই পিক-আপ করেছে। হ্যাঁ রে গো-খোর, এত কিছু পিক-আপ করতে পারিস আর এই বিছানা থেকে জামা-কাপড়গুলো পিক-আপ করতে পারিস না। অ্যাঁ! এ যে একেবারে কাপড়ের এগজিবিশন সাজিয়ে রেখেছিস? বলি, মানুষ বসবেই বা কোথায় আর শোবেটাই বা কোথায়? তোমার মাথায়?'

চেয়ারের দিকে এগোলেন কান্তি। সেখানে আর এক পাঁজা বই। যুগলকিশোর তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বইগুলো দু'হাতে ধরল, সুরম্যর দিকে তাকিয়ে বলল—'জানেন না সাহেব, আমার এ সাহেব মহা ধুর্তু আছেন। নিজেই আমাকে বলবেন—"খবর্দারি, আমার জিনিসে হাত দিবি না, একটা কাগজ এধার থেকে ওধার করলে ব্যাটা তোমার আমি পিঠের ছাল তুলে নেবো।" এই তো? তারপর বাড়িতে লোক এলেই আমার ওপর ত্যাগুাই ম্যাগুাই। অতিথ চলে গেলে আমারই লাভ। সাহেবই দু-দশ টাকার নোট হাতে ধরিয়ে দেবেন। "রসগোল্লা খাস যুগল"। আমারই ভালো।'

মারমুখী হয়ে যুগলের দিকে দু'পা তেড়ে গেলেন কান্তি।

—'আমায় তুমি ধূর্ত বলো!, তুমি নিজে কী? তুমি ব্যাটা বদমাশ, তোমার সঙ্গে আমি বুদ্ধিতে আঁটিব? সুরম্য খুব সাবধান, টাকা-পয়সা না হোক মারে রে, লাল হয়ে গেল ব্যাটাচ্ছেলে আমার টাকা মেরে মেরে। আমার মেরে আবার আমাকেই কথা শোনাবে। টাকা-পয়সা ঠিক করে রাখতে পারেন না তো রোজগার করা কেন?"

সুরম্য কান্তির হাতের মোটা বইখানা ধরে ফেললেন। বইটা তিনি যুগলের মাথা টিপ করে ছুঁড়তে যাচ্ছিলেন।

—'আরে আরে করিস কী কান্তি? যুগল, তুমি এখন যাও তো বাবা, ভালো করে রান্নাটা করো, আমার খুব খিদে পেয়ে গেছে।' যুগল চলে গেল, গজগজ করতে করতে

গেল—'আপনি ধরলেন কেন বইটা ? যুগলও লুফতে জানে। সরতে জানে। মেঝেয় পড়লে অমন বইগুলো চৌচির হয়ে যাবে বলেই না লোফা।' সুরম্য অবাক হয়ে লক্ষ করলেন তিনি কাজের লোকের সঙ্গে অনায়াসে কেমন কথা বলে ফেললেন। এটা তাঁর অভ্যাসের মধ্যেই নেই। প্রথমত তাঁর বাড়ির কাজ করে সব মেয়ে লোক। তেলেঙ্গি মেয়ে সব। তাদের কল্যাণীই সামলান। গাড়ি ধোয়া-পোঁছার যে ক্লীনারটি সে এক বিহারী যুবক। তাকে সম্বোধন করে সামান্য কতকগুলো শব্দ, তার বেশির ভাগ অব্যয়, তাঁকে উচ্চারণ করতেই হয়। এ বাদে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলতে তিনি আদৌ অভ্যস্ত নন। তিনি আরও অবাক হয়ে দেখলেন যে কখন কান্তির সঙ্গে হাত লাগিয়ে বিছানার ওপরটা, চেয়ার, সব খালি করে ফেলেছেন। বইতে বইতে টেবিলটা ছোটখাটো একটা পাহাড়ের আকৃতি নিয়েছে। দু'হাত ঝেড়ে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে কান্তিময় বললেন—'বাঁচা গেল বাব্বা ; সাত সকালে বিছানা ঝাড়ো, চেয়ার ঝাড়ো, বই ঝাড়ো, কাজ কি কম ? এই সুরম্য, বিছানার চাদরটা টান মেরে ফেলে দে তো ! চিটচিটে ময়লা রে, শুতে ঘেন্না করে, বালিশের ওয়াড়টাও দিয়ে দিবি ওই সঙ্গে। ন্যাড়া বোঁচা বিছানা থাকলে যদি ব্যাটাচ্ছেলের চৈতন্য হয়, যদি ফ্রেশ চাদর ওয়াড় পাই। সবই তো দয়াময়ের দয়া কিনা !'

কনভোকেশন হয়ে গেছে। হিজলির রাস্তা দিয়ে দলে দলে ডিগ্রিপ্রাপ্ত প্রযুক্তিবিদ্‌রা চলে গেছে। হাতে ছাড়পত্র। ভারতবর্ষের যে কোনও এক নম্বর প্রতিষ্ঠানে সবচেয়ে বেশি মর্যাদার পদলাভের ছাড়পত্র। এদের মধ্যে চার ভাগের এক ভাগ শেষ পর্যন্ত চলে যাবে বিদেশে। আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্স, মধ্যপ্রাচ্য। দু'দিন ধরে সন্ধেবেলায় ঘুরে ঘুরে সুরম্য দেখেছেন বন কেটে সেই বসত যা তাঁরা সদ্য এসে দেখেছিলেন, তা এখন কেমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কলোনি শহরই হয়ে গেছে। কলেজ বিল্ডিং-এর শাখাপ্রশাখা, ছাত্রদের হস্টেল, ছাত্রীদের হস্টেল, রাস্তাঘাট, বিভিন্ন টাইপের কোয়ার্টার্স হ্যালোজেন-জ্বলা রাতে আলোর গায়ে লেপটে-থাকা রাতপোকা। ন'টা নাগাদ যুগলকিশোর খাবার দিয়ে দিল। খেয়ে-দেয়ে কান্তিময় বললেন—'চল পাগলা, বেড়িয়ে আসি। কালই তো চলে যাবি।'

যুগল বল—'সেই ভালো সাহেব, আপনারা একটু বাইরে গেলে বিছানা টিছানা একটু গুচ্ছে-গাচ্ছে রাখতেও আমার সুবিধে হয়।'

কান্তি বললেন—'নোটিস দিল রে। ঘরের বউও এমনটা দ্যায় না। এমন মাল আর দেখেছিস ?'

সুরম্য বললেন—'চল, আজ আমাদের পুরনো ফেভারিট জায়গাগুলো ঘুরব, বসে থাকবো। যদিও সেসব জায়গা এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা বলা শক্ত।'

কান্তি বললেন 'যেতো না, তুই চিনতে পারতিস না। আমি মাঝের পাঁচ বছর পশ্চিম জার্মানিতে বাদে টানা রয়ে গেছি এখানে, আমি জানি। আমি বলে দিতে পারি। চল।'

গায়ে সোয়েটার। তার ওপর শাল জড়িয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়লেন। 'চিনতে পারছিস জায়গাটা ?'

—'একেবারেই নয়। কোনও ল্যান্ডমার্ক আছে ?'

—'আছে, তবে সেটা এখনই বলছি না। এটা হল সেই ধূধূ তেপান্তরের মাঠ যার ওদিকে সে সময়ে উদ্বাস্তু কলোনি বসেছিল।'

—'সেই মাঠের এই চেহারা হয়েছে ? বলিস কী ? মাঠ বলে যে আর চেনাই যায় না !'

—'সেই মাঠের এই চেহারাই হয়েছে। ল্যান্ডমার্ক হল ওই বট-অশত্থ, দুটো গাছ

একসঙ্গে একই স্পট থেকে বেরিয়েছে। মনে পড়ছে ? দ্যাখ !'

সুরম্য ভালো করে দেখলেন গাছ দুটো। অন্ধকারেও ভিন্ন ভিন্ন পাতার গড়ন বোঝা যাচ্ছে। বট একদম জমাট অন্ধকার। কিন্তু অশত্থের পাতা দুলছে। ফাঁক দিয়ে দিয়ে আকাশের আলো গলে পড়ছে। বললেন—'ঠিকই। সেই গাছ। এখন মনে হচ্ছে এর অন্ধিসন্ধি চিনি আমি। ঠিক এর ধারে ছিল ফিজিক্সের ডেমনস্ট্রেটর উধম সিংজীর কোয়ার্টার্স। পাজি ছেলেরা ওঁর নাম দিয়েছিল উদোম সিং, তোর মনে আছে ? কোয়ার্টার্সটা এইচ-টাইপ। ওঁর স্ত্রী সব সময়ে একটা সেমিজ পরে থাকতেন। আঁটসাঁট মোটা, যখনই দেখা হত 'এ কিষণ' বলতে বলতে বাগান পেরিয়ে রাস্তায় জঞ্জাল ফেলতে চলে যেতেন। আমরা চোখ তুলে তাকাতে পারতুম না।'

কান্তি বললেন—'ইয়া। এবং ওঁদের কিষণ ছাড়াও একটি মেয়ে ছিল। প্রাণচঞ্চল, সুন্দর। তুই তাকে দেখলেই সে সময়ের একটা পপুলার গান গাইতিস—বনময়ূরের নাচ দেখতে যাবো ; মনে আছে ? মেয়েটা বেড়া ধরে সামনে পেছনে দুলত আর হাসত !'

—'খুব মনে আছে,' সুরম্য হাসি হাসি মুখে বললেন।

—'শুনলে আশ্চর্য হোস না, সেই মেয়েটি সন্তোষ এখন এখানকারই এক লেকচারারের স্ত্রী। ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টেরই। মোটা যা হয়েছে, ইয়া খাড়াই, ইয়া ছাতি, তোর সাধারণ ফিতেতে কুলোবে না।'

—'বলিস কী ? বনময়ূরী আর বনময়ূরী নেই ?'

—বনময়ূরী ছেড়ে, বনমুরগী, বন-হরিণী, বন-বাঘিনী কিছুই নেই। নিতান্ত এক ঘরপোষা দুধেল গাই-গরু বনে গিয়েছে। এমনিই পৃথিবীটার অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সের ধরনধারণ রে পাগলা !'

বলতে বলতে কালভার্টের ওপর বসলেন কান্তিময়। পাশে বসতে বসতে সুরম্য বললেন—'তুই কি আমার মতন হাঁপিয়ে গেলি নাকি রে ?'

—'উঁহু। হাঁপাতে আমার এখনও দেবি আছে। একটু বসাই যাক না। একটু বসলেই বুঝতে পারবি ঠিক এইখানটায় আমরা বসতে ভালোবাসতুম। সাইকেল দুটো ও-ই গাছটার গায়ে ঠেসানো থাকত। আমরা বসতুম যেন ঘোড়া থেকে নেমে রাজপুত্তুর। মন্ত্রীপুত্তুর।'

বেশ শীতের রাত। চারদিক শুনশান। পাতাটি কাঁপছে না কোথাও। পৃথিবীর যেন কেমন ঘোর লেগে গিয়েছে। নক্ষত্র দেখতে ওপর দিকে চাইতে হয় না। তারা গোল হয়ে ঘিরে ধরেছে দুজনকে। অগণ্য তারা, তারামণ্ডল, ক্যাসিওপিয়া কালপুরুষ, লঘু সপ্তর্ষি, পারসিউস। রাজপুত্তুর, মন্ত্রীপুত্তুর। অনেক অনেক ক্ষণ পরে সুরম্য বললেন।

—'কিসের গন্ধ রে ? কী ফুল ?' যেন ঘুম ভাঙা স্বর।

—'পাচ্ছিস ? পাচ্ছিস তা হলে ?' চাপা উত্তেজনা কান্তিময়ের গলায়।

—'পাচ্ছি। পাচ্ছি। কী ফুলের গন্ধ বল তো ?'

—'ফুল নয় ফুল নয় রে সুরম্য, এ সময়ে ঘর সাজানো রঙিন ফুল ছাড়া আর কী পাবি, বল ? এ হল মউল আর শাল, ছাতিম আর বকুল গাছের শরীরের গন্ধ, অন্তত আমার তাই ধারণা। গত তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর, তারও অনেক অনেক বেশি কতকগুলো ভীষণ ব্যক্তিত্বশালী, অহঙ্কারী গাছ এই রাস্তার আশেপাশে, কোণে-টোনে কোথাও নিজেদের অস্তিত্ব সদর্পে টিকিয়ে রেখেছে রে পাগলা। সেই এক গাছ, এক গন্ধ যা আমরা ছাত্রকালে পেতুম। সেই এক। মনে কর সুরম্য কী আশ্চর্য ! কী পরমাশ্চর্য ! এই সব ইঁট কাঠ,

রাস্তাঘাট বদলে গেছে, মানুষজন, আমরা যারা যৌবন বাউল ছিলুম কাঁচা বয়সের, তারা এখন পরিপক্ক প্রৌঢ়, তোর মাথায় টাক আমার রগে সাদার ছিট, তোর পেটে ভুঁড়ি, আমার পায়ে কড়া। দ্যাখ তবু সেই এক গাছ, এক বৃক্ষগুচ্ছ, একই গন্ধ সুরম্য, সেই একই গন্ধ। কিছু কি অনুভব করছিস ? কিছু কি মনে পড়ছে ? মনে পড়ে ? এখন ? এইখানে ? এমনি করে ?'

মন্ত্রমোহিতের মতো সুরম্য বললেন—'পড়ে কান্তি। পড়ছে। পঁচিশ বছর আগে কনভোকেশনের পর এখানে এই কালভার্টে তুই আর আমি। আমি আর তুই।'

—'আর এই অন্ধকার। এই গাছ। এই গন্ধ।'

—'এই গাছ। এই গন্ধ কান্তি, এই-ই গন্ধ।'

—'মনে আছে আমরা সেদিন কিরকম যেন হয়ে গিয়েছিলুম--' কান্তি বললেন।

—'স্পষ্ট মনে পড়ছে আমার,' সুরম্য বললেন—'কান্তি তুই রুদ্ধ গলায় বলছিলি, "সুরম্য, বন্দরের কাল শেষ হল রে। এবার আমরা এক একজন এক এক দিকে পাল তুলে ভেসে পড়ব।" আমি বললুম—'জাহাজ আবার পুরনো বন্দরে ভেড়ে, ফিরে আসে। কান্তি আমরা কোনদিন এ বন্দরে ভিড়ব না। ফিরব না।"

কান্তিময় বললেন—'আমি বললুম—"সুরম্য কথাটা খুব মেয়েলি শোনাচ্ছে কিন্তু আমি তোকে ছেড়ে থাকব কী করে ? আমার এই আসল বড় হওয়ার কাল, বালক থেকে যুবক। আর কেউ নয়, তুই, তুই-ই থেকেছিস আমার পাশে। দেখেছিস আমার সব দুঃসহ ঘাম দেওয়া কষ্ট, আমার সব শির ছেঁড়া দপদপে আনন্দ। কেউ জানে না, শুধু তুই জানিস। আমি চিন্তাই করতে পারছি না কী ভাবে আমি তোকে ছেড়ে...'

সুরম্য বললেন—'আজ বলছি, সেদিন তোকে বুঝতে দিইনি। আমি ভেতরে ভেতরে ঠিক এই একই কারণে কাঁদছিলুম। কাঁদছিলুম রে কান্তি। অথচ আমি পুরুষ, আই আই টি-র কঠিন বছরগুলো আমাকে অনম্র পুরুষ করে গড়েছে, তাই সে কান্না দেখানো যায় না। প্রেমিকাকে ছেড়ে চলে যেতে হলে যে দুঃসহ যাতনা হয়, সেই যাতনা তখন আমার মনে।'

কান্তি বললেন—'আমারও মনে। জানি কোনমতেই প্রকাশ করতে পারব না। লোকে ভুল বুঝবে। ভুল ব্যাখ্যা দেবে। অথচ একজন যুবক ছাড়া আর একজন সদ্য যুবককে কেউ বুঝতে পারে না। বোঝার কথা না। সুরম্য সেদিন কি আমরা আবেগের মাথায় কোনও প্রতিজ্ঞা করেছিলুম ?'

—'না রে কান্তি,' সুরম্য বললেন—'প্রতিজ্ঞা করার পক্ষে, প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পক্ষে অনেক পরিণতমনস্ক, প্রাজ্ঞ, আমরা হয়ে গিয়েছিলুম। আমাদের প্রাজ্ঞ মন আবেগকে সারাক্ষণ বলছিল—"স্থিরো ভব। স্থিরো ভব। এই কাঁচামি ভালো না।" তাই দুজনের একজনও অন্যজনকে কোনও প্রতিশ্রুতি দিইনি।'

—'কিন্তু মনে মনে ? মনে মনেও কি না ?'

—'তা নয়। মনে মনে আমরা অবিরাম প্রতিজ্ঞা করছিলুম এই ক'বছরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বৃথা হতে দেবো না। এই অনুপম বন্ধুত্ব নষ্ট হতে দেবো না। এই বিদ্যা ব্যর্থ হতে দেবো না। আমি কি ঠিক বলছি ?'

—'ঠিকই বলছিস রে রাজপুত্তুর, একদম ঠিক। তোর কি মনে আছে সেই সময়ে, ঠিক সেই সময়ে যখন আমরা আসন্ন বিচ্ছেদে ভারাক্রান্ত দুটি বিভ্রান্ত হৃদয় তখন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল !' সুরম্য বললেন, গাঢ় গম্ভীর স্বরে বললেন—'এতো মনে আছে, আর এই

চূড়ান্ত ঘটনাটা, ক্লাইম্যাকসটা মনে থাকবে না ? আমরা মৃদু গলায় কথা বলছি। আমাদের ডান দিকে যেখানে এখন প্রফেসরদের কোয়ার্টার্স, দূরে কিছু প্রাইভেট বাড়িও উঠেছে, ওইখানে ছিল তখন সালোয়ার জঙ্গল। বেশ ভালো জঙ্গল। রাতেরবেলায় শেয়াল ডাকত। সেই জঙ্গলের মধ্যে থেকে হঠাৎ মেয়েলি গলার, খুব মৃদু, মধুর মেয়েলি গলার একটা কান্না উঠল। আমরা দুজনেই সটান উঠে দাঁড়িয়েছি। তীরবেগে ছুটে যাচ্ছি।'

কান্তি বললেন—'দু হাতে গাছের ডাল, ছোট ছোট ঝোপ সরাতে সরাতে এগোচ্ছি। তোর শার্টের কাঁধ ছিঁড়ে গেল, আমার চাদর কাঁটায় আটকে যাচ্ছে। মুখে দুজনেই বলছি কে ? কে ওখানে ? কে কাঁদলে, সাড়া দাও।'

সুরম্য বললেন—'আমি বলছিলুম—"ভয় নেই, আমি আছি। আসছি।" দেখলুম একটা বিরাট গাছ। শিরিষ কি তেঁতুল হবে। রাতের অন্ধকারে ভালো করে চেনা যাচ্ছে না। তার তলায় সাদা কালো ছিট-ছিট শাড়ি পরে একটি মেয়ে পড়ে আছে, যেন হতচেতন।

কান্তি বললেন—'দুজনেই দৌড়লুম। পড়ি-মরি করে। তারপর ?'

—'তারপর দেখলুম গাছতলায় শুধু একটা ছায়া পড়ে আছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুরম্য চুপ করলেন।

অনেকক্ষণ পর কান্তিময় বললেন—'নিজেদের তখন যতই প্রাজ্ঞ মনে করি এখনকার তুলনায় তখন তো বালকই ছিলুম। এই ঘটনাটার সঠিক ব্যাখ্যা দেবার পরিপক্কতা আজ হয়েছে। তুই এটার কী ব্যাখ্যা দিস সুরম্য ?'

—'প্রাকৃতিক ঘটনা। মানসিক আবেগের ফলে একটা ভুল, ভ্রান্তি, ভ্রান্তদর্শন, ভ্রান্ত শ্রুতি এ ছাড়া কি ?' সুরম্য বললেন।

—'আর কিছু নয় ?' কান্তি বললেন—'প্রকৃতি হয়ত হাওয়া তুলেছিল, ডালপালার মধ্য দিয়ে তাকে বইয়েও ছিল, প্রকৃতি হয়ত ছায়া ফেলেছিল, কিন্তু দুজনেরই এক ভুল হল কী করে ? কেন ? তার কারণ আমাদের মনে। সেই কান্না, সেই ছায়াময়ী সে আমাদের মনস্তত্ত্বের একটা সূত্র। আয় আজ তার ব্যাখ্যা করি। তুই চেষ্টা কর প্রথমে।'

সুরম্য বললেন—'কান্তি আমরা তখন জীবনের একটা সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছি। বৃহত্তর জীবন আমাদের ডাকছে। সমস্ত দেহমন দিয়ে আমরা এই জীবনের টান অনুভব করতে পারছি। নদী যেমন অনুভব করে সমুদ্রের টান। কিন্তু সেই জীবন অজানা, অজানা বলেই যেমন আকর্ষক তেমন রোমাঞ্চক। ওই কান্না, নারীকণ্ঠের কান্না, আমাদের সাড়া, ছুটে যাওয়া এবং নারীমূর্তি দেখা সবই সেই ভয় ও আকর্ষণের মিশ্র প্রতিফলন হতে পারে।'

কান্তি বললেন—'তুই তা হলে বলছিস ওই নারীমূর্তি বৃহত্তর জীবনের প্রতীক ? বিপন্ন জীবনের ডাকে সাড়া দিয়ে আমরা ছুটে গিয়েছিলুম ! ভালো, ভালো সুরম্য, হতে পারে। আমি সঠিক জানি না, কিন্তু হতে পারে।'

সুরম্য বললেন—'তোর যেন ব্যাখ্যাটা পছন্দ হল না মনে হচ্ছে ? তুই যেন ঠিক স্যাটসফায়েড নোস। তোরও নিশ্চয় তা হলে একটা আলাদা ব্যাখ্যা আছে।'

—'আছে রে পাগলা আছে। তোর ব্যাখ্যাটার থেকে আরও অনেক সাকার, সাবয়ব সে ব্যাখ্যা। তুই শহরের ছেলে ছিলি। বরাবর সাহেবি ইস্কুলে পড়েছিস। তার ওপরে বাবা অধ্যাপক, মা অধ্যাপিকা। তোর চিন্তাধারায় দার্শনিকতা বরাবর ছিল। আমি দ্যাখ গাঁইয়া। বর্ধমানের গণ্ডগ্রামে আমার বাড়ি। সাত মাইল জঙ্গুলে পথ ঠেঙিয়ে জেলা স্কুলে

পড়েছি। প্রাণ কণ্ঠাগত করে স্কলারশিপ জোগাড় করেছি, আই আই টি-তে জায়গা করে নেওয়ার জন্যে আমায় অনেক দাম দিতে হয়েছে। আমার কাছে এই সব আকাশ মাটি গাছপালা কবিতা নয়, এসব বায়োস্ফিয়ার। ওই অদ্ভুত, অলৌকিক ঘটনাটারও আমার কাছে আরও স্পষ্ট, শরীরী ব্যাখ্যা আছে।'

সুরম্য আগ্রহে সোজা হয়ে বসলেন। কান্তি বললেন—'সুরম্য, তোর মনে আছে বনময়ূরীদের কোয়ার্টার্স যে রাস্তায় তার সমান্তরাল আরেকটা রাস্তায় আমরা অনেক সন্ধেবেলায় বেহালা শুনতে যেতুম !'

সুরম্য বললেন—'মনে আছে। বেহালার ভাঙা ভাঙা গলায় কর্ণাটকী মার্গ সঙ্গীত।'

কান্তিময় বললেন—'আহা, সে যে কী অপূর্ব ! কী অপার্থিব ! সেখানে, সেই রাস্তাতেও এমনি বকুল, মউলের তীব্র মদগন্ধ ছিল, তার সঙ্গে মিশে সেই ঐশী আকুতি আমাদের কিভাবে আলোড়িত করত তোর মনে আছে ?'

—'আছে।'

—'তবে নিশ্চয়ই এ-ও মনে আছে বেহালা বাজাতেন ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রোফেসর রামানুজ বিনায়ক নায়ারের বোন। কেরালা থেকে সদ্য সদ্য এসেছিলেন। চট করে বাইরে বেরোতেন না। দু-এক দিন শুধু প্রফেসরের বাড়ি গিয়ে চকিতের জন্য দেখা হয়ে গিয়েছিল।'

সুরম্য বললেন—'নায়ারের স্ত্রীর কী অসম্ভব শুচিবাই ছিল তোর মনে আছে ? বড় বড় বেড-কভার, পর্দা, সোফা কভার প্রতিদিন, প্রায় প্রতিদিন কাচতেন আর বাগানময় ঝোপের ওপর মেলে মেলে শুকোতে দিতেন।'

কান্তি বলতেন, 'আমরা সেসব দেখতুম না, প্রফেসর নায়ারও ছিলেন খুব স্থূল প্রকৃতির মানুষ। তাঁকেও আমরা পছন্দ করতুম না। তবু তাঁর বাড়ি যেতুম, দুজনে যুক্তি করেই যেতুম, নায়ারের বেহালাবাদিনী বোনকে যদি কোনমতে দেখতে পাই। একদিন আমাদের কফি দিয়ে গেল মেয়েটি, সেদিন তাকে ভালো করে কাছ থেকে দেখি। তোর মনে আছে সেই প্রথম দেখা ?'

—'আছে। তবু তোর মুখে শুনি। শুনতে বড়ো ভালো লাগছে রে কান্তি।'

—'আমরা তার চোখ দেখলুম না, নাক দেখলুম না, মুখ হাত পা কিছু দেখলুম না। শুধু দেখলুম সে তার ওই বেহালাটার মতোই একহারা, ওইরকম মেহগনি রঙের। এবং ওই ভাঙা ভাঙা কর্ণাটকী সুরের মতোই সে করুণ এবং অপার্থিব। আমরা জেনেছিলুম, গোঁড়া নাম্বুদ্রি পরিবারে একমাত্র বড় ছেলেরই বিবাহ করার অধিকার আছে। বাকি সব ছেলেদের বিবাহ সিদ্ধ নয়। তাদের স্ত্রীরা বিবাহিত স্ত্রীর সামাজিক এবং শাস্ত্রীয় মর্যাদা পায় না। অন্যান্য ছেলেদের এই বিবাহ নায়ার পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে হয়। প্রফেসর নায়ারের বোন এইরকম এক বিয়ের প্রহসনকে পেছনে ফেলে পালিয়ে এসেছে দাদার কাছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে এই কুলপ্রথার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হবেই, এইরকম যেন আমরা কানাঘুসোয় শুনেছিলুম। কেন না মেয়েটির দাদার, অর্থাৎ আমাদের প্রফেসর নায়ারের এ ব্যাপারে বোনের ওপর সহানুভূতি ছিল না। তাঁর স্ত্রীর তো নয়ই। সুরম্য, আমার ধারণা আমাদের ছাত্র-জীবনের সেই অন্তিম রাত্রে অরণ্যের মধ্যে সেই কান্না, মেয়েলি কান্না, এবং গাছের ছায়াকে নারী বলে ভুল করার পেছনে ছিলেন প্রফেসর নায়ারের সেই বোন। তাকেই আমরা সেদিন অরণ্যের ছায়ায় দেখেছিলুম।'

সুরম্য বললেন—'খুবই অভিনব ব্যাখ্যা। হতে পারে কান্তি। খুবই সম্ভব।'

'তবু, তা সত্ত্বেও', কান্তি বলে চললেন—'আমরা কেউই এই মেয়েটির ব্যাপারে একটুও এগোইনি, তার কারণ ছিল, দুজনেই জানতুম আমরা উভয়েই তার প্রেমে পাগল, একজন তাকে উদ্ধার করলে সে অপরজনের কাছে মহাপাতকি বলে গণ্য হবে। আমাদের মধ্যে এই অলিখিত সমঝোতা ছিল। সেও এক রকমের প্রতিশ্রুতিই।'

সুরম্য চিন্তিত মুখে চুপ করে রইলেন। কান্তি বললেন—'আমি তোকে কোনও আদালতে প্রতিশ্রুতিভঙ্গের দায়ে সোপর্দ করতে পারব না সুরম্য। কিন্তু তুই কলকাতায় ফিরে গিয়ে সাত তাড়াতাড়ি চাকরি জোগাড় করে প্রফেসর নায়ারের বোন সাবিত্রী কল্যাণী নায়ারকে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করলি, কলকাতা ছাড়লি আমাকে এড়াতে, এটা করে তুই প্রতিশ্রুতিভঙ্গের মহাপাপ করেছিস সুরম্য। কিন্তু কী করে এটা তুই সম্ভব করলি ? তুই কি আগে থেকেই কল্যাণীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলি, আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করে ? এর তুই কী জবাব দিবি বল ?'

অনেকক্ষণ বসে আছেন, পা ধরে গেছে, সুরম্য আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন—'যোগাযোগ আমি করিনি রে কান্তি। কল্যাণীই করেছিল। সে তার নায়ার নিয়তির থেকেই শুধু মুক্তি চায়নি, তোর কাছ থেকেও মুক্তি চেয়েছিল। কল্যাণী আমাকে সমস্তই বলেছে। কিভাবে তুই তার ভোরবেলা জঙ্গলে বেড়াতে যাবার সুযোগ নিতিস। কিভাবে একদিন শেয়ালে আক্রমণ করলে তুই তাকে বাঁচিয়েছিলি কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে একা পেয়ে তুই তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে খুবই অসংযত ব্যবহার করেছিলি। কাউকে কিছু না বলবার প্রতিজ্ঞা করলেও কল্যাণী এসব কথা আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখেনি কান্তি। তোর পাছে কষ্ট হয় তাই আমি এতকাল এ সবই তোর কাছ থেকে গোপন রাখতে চেয়েছিলুম। প্রতিশ্রুতিভঙ্গ তুই-ই আগে করলি। পরে আমি তার চক্রে জড়িয়ে গেলুম।'

কান্তি দু হাতে মুখ ঢেকে বসে ছিলেন। ভাঙা গলায় বললেন, 'সুরম্য, সুরম্য, কল্যাণী আমার অসংযত আচরণটাই দেখল, তার পেছনে আমার উন্মত্ত ভালোবাসাকে দেখল না ? সুরম্য, তুই আমার কথা মনে করেও নিজেকে কল্যাণীর থেকে দূরে রাখতে পারলি না ? তুই যে আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ, সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলি! যা পেয়েছিলুম দুজনে একসঙ্গে পেয়েছিলুম, যা পেতুম না দুজনেরই না পাওয়া থেকে যেত!'

সুরম্য শান্ত, মৃদু, নম্র কণ্ঠে বললেন—'কান্তি, আমাদের সেই ছাত্রজীবনের অন্তিম রাত্রির ঘটনার যে ব্যাখ্যা তুই দিলি তা-ও যেমন সত্য, আমার দেওয়া ব্যাখ্যাটাও তেমনই সত্য। আসলে সাবিত্রী কল্যাণী নায়ার ছিল আমাদের কাছে সেই মোহানা, সেই বৃহত্তর জীবনের প্রতীক যা বিরাট, তীব্র, আকাঙ্ক্ষাময়, করুণ, আর্ত। সেই জীবন, সেই প্রার্থী ধরিত্রীকে আমরা আমাদের রক্ত দিয়ে রক্ষা করতে চেয়েছি। আমি একভাবে করেছি। কল্যাণী আমার ঘরণী হয়েছে, তাকে আমি পেয়েছি। এবং পেয়েছি বলেই অনিবার্যভাবে আস্তে আস্তে খসে গেছে তার অবয়ব থেকে সেই মোহ, সেই সুদূরতা, সেই গভীর কারুণ্য যার নিবেদন মানুষকে চিরকাল প্রাণিত, স্পন্দিত করে রাখে। আমি প্রৌঢ় হয়েছি। মাংসপেশী শিথিল হয়েছে, হাইপ্রেসার, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা, যান্ত্রিকভাবে মেপে মেপে জীবনযাপন করি। সম্পন্ন হয়েছি। কিন্তু সাধারণ। খুব সাধারণ। কান্তি, তুই জিইয়ে রেখেছিস সেই প্রাণ যা এখনও শক্তিতে টগবগ করে, সেই মন, সেই হৃদয় যা এখনও মননে অক্লান্ত, যা এখনও চাইতে পারে, এখনও জীবনের কাছ থেকে অনেক আশা করে, অনেক অনেক আশা, এখনও বেদনায় মুহ্যমান হয়, জীবনে গল্প সাজাতে পারে, ছুটে যায় একটার পর একটা শিখরে। কান্তি, আমার বিশ্বাস সেই ছায়াময়ী যার অন্য নাম জীবন

তাকে যদি কেউ পেয়ে থাকে তবে তুই-ই পেয়েছিস।'

লিখন

ব্রজকিশোরবাবু মধ্যম দৈর্ঘ্যের গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারার মানুষ। বেশ গোঁফ আছে। চাপ গোঁফ। বেশি কথাও বলেন না। আবার কম কথাও বলেন না। অর্থাৎ কারো কারো সঙ্গে বেশ কথা বলেন, কারো কারো ব্যাপারে হুঁ হাঁ করে সেরে দ্যান। আপিসে বড়বাবু ছিলেন। কোনও কোনও সমবয়সী সহকর্মী, কোনও কোনও অধস্তন ছেলে-ছোকরার সঙ্গে বেশ জমাট আলাপ ছিল। মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি থেকে এলে—'ভালো আছো তো ? জামাই বাবাজী এলো না কেন ? কাজ পড়েছে ? ভালো ভালো।' নাতি-নাতনিদের সঙ্গে 'কি দাদুভাই পড়াশোনা কেমন হচ্ছে ?' 'দিদি-ভাই একটু সকাল-সকাল করে বড় রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরবে।' গিন্নির সঙ্গে অবশ্য সম্পর্কটা একটু আলাদা রকমের। চল্লিশের আগে পর্যন্ত ব্রজকিশোরবাবু গিন্নির সঙ্গে দোলনায় দুলেছেন। এক পানের বাটা থেকে দুজনে এ ওকে ও একে পান খাইয়েছেন। রঙ্গ-রসিকতা করেছেন আর দুলে দুলে হেসেছেন। খেলাধুলোর জন্যে লুডো, তাস আর চাইনিজ চেকার সদাসর্বদা ঘরে মজুত থাকত। সাপ লুডোটাই যদিচ সবচেয়ে পছন্দ ছিল দুজনের। তিন মাস অন্তর মাইনের টাকা থেকে জমিয়ে ব্রজকিশোরবাবু গিন্নিকে একটি জব্বর শাড়ি কিনে দিতেন। হাতি পেড়ে, কি গঙ্গা যমুনা পাড়, কি পাছা পেড়ে। গিন্নি বেঁটে মানুষ, রঙ টকটক করছে, নাকটি বড়ির মতন, চুল কালো কুচকুচে তৈলাক্ত মসৃণ। সেই খাটো, মোটাসোটা শরীরটিতে লাল-কালো গঙ্গা যমুনা পাড় শাড়িখানা পরে ঝনাৎ করে যখন পিঠের ঝলকে পেছনে চাবিটি ফেলতেন, নাকের হীরেটিতে আলো ঝলকে উঠত, তখন ব্রজকিশোরবাবুর ভেতরটা কি করত তা একমাত্র ব্রজকিশোববাবুই জানেন। আমরা জানি না।

বয়স পশ্চিমে হেলতে থাকল, ব্রজকিশোরবাবুর ব্রজকিশোরীও ক্রমশ বৌমাদের রান্নাঘরে, আঁতুরঘরে সেঁদোতে লাগলেন। দোলনায় ছেলে বউকে টপকে নাতি-নাতনিরা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে দুলতে লাগল। পান খাওয়া কমে এল। খেলাধুলোয় গিন্নি ক্রমশই আরও খেলুড়ি সংগ্রহ করতে লাগলেন। বড় নাতি দুলাল বলে, 'আমি কিন্তু লাল নেবো।' নাতনি শীলু বলবে, 'আমি, নীল।' সবাই সব নিয়ে-টিয়ে ব্রজকিশোরবাবুর পড়ে থাকবে ম্যাটমেটে, অলুক্ষুণে হলদে। রোজ। রোজ। একদিনও তো মানুষ বুড়োমানুষটাকে লাল দেয়। তাঁর ঘর। তাঁর লুডো। হয় নাতি, নয় নাতনি লাল নিয়ে বসে আছে। তার ওপরে কোথা থেকে শিখে এসেছে কেঁচে খেলা। ঘুঁটি উঠে গেল। তারপর আবার সেখান থেকে দান মতো নেমে কুচ কুচ করে দাদুর ঘুঁটি কাটছে। আ গেল যা। কয়েক দিন খেলে খেলায় জন্মের মতো বীতশ্রদ্ধ হয়ে ব্রজকিশোরবাবু বললেন, 'দুত্তোর ছাই, খেলব না, তোরা খেল গে যা।'

'তিনজনে খেলা হয় না কি ? অ দাদ্ এসো না !'

'নাঃ।'

গিন্নি কটাক্ষে চেয়ে বললেন, 'বাবুর বুঝি রাগ হল ?'

'হ্যাঁ রাগ হল।' ব্রজকিশোরবাবু বারান্দায় পাতা বেতের চেয়ারে গিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসলেন। হাতে খবরের কাগজ।

আশা করি আমি বোঝাতে পেরেছি এই ব্রজকিশোরবাবুর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করতে হলে কিংবা স্ত্রী বিয়োগ হলে কি বিপদ হবে। তাই হল। এবং একসঙ্গে হল। সেপ্টেম্বর মাসে তিন বছর এক্সটেনশনের পর ব্রজবাবু রিটায়ার করলেন। মালা ও চন্দন, ছাতা-ছড়ি, ধুতি-পাঞ্জাবি, শাল নিয়ে। শালটি ঈষৎ বেগুনি আভার। আসল পশমিনা। আদর করে গিন্নির গায়ে জড়িয়ে দিলেন। অক্টোবর মাসে পুজোর সপ্তমীর দিন অষ্টমীর বাজার করে আনলেন স্বামী-স্ত্রীতে। ফুলকপি, বাঁধাকপি, কড়াইশুঁটি, কুমড়ো, টোম্যাটো, প্যাকেটের ময়দা, ভালো ঘি, নৈনিতাল আলু, এক নম্বর ছোলার ডাল, কিসমিস, বেগুন। সন্ধেবেলায় গৃহিণী ঘুরে পড়লেন। পড়লেন তো পড়লেন। আর উঠলেন না। নার্সিংহোম ঘুরে একেবারে কেওড়াতলা চলে গেলেন।

সব কিছু চুকে-বুকে গেলে, বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত, মাথা ঝুঁকিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন দেখে, বড় বউমা, মেজ বউমা, ছোট বউমা এসে বলল—'বাবা, বাবা, আমরা তো আছি।' একটু দূরে তিন ছেলে। বড় হয়ে অবধি বাবার সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলা অভ্যাস নেই—কী ইশারা করল যে যার বউকে। বড় বউ বলল—'বাবা, আপনি আরাম করুন,' মেজ বলল—'কোনও ভাবনা নেই।' ছোট বলল 'আমরা সবাই আছি।'

ব্রজকিশোর বললেন—'হুঁ।' বলে ঘরে চলে গেলেন। দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। থাকো বাবা, সবাই থাকো। কিন্তু ওইখানে থাকো। ওই চৌকাঠের বাইরে। ঘরে যদি থাকি তো আর কাউকে মনোমত না পেলে আমি আমাকে নিয়েই থাকবো। তোমরা তোমাদের সংসারে। আমি আমার সংসারে। চারবেলা চাট্টি খেতে দিও। ব্যস।

বাড়িখানি ব্রজকিশোরবাবুর ঠাকুর্দার করা। তাঁর বাবা, তিনি, ছেলেরা, যে যেমন পেরেছে বাড়িয়েছে, সারিয়েছে। ব্রজবাবুর ঘর বরাবরই দক্ষিণ-পশ্চিমে, দেওয়ালগুলোতে কি মশলা কি ইঁট ব্যবহার করেছিল মিস্তিরি কে জানে, বর্ষার পর দেওয়াল বিশেষত পশ্চিমের দেওয়াল কেমন ভেপসে ওঠে, চুনকাম অসমান, ছোপ ছোপ হয়ে যায়। ঘরের একদিকে একটি সেকেলে পালঙ্ক। পালঙ্কের তলায় গিন্নির সেলাই মেশিন, গরম জামা-কাপড়ের ট্রাঙ্ক বাক্স। ঘরের উল্টোদিকে কাজ-করা আয়নাঅলা মেহগনির আলমারি, পাশে আলনা, তার পাশে টেবিলে আয়না বসানো। সামনের চেয়ারে বসে কাজ-কর্ম করাও চলে, আবার দাড়ি কামানো, চুল বাঁধা, সাজগোজ এসবও চলে, চলে মানে চলত। ড্রয়ারের মধ্যে এখনও একটাতে গৃহিণীর ফিতে-কাঁটা-চিরুনি মজুত। আরেকটাতে চিঠি লেখার সাজসরঞ্জাম—খাম, পোস্টকার্ড, লেটার প্যাড, কলম, ইত্যাদি ইত্যাদি। ঘরের একদিকের দরজা দিয়ে দোতলার দালানে যাওয়া যায়, আরেক দিকের দরজা দিয়ে সরু জাল ঘেরা বারান্দায় যাওয়া যায়। বারান্দায় একটি কাপড়ের ইজিচেয়ার পাতা আছে। একটি টিয়ার খাঁচা থাকে, আর একটি আড়াআড়ি তারে ব্রজবাবুর জামা-কাপড় অর্থাৎ লুঙ্গি, ফতুয়া, গেঞ্জি, রুমাল, গামছা শুকোয়।

এই ঘরেই, এই পালঙ্কেই পূর্বে মাথা পশ্চিমে পা ব্রজবাবু শোয়ার সময় শুয়ে থাকেন।

কাজের মানুষ। আলস্য, কুঁড়েমি, কোনদিনও অভ্যেস নেই। কিন্তু মুখ ফুটে বৌমাদের বলতে পারেন না—আমাকে বাজারটা করতে দাও। এক-এক দিন এক-এক ছেলে—চা খেয়েই পাঁই পাঁই করে বাজারে ছোটে। ঘড়ি দেখতে দেখতে উদ্বিগ্ন মুখে ফিরে আসে কুড়ি পঁচিশ মিনিটের মাথায়। সরু চিলতে বারান্দায় নিজের কাপড়ের আরাম-চেয়ারে বসে বসে তিনি দেখেন। এক দিন দেখলেন, দু দিন দেখলেন, সাত দিন দেখলেন, তারপর আর পারলেন না। অষ্টম দিনের সকাল সাতটায় বড় বউমা চান করে কাপড় মেলছে। মেজ বউমা ভাত বসাবার চাল ধুচ্ছে, ছোট চা ঢালছে কাপে কাপে, ব্রজবাবু থলি হাতে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারি দিলেন। মেজ বউ চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। ব্রজবাবু গলা খাঁকারির মানে 'আমায় বাজারের টাকাটা দাও বউমা।' মেজ বউমা বলল, 'ওকি বাবা, আপনি কেন থলি হাতে ?' ছোট বউমা বলল—'এখনও চা খাওয়া হল না !' বড় বউমা বলল—'বাবা, আপনি ওপরে যান। শিবু আপনাকে চা দিয়ে আসছে, ছি ছি, রিনি। কত দেরি করলি বল্ তো !' ব্রজকিশোরবাবুর এদের সঙ্গে এত কথা বলা সাত জন্মেও অভ্যেস নেই। তবু বললেন— 'বাজারটা আমিই করে দিচ্ছি। ওদের তাড়া আছে। চা খেয়ে যাচ্ছি।'

ছোট ছেলে রবি ছুটে এলো। থলেটা হাত থেকে একরকম কেড়ে নিয়ে বলল—'না, না, আপনি কেন ব্যস্ত হচ্ছেন ? বলুন আপনার কী খাওয়ার ইচ্ছে, আমি নিয়ে আসব।'

ব্রজকিশোর বুঝলেন, এরা তাঁর বাজার করার উৎসাহের অন্য ব্যাখ্যা করেছে : মনে করেছে তাঁর বিশেষ কিছু খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। তাই বাজার যেতে চাইছেন। তিনি একবার কেশে নিয়ে বাজারের থলি ছোট ছেলের হাতে সমর্পণ করে প্রস্থান করলেন। চিলতে বারান্দায় বসে বসে চা খেতে খেতে বুঝলেন এ সংসারে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তিনি আর কারো কোনও কাজে লাগবেন না। বেচারি অবসরপ্রাপ্ত বিপত্নীক। সেদিন দুপুরে ভাত পাতে কচুর শাক, ভেটকি মাছের কাঁটা চচ্চড়ি এবং ধোকা একসঙ্গে দেখে তাঁর মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। এইসব খাদ্যগুলি তাঁর প্রিয়। তাই এরা ভেবেছে তাঁর এগুলি খেতে মন গেছে। বহু কষ্ট করে সবগুলো এক দিনে জড়ো করেছে। বেচারি ওপারের নোটিশ পাওয়া বুড়ো শ্বশুর ! কদ্দিন আর বাঁচবে ? খাইয়ে-মাখিয়ে নাও যে ক'টা দিন বাঁচে। পাতে খাবার পড়ে রইল। কচুর শাক রাঁধা প্রথমত একেলে কলেজে পড়া মেয়ের কর্ম নয়, কাঁটা চচ্চড়িও তাই ; এতো ঝাল দিয়েছে যে, নাকের জলে চোখের জলে অবস্থা। ধোঁকাটা করেছে ভালোই, কিন্তু গিন্নির নানারকম নিজস্ব তাগ-বাগ ছিল। ধোঁকায় সামান্য একটু কুমড়ো কি বাঁধাকপি, কি ফুলকপি মিশিয়ে দিতেন, জিনিসটা নরম এবং সুস্বাদু হত। এ ধোঁকা সে ধোঁকা নয়। কিন্তু ব্রজকিশোরবাবু এতো হৃদয়হীন নন যে, সব তাতেই এরকম দোষ ধরবেন। তাঁর আসলে বড্ড লেগেছিল এই জন্য যে, এরা তাঁকে অকেজো, লোভী, পেটসর্বস্ব বৃদ্ধের দলে ফেলে দিচ্ছে।

সেইদিন বিকেলবেলাই ব্রজবাবু প্রথম লেকের ধারে গেলেন। বাড়ির থেকে দু-এক গলি পেরিয়ে বড় রাস্তার ওপারে দিব্যি পার্ক। তার মধ্যে টলটলে জলের লম্বা একটি পুকুর। পাড়ে কয়েকটি বেঞ্চি ফেলা। এই হল লেক। ব্রজকিশোরবাবু লুঙ্গি বদলে ফর্সা ধুতি পরলেন, গেঞ্জি পাঞ্জাবি, একটি হালকা দেখে চাদর গায়ে ফেললেন, হাতে ছড়িটি নিলেন, জলের ধারে একটি বেঞ্চি পুরো বুড়োদের দখলে। ব্রজকিশোর গিয়ে একটু গলা খাঁকারি দিলেন। নড়ে-চড়ে বসে অবিনাশবাবু বললেন—'আরে ব্রজ এসো এসো, খাঁকরাচ্ছো কেন, আমাদের পার্টিতে ভর্তিতে হবে তো মুখ ফুটে বললেই তো হয়। কি বল

বিভূতি !'

বিভূতিবাবু বললেন—'তাই তো, আচ্ছা ব্রজ, তুমি চিরকেলে রসিক না হয় মানছি, তা রস কি এখানেও পকেটে করে আনবে ? আমাদের বুড়ো হাড়ে আর কত সয় ?' বিভূতিবাবু চোখ টিপলেন। তাঁর চোখের ইঙ্গিত অনুসরণ করে ব্রজবাবু দেখলেন অদূরে বটগাছের ঝুরির আড়ালে একটি আঁচল ও একটি পাঞ্জাবির পাশ পকেট দেখা যাচ্ছে। ব্রজবাবু মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বিভূতি, অবিনাশ এবং তৃতীয় ব্যক্তি রাসু এমন খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে লাগল যে বটগাছের আড়াল থেকে ছেলে-মেয়ে দুটি হঠাৎ উঠে চীনেবাদাম খেতে খেতে সামনে দিয়ে চলে গেল। ছেলেটি মেয়েটিকে বলল—'কালে কালে হল কি রে মন্দিরা, ঘাটের মড়াতেও প্যাঁক দ্যায় ?'

ব্রজবাবু সবচেয়ে ধারে বসেছিলেন, তাঁর দিকে চেয়েই ছেলেটি বলল। ছেলেটি মুখ-চেনা। মনের ভাব মুখে দেখাবার পাত্র ব্রজবাবু নন, কিন্তু মনে মনে তিনি মরমে মরে গেলেন। এরপর ছেলেটির সঙ্গে রাস্তায়-ঘাটে দেখা হলে সে যে এই ধরনের তাচ্ছিল্যকর মন্তব্য আবার করবে না, তার কোনও স্থিরতা আছে !

রাসু বলল—'যাক বাঁচা গেল। তারপর তোমার বাড়ির খবর বলো। ছেলেরা কবে ভেন্ন হচ্ছে ? অ্যাদ্দিন তোমাতে-গিন্নিতে টেনেছো। তিনি হেঁসেল টেনেছেন, তুমি বাজার টেনেছ। এবার তো ভাই হাতা-বেড়ি উঠেছে হাতে, তোমার পেনশনটুকু বই সঞ্চয় নেই। কী ? আছে ?'

ব্রজবাবু উঠে পড়লেন। একটু কেশে, মুখে বললেন, 'ঘুরে আসি।'

'হ্যাঁ, এসো, তাই এসো গে। বয়সটা তো খারাপ ভায়া। ষাটের গাঁটটি উতরেছো। পঁয়ষট্টিতে আর একটি গাঁট চলছে। চলে ফিরে যন্তরগুলোকে সচল রাখো। নইলে...'

ততক্ষণে ব্রজবাবু হনহন করে হাঁটা দিয়েছেন। এর দু-এক দিনের মধ্যেই ব্রজবাবু লাইব্রেরিতে ভর্তি হলেন, মানে সদস্য হলেন, কড়কড়ে কুড়ি টাকার নোটখানি দিয়ে। লাইব্রেরিয়ান মানুবাবু 'প্রিয় বান্ধবী' বলে একখানা বই দিলেন, মুখ গম্ভীর করে ব্রজবাবু বললেন অন্য একখানা দেখি, মানুবাবু এবার দিলেন। 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধু সঙ্গ', ব্রজবাবু এবার বললেন—'ছেলেদের বই নেই ?'

মানুবাবু বললেন—'না দাদু, ছেলেদের বই মেয়েদের বই আমরা আলাদা করি না। ওসব একসঙ্গেই থাকে।'

ব্রজবাবু বললেন, 'ছেলেমানুষদের বই নেই ? বাচ্চা-কাচ্চার ?'

মানুবাবু বললেন, 'তাই বলুন। ভুটুর জন্যে নেবেন, আচ্ছা এই দুখানা নিয়ে যান। আগেকারের পুজোবার্ষিকী সব, সমান ওজনের সোনার দাম দাদু।'

মানুবাবুর পুরো গোঁফ পেকে গেছে। তা সত্ত্বেও তিনি ব্রজবাবুকে দাদু বললেন। যাঁর নাকি গোঁফ কাঁচা, মাথার পাকা চুল হাতে গোনা যায়, দাঁত, পানের ছোপ ধরা হলেও পুরো পাটি আস্ত। ভালো। বলো বাবা বলো। বিপত্নীক হয়ে পড়েছেন তার ওপরে রিটায়ার, এরা তাঁকে জোরজার করেই রওনা করিয়ে দেবে মনে হচ্ছে।

ক্ষুণ্ণ মনে ব্রজবাবু বই দুখানা প্যাকেটে ভরে বাড়ি ফিরলেন। রাতের রুটি তরকারি খেয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ব্যাস। নিজের ঘর, নিজের সংসার। দরকার নেই তোর বাজার। দরকার নেই অমন বুড়োটে কুচুটে ছ্যাঁচড়া আড্ডার। ব্রজবাবুর যদি মনোমত সঙ্গী না-ই মেলে তো ঘরের মধ্যে তিনি থাকবেন তাঁর নিজেকে নিয়ে। দূর করো যত্ত বাজে জঞ্জাল।

দু-একখানা গল্প পড়তে পড়তে কখন মজে গেছেন ব্রজবাবু নিজেই জানেন না। সারাদিন শুয়ে বসে থাকা, এমনিতে ঘুম আসতে চায় না। গল্প পড়তে পড়তে ব্রজবাবুর ঘুম আরও পালিয়ে গেল। ভূতের গল্প, মজার গল্প, ইতিহাসের গল্প, আচ্ছা আচ্ছা গল্প বানিয়েছে তো এরা। রাত দুটো পর্যন্ত পড়ে, বইটিকে মুড়ে ব্রজবাবু এক গ্লাস জল খেয়ে পাশ ফিরে শুলেন। মাথার মধ্যে কিলবিল করছে গপ্পো। সেই সব গপ্পোই তাঁকে সে রাত্তিরে মাথা চাপড়ে চাপড়ে ঘুম পাড়াল।

এমনি নেশা লেগেছে যে পরদিন বারোটা থেকেই ব্রজবাবু চান-টান সেরে নিয়ে গলা খাঁকারি দিচ্ছেন।

বড় বৌ বলল—'বাবার সময়জ্ঞানটা গেছে।'

মেজ বৌ বলল—'এইভাবেই সব যাবে আস্তে আস্তে।'

ছোট বৌ নিঃশ্বাস ফেলে বলল—'আমার দাদুরও ঠিক এইভাবে গিয়েছিল দিদিভাই। সব থেকে আগে সময়জ্ঞানটাই যায়। এরপর দেখো খেয়ে বলবেন খাইনি তো। রাতে বলবেন, সকাল হল চা দিলি না ? এ আমার নিজের চোখে দেখা আছে গো।'

বড় বউমা নিজে হাতে করে ভাত নিয়ে এলো। কোনমতে খাওয়া সেরে, আঁচিয়ে ঘরে দোর দিলেন ব্রজকিশোর।

আয়নার সামনে টেবিলের ওপর বই পেতে গালে হাত দিয়ে বিভোর হয়ে পড়তে লাগলেন। আজ ব্রজবাবু একখানা গল্প পড়ছেন, তার নাম 'হৃদয় রঞ্জনের সর্বনাশ'। লেখক বুদ্ধদেব বসু। পড়া শেষ হয়ে গেলে তিনি আরেকটা আরম্ভ করলেন না। উঠে পায়চারি শুরু করলেন। এই হৃদয় রঞ্জনটি অদ্ভুত মানুষ তো ! তাঁর মতো একলা। মেসের ঘরে থাকতো—ঘরের দেয়ালে স্যাঁতা ধরে নানান ছবি হত হৃদয় রঞ্জন সে দেখে সময় কাটাত, একবার কোথায় গেছে। এসে দ্যাখে মেস ম্যানেজার ঘর চুনকাম করিয়েছে, দেয়ালের ছবি সব অদৃশ্য। মেস ম্যানেজারকে সে এই মারে তো সেই মারে। ভাবতে ভাবতে ব্রজবাবু শুয়ে পড়লেন। অদ্ভুত লোক তো এই হৃদয় রঞ্জনটা। একাচোরা টাইপের। দেখতে পেলে তিনি ভাব করতেন ঠিক। দেয়ালের হাল ? অ্যাঁ দেয়ালের...বলতে বলতে তাঁর দৃষ্টি চলে গেল তাঁর নিজের ঘরের পশ্চিম দেয়ালে। আচ্ছা তাঁর ঘরেও তো ছাপ-ছোপ রয়েছে। দেখা যাক তো কোনও ছবি ছাবা হয় কিনা। ইলেকট্রিক ওয়্যার সমকোণে বেঁকে গেছে সিলিং-এর দিকে। কৌণিক বিন্দুতে একটি পোর্সিলেনের লাইট-শেড, ষাট পাওয়ারের বাল্ব ঝুলছে। তার ওপর দিকটায় সিলিং ঘেঁষে একটা বেশ বড় ছোপ, নীল-নীল, সাদা-সাদা যেমন হয়। দেখতে দেখতে ব্রজবাবু আপন মনেই বললেন—'ধুর।' আর সঙ্গে সঙ্গে সিলিং থেকে অদ্ভুত দর্শন একটা লোক তাঁর দিকে কটমট করে তাকাল। লোকটার নাক প্রকাণ্ড। ধনেশ পাখির ঠোঁটের মতো। ঠোঁট জোড়া আড়াআড়ি শোয়ানো একটা বাংলার পাঁচ। চোখের চারপাশ নীল। মাঝখানে মস্ত বড় মণি জেগে রয়েছে। মাথাটা টাকে ভরা খালি কিনারে কিনারে গুচ্ছ গুচ্ছ লাল সাদা চুল।

লোকটা কটমট করে তাকিয়ে আছে দেখে ব্রজবাবুর হাসি পেল। বললেন—'দূর টাকলু।' বলে লক্ষ্য করলেন লোকটার এইরকম চেহারা হলে কি হবে—যাকে বলে রাম বোকা। চোখটা ভেড়ার চোখের মতো। কেমন মায়া হয়। তিনি বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। প্রায় সমবয়স্ক, কিন্তু রাম বোকা একটা লোক যদি ঘরের মধ্যে সারারাত জেগে থাকে তো কিছু করার নেই। কাল আবার দেখা হবে।

খুব ভোরবেলায় ব্রজকিশোরবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। বেশ ঝরঝরে তরতরে লাগছে শরীরটা। সূর্য এখনও ওঠেনি। শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করল না। ব্রজবাবু উঠে পড়ে মুখ-টুখ ধুয়ে ফেললেন। জামা-কাপড় পরে বেরিয়ে পড়লেন। এত ভোরে পার্কে কেউ কেউ বেড়াচ্ছে বটে, কিন্তু আড্ডা দেবার মেজাজে কেউ নেই। হনহন করে হাঁটছে সব। প্রাণের দায়ে। ব্রজবাবুও হাঁটতে লাগলেন, ধীরে সুস্থে, পাখির ডাক শুনতে শুনতে, ভোরের হাওয়া খেতে খেতে, গাছের পাতার আড়ালে সূর্য ওঠা দেখতে দেখতে। রোদ একটু চড়া হতেই তিনি পকেট-ঘড়ি বার করে দেখলেন সাড়ে ছ'টা, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফিরে খিলটি তুলে দিলেন। ছেলে-বউরা জাগলেও এখন সব যে যার বাথরুমে। কারুর নজর পড়েনি, বাইরের দরজা খোলা ছিল। ব্রজবাবুর মনে হল পরদিন তিনি তালা দিয়ে বেরোবেন।

সকালবেলাই তাঁকে এমন ভব্যিযুক্ত দেখে বড় বউ মুখ তুলল, 'বাবা কি কোথাও বেরিয়ে ছিলেন ?'

—'হ্যাঁ এই মানে একটু দরকার ছিল।' ব্রজবাবুর স্বভাবটাই এমনি। যা সত্য কথা, সেটাকে কিছুতেই বলতে পারেন না। পারেন না মানে, এদের কাছে পারেন না। একটু ঘুরিয়ে বলেন।

'বেড়াতে বেরিয়ে ছিলুম, প্রাতর্ভ্রমণে গিয়েছিলুম' এ ধরনের কথা বলতে যেন ভীষণ লজ্জা।

তবে দু-চার দিনের মধ্যেই বাড়ির সবাই ধরে ফেলল। মুখ টিপে হেসে মেজ বউ বলল, 'বাবা এরকম গুজগুজে স্বভাবের কেন বলো তো দিদি ?'

বড় বউ বলল—'মা ছাড়া আর কাউকে বাবা ঠিক কথাটা বলতে অভ্যস্ত নন। লক্ষ্য করে দেখো। স্বভাব।'

পান মুখে ব্রজবাবু বিছানায় কাত হয়েছেন। পুবে মাথা পশ্চিমে পা। হাতে বই। আগের বই দুটি আদ্যোপান্ত শেষ হয়ে গেছে। ফেরত দিয়ে ব্রজবাবু আরও দুটি 'ছেলেদের' বই এনেছেন। এনেছেন ভুটুকে লুকিয়ে। ড্রয়ারে চাবি দিয়ে রাখেন। নইলে ও ছেলের হাত থেকে আর বই উদ্ধার করতে পারবেন না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল। ব্রজবাবু হাসি হাসি মুখে পশ্চিমের দেয়ালে সীলিং ঘেঁষে তাকালেন,—'কি হে টাকলু, রামপাখি !' ওমা, টাকলুটা তো নেই। তার গাধা-বোকা চোখ নিয়ে টাকলুটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে, চশমা মুছে, এদিক-ওদিক চারদিক থেকে ঘাই মেরে মেরেও ব্রজবাবু লোকটার হদিশ করতে পারলেন না। তারপর হঠাৎ শক খেয়ে ব্রজবাবু বিছানায় চিত হয়ে পড়লেন। সীলিং-এর কোণ থেকে এক সাঙ্ঘাতিক মেয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে। টিকোলো নাক, ইয়া লম্বা লম্বা চোখ, চোখের পাতা। লম্বা নিটোল ঘাড়। ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক, চোখে কটাক্ষ, ঠোঁটে কৌতুকের হাসি। ঘাড় পর্যন্ত স্পষ্ট বোঝা যায়, তারপর আস্তে আস্তে সব কেমন আবছা হয়ে গেছে। ব্রজবাবু কোনদিন গিন্নি ছাড়া অন্য কোনও মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকাননি। এখন গিন্নি নেই। জানতে পারলে তিনি কি মনে করবেন ? কিন্তু ব্রজবাবুর উপায় নেই। চোখ খুললেই সামনে ঘাড় বেঁকিয়ে হাসছে মেয়েছেলেটি। আ গেল যা কি বেহায়া রে বাবা। ব্রজবাবু বেশ শব্দ করে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন, পাশ বালিশটি জড়িয়ে। এক মিনিট, দু মিনিট, পাঁচ মিনিট। তিনি আবার চিত হলেন। বইটি তুলে পড়তে আরম্ভ করলেন। তারপর যেই পাতা উল্টে ওপর দিকে তাকিয়েছেন অমনি দেখলেন মেয়েটা নাচছে। গলার তলায় যেখানটা আবছা আবছা

মতো ছিল সেখানটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। মুখটা চেনা চেনা। অনেক ভেবে তিনি মনে করতে পারলেন গিন্নি যে কি সব সিনেমা পত্রিকা নিতেন তারই কোনটাতে মেয়েটিকে দেখে থাকবেন তিনি। গিন্নি ঘরে না থাকলে ড্রয়ার থেকে বার করে উল্টেপাল্টে দেখতেন, পায়ের শব্দ শুনলেই ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখতেন আবার। খুব কৌতূহল হল। চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে মেয়েটাকে দেখতে থাকলেন তিনি। ঝিরি ঝিরি বাকলের মতো গাছের পাতা দিয়ে করা একটা খাটো ঘাগরা পরেছে। নিটোল পা দুটি নাচের ভঙ্গিতে বেরিয়ে আছে। হাতে কি একটা মুদ্রামতো। ঠিক নাচ নয়, অঙ্গভঙ্গি, এমন অঙ্গভঙ্গি, নাঃ। ব্রজবাবুর রক্ত গরম হয়ে যাচ্ছে। তিনি চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিলেন, ভালো করে দেখতে দেখতে কেমন একটা অসহ্য পুলকে অবশ হয়ে আসতে লাগলেন। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন জানেন না।

কিছুদিন এমন হল ব্রজবাবুর আর ঘর থেকে বেরুতে ইচ্ছে করে না। দালানে ভাত খেতে যান, বারান্দায় একটু রাস্তা দেখেন বসে বসে, কিন্তু ওই পর্যন্ত। কতক্ষণে ঘরে ঢুকবেন, কতক্ষণে দরজা বন্ধ করবেন, যেন তিনি হা-পিত্যেশ করে বসে থাকেন। এতো আগ্রহ, এত পুলকও যে তাঁর সাতষট্টি বছরের শরীরে মনে ছিল তা তিনি জানতেন না। বউরা বলাবলি করতে লাগল, 'বাবাকে ডাক্তার দেখানো দরকার।' ছেলেরা বলল—'কোন নির্দিষ্ট কমপ্লেন নেই, ডাক্তারে কি করবে?' বউরা বলল, 'নাই থাক। থাকলেও তো বলবেন না। আমরা বাবা পরের বাড়ির মেয়ে, লোকে পাঁচ কথা বলবে কিছু হয়ে গেলে।' অগত্যা ডাক্তার এলেন। একগলি পরে বসেন। ছোট ছেলে ডেকে আনল।

ব্রজবাবু বিকেলে বারান্দায় বসে আছেন। ডাক্তার এলো। —'কি খবর দাদু?'

এই ডাক্তার তাঁর ছেলের বয়সী ঠিকই। মেসোমশাই বললে আপত্তি ছিল না। কিন্তু আজকাল কেউই তাঁকে দাদু ছাড়া ডাকছে না। ডাক্তারের কোল কুঁজো চেহারার দিকে তাকিয়ে ব্রজবাবুর হাসি এলো। এরপর তাঁর নিজের ছেলেরাই না তাঁকে দাদু ডাকে।

ব্রজবাবু বললেন—'তুমি এদিকে কি মনে করে? এদের কারো শরীর-টরীর খারাপ নাকি?'

ডাক্তার বলল—'খারাপ? না, না। আপনাকেই একটু চেক আপ করতে এলুম।'

'চেক আপ? আমাকে? কেন? আমার হয়েছেটা কি?'

'চেক আপের আবার হওয়া-হওয়ি কি?'

ভালো করে দেখে শুনে ডাক্তার বলল—'বাঃ। ভালো আছেন তো! খুব চনমনে। খিদে হয়?'

'দিব্যি।'

'ঘুম?'

'চমৎকার।'

'কোনও অসোয়াস্তি?'

'উঁহু।'

'ঠিক আছে। প্রেসারটা একেবারে মার্জিনে আছে। ও কিছু না। পাতে নুনটা খাবেন না।'

যাবার সময় কোলকুঁজো ডাক্তার ছেলেদের ডেকে হেসে বলে গেল—আপনাদের বাবা 'আপনাদের চেয়ে অনেক ভালো আছেন।'

ক'দিন ধরে ব্রজবাবু সীলিং-এ আর সিনেমার মেয়েটিকে দেখতে পাচ্ছেন না। মনটা খারাপ হয়ে রইল দু-তিন দিন। তারপর হঠাৎ নিজেই নিজেকে বললেন, 'ধুত্তেরি' এই বয়সে আর অত ধকল সয় না। গেছে তো বেঁচেছি।'

ব্রজবাবু আবার ভোরবেলা উঠে, সদরে তালা দিয়ে প্রাতর্ভ্রমণে বেরোতে লাগলেন। ছেলেরা নিঃশ্বাস ফেলল। বউরা বলল যাক।

দুপুরে ঘুমোলে আজকাল আর ব্রজবাবু রাতে ঘুমোতে পারেন না। তাই দুপুরটা প্রাণপণে বই নিয়ে, পত্র-পত্রিকা নিয়ে জেগে থাকেন। যদিও ভাত খাবার পর একটা ঢুল আসে। যাই হোক, দুপুরে জেগে থাকার জন্যেই বলা যায়, রাতের ঘুমটা নিশ্ছিদ্র হয়। ঠিক দশটা থেকে পাঁচটা। সেদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। ব্রজবাবু বাথরুম গেলেন, জল, খেলেন তারপর চটিটি পাপোশের ওপর খুলে চিত হয়ে শুলেন। পুবে মাথা পশ্চিমে পা। চোখ তুলতেই ব্রজবাবু ভিরমি গেলেন। পশ্চিমের দেয়ালে এক ভয়ঙ্কর পুরুষ, ইয়া গোঁফ, ইয়া বুকের পাটা, ঝাঁকড়া চুল, তার শেষ কোথায় দেখা যায় না। তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে ভীষণ রুষ্ট চোখে। ভয়ে ব্রজবাবু চোখ বুজলেন। কিন্তু বুজলে কী হবে? সেই মুখ সারাক্ষণ ভাসছে চোখের মধ্যে। ব্রজবাবু উঠছেন, জল খাচ্ছেন, শুচ্ছেন, বসছেন, স্বস্তি পাচ্ছেন না। বারান্দার দিকের দরজা খুলতে সাহস হচ্ছে না। যদি ওইরকম রাক্ষসের মতো কোনও চোর বা ডাকাত...। হঠাৎ মনে পড়ল, বারান্দা তো রটআয়রনের জালি ঢাকা। ব্রজবাবু তড়াক করে উঠে বারান্দায় চলে গেলেন, ঘরের দরজাটিতে শেকল দিলেন। আরাম চেয়ারটা পাতলেন। বাকি রাত সেখানেই আধশোয়া হয়ে কাটিয়ে দিলেন।

সকালবেলা তাঁকে বারান্দায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন দেখে, বড় বউ বলল—'কাল যা গরম গেছে, দিল্লি লখনউকে হার মানায়।'

কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনও ব্রজবাবু বারান্দায় রাত কাটালেন। দুপুরবেলা ঘরের দরজা খোলা রাখেন, বই পড়েন, কোনদিকে তাকান না কিন্তু রাত্তিরে শুনশান, প্রচণ্ড ভয়ে ব্রজবাবুর মতো লোকও দিশেহারা হয়ে যান। চতুর্থ দিন মাঝরাত্তিরে বৃষ্টি এলো। পুবে ছাট। জালের মধ্যে দিয়ে ছাট এসে ব্রজবাবুর জামাকাপড় ভিজিয়ে দিতে লাগল। বুড়ো বয়সে কি ব্রজবাবু শেষে নিউমোনিয়ায় পড়বেন? বুক ভর একটা দম নিয়ে ব্রজবাবু বীরপুরুষের মতো ঘরে ঢুকলেন, গামছা দিয়ে গায়ের জল মুছলেন, ফতুয়া বদলালেন, তারপর শুয়ে পড়লেন, প্রথমে তাকালেন না, মনে মনে বললেন—'হ্যাঃ। একটা ছায়া, তার চেয়েও কম, একটা ছোপ,—ক'দিন পরই পাল্টে যাচ্ছে, তাকে আবার ভয়! তুমিও যেমন।'

পুরো চোখ খুলে সিলিং-এর দিকে তাকালেন ব্রজবাবু। 'কিছু নেই। সিলিং দিয়ে লম্বা রেখার জল পড়েছে। ভয়ানক মুখ মুছে গেছে। কিছু সাদা, কিছু নীল, অর্থহীন দেয়াল। ব্রজবাবু খুব নিরাশ হলেন। কিছু না থাকার চেয়ে কি ভয় থাকাও ভালো? সেই রাত্তিরে ব্রজবাবু ঘুমোতে পারছেন না কারণ সব শূন্য, দেয়ালে। তাঁর দেয়ালে কোনও লিখন নেই। অবশেষে তাঁর ঘরের ভেতর থেকেই কে যেন তাঁকে প্রশ্ন করল—'বেশ তো ব্রজ, কী তুমি দেখতে চাও? বলো? ওই দানব, ওই সিনেমার মেয়ে, না ওই বোকা? না কি আর কিছু, বল বল, বলে ফ্যালো।'

ব্রজবাবু বললেন—না না। ওসব তো দেখা হয়ে গেছে। নতুন কিছু দেখাও। নতুন কোনও মুখ। আমার নিজের মুখ, সেটা আমি এখনও দেখিনি। আয়নায় একরকম

দেখি। গিন্নির চোখে একরকম দেখতুম। ছেলে-বউ, নাতি-নাতনিদের চোখে আবার আরেক রকম দেখি। বাইরের লোকের ডাকে আমি সাড়া দিতে পারি না। তারা কাকে ডাকে আমি আদৌ বুঝতে পারি না। দেয়ালের ওপর যদি একবার আমার সঠিক মুখটি ফুটে উঠত।'

ঘরের মধ্যে থেকে স্বর বলে উঠল—'এতোদিন তো তাই-ই তোমায় দেখাচ্ছিলুম।'

ব্রজবাবু চমকে ওঠলেন—'কে ? কে ওখানে ? কে একথা বললে ? সাড়া দাও।'

কেউ সাড়া দিল না। ব্রজবাবু খাটের তলা, আলমারির পেছন, টেবিলের তলা সব ভালো করে খুঁজে এলেন। কোথাও আবার কেউ না লুকিয়ে থাকে। নাঃ। নেই কেউ। তখন তিনি আবার চটি খুলে, পা মুছে, ফতুয়াটি দ্বিতীয় বার বদলে, কেন না খোঁজাখুঁজিতে ফতুয়া ঘামে ভিজে গেছে, পালঙ্কে এসে শুলেন। পুবে মাথা। পশ্চিমে পা। বললেন—'তা হলে তোমাকেই দেখাও। তুমি কে ! তোমাকেই দেখি।'

ব্রজবাবু কী দেখেছিলেন জানি না। কিন্তু পরদিন মুখের মৃদু মধুর হাসিটি দেখে সবাই বলল—'বেশ গেছেন। সুখস্বপ্ন দেখতে দেখতেই গেছেন। পুণ্যবান লোক তো সব সময়ে জীবন দিয়ে চেনা যায় না, মৃত্যু দিয়েও কখনও কখনও চিনতে হয়।'

ধোঁয়া

এজলাসে বসেছিল বিপ্লব। পুরো জজসাহেবের ধড়াচুড়োয়। সওয়াল জবাব চলছে। হঠাৎ যেন মনে হল রামগতিবাবু ঢুকলেন। বৃদ্ধ, বিশীর্ণ, হাতে ছাতাখানা লাঠির মতো করে ধরা রামগতিবাবুও ঢুকলেন—পুলিশ শশব্যস্তে তাঁকে প্রায় আলিঙ্গন করে বাইরে নিয়ে গেল। দায়ভাগ আর মিতাক্ষরার ধানাই-পানাই শুনতে শুনতে হুট করে অন্যমনস্ক হয়ে গেল বিপ্লব। রামগতিবাবুই তো! নাকি রামগতিবাবুর মতো কেউ। রামগতিবাবুকে শেষ যা দেখেছে তার সঙ্গে এই বৃদ্ধের অল্পই মিল। তবু এঁকে রামগতিবাবু বলেই তার একদা-ব্যারিস্টারি অধুনা-জজসাহেবি চোখ শনাক্ত করেছে যখন, তখন ব্যাপারটা দেখতেই হয়। তবে পরিস্থিতিটা নিশ্চিতভাবে কৌতুকজনক। বিপ্লব ঘোষ উচ্চাসনে এবং রামগতি স্যার জবুথবু হয়ে ঘরে ঢুকছেন। চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার নাটক বুঝি উল্টো-পাল্টা হয়ে আবার এক রজনী অভিনয় হয়ে গেল! বারে মজা! বারে জীবন! ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে তো!

লাঞ্চ আওয়ার! শুনানি মুলতুবি। একদিকে বাঙালি হয়ে যাওয়া মারোয়াড়ি পরিবার, আর একদিকে দায়ভাগ আর মিতাক্ষরা। দু' পক্ষের উকিল এখন মনে মনে তর্কাতর্কি করুক। বিপ্লবের মাথায় খালি একটাই চিন্তা—রামগতিবাবুই তো! জগৎপতি ইন্সটিট্যুশনের ডাকসাইটে অঙ্কর মাস্টারমশাই রামগতি চাটুজ্যে--যাকে ছেলেরা নিজেদের মধ্যে ডাকত যমগতি বলে! ওরে বাপস্ রে, কী মার! কী মার! কুড়িটা অঙ্ক টাস্ক ছিল পনেরটা করেছিস? মার। এক্সট্রা পারিসনি? মার। আঁক কষতে কষতে জানলার দিকে তাকিয়েছিস? মার! ডাস্টারের বাড়ি, আঙুলের গাঁটের বাড়ি, দু আঙুলের মাঝে পেন্সিল, বিশাল বিশাল মুগুর ভাঁজা শক্ত হাতে চটাস, খটাস, দুমদাম। ওরে ব্বাপ রে! পড়াতেন দুর্দান্ত, বোঝাতেন নির্ভুল, কিন্তু ভয়ে ছেলেরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যেত। অভিভাবক যতই রামগতিবাবুকে টিউটর ঠিক করতে চান না কেন, ছাত্ররা নাম শুনলেই 'ওরে বাবারে পিসিমারে' বলে ডাক ছাড়ত। সেসব দিনে মাস্টারমশাইদের নামে কমপ্লেন চলত না। আর কার নামেই বা কমপ্লেন করবে? ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়। একেকটি মাস্টারমশাই একেক রকমের ঠেঙাড়ে। কেউ ডাস্টার স্পেশালিস্ট, কেউ থাপ্পড় স্পেশালিস্ট, কেউ বেত স্পেশালিস্ট। একজন তো ছাতার বাঁটের বাঁকানো দিকটাও অদ্ভুতভাবে ব্যবহার করে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। বাঁকানো জায়গাটা দিয়ে গলা ধরে শিকারকে টেনে আনতেন, তলার দিকে চেপে বসিয়ে দিতেন। আবার ওপর দিকে চাপ দিয়ে ওঠাতেন। একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে, একবার ওপরে একবার নিচে। সে যেন চরকিনাচন। যাই হোক এইসব ঠেঙাড়ের মধ্যেও রামগতিবাবু ছিলেন বিশিষ্ট ঠেঙাড়ে। অত জোর আর কারো

চড়ে ছিল না। অত শব্দও কারো গাঁট্টায় হত না, অত লঘু পাপে অত গুরুদণ্ডও কেউ দিতেন না। রামগতিবাবু যেন ক্লাসে ঢুকেই ক্ষেপে যেতেন। কিংবা ক্ষেপেই ক্লাসে ঢুকতেন। ডিম আগে, না মুরগি আগের মতোই রামগতিবাবুর ক্ষেপা এবং ক্লাসে ঢোকার পারম্পর্যে অগ্রাধিকারটি কার এ কথা চিরকালই রহস্যের অন্তরালে থেকে যাবে।

কোনও ছেলেই রামগতিবাবুর শাসন থেকে পুরোপুরি মুক্ত ছিল না। কিন্তু বিপ্লবের ভাগে শাসনটা যেন ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা ঘটে যেত। স্কুলে এক দফা, বাড়িতে এক দফা। বাড়িতে কখনও কখনও মোক্ষম সময়ে অকুস্থলে মা এসে হাজির হতেন। হাতে চিঁড়ে ভাজা আর চা। তখন মাস্টারমশাইয়ের হাত কান থেকে নামত। বাবা ছিলেন—পিঠে বেঁধেছি কুলো, আর কানে গুঁজেছি তুলো। ধারণা—মার না খেলে ছেলে মানুষ হবে না। কিন্তু স্কুলে ? সেখানে মা-ও নেই, চিঁড়ে ভাজাও নেই। বরং আছে রামবিচ্ছু একদল নিষ্ঠুর—'ঘুঁটে হাসে গোবর পোড়ে'র প্রবচনের ঘুঁটে-স্বভাব বালখিল্যদল। এরা কখনও অন্যের সঙ্গে একাত্ম হতে পারত না। অন্যে মার খেলে বরাবর এদের স্বর্গীয় আনন্দ হ'ত। তাদের সমক্ষে তুলো ধোনা হতে হত বিপ্লবকে। কখনও বিপ্লব বলতেন না মাস্টারমশাই। সব সময়ে বিপুল। বিপুলচরণ, বিপুলচন্দ্র, বিপুলগতি, এমনকি বিপুলবন্ধু, কিন্তু কদাপি বিপ্লব নয়। নামের বাচ্যার্থ বোধহয় পছন্দ ছিল না ভদ্রলোকের। অধিকন্তু নাম বিকৃত করার মধ্যেও একটা বেশ স্থূল রকমের অপমান আছে।

'কি হে বিপুলচন্দর, কালকেই যে এই ষোল নম্বর উপপাদ্যের এক্সট্রা কখানা করিয়ে এলুম। বারো ঘণ্টার ব্যবধানেই ভুলে মেরে দিয়েছো ? বেশ করেছো। কালকে আসলে মুখস্থ করেছিলে, আজকে এ বি সি ডি-র জায়গায় এক্স, ওয়াই, জেড- দিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে গেছো। এটা কোনমতেই আমার প্রত্যাশার বাইরে নয়। এমনটাই আমি প্রত্যাশা করেছিলুম। এসো, আমার প্রত্যাশা পূরণের পুরস্কারটা নিয়ে যাও। এই নাও, এই নাও, এই নাও।'

মাথার তিনটি মোক্ষম জায়গায় গুণে গুণে টোকা মারলেন রামগতিবাবু, সঙ্গে সঙ্গে তিনটি টেঁপারি বেরিয়ে গেল জায়গাগুলোয়।

—'ওরে তোরা উলু দে।' অমনি ক্লাসশুদ্ধু ছেলে হো-হো করে হেসে উঠল, পরক্ষণেই অবশ্য সবচেয়ে জোরালো হাসির মালিকের ডাক পড়বে,—'কি ব্যাপার সমরেশ রাম, তোমার খাতায় অত কালির দাগ কেন ? জোমেট্রির খাতায় কালির দাগ ?'

জোমেট্রির জি ও যে শেখোনি সে তো এই কালিঝুলি দেখলেই টের পাওয়া যায় ! আবার হাসি ! হাসি ! অ্যাঁ ? হাসি !'

এক-একটা কথার পুনরাবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে রামগতিবাবুর হাত উঠছে, নামছে।

সুইংডোর ঠেলে বেয়ারা ঢুকল। একটা স্লিপ দিচ্ছে। 'রামগতি চ্যাটার্জি রিটায়ার্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট মাস্টার, জগৎপতি হাইস্কুল, বি এস-সি বি টি।' অঙ্কের মাস্টারমশাই হাইস্কুলকেই বি এসসি বি টি বানিয়ে দিয়েছেন। ট্রান্সফার্ড এপিথেট।

'আসুন মাস্টারমশাই—আসুন—' উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করল বিপ্লব। রামগতিবাবুই। উনিই ধোঁয়াটে চশমার ভেতর থেকে অবাক হয়ে বিপ্লবের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে,—'ত্‌ তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ ?' রামগতিবাবুর চোখ দিয়ে ধারা নামছে। বরাবরই আবেগপ্রধান ধাতের মানুষ। যৌবনে তার প্রকাশ ছিল রাগ, বার্ধক্যে কান্না।

বিপ্লব বলল—'আরে আমি তো আপনাকে চিনতে পারবোই। সে আর বেশি কথা কি ? আপনিই বরং আমাকে চিনলেনই কি করে আর এতদূর আমার কাছে এলেনই বা কি করে সেটাই আশ্চর্যের বিষয়।'

রামগতিবাবু—চোখ থেকে চশমা নামিয়ে চশমা, চোখ সব ভালো করে মুছলেন। তার পরে বললেন—'হেড ক্লার্ক সরসীকে মনে আছে কি তোমার ? সেই সরসীই বলল, আপনার বিপুল যে এখন জজ হয়েছে। তার কাছেই যান না, ব্যবস্থা হয়ে যাবে।... তা...তুমি আমাকে চিনতে পারবেই একথা বললে কেন বাবা ?'

বিপ্লবের চোখে হাসি চিক চিক করছে, বলল—'বাঃ, আপনি আমার প্রাইভেট টিউটর ছিলেন, স্কুল ফাইনালটা আপনার হাত ধরেই পার হলুম, আর আপনাকে চিনবো না ?'

—'সত্যি ? তুমি তাই মনে করো ? স্কুল ফাইনালে অঙ্কের লেটারটা...'

—'নিশ্চয়ই মাস্টারমশাই, ও লেটার আমার নয়, ও আপনার লেটার।'

—'কি জানি', কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন রামগতিবাবু তারপর একটু ক্ষুণ্ণ স্বরে বললেন, 'সত্যি কথাটা কিন্তু আমার কাছে গোপন করে গেলে যেন !'

—'কি সত্যি কথা ! কি গোপন কথা !'

'আমাকে মনে রাখবার আসল কারণ...'

বিপ্লব বলল—'কি আশ্চর্য, মিথ্যা বলার কি আছে ? টানা সাত বছর স্কুলে পড়েছি আপনার কাছে, তিন বছর না চার বছর বাড়িতে, আমার অঙ্কে মেধা কম হলেও এমনি স্মৃতিশক্তি খুব খারাপ নয় মাস্টারমশাই।' বলল, কিন্তু তার চোখের হাসি গাঢ়তর হল।

রামগতিবাবু বললেন—'যাক, একটা অসুবিধেয় পড়ে তোমার কাছে আসা, দ্যাখো বাবা যদি কিছু করতে পারো। তোমার তো অনেক জানাশুনো !'

বিপ্লব বলল—'হ্যাঁ। আসল কথাটা বলুন ! কি অসুবিধেয় পড়েছেন !'

'জনগণের অসুবিধে দূর করার একটা মেশিনারিই তো আমরা ! এত লোকের করছি আর আপনারটা করব না ? আপনার তো অগ্রাধিকার।'

কাঁধের ঝোলা থেকে কাগজপত্র বার করলেন রামগতিবাবু। রিটায়ার করে গেছেন, ছ-সাত মাস হয়ে গেল, অথচ দশ-এগার বছরের একটা বাড়তি ইনক্রিমেন্টের টাকা আজও পাননি। এখন সেসব ফাইল বহু কাগজপত্রের তলায় চলে গেছে, স্কুল, সরকার কেউ আর গা করছে না।

—'অনেকগুলো টাকা বাবা, জমা রাখতে পারলে সুদে-আসলে কত হয়ে যেত বলো তো।'

বিপ্লব ওর বন্ধু এক এডভোকেটকে ডাকল। বলল—'এই বিশ্বাসসাহেবই আপনাকে সব বুঝিয়ে দেবেন কি করবেন। সেরকম বুঝলে আপনি গভর্মেন্টের বিরুদ্ধে কেস করবেন, প্রাপ্য টাকা খেসারত সমেত আদায় করে দেবো। আপনার এক পয়সাও লাগবে না।'

বিশ্বাসের সঙ্গে চলে গেলেন রামগতিবাবু। মিনিট পঁয়তাল্লিশ পরে, বিপ্লব আবার এজলাসে যাবার জন্য উঠছে উনি বিদায় নিয়ে গেলেন।

—'করে দিতে পারো যদি চিরকাল মনে রাখবো বাবা।'

বিপ্লব হাসল—'বাঃ, আপনার ঋণ শোধ করতে হবে না ?'

হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালেন রামগতিবাবু—'আমার মারের কথা আজও ভুলতে পারোনি, বিপুল, না ?'

বিপ্লব হাসিমুখে বলল—'সে কি ভোলা যায়, মাস্টারমশাই ? তা সে যাই হোক তার জন্য অনুশোচনা করবেন না। আমাদের ভালোর জন্যেই তো মারতেন ? তখন খুব কষ্ট হলেও সে কথা বুঝতুম। এখন তো বুঝিই !'

—'কী বোঝ ? তোমাদের ভালোর জন্য মারতুম ?' রামগতিবাবু কি রকম একরকম করে বললেন।

বিপ্লব বলল—'কতদিনকার কথা সব মাস্টারমশাই। ছাড়ুন ওসব।'

রামগতিবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন—'না বিপুল, তোমাদের ভালোর জন্য মারতুম না। কেন মারতুম এই কথাটা তোমরা এখন দশের এক হয়েছ তোমাদের জানা দরকার। আমার বাড়ি একদিন সময় করে আসবে ? আমি বুঝিয়ে বলব !'

বিপ্লব ভাবল, মাস্টারমশায়ের মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। বলল—'একদিন যাবো, নিশ্চয় যাবো। আপনার কৈফিয়ৎ শোনবার জন্য নয়। এমনিই যাবো।'

যাক, টাকাটা ভালোভাবেই আদায় হয়ে গেছে। রামগতিবাবু নিজে কোর্টে এসে বিপ্লবকে কৃতজ্ঞতা জানালেন। বললেন—'আমি বসছি বিপুল, আজ তোমাকে আমার বাড়ি নিয়ে যাবো। তোমার যা কাজ আছে সেরে এসো।'

—'আরেকদিন হবে মাস্টারমশাই। আজ থাক।' বিপ্লব বলল।

—'তবে আর তুমি গিয়েছো ! তোমাদের ওই আরেকদিন আরেকদিনই থেকে যাবে বাবা।' হতাশ গলায় রামগতিবাবু বললেন।

—'আচ্ছা, আচ্ছা চলুন'—বিপ্লব তাড়াতাড়ি বলল। মাস্টারমশাইয়ের মনে সে দুঃখ দিতে চায় না। এই মাস্টারমশাই তাকে তিনটে লেটার পাইয়ে নামকরা কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে আর পেছন ফিরে তাকাবার দরকার হয়নি। নিজের ছেলের জন্যও এতটা করতে পারেননি মাস্টারমশাই।

—'তুমি নিজে ড্রাইভ করতে পারবে না ?' হঠাৎ রামগতিবাবু বললেন।

অনেকটা রাস্তা, ট্রাফিকের অবস্থা কি তা জানা নেই, ড্রাইভার থাকলে ভালো হত কিন্তু আজ মাস্টারমশাই যা বলেন তাই হবে। ড্রাইভারকে ছেড়ে দিয়ে বিপ্লব নিজে স্টিয়ারিং-এ বসল। পাশে রামগতিবাবু। এককালের দশাসই মানুষটি এখন খুবই শীর্ণ। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন, মাথার চুলগুলি কাঁচা-পাকা, একটু বড় হয়ে গেছে। দাড়ি রেখেছেন। গলা ঢেকে আর সামান্য নিচে নেমেছে দাড়ি। গেরুয়া রঙের খাদির পাঞ্জাবি। বেশি নীল দেওয়া মিলের ধুতি।

এসপ্ল্যানেডের জ্যাম এড়িয়ে স্ট্র্যান্ড রোড ধরে হাওড়া ব্রিজে উঠল বিপ্লব। কি ভাগ্য আজ ব্রিজ ফাঁকা। বাকল্যান্ড ব্রিজে উঠতে উঠতে বলল—'মাস্টারমশাই আপনি এক সময়ে বক্সিং করতেন না ?'

—'বক্সিং নয়, কুস্তি, ফ্রিস্টাইল, গোবরবাবুর কাছে শিক্ষা।'

—'আমাদের যখন পড়াতেন তখনও করতেন ? আপনার ইয়া চেহারা ছিল।'

—'তোমাদের যখন পড়াচ্ছি, তখন সবে ছেড়ে দিচ্ছি ওসব শখ-টখ, কোচিং করতে হত, তা ছাড়া কুস্তিগীরের শরীর স্বাস্থ্য টিকিয়ে রাখতে অনেক হ্যাঁপা বাবা। দু-আড়াই সের পাঁঠার মাংস একাই উদরসাৎ করতে পারতুম।'

—'আগেকার লোকেদের হজম শক্তির কথা হচ্ছে না বাবা, কুস্তিগীরের প্রয়োজনের কথা হচ্ছে। সাধারণ লোক যে পরিমাণ খায়, সেটুকু তার পেটে তলিয়ে যায়। কোথায় যে যায় টের পাওয়া যায় না।' রামগতিবাবু হাসলেন।

জি টি রোড ধরে এগোতে এগোতে বাঁদিকে মোড় নিচ্ছিল বিপ্লব। রামগতিবাবু বললেন,—'ওদিকে না, ডাইনে ডাইনে।'

—'বাড়ি পাল্টেচ্ছেন মাস্টারমশাই ?'

—'আমি পাল্টাইনি বাপ্স, আমার ছেলে শশাঙ্ক পাল্টেছে। এইবার এই, অ্যায়, এইখানে গাড়ি থামাও।'

গলিটা খুব সরু। রামগতিবাবু ঠিকই বলেছেন এখানে গাড়ি ঢুকত না। হঠাৎ যেন ঝপ করে সন্ধে হয়ে গেল। গলির ঠিক মুখেই বহুতল বাড়ি উঠেছে দুটো। ঠিক যেন দু'দিকে দুই দানব প্রহরী। দরজার হুড়কো সামান্য একটু ঠেলতেই আপনি খুলে গেল। রামগতিবাবু বললেন—'এসো বিপুল ভেতরে এসো।'

তিন-চারটি বালক-বালিকা উঠোনের ওপর ছুটোছুটি করে কানামাছি খেলছিল। আর দু'জন দাওয়ার ওপর বসে মুড়ি খাচ্ছে। একজনের তলার দিকটা খুব শীর্ণ। হয় রিকেট, নয় পোলিও। একজন বিধবা যুবতী বার সাবান দিয়ে কাচা মোটা একখানা সেলাই করা চাদর উঠোনের তারের ওপর মেলে দিয়ে চলে গেল। কোথাও থেকে উনুনে 'রুটি পোড়ার তীব্র গন্ধ হাওয়ায় ভেসে আসছে। কোণের ঘর থেকে খ্যানখেনে গলায় কে বলল—'রুটিগুলো যে খাক হয়ে গেল হারামজাদী!—বাড়ির দ্বিতীয় ঘর থেকে কস্তাপেড়ে শাড়িপরা এক মহিলা সঙ্গে গলায় স্টেথো দীন চেহারার এক ডাক্তারকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। ডাক্তারটি বললেন—'এ মারাত্মক হাঁপের টানের উপশম করি আমার ডাক্তারি বিদ্যের এ সাধ্যি নেই মা জননী। শশাঙ্ক। তোমরা বাপু বাড়ি বদলাও।' তিনটি শিড়িঙ্গে যুবক রাস্তার দিকের দরজা ঠেলে ঢুকে এসে বলল—'ভিজিল্যান্স পার্টির এ মাসের চাঁদাটা দাদু দিয়ে দেবেন তাড়াতাড়ি। গত মাসের মতো যেন চেল্লাচেল্লি করতে না হয়।'

'কোচিনে তো মন্দ কামান না।'

হঠাৎ চতুর্দিক থেকে কারা একটার পর একটা ধোঁয়ার বল ছুঁড়ে দিতে লাগল। বড় বড় বল, শব্দহীন বোমার মতো তারা ফেটে যায় আর উঠোনটাকে গিলে ফেলে, ভয়ানক কাশির আবহসঙ্গীত পেছনে নিয়ে সেই ধোঁয়ার উর্ধ্বস্রোত হঠাৎ যেন আরব্য উপন্যাসের কলসীর ধোঁয়া হয়ে যায়। হতভম্ব আরবী ধীবরের মতো বিপ্লব ধোঁয়ার মধ্যে থেকে বিষণ্ণ দৈত্যের গলা শুনতে পায়—'বলেছিলুম না বিপুল। বাড়ি এলেই তোমায় বুঝিয়ে দেবো। তখন কেন এত মারতুম। চল্লিশ বছর ধরে এই ধোঁয়ায় বন্দী হয়ে আছি বাবা, তোমাদের ভালোর জন্যে মারতুম, মনেও করো না। মারতুম এইজন্যে।'

পিসিমা

ব্রাহ্মণ ভোজন গতকাল হয়ে গেছে। এলাহি লোকজন। আজ নিয়মভঙ্গ। নয় নয় করেও আড়াইশ'র কাছে লোক হয়ে গেল। বাড়ি-বর্গে নিজেদের গুষ্টিই তো পঞ্চাশের ওপরে। তার ওপর এতগুলি কুটুম। পাড়ার লোকও আছে।

অনীশ বলল—'ওদের মাছ-ভাত না খাওয়ালে বাবার তো মান থাকতোই না, আমাদেরও না। করেছে অনেক।'

দীপিকা বা দীপু বলল—'একশবার। বাবা অদড় হয়ে পড়েছিল। তোমরা ছেলেরা তো কোন্‌কালে ভেগে গেছো। পাড়ার এইসব কেষ্টা, বিষ্টু, গনু, ভোঁদড়—এরা না থাকলে বাবার ডাক্তার বদ্যিটুকুও সময়ে অসময়ে হত কি-না সন্দেহ। পিসিমা মেয়েমানুষ বই তো নয়!

কথার মাঝখানটা অনীশের খট করে লেগেছিল। দীপুটা চিরকালের অপ্রিয়বাদিনী। সে তো স্বীকারই করছে সে করেনি। তার করার অবস্থা ছিল না। কর্মস্থল যদি কারুর হোসিয়ারপুর পাঞ্জাব হয় তা হলে বাবার দেখাশোনার জন্য শ্রীরামপুর ঋষি বঙ্কিম সরণি ঘড়ি-ঘড়ি দৌড়ে আসা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। বরঞ্চ যারা অপেক্ষাকৃত কাছেপিঠে থাকে তাদেরই উচিত ছিল নিজেদের মধ্যে একটা সমঝোতা করে নেওয়া এ ব্যাপারে। দীপিকার টিপ্পনির উত্তর অবশ্য দিল অনীশের বউ, দীপিকার বউদি। কুমিল্লার মেয়ে, তার কথার বাঁধুনিই আলাদা। বলল—'তা দিদি, তোমার বড়দা তো সংসারের সবার সুসারের কথা ভেবে ভেবে কোনকালেই গেছেন, কিন্তু মেয়েরাও তো আজকাল সম্পত্তির ভাগ পাচ্ছে। দেখাশোনার বেলা বুঝি শুধুই ছেলে!'

দীপিকা মুখ শুকনো করে জবাব দিল—'তোমার যদি আমার ছেলের মতো একটি গুণধর থাকত! তা হলেই একমাত্র বুঝতে বউদি আসানসোল থেকে শ্রীরামপুর য' ঘণ্টারই রাস্তা হোক, ঘন-ঘন বাপেরবাড়ি আসার ভাগ্যি আমার নয় কেন।'

অতীশের বউ শুক্লা আমুদে মানুষ, ঝগড়াঝাটি, মনকষাকষি পছন্দ করে না। সে হেসে উঠে বলল—'এসে অবধি দেখছি দিদি তুমি সব ব্যাটাকে ছেড়ে বেঁড়ে ব্যাটাকে ধরার মতো বুবুলরামকে ধরেছ। কেন? কী করেছে সে!"

—'কি আর করবে ভাই! কিছুই করেনি। শুধু প্রতিদিনকার রুটিনটা ওর রক্তাক্ষরে লেখা। আজ ভুরুর ওপর ট্যাংরা মাছের কাঁটা। কাল কুঁচকিতে ডিউস বল, পরশু হাত বঁটির ওপর পড়ে দে-গঙ্গা নে-গঙ্গা। এদিকে পাড়া থেকে ওদিকে স্কুল থেকে নালিশের পর নালিশ। যাই না প্রতি বছর ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে উঠছে, তাই অত শয়তানির পরও স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়নি।' পুত্রগর্বে এই সময়ে দীপুর মুখ চকচক করতে থাকে।

—'এত দুষ্টু বুবুলরাম ? কই দেখলে তো মনে হয় না !'

কথাটা অন্য খাতে বওয়াতে পেরে দীপু বেশ খুশি হয়ে গিয়েছিল। সে তো দাদার সঙ্গে ঝগড়া করতে চায়নি। মাঝে মাঝে একটু কুটুস-কামড় দিতে তার ভালো লাগে। সে বলল—'দুষ্টু মানে ? বলছি না শয়তান ! শয়তান ! তার ওপরে বালির বস্তায় ঘুষি মারছে দু-বেলা, আমাকে উবু করে বসিয়ে মাথার ওপর দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে যাবে, না কি কারাটে শেখা হচ্ছে। ক্লাবটি তো হয়েছে সোনায় সোহাগা।'

দীপুর বোন অনীতা বা অনু দিদির পুত্রগর্বে গর্বিত বোধ করছিল। সাধারণত বোনে বোনে এসব ব্যাপারে একটা সহমর্মিতা থাকে। সে বলে উঠল—'মেজবউদি, তুমি শোনোনি, বুবুল অল বেঙ্গল যোগকুমার হয়েছে গত বছর। যোগাসনে চ্যাম্পিয়ন। কী শক্ত শক্ত আসন করে তোমার দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। সার্কাসের প্লাসটিক বডিকে হার মানায়।'

শুক্লা চোখ কপালে তুলে বলে—'বলো কি অনু, ওইটুকু ছেলের এত গুণ ? বুঝতে পারিনি তো ! আমরা জানতুম লেখাপড়াতেই ভালো।'

মহিলাদের আড্ডা যথারীতি ছেলেদের গুণগানে পৌঁছেছে দেখে অনীশ এই সময়ে বিরক্ত হয়ে ঘর ত্যাগ করছিল। অতীশ এসে বলল—'দাদা, তুমি এখানে করছ কি ? বাবার বস দাসসাহেব অফিসের আরও কয়েকজনকে নিয়ে এসে সেই কখন থেকে বসে আছেন। দাসসাহেবকে মনে আছে তো !'

—'দাসসাহেবকে মনে থাকবে না, কি যে তুমি বলো রন্টু ! উনিই তো আমাকে গাইড করেছেন অল্প বয়সে। ওঁর কথাতেই তো আমি কমপিটিটিভ পরীক্ষার দিকে যাই। ডাকবে তো আমাকে !'

লম্বা কোঁচাটা সামলাতে সামলাতে ন্যাড়া মাথায় সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী চেহারার দুই ভাই অবিলম্বে শশব্যস্তে বেরিয়ে গেল।

ছোট বোন ঈষিতা বা ইতুর সঙ্গে দালানেই ঠোকাঠুকি হয়ে গেল দাদাদের। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই দোতলার বড় হলঘর, নিমন্ত্রিতরা সেখানেই বসেছেন। ইতু তাঁদেরই আপ্যায়ন করছিল। দাদাদের সঙ্গে দেখা হতে হাত মুখ নেড়ে বলল—'এই যে গৌর-নিতাই ওরফে জগাই-মাধাই, কোথায় যাওয়া হচ্ছে দু'জনের হন্তদন্ত হয়ে ! ফার্স্ট ব্যাচ বসাতে হবে সে খেয়াল আছে !'

অতীশ বলল—'তুই তো এক্সপার্ট, যা না, দীপু অনু বউদি এদেরও ডেকে নিয়ে যা, শুক্লাটাকে ডাকিস না। উল্টোপাল্টা করবে।'

—'উল্টোপাল্টা করবে, না নিজের বউকে আড়াল করছ বাওয়া !' ইতু ভ্রূভঙ্গি করল।

—'যা, যা, ইয়ার্কি মারিস না। নিয়ে গিয়েই একবার মজাটা দ্যাখ না—মাসিকে কেমন মামী বলে, কাকাকে দাদা, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপালে মজাটা নিজেই টের পাবি।'

অতীশ আর দাঁড়াল না, দাদা এগিয়ে গেছে, সেও কোঁচাটা হাতে তুলে নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল। দাসসাহেবরা অনেকক্ষণ বসে আছেন। বাড়ির বড় ছেলে অনীশ যখন ফার্স্ট ক্লাস অনার্স নিয়ে বি এসসি পাস করল তখন এই দাসসাহেবই তাঁর রাশভারি গাড়ি চড়ে এক বাক্স কেক নিয়ে থিয়েটার রোড থেকে শ্রীরামপুর এই সারাটা পথ উজিয়ে এসেছিলেন। গমগমে গলায় পুরনো বাড়ির অলিগলি ভরে দিয়ে বলেছিলেন—'দেখবেন রাখহরিবাবু, ছেলেকে যেন আবার এম এসসি-তে ভর্তি করবেন না। কমপিটিটিভ পরীক্ষায় বসান।'

—'সে কি ? অত ভালো রেজাল্ট করল ছেলেটা, পড়াব না !'

—'কেন ? কেরানীগিরি করতে ! না দুশ পঁচাত্তর টাকার মাস্টারি করতে ! অনীশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের পরীক্ষায় বসবে এই আমার হুকুম। এম এসসি-টি ভুলে যাও। বাঙালির ছেলে অল ইন্ডিয়া কমপিটিশনে ক্রমশ পেছিয়ে পড়ছে রাখহরিবাবু। মাদ্রাজি, ইউ পি, এমন কি বেহার থেকে পর্যন্ত সব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে যাচ্ছে, আর এই বইয়ের পোকা বঙ্গসন্তান সব ফ্যারাডে আর এডিসনের ভূত মাথায় পুরে দিন আনছে দিন খাচ্ছে।'

অনীশ যে সময়ে আই পি এস হয়েছিল সে সময়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে সত্যিই এ লাইনে চিন্তা করত না। মধ্যবিত্ত বাবা তো নয়ই। অশীতিপর দাসসাহেবকে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করতে করতে অনীশের সেই কথাই মনে হচ্ছিল।

—'থাক, থাক, দীর্ঘায়ু হও বাবা।' দাঁত পড়ে, চুল খুইয়ে এককালের সাহেব মানুষটি এখন খুব ঘরোয়া বাঙালি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। ঝুলন্ত মুখগহ্বরে সব সময়েই যেন কী চিবোচ্ছেন। হাতে লাঠি। ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি-র ভেতরে কোনও মানুষের শরীর আছে কি না সন্দেহ হয়।

—'তোমাদের পিতৃদেব সেন্ট পার্সেন্ট সৎ মানুষ, সৎ নাগরিক ছিলেন বাবা। কর্তব্যপরায়ণ, স্বার্থশূন্য, পরহিতৈষী। স্ত্রী বিয়োগের পরও তাঁকে দশ-দশটা বছর এভাবে বেঁচে থাকতে হল কেন জানি না। সবই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা।'

অনীশের শ্বশুরমশাই উপস্থিত ছিলেন, বললেন—'আমার বেয়ান রত্নগর্ভা ছিলেন রাধামোহনবাবু। ছেলে মেয়ে কটি সবই তো তাঁর দয়ায় সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি যেখানে যেমন রেখেছেন, সেখানেই থাকতে বাধ্য তো সব। যথা নিযুক্তোহস্মি, তথা করোমি। তবে দেখাশোনা সব বাবাজিরা পালা করেই করত। তার ওপরে সবার মাথায় ছিলেন আমার আরেক বেয়ান। এদের পিসিমা। দাদাকে দু হাতে আগলে রেখেছিলেন, এদের গর্ভধারিণীর অভাব জানতে দেননি। যাওয়া-আসা একরকম নিত্যই করতুম কি না ! পানটি ছেঁচা, সময়ে ফলের রস, চা, শরবৎ, বেলের মোরব্বা, ইসবগুল। একেবারে তেরেকেটে ধা, তালে বাঁধা, তাল কাটার কোনও উপায় নেই।'

—'তাই নাকি ! তাই নাকি !' দাসসাহেবের সচল মুখ আরও সচল হয়ে উঠল। —'তা হলে তো রাখহরিবাবুর অশেষ পুণ্য। আমি তো একটি মাত্র কন্যার কানাডায় বিয়ে দিয়ে মনে মনে দিন গুনি দাদা, গৃহিণীর তিরোধান যেন সইতে না হয়। জপের মালার মতো জপি দিনরাত। আহা, উইডোয়ারের দুঃখে শেয়াল কুকুরও কাঁদে, জানেন তো দাদা ! তা সেই পুণ্যবতী ভগ্নীটি আমার কই ! তাঁকে দর্শন করে চক্ষু সার্থক করি একবার।'

দাসসাহেবের সামান্য ভীমরতি হয়েছে সেটা অনীশ অতীশ দু ভাই-ই বেশ বুঝতে পারছিল। কিন্তু নখদন্তহীন এই ব্যাঘ্রই একদিন দোর্দণ্ড প্রতাপ এবং এ বাড়ির গার্জেন এঞ্জেল ছিলেন স্মরণ করে অনীশ বলল—'রণ্টু, পিসিমাকে একবার আনো।'

শ্রাদ্ধের দিন এসেছিলেন দাসসাহেব, তাঁর পুরনো মরিস মাইনরে চেপে। কিন্তু সেদিন এরা ভাইয়েরা সবাই কাজে ব্যস্ত ছিল। ষোড়শোপচার শ্রাদ্ধ। একেবারে শাস্ত্রবিধিসম্মত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পুরোহিত। তিনি কোনও কাজে একবিন্দু আপস সইবেন না। কাজে কাজেই সেদিন এত কথাবার্তা আপ্যায়নের সুযোগ ছিল না। কীর্তন শুনে, প্যালা দিয়ে, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কাছে মিনিট দশেক বসে লিমকা আর রাজভোগ

খেয়ে ফিরে গিয়েছিলেন বৃদ্ধ আর সবাইয়ের মতো।

অতীশ পিসিমাকে দোতলায় মেয়েদের ঘর থেকে সিঁড়ি নামিয়ে বড় দালান পেরিয়ে আনতে আনতে গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছিল। এর চেয়ে যদি দাসসাহেব তার বউ শুক্লাকে আনতে বলতেন কাজটা আরও সহজ এবং মনোজ্ঞ হত। শুক্লা সপ্রতিভ, পরিহাসপটু, সুশ্রী, সুশ্রী কেন রীতিমত সুন্দরীই। আজ বার দিন পর নখ-টখ পালিশ করে, চুলে শ্যাম্পু দিয়ে, সিঁদুর টিপ পরে, নতুন গোল্ডেন সিল্ক টাঙ্গাইল পরে দেখাচ্ছে দারুণ! টকটক করে আসত, টুকটুক করে কথা বলত। কিন্তু এই পিসিমাকে নিয়ে যেতে তার দম বেরিয়ে যাচ্ছে। একেই তো তিয়াত্তরের ওপর বয়স হয়েছে। মাথাটি সাদা কালো কদম ফুল। বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচির মতো এক পেল্লাই সাইজের মাড় খড়খড়ে থান পরিয়েছে ভাইঝি আর ভাইপো বউয়েরা মিলে। পায়ে বাত, দাদাটি গত হবার পরই পিসিমা যেন হঠাৎ করে আশি পেরিয়ে পড়েছেন। জড়ভরত, পুঁটলির মতো। চোখ চলে না, পা চলে না। অতীশ বিরক্ত হয়ে বলল—'তোমার কি কুশ পা না কি গো, পিসিমা! এত ফ্যাশনের কাপড়ই বা তোমাকে পরালো কে! এ যে কুইন এলিজাবেথের গাউনের মতো চারদিক থেকে ফুলে রয়েছে! যাচ্চলে!'

পিসিমার দাঁতগুলি এই বয়সেও গুটিকয় কষের দাঁত ছাড়া, মোটামুটি আছে। বললেন—'আমি কি আর পারি ধন? মানিক আমার! এখন তোমরাই আমার হাত পা, তোমরাই আমার চোখ, যদি নিয়ে যেতে পারো তো গেলুম। নয় তো এখেনেই বসলুম।'

অতীশ বলল—'ভালো জ্বালা। থামা দিলে কেন? দাসসাহেব তোমাকে দেখতে চাচ্ছেন যে!'

শেষ ব্যাচ সুদ্ধু বাড়ির ভাইবোন বউজামাই লোকজনকে নিয়ে। পিসিমা তখনও দাঁড়িয়ে থাকতে চাইছেন দেখে অনীশের বউ প্রতিমা জোর দিয়ে বলল—'তা হয় না পিসিমা, আপনি এবার গিয়ে একটু শুয়ে পড়ুন।'

পিসিমা বললেন—'তুই মা পূর্ববঙ্গের মেয়ে হয়ে দুপুরে শোয়ার কথা মুখে আনিস কি করে? আমার শুতে লাগবে না।'

—'খেলেনও না তো কিছু!'

—'বাঃ, দু-দুটো পুরুষ্টু কলা, হাতাভর চিঁড়ে ভিজে, সন্দেশ! ভেসে যায় রে, ভেসে যায়। তিয়াত্তর পার হয়ে চুয়াত্তরে পড়লুম—একবেলা দুটোখানি যা হক হলেই এ শরীর চলতে থাকে ঠিক। এখন তো আর শরীরের জোরে চলি না ধন, মনের জোরে চলি।'

ছোট একটি মোড়া টেনে, গুটিসুটি বসলেন পিসিমা একধারে।

—'শোলপোড়া একটু একটু মুখে দাও মা, শুক্লা, মেজবউমা, ফেলে দিসনি। ভাতের মধ্যে করে একটু গিলে নে মা, দশহরার দিন যেমন কলা গেলো।'

অনীশ বলল—'এ সব পুরনো আচার-বিচার আর নেই পিসিমা, যেটুকু আছে উঠিয়ে দাও।'

শুক্লা অতীশকে বলল—'দশহরার দিনে কলা গেলা কি গো!'

—'ওসব কলা গেলা ফেলা কি আমি জানি?' অতীশ বলল।

দীপিকা উল্টো দিকে বসে ছিল, বলল—'কেন, তোর মনে নেই মেজদা, দশহরার দিনে কলার মধ্যে উচ্ছে পুরে মা আমাদের গিলিয়ে খাওয়াতো। খুব নাকি ভালো প্রতিষেধক! সত্যিই আমাদের কিন্তু রোগভোগগুলো কম হত। হপ্তায় দু দিন চিরেতা, দু দিন কালমেঘ। সেসব দিন গেছে! হাত পা ছোঁড়াছুঁড়ি, কান্নাকাটি, বাব্বাঃ!'

তিনটে নাগাদ মোটের ওপর খালি হয়ে গেল বাড়ি। আত্মীয়-কুটুমরা সব একে একে বিদায় নিলেন। রবিবার বলেই নিমন্ত্রিতরা সবাই এসেছিলেন। অনেক দিন পর সবার সঙ্গে দেখা, খবরাখবর নিতেই সময় চলে যায়। বৃদ্ধেরা সব একে একে যাচ্ছেন। একে একে নিভিছে দেউটি। সেই কথা বলাবলি করতে করতে চলে গেলেন সব। ছেলে-পিলেরা কেউ এখনও ডেকোরেটরের চেয়ার নিয়ে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে, কেউ ঘুমে ঢুলে পড়েছে।

অনু এসে বলল—'তোর ছেলেকে আমি সামলাতে পারলুম না রে দিদি। হেরে গেলুম। বুবুল একাই থ্রি ফোর্থ চেয়ার তুলে দিল। ডেকোরেটরের লোকগুলো বেকার বসে বসে বিড়ি খাচ্ছে আর দাঁত বার করে হাসছে। চেয়ার সারা হয়েছে এবার টেবিল তুলছে। মানে সেই লম্বামতো কাঠগুলো আর কি!'

দীপু পান চিবোতে চিবোতে অলস গলায় বলল—'কেন, দাদা, মেজদা কি করছে?'

—'দাদা মেজদা কি এ তল্লাটে আছে না কি? দাদা তো শ্বশুরকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে গেল। মেজদাও...'

শুক্লা বলল—'এই মেজদি আমি আছি কিন্তু এখানে। বেফাঁস কিছু বলে ফেলো না বাবা।'

অনু মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। ইতু হাসছে। বলল—'আমরা তিন বোনে যা বলি মুখের সামনেই বলি। আড়ালে বলি না মেজবউদি।'

শুক্লা হেসে বলল—'আমরা কিন্তু বুবুলরামকে নিয়ে আরম্ভ করেছিলুম।'

দীপু বলল—'হ্যাঁ হ্যাঁ, সে চেয়ার-টেবিল তুলছে তো! ঠিক আছে। তুলতে দাও। যে ভবিষ্যতে যা হবে তার মহড়া আগে থেকেই শুরু হয়ে যাওয়া ভালো।'

অনু বলল—'তোর ছেলে কি ডেকোরেটর হবে। না কেটারার হবে রে?'

দীপু বলল—'চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হবে ভাই। ওর দ্বারায় আর কিছু হবে না।'

শুক্লা বলল—'বাপ রে, ক্লাসে প্রতিবার ফার্স্ট হয়ে ওঠা ছেলেকে নিয়ে তুমি এত ভাবছ?'

দীপু বলল—'ক্লাস ফোর স্টাফের মধ্যে আই কিউ কম আছে বলে মনে করো নাকি? একেক জন আছে ঠিকমতো গাইড্যান্স দিলে অনেক এঞ্জিনিয়ার ডাক্তারের ভাত মারতে পারত। আসলে প্রবৃত্তি, বউদি প্রবৃত্তি। এঁটো পাত তুলতে যার প্রবৃত্তি সে ভবিষ্যতে এঁটো পাতই তুলবে। কেন, এতগুলো ছেলেমেয়ে তো রয়েছে. দাদার রাই না হয় বড় হয়ে গেছে, কিন্তু তোমার কিষণ অনুর শাম্পি-মাম্পি কেউ আর শূন্য চেয়ার, এঁটো টেবিল তুলছে, এঁটো পাত তুলছে?'

ইতু বলল—'আমার ছেলের অ্যাকটিভিটি বাদ দিলি কেন দিদি? দ্যাখ ও কিসের রিহার্সাল দিচ্ছে।'

ইতুর ছেলের বয়স সাড়ে সাত মাস। সে এখন সবে ঘুম ভেঙে উঠে বড়কর্ম করে মুখটা ভেবলে ছিল। ইতু হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল—'দ্যাখ তোর ফর্মুলা অনুসারে আমার ছেলেটা সারাজীবন এই-ই করবে।'

দীপু হাত বাড়িয়ে বোনের পিঠে একটা কিল বসালো। শুক্লার হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে, বলল—'বাব্বাঃ। ইতুটা পারেও। দেখি, তোমাদের দাদারা আর দিদিভাই কোথায় গেল।'

ইতু চেঁচিয়ে বলল—'দাদার সঙ্গে রা' আর দিদিভাইটা বাদ দে মেজবউদি। তুই কাকে

খুঁজতে যাচ্ছিস আমরা সবাই জানি।'

সকলে হাসতে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর শুক্লা সত্যিই চারজনকে ধরে নিয়ে এলো। অনুর বর আজ আসতেই পারেনি, দীপুর বর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান দেখে আসানসোল ফিরে গেছে। একমাত্র ইতুর বর, বাড়ির ছোট জামাই, জামাইদের মধ্যে উপস্থিত ছিল।

অতীশ এসে কোঁচা গুটিয়ে সবার মাঝখানে জমিয়ে বসে বলল—'বলো এবার তোমরা কে কি বলবে। অনেকক্ষণ ধরে আমাকে খোঁজাখুঁজি হচ্ছে শুনছি।'

দীপু বলল—'খুঁজছিল আসলে শুক্লা, কিন্তু তুই যখন এসেই গেছিস তখন ধর আমরাও তোকে খুঁজছিলুম। কদ্দিন পর ভাইবোনেরা মিললুম বল তো! কথায় বলে রাজায় রাজায় দেখা হয়, বোনে বোনে হয় না। আমাদের শুধু বোনে বোনে নয়, ভাইবোনেও দেখা হয় না রে!'

অনীশ বলল—'তা বাচ্চাগুলো সব কে কোথায়? দীপুর ছেলেটা তো দেখলুম ইসমাইলের সঙ্গে জোর তর্ক জুড়েছে। ইসমাইল বলছে ওদের গ্রামে নাকি কে এক খুনখুনে বুড়ো আছে, দুশ তিয়াত্তর বছর বয়স। দীপুর ছেলে বলছে তা হতেই পারে না, গিনেস বুকে না কি ও কোন রাশিয়ান না চীনে বুড়োর নাম দেখেছে।'

অনু বলল—'সত্যি! বুড়ো হওয়ার কী কষ্ট, না? বাবার কত হয়েছিল গো!'

দীপু বলল—'তিরাশি। কানে শোনেন না, চোখে দেখেন না, দাঁত নেই যে পছন্দের জিনিস খাবেন।'

অনীশ বলল—'কেন, বাবার তো বাঁধানো দাঁত ছিল।'

প্রতিমা বলল—'থাকলে কি হবে, বাবা তো সেটা নিয়মিত ব্যবহারই করলেন না, একটু লাগত, প্রথম দিকে যেমন লাগে। আমার বাবার তো ষাটের কোঠা থেকেই পুরো বাঁধানো। এঁর মাথায় কে ঢুকিয়েছিল ক্যানসার হতে পারে। ব্যাস্।'

ইতু বলল—'চোখের ছানি কাটানো নিয়ে তো সেই সত্তর বছর থেকে বলা হচ্ছে। তখন মা-ও বেঁচে, আমারও বিয়ে হয়নি। খালি এক কথা কটা দিনই বা আর বাঁচব, এই চোখেই আমার চলে যাবে।'

অতীশ বলল—'সেই সত্তর তিরাশিতে গড়াল। আজকাল এসব অপারেশন কিচ্ছু না, দু'ঘণ্টা পরে ছেড়ে দেয়। আমায় একবারটি অনুমতি দিলেই নেত্রালয়ে ব্যবস্থা করে দিতুম। করতে তো দিলেন না।'

দীপু বলল—'শয্যাশায়ী হয়ে পড়েননি, বেডসোর হয়ে যায়নি, সে শুধু পিসিমার জন্যে। দু ভাইবোনে টুকটুক করতে করতে দু'বেলা ছাদে উঠতেন, গাছের পরিচর্যা করতেন। বাবা সোজা-সমর্থই গেছেন। নিরামিষ ছাড়া খেতে ভালোবাসতেন না ইদানীং।'

ইতু বলল—'আমরা এলে কিন্তু পিসিমার মাছ-মাংস আনানো চাই।'

অনু বলল—'ইতু তোর পিসিমার হাতের আলুর তরকারি মনে আছে? আর নটে শাকের চচ্চড়ি?'

ইতু বলল—'থাকবে না আবার! মজাটা শোন না! আমি তো আগে শাক-টাক খেতুম না! আলুও খুব একটা পছন্দ করতুম না। ওদিকে ভাগলপুরে ওদের বাড়িতে বিহারী বামুন রাঁধে। সে কি জঘন্য ধারণা করতে পারবি না। শুধু অড়র ডাল আর বেগুন-চোখা বলে ওদের নিজস্ব একটা রান্না ভালো করত। আমাদের এদিকের রান্না কিচ্ছু পারে না। আমার শাশুড়ি তো আবার অ্যাডভোকেট। এসব দিকে হুঁশ খেয়াল নেই। আমি তিন

মাস পরে বাড়ি এসে পিসিমার হেঁশেলে উঁকি দিয়েছি। পিসিমা বলল—"যা খেতে বসগে যা, দিচ্ছি।" আমি বললুম—"যা যা রেঁধেছ একটু একটু দিও পিসিমা।" পিসিমা বলল—"নটেশাকের চচ্চড়ি তুই খাবি ?" আমি বললুম—"জরুর।" ওরে দিদি রে, বউদি রে, সে কি রান্নারে, মুখ ছেড়ে গেল একেবারে। বিকেলবেলা পিসিমা নরম সাদা সাদা পরোটা করে দিল আর আলুর তরকারি। দম নয়, তরকারি। তার কী স্বাদ !'

অনু বলল—'আমার শ্বশুরবাড়িতে তো ফি বছর একঝুড়ি করে খাজা যায়। আমাদের আশেপাশে তো জ্ঞাতি ভাসুর-দেওররা থাকে, তাদের ভাগ দিই। এমন হয়েছে পুজোর ষষ্ঠীর দিন থেকে ওরা সব বলতে থাকবে বউদি, বউদি, অনীতা, অনীতা এবার পিসিমা খাজা পাঠাবেন তো ! এমনি হ্যাংলা !'

অতীশ বলল—'এ আর বেশি কথা কি ! দুর্গাপুরে যখন আমার প্রথম পোস্টিং হয়, পিসিমাকে নিয়ে গিয়েছিলুম। শী সুন বিকেম আ পপুলার ফিগার। ছাত্ররা, কলীগ-রা সব আমাকে যত না চেনে, পিসিমাকে চেনে তার চেয়ে অনেক বেশি। আরে আমার পরিচয়ই হয়ে গেল "পিসিমার ভাইপো", ওই খাজা গজা, মালপো, আচার আরও কি কি সব তোদের আছে ! বেগতিক দেখে একদিন বললুম—"পিসিমা তোমাকে আনলুম আমার খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে দূর করবার জন্য, এদিকে তুমি সারা দুর্গাপুরের খাওয়া-দাওয়ার ভার নিয়ে বসে আছো ? এরকম রান্না রাঁধলে তো আমাকে পথে বসতে হবে !" পিসিমা হেসে বলল—"কেন ? কেউ খেতে চাইছে ?" পি আর সেন ছিল একেনম্বরের পেটুক, বুঝলি ! ও-ই ধরেছিল। পিসিমা আমাকে অভয় দিয়ে বললে—"দাঁড়া আমি দেখছি কি করা যায়।" সেদিন বিকেলে পি আর সেন এসেছে, পিসিমা এক প্লেট রসবড়া দিয়ে বললে—"পিনাকী, ক'দিন ধরেই বাবা খুব একটা সাধ জাগছে তোমাকে নিয়ে।" পি আর সেন বলল—"বলুন পিসিমা, এ ভাইপো আপনার হুকুম তামিল করতে সব সময়ে হুজুরে হাজির। বলুন, ক'বার বাজার যেতে হবে ?" পিসিমা বলল—"তা একটু যেতে হবে বাবা। তোমার বাড়িতে আমার হাতে একদিন সব্বাইকে খাওয়াবে এই আমার সাধ বাবা।" পি আর সেন পড়েছে এদিকে ফাঁপরে। কিন্তু এত ভালোবাসত পিসিমাকে সঙ্গে সঙ্গে পিসিমাকে কোলে তুলে নিয়ে ধেই ধেই নাচ। আমাকে এতটুকু খাটতে পর্যন্ত হয়নি। ক্যামপাসসুদ্ধ কলীগ-কে খাইয়েছিল পিসিমার হাতে। ধন্য ধন্য রব চারদিকে।'

দীপু বলল—'পিসিমা তো তা হলে বুদ্ধিও ধরে খুব। আই কিউ টেস্ট করলে নিশ্চয় অ্যাবভ অ্যাভারেজ হবে।'

অনীশ বলল—'তা তো হতেই পারে। মারই তো দেখেছি কী ভীষণ স্মৃতিশক্তি, যে-কোনও ঘটনার সাল তারিখ অবিকল বলে দিতে পারত। কবে ইতু কী মজার কথা বলেছিল, রন্টু কোথা-থেকে এশিয়াটিক কলেরা নিয়ে এলো, আমার বন্ধুরা আড্ডা মারতে মারতে মাকে কবে কি বলেছিল, সব মা মুখস্ত বলে দিত। সাঙ্ঘাতিক মেধা। আমাদের দেশের অনেক বয়স্ক লোকের মধ্যেই এটা পাবি। অরিজিন্যাল ব্রেন পাওয়ারটা যাবে কোথায় বল ? তা পিসিমা এখন কোথায় !'

—'একটু শুতে পাঠিয়েছি জোর করে,' অনু ইতু বলল।

অনীশ বলল—'একটা খুব জরুরি কথা আছে, এখনই সেটা সেরে নেওয়া ভালো। জামাইরাও সব থাকলে ভালো হত। যাক্ সে, নেই যখন আমাদের নিজেদের মধ্যেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হওয়া দরকার।'

অনীশের গম্ভীর গলা শুনে অনু ঘাবড়ে গিয়েছিল, বলল—'অত সিরিয়াস কেন রে

দাদা, একটু হাসিমুখে যা বলবি বল না বাবা! তোর রকম দেখে আমার বুক ধড়ফড় করছে!'

অনীশ গলা খাটো করে বলল—'এই এত বড় বাড়িখানাতে পিসিমা এখন একেবারে একা হয়ে গেল, এটা কেউ খেয়াল করেছ? একদম একলা। তিয়াত্তর বছরের একজন বৃদ্ধাকে এইভাবে রাখা ঠিক কি না তোমরা বলো!'

দীপু বলল—'তাই তো! তা হলে! একটা বিশ্বাসী লোক পর্যন্ত নেই।'

অতীশ বলল—'বিশ্বাসী লোকের কথা ছাড়ো। বিশ্বাসী অবিশ্বাসী কোনও লোকের হাতেই এত বড় বাড়ি এবং একজন বৃদ্ধাকে ছেড়ে রাখা যায় না। একমাত্র উপায় আমাদের কেউ সঙ্গে থাকা। অনু, তুই পারবি!'

অনু বা অনীতা বালিগঞ্জ প্লেসে থাকে। স্বামীর নিজস্ব অডিটর্স ফার্ম। সেটা গড়িয়ার দিকে। বাড়িতে শ্বশুর-শাশুড়িও আছেন। অনীতা বলল—'আমি আসা-যাওয়া করতে পারি। কিন্তু এসে থাকা ইম্‌পসিব্‌ল্। আমার শ্বশুরেরও চুয়াত্তর হল। শাশুড়ির উনসত্তর। তাঁদেরও তো আমাকে চব্বিশ ঘণ্টাই দেখতে হয়। শাম্পি-মাম্পি মডার্নে পড়ে। কত কষ্ট করে, কত কাঠ খড় পুড়িয়ে ওদের ভর্তি করা!'

অনীশ বলল—'অনুই একমাত্র কলকাতায় থাকে। তারই যখন এসে থাকবার প্রশ্ন উঠছে না, তখন অন্যদের তো কথাই নেই। তা হলে উপায় পিসিমাকেই নিয়ে যাওয়া। আমার দ্যাখ অনিশ্চিত অবস্থা, তিন বছর হয়ে এলো, যে-কোনও জায়গায় যে কোনও মুহূর্তে বদলি হয়ে যেতে পারি। যেখানেই যাই, বড় কোয়ার্টার্স পাবো। সবই ঠিক। কিন্তু আমাকে সবসময়ে ডেঞ্জার জোন-এ থাকতে হয়, যেতে হয়। রাইকেই আমি হস্টেলে রাখি। প্রতিমাকেও অন্যত্র রাখলে ভালো হয়, তার ওপর পিসিমার মতো একজন পর-নির্ভরশীল বৃদ্ধাকে নিয়ে গেলে আমার কিংবা প্রতিমার এক হপ্তার মধ্যে দুশ্চিন্তায় স্ট্রোক হয়ে যাবে। রণ্টু, তুই কি বলিস!'

অতীশ বলল—'তুমি তো জানোই দাদা, মাস তিনেকের মধ্যে আমার জার্মানি যাবার কথা। কিষণকে বোর্ডিং-এ রেখে, শুক্লাকেও নিয়ে যাবো ভেবেছি। স্ত্রী অ্যালাউড। এরকম সুযোগ ওর জীবনে দু'বার আসবে না। পিসিমাকে নিয়ে গেলে তো সেটা সম্ভব নয়! দীপু তুই তো পারিস? অনু ইতু দু'জনেরই শ্বশুর-শাশুড়ি রয়েছেন, অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনও রয়েছে। তাদের মাঝখানে পিসিমাকে নিয়ে-যাওয়াটা তো ঠিক যুক্তিযুক্ত হবে না!'

দীপু আমতা আমতা করে বলল—'ও নেই। ওর মত না নিয়ে তো আমি কিছু বলতে পারি না। তা ছাড়া ও সাঙ্ঘাতিক রাগী মানুষ। এটা আমি লুকোছাপা করি না। তোমাদেরই জামাই, তোমরাই দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছ। যেকালে তোমাদের জামাইয়ের পান থেকে চুন খসলে রৈ রৈ কাণ্ড হয়, সেকালে তার অনুমতি না নিয়ে পিসিমাকে তার সংসারে নিয়ে যাবার সাহস আমার নেই। তা ছাড়া আমি জানি, অনুমতি সে দেবে না, বাড়িতে থার্ড পার্সন তার একদমই পছন্দ নয়।'

অনীশ হতাশ হয়ে বলল—'তা হলে?'

অতীশ বলল—'তা হলে একটাই উপায় বাকি রইল। অনেক ভালো ভালো বৃদ্ধাবাস হয়েছে আজকাল। তারই একটাতে দেখেশুনে দিয়ে দাও।'

অনীশ বলল—'বাড়ি?'

—'বাড়ি বিক্রি করে আমরা পাঁচজনে ভাগ করে নেবো। শ্রীরামপুরে তো আর কেউ

থাকতে আসছে না। আমি দুর্গাপুরেই জমি কিনেছি। বাড়িটা তা হলে আরম্ভ করে দিতে পারি, এ-বাড়ি বিক্রির টাকাটা পেলে।'

অনীশ চিন্তিত মুখে বলল—'বাড়ি তো সত্যিই আমারও দরকার। আমি হয়ত শেষ পর্যন্ত দিল্লিতেই সেট্‌ল করব। টাকাটা পেলে আমারও সুবিধে হয়। তবে পাঁচ ভাগ করে আর শেষ পর্যন্ত কিই বা থাকবে?'

দীপু অনু নীরবে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল। দীপু বলল—'ভাগ ছেড়ে দেওয়ার কথা যদি বলো, তা হলে তোমাদের জামাইদের উপস্থিতি দরকার।'

অতীশ বলল—'বাজে বকিসনি। বাড়ির ভাগ থাকলে তোদেরই থাকবে। জামাইদের তো আর ভাগ নয়। যা বলবার তোরা অনায়াসেই বলতে পারিস।'

ইতু বলল—'শ্বশুরবাড়ির হাত তোলা হয়ে থাকি। পাঁচ ভূতের বাড়ি। ওর পর্যন্ত রোজগারের পাই-পয়সা শ্বশুরের হাতে তুলে দিতে হয়। হাতে নিজস্ব টাকা না থাকার কি কষ্ট সে আমিই জানি।'

অনু বলল—'যা বলেছিস। আমারও সেই এক কথা। চাবি শাশুড়ির কাছে, কর্তৃত্ব তাঁর, খাটুনি আমার। কখনও যদি হাত-খরচ কিছু দিল তো তার ডেবিট-ক্রেডিট দাখিল করো, জার্নাল মেনটেন করো। বাব্বাঃ।'

দীপু বলল—'দেখো বড়দা-মেজদা ভদ্রেশ্বরের বাড়ি ওদের পৈতৃক। সাত ভাইয়ের ভাগ। বুঝতেই পারছো কি অবস্থা। তিন ভাই বাইরে থাকে। বাকি চার ভাই ভদ্রাসন কামড়ে পড়ে আছে। এদিকে এলেও তো বরাবর আমি বাবার কাছে উঠি। শ্বশুরবাড়ির ভাগ পেয়ে তাতে জমি কিনে বাড়ি তুলতে হলে আমাকে এক জন্ম ঘুরে আসতে হবে। এ বাড়ির ভাগের টাকাটা পাই তো আসানসোলে হোক, ভদ্রেশ্বরে হোক, যেখানে হোক একটা মাথা গোঁজার আস্তানা করার কথা ভাবতে পারি।'

অনীশ বলল—'ঠিক আছে। ঠিক আছে। তবে ওই কথাই রইল। সবাই বৃদ্ধাবাসের খোঁজ করতে থাকো, আমি আর দিন সাতেক আছি, এরই মধ্যে যা হয় ব্যবস্থা করতে হবে।'

এই সময়ে দরজায় শব্দ হল। পিসিমার কদমফুল মাথাটি দেখা গেল, তিনি দরজাটা হাট করে খুলে দিয়ে বললেন—'দীনু আয় বাবা, এখানে আমার চাঁদের হাট বসেছে। বড় বউমা ধন আমার, দীনুর ট্রে থেকে চা-গুলো সব ঢেলে ঢেলে তুলে তুলে দাও তো মা!'

প্রতিমা, ইতু দু'জনেই উঠে পড়ল। প্রতিমা চা ঢালছে আর ইতু কাপগুলো এগিয়ে এগিয়ে দিচ্ছে। দিতে দিতে ইতু বলল—'এ কি পিসিমা, মাছভাজা, পাঁপড়ভাজা এসব কি কাণ্ড? পানতুয়া! দুপুরের অত খাওয়ার পর!'

পিসিমা বললেন—'তুই থাম তো মুখপুড়ী। লুচির ফোসকা ছিঁড়ে ছিঁড়ে তুই মড়ার দড়া হয়ে থাকবি তো থাক। দুপুরে গাঁই গোত্তর সব খাইয়ে তোরা কতটুকু দাঁতে কেটেছিস যেন আমি দেখিনি: ঠাকুরকে সব মাছ কালিয়ায় দিতে দিইনি। এখন সব খা, গরম গরম ভালো করে খা। মণ্টু খবর্দার না বলবি না, মেজবউমা, তুমি রণ্টু ধনকে জোর করে খাইয়ে দাও তো, তুমি বললে কেমন না খায় দেখি। ...দীপু মানিক, ছেলের দৌরাত্ম্যে দুপুরে কিছু খাওনি মা আমি দেখেছি।'

অনু বলল—'আমায় ধন মানিক কিচ্ছু বললে না পিসিমা, খেতেও বললে না। আমি খাবো না যাও। গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না, না?'

পিসিমা একমুখ হেসে বললেন—'তোকে যে আমি কোলে বসিয়ে খাইয়ে দেবো মা।

তোর যে আলাদা খাতির ! শিবঠাকুরের তো লক্ষ্মী সরস্বতী আছেই, কিন্তু তাঁর একদম নিজের নিজস্ব কন্যেটি যে মা'মনসা, তার জায়গা যে ঠাকুরের একেবারে কোলে-কাঁখে !'

সত্যিই, অনু হবার সময়ে তার মা যায়-যায় হয়ে ছিলেন। অনেক দিন খাওয়ানো-দাওয়ানো তো দূরের কথা, একটু কোলে করাও তাঁর বারণ ছিল। অনুকে পিসিমাই একরকম বড় করেছেন।

শুক্লা বলল—'পিসিমা বসুন না, এই যে মোড়াটাতে বসুন।'

—'তা বসব বইকি,' পিসিমা বললেন—'এমন জমজমে আনন্দমেলা বসেছে, দেখব না ? দু'টো চোখ যখন ভগবান এখনও রেখেছেন তখন দেখে সাধ পুন্ন করি।'

অতীশ বলল—'বাবার শ্রাদ্ধের নিয়মভঙ্গ উপলক্ষে এই জমায়েত। একে তুমি আনন্দমেলা বলছ পিসিমা ?'

—'বলব না তো কি ! দাদা নিজেও ওপর থেকে দেখে দেখে ঠিক এই কথাই বলছে যে রে, বউদির সঙ্গে হাসতে হাসতে বলছে। আমরা না ম'লে যে তোরা একত্তর হস না বাবা। সে বেশ গেছে। ভগবান করুন আমিও যেন এমনি যেতে পারি। তখনও তোরা এমনি মেলা বসাবি, আমোদ আহ্লাদ করবি। খুনসুটি করবি...।'

পিসিমা আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছলেন।

দিন তিনেক পরে খোঁজখবর করে অতীশ এসে অনীশকে বলল—'দাদা একটা ভীষণ মুশকিল হয়ে যাচ্ছে।'

—'কেন রে ?'

—'বৃদ্ধবাস ইজ অল রাইট। কিন্তু ভালোগুলো সবই বেশ মোটা টাকা চায়। কয়েকটা তো আবার প্রথমেই থোক টাকা জমা রাখতে বলছে।'

—'তুই মিশনারিদেরগুলো খোঁজ করেছিলি ?'

—'করেছি, কিন্তু পিসিমার স্ট্রিক্ট্ ব্রাহ্মিনিজম্ তো জানিসই। মিশনারি প্রতিষ্ঠানে রাখলে শেষে অন্নজল না ত্যাগ করে।'

—'ভাবালে।' অনীশ চিন্তিত মুখে বলল, 'দেখি আমার সোর্সগুলো ট্যাপ করে দেখি।'

শেষ পর্যন্ত অবশ্য অনুর বর রঞ্জিত খবর আনল একটা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের। পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা পুরোপুরি হিন্দুই। তবে সব জাতের বৃদ্ধ বৃদ্ধাই তারা রাখে, একেবারে বিনা পয়সায়। জায়গাটা শেয়ালদা লাইনে, একদিন অনীশ, অতীশ, রঞ্জিতের সঙ্গে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে এলো। ভালোই মনে হচ্ছে। বহু বড় বড় লোকের গোপন ডোনেশন আছে, ওরা কিছু নেয় না। নেহাত পীড়াপীড়ি করলে হয়ত ডোনেশন কিছু নিতে পারে। পিসিমার কাছে তারপর ভাঙা হল কথাটা।

দীপু বলল—'পিসিমা, তুমি এখন কি করবে ?'

—'কিসের কি রে ?'

—'না মানে কোথায় থাকবে ? কিভাবে ? সে কথা কিছু ভেবেছো ? ছেলেমেয়েরা সবাই উপস্থিত। পিসিমা অবাক চোখে চেয়ে বললেন—'একটা নয়, দুটো নয়, পাঁচ-পাঁচটা ছেলেমেয়ে আমার। তিয়াত্তর বছর বয়সে আমার ভাবনা আমি ভাবব ?'

ছেলে-মেয়ে সকলেই চুপ করে রয়েছে। অতীশই শেষে বলল—'ঠিক আছে। তোমার ভাবনা আমরা ভাবব তো ? ভাবতে দিচ্ছো তা হলে ! শোনো তবে, তোমার জন্যে শ্যামনগরে একটা খুব ভালো প্রতিষ্ঠান দেখা হয়েছে। সেখানেই তুমি থাকবে। ওরাই

তোমার দেখাশোনা করবে। আমরা যে যখন পারি মাঝেমধ্যেই যাবো, দেখে আসবো। হিন্দুদের জায়গা পুরোপুরি, কেরেস্তান-টান, ম্লেচ্ছ-টেচ্ছ ব্যাপার নয়, তুমি নিজের মতো থাকতে পারবে।'

পিসিমা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। বিস্ময়ে তাঁর মাথা থেকে ঘোমটা খসে পড়েছে। হাবলা মুখে তিনি বললেন—'পতিষ্ঠান? পতিষ্ঠান আমার কি করবে রণ্টু? এ বাড়িতে, এই 'ড্যাস গল'-এ আমি থাকতে পাবো না?' বাড়িটার নাম 'গ্রেস ডেল'। পিসিমা বরাবর উল্টোপাল্টা বলে এসেছেন। ওই উল্টোপাল্টা নামটাই তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়।'

অপ্রস্তুত মুখে অতীশ বলল—'থাকতে পাবে না কেন? কিন্তু এখানে কে তোমার দেখাশোনা করবে? সেটাই তো হচ্ছে মুশকিল। বয়সটা তো তোমার বাড়ছে? না কমছে! এত বড় বাড়ি দেখাশোনা পরিচ্ছন্ন রাখা চাট্টিখানি কথা না কি? সেরকম বিশ্বাসী লোকই বা কই?'

—'কেন রণ্টু, দীনু রইল। তোরা মাস গেলে দু'শ একশ যে যা পারিস দিতিস, বাবা থাকতে যেমন দিচ্ছিলি! আমার ভেসে যেত। তোরা এদিকে এলে সব আমার কাছে আসবি। খাবি, থাকবি।'

—'তারপর তোমার অসুখ-বিসুখ করলে?'

—'আমার কিচ্ছু হবে না ধন। ভগবানের আশীর্বাদে আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যাবো। দীনুও রইল।'

—'দীনুকে আমরা অতটা বিশ্বাস বা নির্ভর করতে পারছি না পিসিমা। ফসল-কাটার সময় হলেই তো ও দেশে চলে যাবে, দু মাস তিন মাস বেপাত্তা। শেষকালে দেখবে এ বাড়ি জবরদখল হয়ে যাবে। ওই দীনুই সাহায্য করবে তাদের।'

—'তা হলে?'

—'তা হলে যা বললুম, খুব সুন্দর জায়গায় থাকবে তুমি, আমি জার্মানি থেকে ফিরে তোমায় নিয়ে যাবো'খন, দাদার সুবিধে হলে দাদাও নিয়ে যাবে। আপাতত তো এ ছাড়া অন্য উপায় দেখছি না।'

পিসিমা কিছু বললেন না। অনীশ-অতীশের কাজ ছিল। বেরিয়ে গেল। বাইরে বাড়ির দালাল। ওদিকে মিউনিসিপ্যালিটিতে যেতে হবে, মিউটেশনের জন্য কী কী করা দরকার...। সবই তো এই ক'দিনের মধ্যে! প্রতিমা রাইকে নিয়ে পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছে। তার মেয়ের মাথায় ঈষৎ সোনালি চুল, টকটকে রঙ, সুন্দরী না হলেও জৌলুষ-অলা চেহারা। সে মিরান্দা হাউজে পড়ে। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে এসে সেই ছোট্ট এতটুকু রাইকে এত বড়, এত সুন্দর দেখে পাড়ার অনেকেই মুগ্ধ। তাদেরই অনুরোধে এই সামাজিক নিয়মরক্ষা। শুক্লা কিছুক্ষণ বসেছিল, হঠাৎ মনে হল কিষণকে অনেকক্ষণ দেখেনি, কে জানে বুবুল দুরন্ত ছেলে তার সঙ্গে মিলে কি বদবুদ্ধি করছে! সে 'কিষণ কিষণটা কোথায় গেল' বলতে বলতে উঠে গেল। দীপু বসে বসে নখ খুঁটছিল, তিন বোনে সামান্য আগে পরে পিসিমার ঘর থেকে সন্তর্পণে বেরিয়ে গেল। পিসিমা ছোট মোড়ার ওপর বসেই রইলেন, বসেই রইলেন। তাঁর মুখের ওপর দিয়েই সন্ধে গড়াল, রাত হল। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে পিসিমার দশটি বছর বয়স বেড়ে গেল।

সইসাবুদ শেষ হলে দীপিকা বলল—'আচ্ছা মাতাজী, আপনাদের ভিজিটিং-ডে এবং আওয়ারগুলো আমাদের একটু বলে দেবেন, নোট করে নিই।'

মাতাজী মুখ তুলে বললেন—'দেখুন, আপনারা একটু ভুল করছেন। এখানে যাঁরা আসেন, তাঁদের তিনকুলে কেউ নেই দেখাশোনা করার বা আর্থিক দায়িত্ব বহন করার। কাজেই আমাদের ওসব ভিজিটিং আওয়ার-টাওয়ারও নেই।'

অনীতা হাঁ করে বলল—'ভিজিটিং আওয়ার নেই!'

—'না, আপন বলতে যাদের কেউ নেই, তাদেরই একমাত্র এখানে রাখা হয়।' অনীতা সামলে নিয়ে বলল—'তা অবশ্য সত্যি দিদি, পিসিমার তো যাকে বলে আপন, তেমন কেউ নেই। ছেলে না, মেয়ে না। নাতি-নাতনি কেউ না।'

দীপু বলল—'আমরা তো যাকে বলে নিস্পর। পরস্য পর। পিসিমা তো আবার বাবার সতাত বোন, জানিস তো!'

ইতু বলল—'মা বেঁচে থাকতে আমরা কেউ জানতেই পারিনি কথাটা।'

অনু বলল—'মায়ের বাহাদুরি আছে। হাজার হোক পরের বাড়ির মেয়ে তো!'

দীপু বলল—'বাবারও বাহাদুরি।'

এইখানেই এ কাহিনী শেষ হয়ে যেত। হওয়ারই কথা ছিল। কিন্তু হল না। একদিন গভীর রাত্তিরে ঘুমোতে ঘুমোতে দীপু হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। শব্দে জেগে উঠেছে অসমঞ্জ, তার রাগী স্বামী। ওদিকে দামাল ছেলেও। অসমঞ্জ বললে—'আরে মাঝরাত্তিরে এরকম মড়াকান্না জুড়ল কেন? হয়েছেটা কি?'

দীপু বাচ্চা মেয়ের মতো কাঁদছে আর বলছে—'পিসিমাকে তুমি আমার কাছে রাখতে দেবে কি না বলো, আগে বলো। আমি সারাটা জীবন তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকব। অনু হবার পর আমি খেতুম না পিসিমা খাইয়ে না দিলে, পিসিমার বুকে হাত রেখে মা মনে করে ঘুমোতুম। সেই পিসিমাকে...। উঃ! ওগো, পিসিমা না থাকলে আমি মরে যেতুম। পুঁয়ে-পাওয়া হয়ে গিয়েছিলুম। তুমি আমায় পেতেই না। অন্য কোনও রাক্কুসী এসে তোমার এ সংসার সাজাত!'

অসমঞ্জ বললে—'মাঝরাত্তিরে তুমি একী আরম্ভ করলে? পিসিমাকে তুমি তোমার কাছে এনে রাখতে চাও এ কথা তো আগে বলোনি!'

—'বলব কি? তোমার যা মেজাজ, তোমাকে আমি হিটলারের চেয়েও ভয় পাই।'

—'তা হলে আর আমায় বলা কেন। পিসিমা এলে তো চমৎকার হয়, রান্না-বান্নায় তো তিনি একাই একশ। যাও যাও নিয়ে এসো গে, রোজ রোজ আর আমায় নুন কম, মিষ্টি বেশি, আধসেদ্ধ খেতে হবে না। এই জন্যে এত কান্না!'

—'যদি তোমার মা কিছু বলেন?'

—'বলবেন তো ভদ্রেশ্বরে। এখানে তো সে কথা আমাদের কানে আসছে না। আর বলবেন আমার মা বলবেন, সে আমি বুঝব। ওহ্ তোমরা মেয়েরা না একেন্নম্বরের কুচুটে।'

—'কুচুটে নয় গো কুচুটে নয়, ভিতু। ভিতু।'

—'আচ্ছা তাই তো তাই। এখন ঘুমোও দিকি!'

স্টেশনেই অনুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল দীপুর। এখন ওদের পাঁচজনের কাছেই শ্রীরামপুরের বাড়ির চাবি ভেতরের কোল্যাপসিবল গেটের। বাইরের দরজার চাবি দীনুর কাছে। যতদিন না বাড়ি বিক্রিবাটা হয়, সে-ই কেয়ারটেকার।

অনু অবাক হয়ে বলল—'দিদি তুই?'

দীপু বলল—'অনু তুই ?'

অনুর চোখ ছলছল করছে। বলল—'কাল রাতে স্বপ্ন দেখছি একটা খুব রোগা না-খেতে পাওয়া বেড়ালছানা, তাকে শাম্পি পাঁচিলের ওপাশে ফেলে দিচ্ছে, হঠাৎ বেড়ালটা মিউ মিউ করে ডেকে উঠল করুণ স্বরে। তার পরেই দেখলুম সেটা বেড়াল নয়, পিসিমা। দিদিরে, আমি পিসিমাকে বৃদ্ধাবাসে ফেলে রেখে থাকতে পারবো না। ভগবান তা হলে কক্ষনো আমাকে মাপ করবেন না। মায়ের সূতিকার সময়ে পিসিমাই তো আমায় বাঁচিয়েছে। পিসিমাই আমার আসল মা।' অনু কেঁদে ফেলল।

দুই বোনে এক রিকশায় মনের কথা বলাবলি করতে করতে বাড়ি চলল। দীপু বলল—'তোর অসমঞ্জদাকে আমি সত্যি বলছি অনু এত দিন শুধু ভয়ই করে এসেছি। মারাত্মক ভয়। মোজা রিপু নেই, ছুঁড়ে ফেলে দিল, ডালে নুন নেই ছুঁড়ে ফেলে দিল, বুবুলের স্কুল থেকে ডেকে পাঠিয়েছিল, আসতে দেরি হয়েছে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেল। বাপরে! সেই লোক! আজ এই প্রথম ওকে শ্রদ্ধা করলুম, ভালোও বাসলুম বলতে পারিস।'

অনু বলল—'অনেক ভেবে ঠিক করলুম, যতদিন না বাড়ি বিক্রি হয় আমি এসে থাকব। দ্যাখ, এতদিন আমি শাশুড়ির ছেলেকে দেখেছি, কিছুদিন উনি আমার মেয়েদের দেখুন। শাম্পি-মাম্পি শুক্রবার রাতে এ বাড়ি চলে আসবে, রবিবার আবার বাবার সঙ্গে চলে যাবে। ওদেরও একটু আত্মনির্ভরশীল হওয়া ভালো, এইট তো হল। তারপর বাড়ি বিক্রি হলে, আমার ভাগটা দিয়ে আমি পিসিমাকে আমাদের বাড়ির খুব কাছে, একটা মাদ্রাজি পরিবারে পেয়িংগেস্ট রাখব। পেয়িংগেস্ট মানে- মেজানিন ঘর, একটু রান্নাঘর, বাথরুম ওরা দেয়, পিসিমা নিজের রান্না নিজেই করে নেবে। পিসিমার সুন্দর কুলিয়ে যাবে। আমি তো সব সময়ে দেখাশোনা করতে পারবোই।'

শ্রীরামপুরের বাড়ির দরজা খুলে দিল অতীশ স্বয়ং। খুলেই অবাক হয়ে বলল—'কি ব্যাপার রে ? তোরা জয়া-বিজয়া কোত্থেকে ?'

—'মেজদা তুই ?'

—'আরে, আর বলিসনি, দুর্গাপুরে পৌঁছে থেকে শুক্লা গুম হয়ে আছে। কাল মহা কান্নাকাটি জুড়ে দিল। বলে—"আমি জার্মানি যাবো না। ভাগ্যে থাকলে আবার হবে। না থাকলে না-ই হল, আমি অমন ফরেন-হ্যাংলা নই। তুমি ঘুরে এসো। পিসিমা আর কিষণকে নিয়ে আমি থাকব এখানে।" তার পরে আবার আরেক কাণ্ড।'

—'কি কাণ্ড ?'

—'আয়, ভেতরে আয়, দেখাচ্ছি।'

ভেতরে যেতে যেতে অতীশ চেঁচিয়ে বলল—'দীনু ভালো করে কাঁচা তেজপাতা ভিজিয়ে চা কর। একটা তরকারি কিছু চড়িয়ে দে। দিদিরা দু'জন এসেছে।'

দীনু এসে বলল—'টাকা দিন কিছু, বাজার আনি। কেরোসিনেরও ভাঁড়ে মা ভবানী। সে-ও কিনতে হবে।'

দুম করে লোডশেডিং হয়ে গেল। উঠোনে শ্যাওলা, তুলসী গাছটা বিরাট ঝাড় হয়ে উঠেছে, তাকে আর ঠাকুর-দেবতা মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে উড়নচণ্ডী রাক্ষুসী।

অতীশ বলল—'সাবধানে বাথরুমে যাস দীপু, উঠোনটা একেবারে। আমি তো পড়ে গিয়ে যা কেলো...উঃ।'

দীনু বলল—'পিসিমা থাকলে এসব কিছু ভাবতে হত না, দাদা। অন্নপুন্নোর ভাণ্ডার।

বাড়িতে লক্ষ্মী অষ্টপহর জ্বল জ্বল করছেন। শ্যাওলা উঠোন, আঁধার-বাড়ি এ আমি আমার জন্মে কখনও দেখিনিকো।'

অতীশ ধমক দিয়ে বলল—'যা যা তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কর। বেশি আর লেকচার দিসনি। তোর আবার জন্ম। এ বাড়িতে ক'দিন আছিস ? পাঁচ বছর না সাত বছর ?'

দীনু বলল—'যাঁহা পাঁচ তাঁহাই সাত, ধরুন না গিয়ে দাবাবু।'

আলো এলে একটা টেলিগ্রাম, আর একটা কিউ এম এস লেখা অন্তর্দেশীয় পত্র অতীশ দু বোনের হাতে তুলে দিল।

টেলিগ্রামটা অনীশের। অতীশের দুর্গাপুরের ঠিকানায় করা।

'অ্যাম ট্রানসফার্ড টু ডেলহি। সেন্ড পিসিমা শার্প বাই দা নেক্সট রাজধানী। অ্যাওয়েটিং ইনফর্মেশন—দাদা।'

ইতুর চিঠিটাও দুর্গাপুরের ঠিকানায়। লিখেছে অতীশ-শুক্লাকে।

প্রিয় মেজদা-মেজবউদি,

পিসিমাকে বৃদ্ধাবাসে পাঠাবার প্রস্তাবটা আমাদের গোড়ার থেকেই ভালো লাগেনি। কিন্তু আমি একে সবার ছোট, তার পরে শ্বশুরবাড়িতে পরিজনও অনেক। তোমাদের জামাই একে মুখচোরা, তায় সেও বাড়িতে সবার ছোট। আমার পক্ষে পিসিমার কোনও ব্যবস্থা করা নিতান্তই অসম্ভব। কিন্তু যখন থেকে শুনেছি পিসিমাকে এমন জায়গায় রাখা হয়েছে যেখানে দেখতে যাবার পর্যন্ত অনুমতি দেয় না, তখন থেকেই আমার প্রাণ কাঁদছে। এখানে এসে তোমাদের জামাইয়ের সঙ্গে অনেক আলোচনার পর একটা লিগ্যাল পয়েন্ট আবিষ্কার করলুম। পিসিমা বাবার সৎ-বোন হলেও, একই বাবার সন্তান। এবং শ্রীরামপুরের—'গ্রেস ডেল' বাড়ি বাবা একটু-আধটু বাড়ালেও ঠাকুর্দারই করা। সেই হিসেবে কিন্তু বাড়ির অর্ধভাগ পিসিমার প্রাপ্য হয়। বাকি অর্ধভাগকে পাঁচ ভাগ করে আমরা পাঁচ ভাইবোন নিতে পারি। সেক্ষেত্রে পিসিমাকে আমরা যতটা অসহায় মনে করছি ততটা তিনি নন। বাড়ি বেচে হয় তোমবা পিসিমাকে তাঁর প্রাপ্য টাকায় একটা যথার্থ ভালো প্রতিষ্ঠানে রাখো, যেখানে তাঁকে আমরা দেখতে যেতে পারবো, এবং প্রয়োজন হলে নিজেদের কাছে এনে রাখতে পারবো। আর তা যদি না হয়, পিসিমা অবলা বলে তাঁকে যদি তোমরা বঞ্চিতই করো, তা হলে আমার ভাগটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, তা দিয়েও পিসিমার অনুরূপ ব্যবস্থা হতে পারে। সাত কাঠার কাছে ভদ্রাসন আমাদের। পাঁচ ভাগের এক ভাগ তো লাখখানেক টাকা হবেই ! ভালোবাসা জেনো।

ইতি

তোমাদের ইতু

চিঠিটা পড়া হয়ে গেলে দীপু বলল—'সত্যিই তো, মেজদা আজকালকার আইনে পিসিমারও তো একটা ভাগ থাকার কথা ! এটা তো আমাদের কারো মনে হয়নি ! তোব হয়েছিল ?'

অতীশ বলল—'অনেস্টলি বলছি দীপু হয়নি।'

বহু রাত পর্যন্ত তিনজনে পরামর্শ হল। মাঝে দীনু দোকান থেকে অখাদ্য রুটি-তড়কা এনে দিল। কেরোসিন পাওয়া যায়নি। চারজনের রান্নায় দীনুর খুব একটা উৎসাহও দেখা গেল না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল অবিলম্বে পিসিমাকে 'আশা-নিকেতন' থেকে নিয়ে আসা। শ্রীরামপুরের বাড়ি বিক্রির চেষ্টা আপাতত বন্ধ থাক। পিসিমা যতদিন আছেন

বাড়ি ভোগ করুন, দীনু থাকবে, দরকার হলে আর একটি লোকও রাখা হবে, ঠিকে। অনু দেখাশোনা করবে। শনি-রবিবার এসে থাকবে। পরে পিসিমার মৃত্যু হলে যা হয় ব্যবস্থা করা হবে।

পরদিন সকালে তিন ভাইবোন নতুন ব্যবস্থার কথা জানিয়ে অনীশ এবং ইতুকে টেলিগ্রাম করে শেয়ালদা চলল।

ট্রেন চলেছে। তিন ভাই বোন অধৈর্য হয়ে স্টেশনের নাম পড়ছে।

অতীশ বলল—'দ্যাখ। সত্যিই আমাদের অ্যাকচুয়ালি মা-বাবা আর পিসিমাতে কোনও তফাত নেই। মা-বাবা কোনদিন করেননি।'

দীপু বলল—'একটু লেটে বুঝলি মেজদা। পিসিমার মধ্যে আমরা বাবার রক্ত আর মায়ের স্নেহ পেয়েছিলুম।

অনু বলল—'মা কিভাবে "দিদিমণি" বলে ডাকত, সে ডাকটা তোর মনে আছে? বালবিধবা বলে বাবা-মা যেন সমস্ত শক্তি দিয়ে পিসিমাকে আগলে রাখত।'

দীপু বলল—'আমি আগেরবার বাবাকে বলতে শুনেছি—"রুচি তুই আমার আগে যাস।" পিসিমা বলছে—"অমন কথাও বলো না দাদা, তুমি আগে যাও, পরে আমি আসছি। আমি গেলে তোমায় দেখবে কে?"—"আমি গেলেই বা তোকে দেখবে কে শুনি?" বাবা বলল। পিসিমা বলল—"আমার কথা ছেড়ে দাও। একটু, এই এতটুকুটি হলেও মেয়েমানুষের ভেসে যায়..."'

আশা-নিকেতনে এখন যিনি তত্ত্বাবধানে আছেন, সেই মাতাজী আগের জন নন। হঠাৎ দেখলে বোঝা যায় না। সেই একই রকম সাদা কাপড়, কানের পাশ দিয়ে ঘোমটা দিয়ে পরা। সব কথা মন দিয়ে শুনে বললেন—'দেখুন, আপনারা খুব ভুল, খুব অন্যায় করেছেন। আমাদের এখানে আত্মীয়-পরিজনহীন মানুষ ছাড়া নেওয়া হয় না। সমাজের নিয়ম হল পরস্পর পরস্পরকে দেখা। যাঁর দেখবার লোক আছে তিনি কেন দাতব্য-প্রতিষ্ঠানে আসবেন! তাঁর দেখাশোনা যেমন করেই হোক, তাঁর নিকটজনদের নৈতিক দায়িত্ব। কেন আপনারা রেখেছিলেন ওঁকে? বিপদটা কি জানেন? সারা ভারতে ছড়িয়ে আছে আমাদের প্রতিষ্ঠান। শুধু বৃদ্ধ বৃদ্ধা নয়, সর্ব অর্থে অনাথ যারা তাদেরই ব্যবস্থা এখানে করা হয়, আমাদের সাধ্যমত। প্রত্যেককে কিছুটা শ্রমও দিতে হয়। আবাসিকদের আমরা দীর্ঘ দিন এক জায়গায় রাখি না। কয়েক মাস অন্তর অন্তর স্থান বদল করাই। এই আমাদের নিয়ম। এবং তাঁদের কোনও ঠিকানা নিই না। নাম নিই না। একটা নম্বরের পাশে, তাঁদের এখানে নতুন নামকরণ হয়। পুরনো পরিচয় মুছে ফেলে তাঁরা যাতে নতুন জীবন লাভ করতে পারেন, তারই চেষ্টা করি। তবে আমার যতদূর মনে পড়ছে, সম্প্রতি এখান থেকে ওরকম স্থান-বদল হয়নি। আপনাদের দেওয়া এই রুচিশীলা ভট্টাচার্য, নাম আমরা ভেতরে গিয়ে বলতে পারব না। আমাদের নাম আলো, সলিল, বহ্নি, বরুণ, পবন, আগুন—এইসব। কে যে এঁদের মধ্যে রুচিদেবী তা জানি না, জানাতেও পারি না।

অনুকে কাঁদতে দেখে, মাতাজী বললেন—'ঠিক আছে, আপনাদের জন্য আমি একটা কাজ করছি। এ ঘরে আপনারা বসুন, ঘরটা আমি অন্ধকার করে দিচ্ছি। ওদিকের চৌকো জানলাটা দেখছেন, ওর পেছনে দালান। ওই দালান দিয়ে আমি মহিলা আবাসিকদের পাস করাবো। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এইভাবে আপনারা গুনবেন। ঠিকজনকে চিনে নেবেন, তারপরে আমি ওঁকে আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি।'

বাইরের জানলাগুলো বন্ধ করে দিলেন মাতাজী। ভেতরের জানলাটা খুলে দিয়ে চলে গেলেন।

একটু পরে জানলার ওপাশে আইডেনটিটি প্যারেড শুরু হল। প্রথম জন, মাথার চুল কদম ছাঁট, সাদা কালো, মুখ ঈষৎ কুঁচকোনো, না কালো, না ফর্সা। দ্বিতীয় জন—মাথার চুল ঘাড় অবধি সাদা-কালো, কুঁচকোনো মুখ, না কালো, না ফর্সা। তৃতীয় জন মাথার চুল কদমছাঁট সাদা, কুচকোনো মুখ, না ফর্সা, না কালো। এইভাবে তেরজন হয়ে গেলে শোভাযাত্রা থামল। একটু পরে মাতাজী ঘরে ঢুকে বললেন—'দেখেছেন? বলুন কোনজন?'

দীপু বলল—'কে আবার! প্রথম জন!'

অতীশ বলল—'য্যাঃ, তৃতীয় জন। চুলগুলো একেবারে পেকে গেছে বলে বুঝতে পারিসনি।'

অনু বলল—'আমি শিওর পঞ্চম জন।'

মাতাজী বললেন—'সে কি? আপনাদের আপনজন, পিসিমা বলছেন, চিনতে পারছেন না? আচ্ছা আমি এই তিনজনকেই আলাদা আলাদা করে জিজ্ঞেস করে আসছি তিনি রুচিশীলা দেবী কিনা। যদিও, আবারও বলছি—এটা আমাদের নিয়ম নয়।'

পাঁচ মিনিট পরে ফিরে এসে মাতাজী বললেন—'ওঁদের কারুর নামই রুচিশীলা নয়। প্রথমজনের নাম জান্‌কীবাই—উনি বিহারী। তৃতীয় জন ফতিমা বেগম—বুঝতেই পারছেন বাঙালি মুসলমান। আর পঞ্চম জনের নাম শুদ্ধু বুড়িয়া, ও একটি ভিখারি-বস্তিতে থাকতো, কখনও নামকরণ হয়নি, হয়ে থাকলেও ভুলে গেছে, ওকে আমরা 'ধরিত্রী' বলে ডাকি। আপনারা এক কাজ করুন, আপনাদের পিসিমার একটা সাম্প্রতিক ফটো, তাঁর চেহারার সঠিক বর্ণনা, আর কিছু আইডেনটিফাইং মার্ক দিন। তারপর দেখছি কি করা যায়।'

তখন অতীশ, দীপু ও অনু নিজেদের মধ্যে অনেক আলোচনা করে দেখল—গত দশ বছরে কোথাও, কোনও উপলক্ষে পিসিমার কোনও ফটো তোলা হয়নি। এবং তাদের পিসিমা খুব রোগাও না, মোটাও না, কালোও না, ফর্সাও না, চুল পুরো পাকাও না, আবার পুরো কাঁচাও না, দাঁত যে সব গোটা তাও না, আবার সব যে পড়ে গেছে তা-ও নয়, তিনি খুব বুড়োও নন, আবার কম বুড়োও নন। আসলে তাঁর কোনও পরিচয়-চিহ্ন নেই। তিনি আসলে শুধুই একজন পিসিমা। অগণ্য পিসিমার মধ্যে একজন। কারো মা নয়, বাবা নয়, শুধুমাত্র পিসিমা।

আসন

সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল। দর-দাম, দলিল-দস্তাবেজ, ইনকাম-ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স, সব। সব হয়ে যাবার পর গলদঘর্ম বাড়ি ফিরে একটু জল গরম করে নিয়ে ঠাকুর্দার আমলের বাথটাবটাতে শুয়ে শুয়ে বিকেল সাড়ে তিনটেয় একটা লম্বা অবগাহন স্নান। আ-হ্। যেন অনেক দিনের পুরনো পাপের বোঝা নেমে গেল ঘাড় থেকে। শুধু স্নান নয় শুচিস্নান। সত্যিই, পিছটান বলে তো কিছু নেই। শুধু আপনি আর কপনি। তা আপনির ইচ্ছেমতো কপনি চলবে ? না কপনির ইচ্ছেমতো আপনি ! এ ক' দিনের মধ্যে এই নিয়ে বোধহয় সাতবারের বার গুরুদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে দু হাত কপালে ঠেকালো সুনন্দা। স্থাবর সম্পত্তি বড় জ্বালা ! বড় গুরুভার। হালকা হয়ে যে আকাশে পাখা মেলতে চায় ইঁট-কাঠ তার ঘাড়ের ওপর অনড় হয়ে বসে থাকলে সে বাঁচে কেমন করে ? সবই গুরুদেবের কৃপা ! বাড়িটা শেষ পর্যন্ত কিনতে রাজিই হয়ে গেল শরদ দেশাই। তিন শরিকের এক শরিকি অংশ। বাবা নিজের অংশটুকু ঢেলে সাজিয়ে নিয়েছিলেন তাই বাসযোগ্য ছিল এতদিন। সামনের উঠোন চৌরস করে ভেঙে খোলামেলা নিশ্বাস ফেলবার জায়গা খানিকটা। একটা আম গাছ, একটা নিম, সেগুলো ফেলেননি। নিম-আমের হাওয়া ভালো। তা ছাড়াও আমের কোঁকড়া পাতায় ফাগুন মাসে কেমন কচি তামার রঙ ধরে ! বাকি জায়গাটুকু নানারকমের বাহারি গাছপাতা দিয়ে সাজানো। ফুল গাছ নয়, পাতাবাহার। বাবার শখের গাছ সব। না-বাগান না-উঠোন এই খোলা জায়গাটুকু পার হতে হতে দোতলার লাল টালি ছাওয়া বারান্দাখানা চোখে পড়বে। তার ওপর ছড়ানো বোগেনভিলিয়ার ফাগ আর মুক্তো রঙের ফুলঝুরি। মার্চ-এপ্রিল থেকে ফুল ফোটা শুরু হবে, চলবে সেই মে অবধি।

বারান্দাটা যেন বেশ বড়সড় একখানা মায়ের কোল। তেমনি চওড়া, নিশ্চিন্ত-নির্ভয়। সুনন্দার নিজের মায়ের কোলটিও বেশ বড়সড় ছাড়ালো দোলনার মতোই ছিল বটে। মনে থাকার বয়স পর্যন্ত সেই শীতল, গভীর কোলটিতে বসে কত দোল খেয়েছে সুনন্দা। তারপর মায়ের বোধহয় বড্ড ভারি ঠেকল। হাত-পা ঝেড়ে চলে গেলেন, ফিরেও তাকালেন না। টাকার সাইজের এক ধামি সাদা ময়দার গোল পিংপঙ বলের মতো লুচি সাদা আলুভাজা দিয়ে না হলে যে সুনন্দা রেওয়াজে বসতে পারে না এবং সে জিনিস যে আর কারো হাত দিয়েই বেরোবার নয় সে কথা মায়ের মনে থাকল না।

অনেকদিন আগলে ছিলেন বাবা। মায়ের কোল থেকে বাপের কাঁধ, সে তো কম পরিবর্তন নয় ! ঈশ্বর জানেন বাবাকে মা হতে হলে স্বভাবের নিগূঢ় বাৎসল্য রসের চালটি পর্যন্ত পালটে ফেলতে হয়। তিনি কি তা পারেন ? কেউ কি পুরোপুরি পারে ? মায়ের

জায়গাটা একটা বায়ুশূন্য গহ্বরের মতো খালি না থাকলে বুঝবে কেন সে কে ছিল। কেমন ছিল ? বোঝা যে দরকার। মা হতে পারেননি, কিন্তু চেষ্টা করেছিলেন, তাই বাবা আরও ভালো বাবা, আরও পরিপূর্ণ বাবা হতে পেরে গিয়েছিলেন। পাঁচজন যেমন বউ মরলেই হুলু দিয়ে থাকে তেমন দিয়েছিল বই কি ! তিনি চেয়েছিলেন মাথায় আধ-ঘোমটা গোলগাল ছবিটির দিকে। চোখ দুটি ভারি উদাস, কিন্তু ঠোঁটের হাসিতে ফেলে-যাওয়া সংসারের প্রতি মায়া ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা। তারপর ফিরে তাকিয়েছিলেন ঘুমন্ত ফুলো-ফুলো মুখ, ফুলো-ঠোঁট আর বোজা চোখ দুটির দিকে। ঘুমের মধ্যে চোখের মণিদুটো পাতার তলায় কাঁপছে। আহা ! বড় বনস্পতির বীজ। কিন্তু কত অসহায় ! মাতৃকুলে যন্ত্রসঙ্গীত পিতৃকুলে কণ্ঠসঙ্গীত। সরু সরু আঙুলে এখনই কড়া পড়ে গেছে। ওইটুকুন-টুকুন আঙুল তার টেনে টেনে এমন নাজনখরা বার করে যে মনে হবে রোশেনারা বেগম স্বয়ং বুঝি হোরি গুনগুন করছেন।

—'মানুষের আপন পেটের বাপ-মা কি দুটো হয় ?' ভ্যাবলা মেরে-যাওয়া কন্যাদায়গ্রস্ত কিংবা হিতৈষীদের তাঁর এই একই উত্তর। নাও এখন মানে করো।

বালিকা থেকে কিশোরী, কিশোরী থেকে তরুণী, তরুণী থেকে যুবতী বাবা ঠায় কাঁধে মাথাটি নিয়ে। আয় ঘুম যায় ঘুম বর্গীপাড়া দিয়ে। একটি দিনের জন্যও ঢিলে দেননি। 'সুনি নতুন শীত পড়েছে, বালাপোষখানা বার কর', 'সুনি, আদা তেজপাতা গোলমরিচ দিয়ে ঘি গরম করে খা, গলাটা বড্ডই ধরেছে', 'টানা তিন ঘণ্টা রেওয়াজ হল সুনি, আজ যেন আর খুন্তি ধরিসনি, তোর বাহন যা রেঁধেছে তাই ভালো।'

মাতৃহীন, অবুঝ, অভিমানী, তার ওপর অমন গুণী পিতৃদেব কিছুতেই আর বিয়ের জোগাড় করে উঠতে পারেন না। পাত্র ঠিক বলে তো পাত্রের বাড়ি যেন উল্টো গায়। বাড়ি-ঘর ঠিক আছে তো পাত্র নিজেই যেন কেমন কেমন ! অমন ধ্রুপদী বাপের সেতারী মেয়ের পাশে দাঁড়াবার যুগ্যি নয়। গুণীর পাশে দাঁড়াতে হলে গুণী যে হতেই হবে তার কোনও মানে নেই। কিন্তু সমঝদারিটাও না জানলে কি হয় ? বাবার যদি বা পছন্দ হয়, মেয়ে তা-না-না-না করতে থাকে।

—'অমনি রাঙা মুলোর মতো চেহারা তোমার পছন্দ হল বাবা ? সব শুদ্দু ক'মণি হবে আন্দাজ করতে পেরেছো ?'

মেয়ের যদি বা পছন্দ হল তো বাপের মুখ তোম্বা হয়ে যায়—'হলোই বা নিজে গাইয়ে। দুদিন পরেই কমপিটিশন এসে যাবে রে সুনি, তখন না জানি হিংসুটে-কুচুটে তোর কী হাল করে !'

এই হল সুনির বিবাহ বৃত্তান্ত। বেলা গড়িয়ে গেলেও উৎসুক পাত্রের অভাব ছিল না। কে বাগেশ্রী শুনে হত্যে দিয়ে পড়েছে, কে দরবারীর আমেজ আর কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। কিন্তু পিতা-কন্যার মন ওঠেনি। আসল কথা ধ্রুপদী পিতার ধ্রুবপদটি যে কন্যা ! আর কন্যা তার পরজ-পঞ্চমের আরোহ-অবরোহ যখন ঘাট নামিয়ে-নামিয়ে বেঁধে নিয়েছিল পিতার সুরে, জীবনের সুরটিও তখনই ঠিক তেমনি করেই বাঁধা হয়ে গেছে।

বেলা যায়। বেলা কারো জন্যে বসে থাকে না। একটু একটু করে একজনের মাথা ফাঁকা হতে থাকে। আরেকজনের রুপোর ঝিলিক দেয় মাথায়। বাবার মুখে কালি পড়ে। শেষে একদিন পাখোয়াজ আর পানের ডিবে ফেলে উঠে আসেন শীতের মন খারাপ করা সন্ধ্যায়।

—'কি হবে মা, বেশি বাছাবাছি করতে গিয়ে আমি কি তোর ভবিষ্যৎটা নষ্ট করে

দিলুম ?'

ঝঙ্কার দিয়ে উঠল সুনন্দা—'করেছোই তো, খুব করেছো, বেশ করেছো ! এখন তোমার ডিবে থেকে দুটো খিলি দাও দেখি, ভালো করে জর্দা দিও, কিপটেমি করো না বাপু !' হেসে ফেলে মেয়ে। বাপের মুখে কালি কিন্তু নড়ে না।

অবশেষে সুনন্দা হাত দুটো ধরে করুণ সুরে বলে—'বাবা, একবারও কি ভেবে দেখেছো, আর কেউ সেবা চাইলে আমার সেতার, সুরবাহার, আমার সরস্বতী বীণ সইবে কি না ! এই দ্যাখো, কড়া পড়া দু আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে সুনন্দা বলে—'এই দ্যাখো আমার বিবাহ-চিহ্ন, এই আমার শাঁখা, সিঁদুর।'

'আমি চলে গেলে তোর কী হবে সুনি ?' আঁধার মুখে বাবা বললেন।

—'বাঃ, এই আমার একলেশ্বরীর শোবার ঘর, ওই আমার তেত্রিশ কোটি দেবতার ঠাকুরঘর, ও-ই আমার জুড়োবার ঝুল-বারান্দা, আর বাবা নিচের তলায় যে আমার তপের আসন ! আমি তো আপদে থাকবো না ! এমন সজ্জিত, নির্ভয় আশ্রয় আমার, কেন ভাবছো বলো তো ?'

বাবার মুখে কিন্তু আলো জ্বলল না। সেই আঁধার গাঢ় হতে হতে যকৃৎ-ক্যান্সারের গভীর কালি মুখময়, দেহময় ছড়িয়ে পড়ল। অসহায়, কাতর, অপরাধী দু চোখ মেয়ের ওপর নির্নিমেষ ফেলে রেখে তিনি পাড়ি দিলেন।

তার পরও দশ এগারোটা বছর কোথা দিয়ে কেটে গেছে, সুনন্দা খেয়াল করতে পারেনি। রেডিওয়, টেলিভিশনে, কনফারেন্সে, স্বদেশে-বিদেশে উদ্দাম দশটা বছর। খেয়াল যখন হল তখন আবারও এক শীতের মন খারাপ করা সন্ধ্যা। এক কনফারেন্সে প্রচুর ক্লিকবাজি করে তার প্রাপ্য মর্যাদা তাকে দেয়নি, চটুল হিন্দি ফিলমের আবহসঙ্গীত করবার জন্য ডাকাডাকি করছে এক হঠাৎ-সফল সেদিনের মস্তান ছোকরা, যে গানের গ-ও বোঝে না, এখনও, এই বয়সেও এক আধা বৃদ্ধ গায়ক এতো কাছ ঘেঁষে বসেছিলেন যে টেরিউলের শেরওয়ানির মধ্যে আটকে পড়া ঘামের দুর্গন্ধ দামী আফটার শেভের সৌরভ ছাপিয়ে যেন নাকে চাবুক মেরেছে।

সামনের কম্পাউন্ডে নিমের পাতা আজ শীতের গোড়ায় ঝরে গেছে। আম্রপল্লবের ফোকরে ফোকরে শীতসন্ধ্যার কাকের চিৎকার কানে তালা ধরায়, শরিকি বাড়ির ডান পাশ থেকে স্বামী-স্ত্রীর চড়া বিবাদী সান্ধ্য ভূপালির সুর বারবার কেটে দিয়ে যাচ্ছে। বাঁ দিকের বাড়ি থেকে কৌতূহলী জ্ঞাতিপুত্র বারান্দায় মুখ বাড়িয়ে থেকে থেকেই কী যেন দেখে যাচ্ছে। এতো রাগ-রাগিণীর ঠাট মেল জানা হল, নিজের রক্তের এই রক্তবীজটি যে কোন ঠাটে পড়ে, কী যে ও দ্যাখে আর কেন যে, সুনন্দা তা আজও ধরতে পারল না। শিল্পীবাড়ির শরিক যে কি করে এত রাম-বিষয়ী হয়, তাও তার অজানা। দেখা হলেই বলবে—'তোমাদের ড্রেনটা ভেন্ন করে ফ্যালো, আমি কিন্তু কর্পোরেশনে নোটিফাই করে দিয়েছি, এর পরে তুমি শমন পাবে।' হয় এই, আর নয়তো বলবে—'ইস মেজদি, চুলগুলো তোমার এক্কেবারেই পেকে ঝুল হয়ে গেল ! বয়ঃ কতো হল বলো তো !'

চুল পেকে গেলে যে কি করে ঝুল হয় তা সুনন্দা জানে না। আর, বিসর্গ যে উচ্চারণ করতে পারে 'স' উচ্চারণ করতে তার কেনই বা এতো বেগ পেতে হবে, তা-ও না। ও যেন যমের দক্ষিণ দুয়ার থেকে রোজ এসে একবার করে জানান দিয়ে যায়। 'এই যে মেজদি, তুমি হয়ে গেলেই আমার হয়ে যাবে।'

সামনের ঝুপসি অন্ধকারের দিকে চেয়ে সুনন্দা হঠাৎ বলে উঠল—'ধ্যাত্তেরি।'

বারান্দার আরাম-চেয়ার থেকে সে উঠে পড়ে, শোবার ঘরে ঢুকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তার একলার খাট-বিছানা, চকচকে দেরাজ-আলমারি, দেয়াল-আয়নার গোল মুখ, আবার বলে—'ধ্যাত্তেরিকা।' পাশে ছোট্ট ঠাকুরঘর। সোনার গোপাল, কষ্টিপাথরের রাধাকৃষ্ণ এসব তাদের কুলের ঠাকুর। মার্বেলের শিব, কাগজমণ্ডের বুদ্ধ, পেতলের নটরাজ, এসব শেলফের ওপর, নানা ছাত্র ছাত্রী, গুণমুগ্ধ অনুরাগীর উপহার। চারদিকে সাদা পঙ্খের দেয়াল, খালি, বড্ড খালি। সিলিং থেকে জানলার লিনটেল বরাবর বেঁকা একটা চিড় ধরেছে। সেই খালি দেওয়ালে একটি যোগীপুরুষের ছবি। সেই দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে শেষকালে সে বলে—'তুমিই ঠিক। তুমিই সত্য। তুমিই শেষ আশ্রয়।'

ড্রয়ারের ভেতরে ফাইল, ফাইলের ভেতর থেকে 'মধুরাশ্রম' ছাপ মারা খামটা দিনের মধ্যে এই তৃতীয়বার সে তুলে নেয়।

মোটা সুতোর কাগজ। হাতের লেখা খুব জড়ানো। ঠাকুর এক বছর ধরে রোগশয্যায়। স্মিতমুখে শরের মতো টান-টান শয়ান। বুকের ওপর খাপ কাটা হেলানো লেখার ডেস্ক, মাথার দিকটা তোলা। ঠাকুর সিদ্ধদাস নিজ হাতে সুনন্দাকে এই চিঠি দিয়েছেন অন্তত ছ মাস আগে।

সুরাসুর সিদ্ধাসু মা সুনন্দা,

তোমার সমস্যা নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ অনেক ভাবাভাবি করেছি মা। আমি ভাবার কেউ নয়, যাঁর ভাবনা তিনি ভাবছেন বলেই বুঝি তোমার সুরসমুদ্রটি এবার এমন স্রোত গুটিয়ে ভাটিয়ে চলল। তোমার হৃদয়ে যখন তাঁর ডাক এমন করে বেজেছে তখন দরজা দু হাতে বন্ধ রাখবে সিদ্ধদাসের সাধ্য কি ? তুমি এসো। মনের সব সংশয়, দ্বিধা ছিন্ন করে চলে এসো। বিষয়-সম্পত্তি তুমি যেমনি ভালো বুঝবে, তেমনি করবে। আশ্রমে খাওয়া-থাকার জন্য নামমাত্র প্রণামী দিতে হয়। সে তো তুমি জানোই। এখানে বরাবর বাস করতে গেলে লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরার বিধি। নিজের পরিধেয়র ব্যবস্থা তুমি নিজেই করবে। খালি এইটুকু মনে রেখো মা, তোমার বস্ত্র যেন অন্য আশ্রমিকাদের ছাড়িয়ে না যায়। তোমার যন্ত্র সব অবশ্যই আনবে মা। তাঁর আশ্রম স্বর্গীয় সুরলাবণ্যে ভরিয়ে তুলবে, তাতে কি আমি বাধা দিতে পারি ? তোমার সিদ্ধি সুরেই। সে তুমি এখানেই থাকো, আর ওখানেই থাকো। আমি ধনঞ্জয়কে তোমার ঘরের ব্যবস্থা করে রাখতে বলছি। আসার দিনক্ষণ জানিও। গাড়ি যাবে। শ্রীভগবানের আশীর্বাদ তোমার ওপর সর্বদা থাকে প্রার্থনা করি।

সিদ্ধদাস

চিঠিটা কোলে নিয়ে অনেকক্ষণ ঠাকুরঘরে জোড়াসনে বসে থাকে সুনন্দা। তারপর আস্তে আস্তে ওঠে। ঠাকুরকে ফুল জল দেয়, দীপ জ্বালে। ধূপ জ্বালে। একলা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে, কালো পাথরের চকচকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামে। নিজের ঘরের তালা খুলে সুইচ টিপে দেয়। অমনি চারদিক থেকে ঝলমল করে ওঠে রূপ। আহা। কী রূপ, কত রূপ ! কাচের লম্বা চওড়া শো-কেসে শোয়ানো যন্তরগুলো। সবার ওপরে চড়া সুরে বাঁধা তার হালকা তানপুরা। পরের তাকে ঈশ্বর নিবারণচন্দ্র গোস্বামীর নিজ হাতে তৈরি, তার ষোল বছর বয়সে বাবার উপহার দেওয়া তরফদার সেতার। তারপর লম্বা চকচকে মেহগনি রঙের ওপর হাতির দাঁতের সূক্ষ্ম কারুকাজ করা সুরবাহার। আর সবার শেষে, একেবারে নিচের তাকে অপূর্ব সুন্দর সমান সুগোল দৈবী স্তনের মতো ডবল তুম্বি শুদ্ধ

সরস্বতী বীণ। তানসেনের কন্যা সরস্বতীর নামে খ্যাত সুগম্ভীর গান্ধর্বী নাদের বীণা। ডান দিকে নিচু তক্তাপোশে বাবার খোল, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ। কোণে বিখ্যাত শিল্পীর তৈরি কাগজের সরস্বতী মূর্তি—কাগজ আর পাতলা পাতলা বেতের ছিলে। বাঁ দিকে শ্বেতপাথরের বর্ণহীন-সরস্বতী, গুরুদেব জব্বলপুর থেকে আনিয়ে দিয়েছিলেন। বলতেন 'অবর্ণা মা'। এই মূর্তির সানুদেশ ঘেঁষে মেঝের ওপর সমুদ্র নীল কার্পেট। তার ওপর সাদা সাদা শুক্তি-ছাপ। পাশেই আর একটি নিচু কাচের কেসে তার শেখাবার সেতার এবং ডবল ছাউনির টঙটঙে তবলা। ঘরের মাঝখানে নিচু নিচু টেবিল-সোফা-মোড়ায় বসবার আয়োজন। মায়ের হাতের নকশা করা চেয়ার-ঢাকা, কুশন-কভার এখনও জ্বলজ্বল করছে।

সুনন্দা এই সময়ে রেওয়াজে বসবার আগে এ ঘরেও দীপ ধূপ জ্বালিয়ে দেয়। ঘর খুলতেই যেন কতকালের ধূপগন্ধ তার নাকে প্রবেশ করল। অগুরু গন্ধে আমোদিত ঘর। মার্বেলের প্রতিমার সামনে দীপগাছ জ্বালিয়ে বিজলিবাতি নিবিয়ে দিল সুনন্দা। আধা-অন্ধকার ঘর যেন গন্ধর্বলোক। বাবার পাখোয়াজের বোল কি শুনতে পাচ্ছে সুনন্দা? না, না, সেখানে শুধু ইষ্টনাম। শুনতে পাচ্ছে কি গুরুজীর সেই অনবদ্য বঢ়হত, আওচার, মন লুটিয়ে দেওয়া তারপরণ? দীপালোকে অস্ফুট ঘরে প্রতিমার সামনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছে সুনন্দা। হাতে নিবারণ গোঁসাইয়ের সেতার। সোনালি রুপালি তারে মেজরাপের ঝঙ্কার। রাগ দেশ। গুরুজী সিদ্ধ ছিলেন এই রাগে। সেতার ধরলেও যা সুরবাহার ধরলেও তা। বীণকারের ঘরের বাজ। সুরে ডুবে ডুবে বাজাতেন। আলাপাঙ্গে তাঁর অসীম আনন্দ। আলাপ থেকে জোড়, মধ্য জোড়, ডুব সাঁতার কেটে চলেছেন। নদীর তলাকার ভারী জল ঠেলতে ঠেলতে গতের মুখটাতে এসে যখন তেহাই মেরে ভেসে উঠতেন তখন আঙুলে সে কী জয়ের উল্লাস! অনেক দিনের স্বপ্ন বুঝি আজ সত্য হল। যা ছিল রূপকথার কল্পনাবিলাস তা বুঝি ধরা পড়ে গেল প্রতিদিনের দিনযাপনের ছন্দে রূপে। এমনিই ছিল গুরুজীর বাজের তরিকা। কনফারেন্সে বাজাতে চাইতেন না। অভ্যাস ছিল নিজের গুরুদেবের ছবির সামনে বীণ হাতে করে বসে থাকা। কিংবা গুটিকতক নিষ্ঠাবান তৈরি ছাত্র-ছাত্রী ও সমঝদারের সামনে আনন্দসত্র খুলতেন। বলতেন, 'আজ তোদের কাঁদিয়ে ছাড়ব। লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদবি বাবারা।'

কিন্তু সুনন্দা আজ জানতেই পারল না কখন তার দেশ তিলককামোদ-এর রাস্তা ঘুরে ঘুরে বৃন্দাবনী সারঙের মেঠো সুর তুলতে লেগেছে। একেবারে অন্যমনস্ক। ক'দিন ধরেই এই হচ্ছে। দিন না মাস! মাস না বছর! সুনন্দা যেখানকার সেতার সেখানে শুইয়ে রেখে হাত জোড় করে বলল, 'আমি চললুম, আমায় মাফ করো।' অবর্ণা সরস্বতীর দিকে ফিরে বদ্ধাঞ্জলি আবারও বলল, 'পারলে ক্ষমা করো, আমি চললুম।'

মধুরাশ্রমে ধনঞ্জয়ের সাজানো ঘরে, নিশ্বাসে মালতীফুলের গন্ধ আর দু চোখ ভরা তারার বৃষ্টি নিয়ে তবে যদি এ হাতে আবার সুরের ফুল ফোটে। আর যদি না-ই ফোটে তো না ফুটুক। অনেক তো হল। আর কিছু ফুটবে। এই আর কিছুর জন্যে সে বড় উন্মুখ হয়ে আছে।

॥ ২ ॥

মধুরাশ্রমে ঢোকবার গেট বাঁশের তৈরি। তার ওপরে নাম-না-জানা কি জানি কি নীল ফুলের বাহার। মধুরে মধুর। জমিতে মধু, হাওয়ায় মধু, জলে মধু। ভেতরে দেখো বিঘের পর বিঘে বাগান, ফলবাগান, ফুলবাগান, সবজিবাগান। প্রতি বছরেই একবার করে এখানে এসে জুড়িয়ে যায় সুনন্দা। কোলাহল নেই। না যানের, না যন্ত্রের, না মানুষের। নিস্তব্ধ আশ্রম জুড়ে শুধু সারাদিন বিচিত্র পাখির ডাক। সন্ধান দিয়েছিল আজ দশ-এগার বছর আগে—মমতা বেন। এক ছাত্রী। মমতার বাপের বাড়ির সবাই সিদ্ধদাসের কাছে দীক্ষিত। বাবার মৃত্যুর পর তখন সেই সদ্য সদ্য সুনন্দার মধ্যে একটা হা-হা শূন্যতা তেপান্তরের মাঠের মতো। সব শুনে বুঝে ছাত্রী মমতা গুরুগিরি করল। ঠাকুর সিদ্ধদাসের হাতের ছোঁয়ায় অনেকদিনের পর সেই প্রথম শান্তি।

দেশাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগও মমতার মাধ্যমে। মধুরাশ্রমে যখন মন টানল তখন শরিকি বাড়ির অংশটুকু নিয়ে মহা মুশকিলে পড়েছিল সুনন্দা। মোটে আড়াই কাঠার বাস্তু, তার ওপরে তো আর জগদ্দল কংক্রিট-দানব তৈরি করা যাবে না, সুতরাং প্রোমোটারে ছোঁবে না। যারা বাস করবার জন্য কিনতে চায় তারাও দুদিকে শরিকি দেয়াল দেখে সরে পড়ে। জমির দাম আকাশ-ছোঁওয়া। কে আর লাখ লাখ টাকা খরচ করে বিবাদ বিসংবাদ কিনতে চায়? এইরকম হা হতোস্মি দিনে মমতা বেন দেশাইয়ের খোঁজ দিয়েছিল। কোটিপতি ব্যবসায়ী, কিন্তু সমাজসেবার দিকে বিলক্ষণ নজর। সোশ্যাল সার্ভিস সেন্টার খুলবে। একটা ছোটখাটো বাড়ি কিনতে চায়। পরিবার পরিকল্পনা, ফার্স্ট এড, শিশু কল্যাণ ইত্যাদি ইত্যাদি। সুনন্দার বাড়ি তার খুব পছন্দ হয়ে গেল। বসবার ঘরটাকে পার্টিশন করেই তিনটি বিভাগ খুলে দেওয়া যায়। ভালো দাম দিল দেশাই।

সবটুকুই সামলালো মমতা আর তার স্বামী। সমস্ত আসবাবসমেত বাড়ি বিক্রি করে দিচ্ছে সুনন্দা। মায়ের বিয়ের আলমারি, খাট, দেরাজ, সোফাসেট, রাশি রাশি পুতুল আর কিউরিও-ভর্তি শো কেস, বাহারি আয়না, দেওয়ালগিরি, ঝাড়বাতি, সমস্ত সমস্ত। শ্বেতপাথরের সরস্বতী প্রতিমাটি মমতাকে সে উপহার দিয়েছে। বেত কাগজের শিল্পকীর্তি দেশাইয়ের বড় পছন্দ। তার নিজস্ব বাড়ির হলঘরে থাকবে। বিক্রিবাটার পর যতদিন সুনন্দা থেকেছে, বাড়ি যেমন ছিল তেমনি। আশপাশের কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি কিচ্ছু।

ঠাকুরঘরের ফাটল আর শোবার ঘরের বাঁ কোণে চুঁইয়ে পড়া জলের দাগটার দিকে তাকিয়ে সুনন্দা মনে মনে ভেবেছিল, 'বাববাঃ, এসব কি একটা একলা মেয়ের কম্মো!' ওই ছাদ কতবার হাফ-টেরেস হল, টালি বসানো হল, তা সত্ত্বেও জল চোঁয়াচ্ছে দেখে মাঝরাত্তিরে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠেছিল সে। এখন বেশ ঝাড়া হাত, ঝাড়া পা, পরনে লাল পেড়ে সাদা শাড়ি আর হাতে সেতার, বাঃ!

এবার যেন মধুরাশ্রম আরও শান্তিময় লাগল। গুরুভাই ধনঞ্জয় সেই ঘরটাই ঠিক করে রেখেছে যেটাতে সে প্রত্যেকবার এসে থাকে। সরু লম্বা। ছয় বাই বারো মতো ঘরটা। ঢোকবার নিচু দরজা সবুজ রঙ করা। উল্টো দিকে চার পাল্লার জানলা। খুলে দিলেই বাগান। এখানকার সবাই বলে মউ-বাগান। মউমাছির চাষ হয় ফুলবাগানের এই অংশে। ঘরের মধ্যে নিচু তক্তাপোশে শক্ত বিছানা। একপাশে সেতার রেখে, শুতে হবে। একটিমাত্র জলচৌকি। ট্রাঙ্ক সুটকেস রাখতে পারো, সে সব সরিয়ে লেখার ডেস্ক

হিসেবেও ব্যবহার করতে পারো, কোণে চারটে ইটের ওপর মাটির কুঁজো। আশ্রমের ডিপ টিউবওয়েলের জল ধরা আছে। ঘরের বাইরে টিউবওয়েলের জলে হাত পা ধুয়ে পাপোশে পা মুছে, কুঁজো থেকে প্রথমেই এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেল সুনন্দা। আহা! যেন অমৃত পান! ধনঞ্জয় বলল, 'দিদি, ঠাকুরের সঙ্গে যদি দেখা করবেন তো এই বেলা।'

ট্রেনের কাপড় ছেড়ে সঙ্গে আনা বেগমপুরের লালপেড়ে শাড়িটা পরে দাওয়া পেরিয়ে ঠাকুর সিদ্ধদাসের ঘরে চলল সুনন্দা। চারদিকে খোলা আকাশ, একেবারে টইটম্বুর নীল। সেই আকাশটা তার রঙ, তার ব্যাপ্তি, তার গাঢ়তা আর গভীরতা নিয়ে ফাঁকা বুকের খাঁচাটার মধ্যে ঢুকে পড়ছে টের পেল সে। প্রণাম করল যে, আর প্রণাম পেলেন যিনি উভয়েরই মুখ সমান প্রসন্ন। সিদ্ধদাস বললেন, 'মা খুশি হয়েছ তো?' আলোকিত মুখে জবাব দিল সুনন্দা।

ঠাকুর সিদ্ধদাস তাঁর পুবের ঘরের আসন থেকে বড় একটা নড়েন না। ব্রাহ্ম মুহূর্তে একবার, সন্ধ্যায় একবার আশ্রমের চত্বর বাগান ঘুরে আসেন। নিত্যকর্মের সময়গুলো ছাড়া অন্য সময়ে তিনি তাঁর আসনে স্থির। ভোরবেলা তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় সুনন্দার। সে-ও সে সময়টা বেড়াতে বেরোয়। কিন্তু তখন সিদ্ধদাস তদ্গত তন্ময়। কারো সঙ্গে কথা বলেন না, হনহন করে খালি হেঁটে যান। কে বলবে ক'মাস আগেও কঠিন রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন!

এখানকার দিনগুলি যেন বৈদিক যুগের। শান্তরসাস্পদ। পবিত্র, সরল, উদার, সুগন্ধ। একটু কান খাড়া করলেই বুঝি মন্ত্রপাঠের ধ্বনি শোনা যাবে। নাসিকা আরেকটু গ্রহিষ্ণু হলেই যজ্ঞধূমের গন্ধ পাওয়া যাবে। যেন জমদগ্নি, শ্বেতকেতু, নচিকেতা, উপমন্যু এই বন বাগানের অন্তরালে কোথাও না কোথাও নিজস্ব তপস্যায় মগ্ন। কিন্তু কী আশ্চর্য, আশ্রমের রাতগুলি যে আরব্য উপন্যাসের! তারার আলো যেমন একটা রহস্যজাল বিছিয়ে দেয় রাত আটটা নটার পরই। কে যেন ড্যাঁও ড্যাঁও করে রবাবের তাঁতের তারে চাপা আওয়াজ তোলে, চুমকি বসানো পেশোয়াজ, ওড়না সারা আকাশময়, ঘুঙুর পায়ে উদ্দাম নৃত্য করে কারা, হঠাৎ কে তীব্র স্বরে চিৎকার করে বলে 'খামোশ'! একদিন দু'দিন করে মাস কেটে গেল। আকাশে বাতাসে চাপা রবাবের আওয়াজ শুনে শুনে সুনন্দা আর থাকতে পারে না। ব্রাহ্ম মুহূর্তে বেড়াতে বার হয় না সে, চৌকির ওপর বিছানা গুটিয়ে রাখে। সদ্যতোলা গোলাপফুল রেকাবির ওপর রেখে অদৃশ্য সরস্বতী মূর্তিটির উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে সেতারের তারে মেজরাপ ঠেকায়। ললিতে আলাপ। মন্দ্র সপ্তকে শুরু। খরজের তারে অভ্যাস মতো হাত চালায়, টাঁই আওয়াজ করে তার নেমে যায়, নামিয়ে তারগুলোকে আবার টেনে বাঁধে সুনন্দা। কান লাগিয়ে লাউয়ের ভেতরের অনুরণন শোনে। আবার আলাপ ধরে! তারগুলি কিন্তু সমানে বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে, সুনন্দার তর্জনী আর মধ্যমার তলায় যেন কিলবিল করছে অবাধ্য, সুর ছাড়া, সৃষ্টিছাড়া কতকগুলো সাপ, জোর হাতে কৃন্তন লাগাতে গিয়ে আচম্‌কা ছিঁড়ে যায় তার।

সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরের ঘরের ধ্যানের আসর থেকে নিঃশব্দ পায়ে উঠে আসে সুনন্দা। সকালবেলাকার সেই ছেঁড়া তার যেন আচমকা তার বুকের মধ্যে ছিটকে এসে লেগেছে। সারি সারি নিস্তব্ধ, তন্ময় গুরু ভাইবোনেরা। কেউ লক্ষ্যও করে না। কিন্তু তার মনে হয় ধূপজ্বলা অন্ধকারের মধ্য থেকে জোড়া জোড়া ভুরু তার দিক পানে চেয়ে কুঁচকে উঠছে।

রাতে তার ঘুম আসে না। সকালের ডাকে কলকাতার চিঠি এসেছে। অন্তরঙ্গ এক সহকর্মী দুঃখ করে লিখেছেন, তিনি ছিলেন না বলেই সুনন্দা এমন সিদ্ধান্ত নিতে

পেরেছেন। তিনি থাকলে নিশ্চয় বাধা দিতেন। কেন যে এ কথা লিখেছেন পরিষ্কার করে বলেননি। সুনন্দার ভালো-মন্দ সুনন্দা কি নিজে বোঝে না! জানালা দিয়ে কত বড় আকাশ দেখা যাচ্ছে। শহরের সেই গলির বাড়িতে এতো বড় আকাশ অকল্পনীয় ছিল। আস্তে আস্তে মনটা কি রকম ধোঁয়ার মতো ছড়িয়ে পড়ছে ওই আকাশে, তার যেন আর কোনও আলাদা অস্তিত্ব থাকছে না। কিছুতেই তাকে গুটিয়ে নামাতে পারছে না সে আঙুলে।

মাস তিনেকের মাথায় সিদ্ধদাস নিভৃতে ডেকে পাঠালেন—'মা, খুবই কি সাধন ভজন করছ?'

সুনন্দা চুপ।

'তোমার বাজনা শুনতে পাইনে তো মা!'

—'বাজাই না ঠাকুর।'

চমকে উঠলেন সিদ্ধদাস, 'বাজাবার কি দরকার হয় না মা? এমন দিন আসা অসম্ভব নয় যখন বাজাবার দরকার আর হয় না, মন আপনি বাজে।'

—'আমার সে দিন তো আসেনি!' সুনন্দা শুকনো মুখে বলল—'আঙুলে যেন আমার পক্ষাঘাত হয়েছে। হাত চলে না। সুর ভুলে যাচ্ছি, হৃদয় শুষ্ক,' সুনন্দার চোখ দিয়ে এবার অধৈর্য কান্না নামছে, 'অপরাধ নেবেন না ঠাকুর, কিছু ভালো লাগছে না, সব যেন বিষ, তেতো লাগছে সব।'

সিদ্ধদাস বললেন, 'অপরাধ কি নেবো! তুমিই আমার অপরাধ মার্জনা করো মা। তোমাকে সঠিক পথ দেখাতে পারিনি। কিছুদিন ধরেই শুনতে পাচ্ছি, তুমি খাচ্ছো না ভালো করে, ঘর ছেড়ে বেরোও না, ধ্যানের সময়ে আসো না। মন অস্থির চঞ্চল হয়েছে বুঝেছি। তুমি আর কিছুদিন অপেক্ষা করো, একটা না একটা উপায় বার হবেই, আশ্রম কখনও তোমাকে জোর করে ধরে রাখবে না। তোমার যেখানে আনন্দ, তাঁরও যে আনন্দ সেইখানেই।'

সেই রাত্রে অনেক ছটফট করে ঘুমিয়েছে সুনন্দা, দেখল সে সমুদ্রের ওপর বসে বাজাচ্ছে। বার বার ঢেউয়ে ডুবে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে। বিশাল তুম্বি সুদ্ধু বীণ বারবার তার সিল্কের শাড়ির ওপর দিয়ে পিছলে যাচ্ছে। খড়খড়ে তাঁতের কাপড় পরে এলো সে। বীণে মিড় তুলেছে। পাঁচ ছয় পর্দা জোড়া জটিল মিড়। কার কাছে কোথায় যেন শুনেছিল। কিছুতেই পারছে না। বীণ শুধু ড্যাঁও ড্যাঁও করে মত্ত দাদুরির মতো আওয়াজ তুলে চলেছে, হাত থেকে ছটাং ছটাং করে তার বেরিয়ে যাচ্ছে। এক গা ঘেমে ঘুম ভেঙে গেল, বীণ কই? সুরবাহার কই? সে সব তো এখনও আসেইনি! আঁচল দিয়ে সেতার মুছে দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইল সুনন্দা। শেষ রাতে আবার চোখ জড়িয়ে এসেছে। আবারও সেই স্বপ্ন। সমুদ্রের ওপর বীণ হাতে একবার ডুবছে, একবার ভাসছে। হাত থেকে বীণ ফসকে যাচ্ছে। ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে কেঁদে উঠল সুনন্দা।

দরজার কড়া নড়ছে জোরে। ঝাঁকাচ্ছে কেউ। খুলতেই সামনে মমতা।

—'সারা রাত কী বৃষ্টি! কী বৃষ্টি! এখানে পৌঁছে দেখি বালি মাটির ওপর দিয়ে সব জল কি সুন্দর সরে গেছে', মমতা একগঙ্গা বকে গেল, তারপর অবাক হয়ে বলল—'একি সুনন্দাদি, কাঁদছ কেন!'

সুনন্দা চোখের জল মুছে বলল, 'তুই হঠাৎ? কি ব্যাপার? আমার বীণ নিয়ে

এসেছিস ?'

মমতা বলল, 'ব্যাপারই বটে সুনন্দাদি। বীণ আনবো কি ? গোটা বাড়িটাকেই বুঝি তুলে আনতে হয়।'

ঘরে এসে বসল মমতা, 'শোনো সুনন্দাদি, রাগ করো না। দেশাই তোমার বাড়ি নিতে চাইছে না। বলছে ওখানে ভূত আছে। রি-মডেলিং করার আগে যোশী আর দেশাই ক'দিন তোমার নিচের ঘরে শুয়েছিল, অমন সুন্দর ঘরখানা তো ! তা সারা রাত বাজনা শুনেছে।'

—'যাঃ'— সুনন্দা অবাক হয়ে গেছে, 'কি বাজনা।'

—'ওরা কি অত জানে ! খালি বাজনা, কত বাজনা। ঘুম আসলেই শোনে, চোখ মেললেই সুর মিলিয়ে যায়। ঘরের একটা জিনিসও সরাতে পারেনি।'

—'কেন ?' মমতাকে দু হাত দিয়ে চেপে ধরেছে সুনন্দা।

—'কেন আর ? কিছুই না। জিনিস সরাতে গেলেই অমন কাঠখোট্টা ব্যবসাদারেরও মনে হয় আহা থাক। বেশ আছে, বড় সুন্দর আর ক'দিন যাকই না।'

সুনন্দা বলল—'তুই বলছিস আমার ঘর যেমন ছিল তেমনি আছে ?'

—'শুধু ঘর নয় গো। বাড়ি আসবাব যা যেখানে ছিল, সেখানেই আছে।'

সুনন্দা হঠাৎ উত্তেজিত পায়ে বাইরে ছুটল, 'ধনঞ্জয় ! ধনঞ্জয় !'

—'কি দিদি !'

—'আমি আজকের গাড়িতেই কলকাতা যাচ্ছি। আমার বাজনা প্যাক করে তুলে দেবার ব্যবস্থা করো ভাই।'

বৃষ্টি ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে ঘরে ফিরছেন ঠাকুর সিদ্ধদাস। উদ্‌ভ্রান্ত সুনন্দা উল্কার মতো ছুটে আসছে।

—'ঠাকুর ঠাকুর, আমি বাড়ি ফিরছি, বাড়ি।'

স্মিতমুখে ডান হাত তুলে সিদ্ধদাস বললেন, 'স্বস্তি স্বস্তি।'

কেউ নেই এখন। কেউ না। না তো। ভুল হল। আছেন। অবর্ণা, বর্ণময়ী আছেন। সর্বশুক্লা। তাই লক্ষ সুরেব রঙবাহার তাঁর পায়ের কাছে মিলিয়ে গিয়ে আরও লক্ষ সুরের আয়োজন করে। সেতার নামিয়ে আজ বীণ তুলে নিয়েছে সুনন্দা। গুরুজীর শেষ তালিম ছিল বীণে। বলতেন নদী তার নাচন-কোঁদন সাঙ্গ করে সমুদ্রে গিয়ে মেশে বেটি, বীণ সেই সমুন্দর সেই গহিন গাঙ। বীণ তক পঁহুছ যা। সুনন্দা তাই বীণে এসে পৌঁছেছে। মগ্ন হয়ে বাজাচ্ছে, হাতে সেই স্বপ্নশ্রুত মিড়। সুরের কাঁপনে বুকের মধ্যে এক ব্যথামিশ্রিত আনন্দ, তবুও মিড়ের সূক্ষ্ম জটিল কাজ কিছুতেই আসছে না। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, সুনন্দা অসম্পূর্ণ সুরের জাল বুনেই চলেছে, বুনেই চলেছে। খোলা দরজা, বাইরের ছায়াময় উঠোন বাগান দেখা যায়। কিন্তু সুর বন্দিনীর মতো গুমরে গুমরে কাঁদছে ঘরময়। কিছুতেই মুক্তি পাচ্ছে না। সেই সঙ্গে মুক্তি দিচ্ছে না তাকেও, দরদর করে ঘাম নামছে, ঘাম না কি চোখের জল যা দেহের রক্তের মতোই গাঢ়, ভারী ! পরিচিত জুতোর শব্দ। খোলা দরজা দিয়ে গুরুজী এসে ঢুকলেন, বললেন, 'সে কি ! এতোক্ষণেও পারছিস না বেটি ! এই দ্যাখ।' চট করে দেখিয়ে দিলেন গুরুজী। কয়েকটা শ্রুতি ফসকে যাচ্ছিল। স্মৃতির কোণে কোথায় লুকিয়ে বসেছিল। গুরুজী তাদের টেনে আঙুলে নামিয়ে আনলেন। সুনন্দা বাজিয়ে চলেছে। হুঁশ নেই আনন্দে। গুরুজী যে চলে যাচ্ছেন, ওঁকে যে অন্তত দু'খিলি পান দেওয়া দরকার সে খেয়ালও তার নেই। যাবার

সময়ে বলে গেলেন—'আসন, বেটি। আসন ! তুই যে আসনে ধ্যান লাগিয়েছিস, তুই ছাড়লেও সে তোকে ছাড়বে কেন ?' বলতে বলতে গুরুজী মসমস করে চলে গেলেন। হঠাৎ দেয়ালঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। সুনন্দা যেন এতক্ষণ ঘোরে ছিল। সে বীণ নামিয়ে উঠে দাঁড়াল। গুরুজী এসেছিলেন এত রাত্রে ? সে কি ? পান ? অন্তত দু খিলি পান...কাকে পান দেবে ? গুরুজী তো বাবা যাবার তিন বছর পরেই কাশীতে...। চার দিকে চেয়ে দেখে সুনন্দা। খোলা দরজায় এসে দাঁড়ায়। নিমের পাতায় হু হু জ্যোৎস্না। কোথাও কারও চিহ্ন নেই। দ্রুত দরজা বন্ধ করে দিল সে, তারপর তীব্র ভঙ্গিতে এসে বীণ তুলে নিল। মিড় তুলল। সেই জটিল, অবাধ্য মিড়। হ্যাঁ। ঠিকঠাক বলছে। অনেক দিনের স্বপ্নের জিনিস তুলতে পেরে এখন সুনন্দার হাতে সুরের জোয়ার। আরও মিড়, জটিলতর, আরও ব্যাপ্ত, আরও প্রাণমন কাঁদানো, সব মানুষের মধ্যেকার জাত-মানুষটাকে ছোঁবার মিড়। গুরুজী সত্যি এসেছিলেন কি আসেননি তৌল করতে সে ভুলে যায়। সে তার আসনে বসেছে, তার নিজস্ব আসন। সমুদ্র নীলের ওপর বড় বড় শুক্তি ছাপ। সাত বছর বয়স থেকে এই আসনে বসে সে কচি কচি আঙুলে আধো আধো বুলির মতো কতো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাজ নখরা ফুটিয়েছে ত্রিতন্ত্রী বীণায়। ঠিক যেমনটি কেসর বাই কি রোশেনারার রেকর্ডে শুনেছে। অবর্ণা দেবীমূর্তির দিকে মুখ করে, কিন্তু নতমুখ আত্মমগ্ন হয়ে, সারারাত সুনন্দা সমুদ্রের দিকে চলতেই থাকে, চলতেই থাকে। পাশে শোয়ানো সেতারের তরফের তারগুলি ঝংকৃত হয় থেকে থেকে। কাচের কেসের ডালা খোলা। সেখান থেকে সরু মোটা নানান সুরে আপনা আপনি বেজে ওঠে সুরবাহার, তানপুরা।

কে আছে দাঁড়িয়ে এই সুরের পারে ? তারের ওপর তর্জনীর আকুল মুদ্রায় প্রশ্ন বাজাতে থাকে। কে আছে ? কে আছো ? ঝংকারের পর ঝংকারে উত্তর ভেসে আসে সুর। আরও সুর। তারপরে ? আরও সুর। শুধুই সুর। ধু ধু করছে সুরের কান্তার। ঠিক আকাশের মতোই। তাকে পার হবার প্রশ্ন ওঠে না। শুধু সেই সুরের ধুলি বৃন্দাবন রজের মতো সর্বাঙ্গে মাখো। সেই সুরেব স্রোতে ভেসে যাও, আর সুরের আসনে স্থির হয়ে বসো। 'মন রে, তুই সুরদীপ হ'।

হারান-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

মেজদার ছেলে অমুর ছবিটা টিভি-তে এলো মঙ্গলবার। মেজবউদি খাটের ওপর উপুড় হয়ে পড়েছিল। মেজদা কৌচে বসে। আমি ঘটনাচক্রে ওঘরে ছিলাম সে সময়টা। চেঁচিয়ে ডাকলাম বড়দাকে। বড়দা-বড়বউদি মহুল পাপুল চারজনেই ছুটে এল। দীপু এখন নেই নইলে সেও আসত। আমার ছেলে অরু এ সময়টা কোচিং-এ যায়। মাকে আমি ডাকিনি, মা নিশ্চয়ই ছাদের ঠাকুরঘরে। কিন্তু কি ভাবে আমার ডাকের শব্দ ও অর্থ দুই-ই মায়ের কানে পৌঁছে গেল জানি না, মা-ও দেখলাম তাড়াতাড়ি এসে ঢুকছে। তখন ঘোষণা শেষ হয়ে এসেছে। অমুর একটু গম্ভীরগোছের, ছেলেমানুষি, আঠার বছরের মুখখানা সেকেন্ড কয়েক টিভি-র পর্দায় থমকে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মেজবউদির ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। মা বলল—'মেজবউমা, ওরকম অধীর হয়ো না। ওতে অকল্যাণ হয়!'

বড়বউদি বলল—'আমরা তো সবাই আছি শীলা, মাথা ঠাণ্ডা রাখাটাই এখন আসল।'

বড়দার একটা নিশ্বাসের শব্দ মনে হল শুনলাম। মা বেরিয়ে গেল। পেছন পেছন মহুল পাপুল। বড়দা একটু দাঁড়িয়ে থেকে কী যেন বলবে বলবে করে চলে গেল। বড়বউদিও। মেজদা সিগারেট পাকাতে পাকাতে সেদিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'হুঁঃ।'

অমুর ছবিটা ভালো আসেনি। মুখের বাঁ-দিকটা আবছা। ডান দিকটা অবশ্য চোখ, ভুরু, ওর খাড়া খাড়া কান, চুলের ঢেউ, ছোট্ট পাতলা মেয়েলি ঠোঁট সবসুদ্ধু নিয়ে মোটামুটি স্পষ্টই। এই ছবি দেখে আধা পরিচিত লোক হলে হয়ত চেহারাটা দেখে চিনতে পারবে কিন্তু একেবারে অচেনা লোকের পক্ষে কতখানি চেনা সম্ভব বলা মুশকিল। আমার মনে হল এই একই ধরনের কিশোর মুখ আমি অনেক দেখেছি। অরুর মুখ, দীপুর মুখও মূলত একই ধাঁচের। রাস্তায় বেরোলেই এরকম পাতলা ছাঁচের সরল গম্ভীর চোখ-অলা, নরম চুল, নরম নতুন গোঁফদাড়ির কিশোর যেন অনেক দেখা যায়। মেজদাকে কথাটা বলতে গিয়েও বললাম না। কে যেন আমার বুকের ভেতর বসে নিষেধ করে দিল বলতে। সত্যিই, কথাবার্তা আমাকে অনেক বুঝে-সুজে কইতে হয়। অরুর বাবা যাবার পর আমার মুখে কুলুপ পড়েছে। কানে শুনি অনেক বেশি, চোখেও দেখি বেশি। কিন্তু অত সব দেখলে শুনলে আমার চলবে না এটা আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে! অরুর বাবার রেখে যাওয়া টাকার সুদে ওর লেখাপড়াটা হয়, খাই-খরচ বাবদ সামান্য কিছু দিতে পারি, কিন্তু মোটের ওপর তো আমি দাদাদের ওপর নির্ভর করেই আছি! মা আছে, এটাই মস্ত ভরসা।

তিন দিন হল অমু নিরুদ্দেশ। উচ্চমাধ্যমিকটা হতে না হতেই অমুটা জয়েন্টে বসল। আই আই টি-র এনট্রান্সটা কিছুতেই দিল না। এ জন্য ওর মা ওর পায়ে মাথাটা কুটতে শুধু বাকি রেখেছে। বড়দা বড়বউদি দুজনে মিলে দীপুকে তো তৈরি করেছে ভালো! হাজার হোক দুজনেই মাস্টার। দীপুর বেরোতে আর বছর দুয়েক। ওর বাবা-মা মুখে রক্ত তুলে টাকার যোগাড় করছে। বেরোলে আর ভাবনা নেই। মেজদাই বলে, আমি আর জানব কোত্থেকে, ওর বাঁধা চাকরি, চাইকি এক্ষুনি বিদেশি স্কলারশিপ। এই পরিস্থিতিতে মেজবউদির রোখ চেপে যাওয়া স্বাভাবিক। বংশের একটা ধারা আছে তো! ঠাকুর্দা ছিলেন পি আর এস পি এইচ ডি। বাবা হেডমাস্টার, লোকে বলত স্বয়ং নেসফীল্ডও বাবার কাছে গ্রামার শিখে যেতে পারতেন। আমার বড়দাকে ঠিক দেবদূতের মতো দেখতে। স্বভাবেও তাই। অত সরল হাসি, নম্র স্বভাব, বৈষয়িক নির্লিপ্ততা যেন ঠিক এ যুগে, এ সমাজে খাপ খায় না। বড়দাও ঠিক বাবার মতো গ্রামার-পাগল, ডিকশনারি-পাগল। তবে, বাবার যতটা সাফল্য আমরা দেখেছি, বড়দার তার কিছুই নেই। দায়িত্ব নিতে ভয় পায়, সাধারণ শিক্ষক হয়েই জীবন কাটিয়ে দিল।

ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার এসব হওয়া মেজদার কপালে হয়ে উঠল না, সে নেহাত কপালেরই দোষ। ফিজিক্সে অত ভালো মাস্টার্স ডিগ্রি করে মার্চেন্ট অফিসে চাকরি করছে। আসলে বাবার পয়সার জোর ছিল না, মেজদার তাই পয়সার জন্য রোখ চেপে গিয়েছিল। দুঃখের কথা কি বলব আমাকে বাবা নিজে মাস্টারমশাই হয়ে গ্র্যাজুয়েট হবার সুযোগ দিলেন না, ইন্টারমিডিয়েট পড়তে পড়তে বিয়ে দিয়ে দিলেন। তার ফলভোগ আমি করছি, তাঁর সৌভাগ্য তাঁকে এ জিনিস দেখে যেতে হয়নি। আমার ছোড়দা যেটি ছিল, সে তো ক্ষণজন্মা। যা শুনত, অবিকল মনে রেখে দিত। ক্ষণজন্মারা থাকে না, ছোড়দাও থাকেনি। অমুর ওপর ওর বাবা-মায়ের, আমাদের সবার অনেক আশা। দীপু এঞ্জিনিয়ার হচ্ছে, হোক। অমু আমাদের ডাক্তার হবে। আমার দাদামশাই ছিলেন ধন্বন্তরী কবিরাজ। সেই ঐতিহ্য যদি অমুর মধ্যে বর্তায় আমরা খুশি হই। মেজদার অবশ্য বরাবরের ইচ্ছে অমু দীপুর মতো ইলেকট্রনিক্স-এর দিকেই যাক। দীপুতর এঞ্জিনিয়ার হোক। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা অমুর খুবই ভালো হয়েছে। পাঁচ ছটা লেটার বাঁধা। অঙ্ক দুটো পেপারেই পুরো নম্বর। প্রশ্নপত্র পরীক্ষা করে মেজদা তো খুবই প্রসন্ন মনে হল। মা তারকেশ্বরের কাছে মানত করেছে আমি জানি। বিকেলের দিকে কোন ছেলে আর বাড়ি থাকে! অমুও বেরিয়ে ছিল। কোথায় আর যাবে? পাড়ার ক্লাবে, কিংবা কোনও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা মারতে। রাত বাড়ল অমু ফিরল না। এখানে ওখানে ফোন, খবরাখবর। কেউ কিছু বলতে পারল না। বাড়ির সামনে একটা দর্জির দোকান। তার মালিক চৈতন্য বলল—'আরে অমুদাদা তো সন্তুদা আর মিন্টুর সঙ্গে রকে বসে বসে গল্প করছিল। কিছুক্ষণ পর দেখি কেউ নেই।'

সন্তু আর মিন্টুকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। ওরা দুজনেই কিছুক্ষণ অমুর সঙ্গে গল্প করেছে তারপর প্রথমে মিন্টু পরে সন্তু চলে গেছে। সন্তু যখন গেছে তখনও অমু নাকি আমাদেরই রকে বসে।

অগত্যা পুলিশে ডায়েরি। কাগজে ছবি ছাপা, টিভি-তে প্রচার। কিন্তু তিন দিন তো হয়েই গেল। মেজবউদি শয্যা নিয়েছে। বাড়ি সুদ্ধু সবাই হানটান করছে। মেজদা নাম কা ওয়াস্তে অফিস যাচ্ছে। বড়দা দেখছি সারাক্ষণ গালে হাত, ভেতরের দালানের বেঞ্চিটাতে বসে। চোখ বসে গেছে, গালে বাসি দাড়ি। কদিনেই বড়দার টকটকে রঙে

একটা ময়লা ছোপ পড়েছে। শুধু অমু বাড়ির ছেলে, সবার প্রিয় বলেই নয়। এই সেদিন পর্যন্ত ও দাদা-বউদির কাছেই পড়াশোনা করত। মাত্র মাধ্যমিকের আগের বছরেই মেজদা ওর আলাদা আলাদা বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা টিউটর রেখে দিল।

চতুর্থ দিন ভোরবেলা নিচে একটা হাউমাউ হই-হই মতো গোলমাল শুনে তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি সদর দরজা খুলে বড়বউদি চেঁচামেচি করছে, দরজার সামনে অমু। চেঁচামেচিতে সবাই-ই তখন নেমে এসেছে। নিচের উঠোনে সব জড়ো হয়ে গেল দেখতে দেখতে। অমুর চেহারা এই তিন দিনেই হয়েছে কাঙালির মতো। চুল মাটিমাখা, পরনের জামা-কাপড় ঝুল-ময়লা, কেমন উদভ্রান্তের মতো চাউনি। মেজবউদি তখন খুব কাঁদছে আর বলছে—'কোথায় ছিলি ? কোথা থেকে এলি ? শিগগিরই বল, বল, বল।'

অমু দাড়িতে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'আমার কোনও দোষ নেই। আমাকে একটা লোক ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।'

—'বলিস কি রে ?' মেজদা এগিয়ে এসে বলল।

বড়দা বলল—'তোমরা জায়গাটা একটু ফাঁকা করো। ওকে আগে খাওয়া-দাওয়া করতে দাও।'

সত্যিই অমু যেন টলছিল।

স্নান, খাওয়া-দাওয়া এবং লম্বা ঘুমের পর অমু যা বলল তা বড় অদ্ভুত। বিংশ শতাব্দীর শেষ হয়ে এসেছে। জলজ্যান্ত একটা শহরের বুকের ওপর এরকম ঘটনা ঘটতে পারে যেন বিশ্বাস হতে চায় না। পাপুল বলল—'দ্যাখো দ্যাখো পিসিমণি আমার কেমন গা শিউরোচ্ছে !'

অমুর গল্পটা এইরকম। ও মিণ্টু আর সন্তু আমাদের বাড়ির রকে বসে গল্প করছিল, সন্তু অমু দুজনেই এইচ এস দিয়েছে। মিণ্টু পরের বছর দেবে। ওদের খুব ভাব। মিণ্টু আগে চলে যায়, তারপর সন্তু বলে—'চল ক্লাবে যাই।' অমু রাজি হয়নি। এমনিই রকে বসেছিল, ভাবছিল এখুনি ভেতরে ঢুকবে। তখন মোটামুটি সন্ধের ছায়া পড়ে গেছে। এমন সময় পেশকার লেনের ভেতর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এসে অমুকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। লোকটার পরনে গেরুয়া জোব্বা। মুখে বেশ লম্বা দাড়ি, চুলগুলো বাবরিমতো, কাঁচা পাকা, হাতে একটা গেরুয়া রঙের থলি ছিল।

মেজদা বলল—'ডাকল, অমনি তুই চলে গেলি ?'

অমু বলল—'আমি ভেবেছিলুম, ও আমাকে কোনও ঠিকানা-টিকানা জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু ও আমাকে দেখেই হাতছানি মতো একটা ইশারা করে চলতে লাগল।'

—'তুইও অমনি চলতে লাগলি ?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু কেন আমি জানি না। লোকটা অলিগলি দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে চলেছে আমিও পেছন পেছন চলছি। মাঝে মাঝে খেয়াল হচ্ছে আমার ডান পাশে একটা বড়নদী, কলকারখানা চিমনি, এইভাবে আমি চলেছি। তারপরে কি হয়েছে জানি না। হঠাৎ যেন আমার খেয়াল হল আমি বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যাচ্ছি। একটা লোক আমাকে নিয়ে চলেছে, তখন আমি খুব চেঁচিয়ে উঠি, লোক জড়ো হয়ে যায়। জায়গাটা একটা আধাশহর মতো। দেখি গেরুয়া-পরা লোকটা নেই। ওই লোকগুলোই বলল—জায়গাটার নাম জয়নগর, মেছুয়াপাড়া। ওরাই আমাকে পয়সা দিয়ে বাসে তুলে দিল। তারপর এই এসে পৌঁছচ্ছি।'

মেজদা বলল—'ব্যাটাকে আমি ছাড়ব না। পুলিশ লাগিয়ে যেমন করে হোক খুঁজে

বার করব।'

মা বলল—'তোমরা তো বিশ্বাস করো না, নিশির ডাক, নিশিতে পাওয়া এসব আছে, এখনও আছে।'

—'দূর করো তোমার নিশি' মেজদা বলল, 'নিশি-ফিশি নয়। ব্যাটা ছেলে-চোর। কত কি বদ উদ্দেশ্যে আজকাল ছেলে গাপ হচ্ছে খবর রাখো ?'

বড়দা বলল—'কিন্তু অমু তো বাচ্চা নয় ! ওভাবে একটা লোকের পেছন পেছন যাওয়াটা...'

মেজবউদি বলল—'নিশ্চয় হিপনোটাইজ করেছিল ! কী সাঙ্ঘাতিক !'

বড়বউদি বলল—'অত বড় একটা ছেলেকে অতক্ষণ ধরে হিপনোটাইজ করে রাখবে, যেখানে খুশি নিয়ে যাবে...এ তো আমি ভাবতেও পারছি না। এরকম হলে তো কারুরই নিরাপত্তা বলে কিছু থাকবে না !'

মেজদা তেতো গলায় বলল—'হিপনোটাইজ অনেক ভাবেই করা যায় ; অনেকেই করতে জানে। সেটা কোনও কথা নয়। কথা হল আমার ছেলে হয়ে অমু এতটা সফ্‌টি হয় কি করে ? দুর্বল হয় কেন ?'

মেজদা সত্যিই খুব কড়া ধাতের লোক। কোনও আবেগ-সেন্টিমেন্টের ধার ধারে না। ওর বিয়ের সময়ে বাবা চাননি কিন্তু মেজদা নিজেই দশ হাজার টাকা পণ দাবি করেছিল, বাবাকে বলে দিয়েছিল ওই পণের টাকা যার কাছে পাওয়া যাবে সেই বাপের মেয়েকেই ও বিয়ে করবে। মার্কেনটাইল ফার্মের এগজিকিউটিভ জামাই করতে খরচা লাগে। এটা ওর এক ধরনের জেদ। বাবা একটু আদর্শবাদী ধাতের মানুষ ছিলেন। বড়দার ওপর ঝোঁকটা ছিল বেশি। বড়দার বিয়েতে এক পয়সাও নেননি। নিজের সঞ্চয় থেকেই খরচ করেছিলেন। মেজদার সেটা রাগের কারণ ছিল। হিপনোটাইজ করার কথাটা মেজদা ওভাবে বলল কেন বড়বউদি বোঝেনি, আমি কিন্তু বুঝেছি। অমু ওদের একমাত্র ছেলে কিন্তু বড়দা-বউদির বড্ড ন্যাওটা ছিল ছোট থেকে। দীপু, মহুয়া, পাপুয়া, অমু, অরু একটা গ্রুপ। পাঁচজনের খুব ভাব। অনেক সময়ে অমু বড়মার ঘরে শুয়ে পড়ত দাদার পাশে। মেজদা এল টি সি নিয়ে নিয়মিত বেড়াতে যায়। অমু সব সময়ে যেতে চাইত না। এটা মেজদা মেজবউদি ভালো চোখে দেখত না। ছোটতে যখন সুবিধে ছিল ছেলে ট্যাঁকে না থাকার, তখন কিছু বলত না। সিনেমা যেতে, বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি বেড়াতে যেতে অমুকে বড়মার কাছে রেখে চলে যেত। কিন্তু অমু বড় হয়ে যেতে এটা ওদের একদম পছন্দ হচ্ছিল না। অমুর জন্য আলাদা টিউটর রাখাতে বড়দা-বউদি দুজনেই খুব আঘাত পায়। বড়দা অঙ্ক ইংরেজি ভালো জানে। বউদি ভূগোলের টিচার। আমি শুনেছি বড়দা বলছে—'দ্যাখো উমা, তুমি অসিতকে বারণ করো, অতগুলো পয়সা খরচ করবে কেন শুধু শুধু ? ওতো ভালোই করছে আমার কাছে। আমি না পারলে দীপু রয়েছে। যখন আসবে দেখিয়ে দেবে। তা ছাড়া মাধ্যমিকের জোগ্রাফির কত ফ্যাচাং ! তুমি না দেখালে কে আর ওভাবে দেখাবে ?'

বড়বউদি বলেছিল—'আমার যা কিছু শেখাবার তা অমু কবেই শিখে গেছে। আমার আর ওর মাস্টারি করবার দরকার নেই। আর ওর বাবা-মা যদি তোমার পড়ানোয় সন্তুষ্ট হতে না পারে, তাতে তোমারই বা এতো কি ?'

বড়দা ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিল—'সন্তুষ্ট-অসন্তুষ্টর কথা উঠছে কোথা থেকে ? তুমি সবটাই বড় ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে দ্যাখো। আসলে ও মনে করেছে আমি আদতে ইংরিজির লোক,

অঙ্কটা...'

বড়বউদি বলেছিল—'মনে তো ঠিকই করেছে। তুমি এই নিয়ে রগড়ারগড়ি করা ছেড়ে দাও।'

অমু নিজেও খুব ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল, বলেছিল—'জেঠু আমার অ্যাডিশনাল ম্যাথ্‌স্ পর্যন্ত সামলে দিচ্ছে! আমার আবার টিউটর কি হবে? ফিজিক্স তো তুমি ইচ্ছে করলেই দেখাতে পারো। কেমিস্ট্রি দরকার হলেই বড়মার কাছে যাই।'

—'ভূগোলের মাস্টারনি কেমিস্ট্রির কি জানে রে?' মেজদা তেড়েমেরে বলেছিল।

—'জানে অনেকরকম। ডাকিনীবিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্র', মেজবউদি মন্তব্য করল। হিপনোটিজমের প্রসঙ্গের উৎস ওইখানে। আমি ঠিকই ধরতে পেরেছি।

পুলিশের কাছে আবার নতুন করে যাতায়াত শুরু হল। থানার ও-সি মেজদার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তেন। খাতির আছে। বললেন—'নৈহাটি অঞ্চলে ছেলেধরা সন্দেহে স্থানীয় লোক দুজন যুবককে পিটিয়ে খুন করেছে। ছেলেধরার উপদ্রব আমাদের এদিকে তো ছিল না। অমিতাংশুকে দিয়ে শুরু হল। তার মানে লোকটা চট করে এ অঞ্চল ছাড়বে না। ওকে ফিরে আসতে হবেই। আর তখনই ওকে ধরা পড়তে হবে আমার জালে। এক কাজ করো, অমিতকে আমার সঙ্গে একটু একলা কথা বলতে দাও। দরকারি কথাগুলো জেনে নিই।'

আধ ঘণ্টাটাক অমুকে নির্জনে জেরা করে ছেড়ে দিলেন প্রতাপদা। মেজদা বলল—'প্রতাপ বলেছে বড়জোর এক মাস। তার মধ্যেই ব্যাটা ভণ্ড সন্ন্যাসীকে ও খুঁজে বার করবেই।'

কিন্তু আমরা অমু সম্পর্কে একটু সাবধান হয়ে গেছি। ওকে বড় একটা বাড়ি থেকে বার হতে দেওয়া হয় না। হলে সঙ্গে অরু থাকে। অরু অবশ্য নেহাত ছেলেমানুষ। তবু একটা মানুষ তো! অমুর বন্ধুবান্ধবদেরও পইপই করে বলে দেওয়া হয়েছে ওরা যেন ওকে একলা ফেলে অন্যত্র না যায়।

বড়দা অবশ্য আমাদের এতো সাবধানতা দেখে বলল, 'ছেলেধরাই যদি হয় তা হলে তোরা অরুর ওপরও নজর রাখ। ও তো সত্যিই পুঁচকে। একলা একলা স্কুল, কোচিং, খেলার মাঠ, বাজার সবই তো করছে। অমুর বয়সের ছেলের চেয়ে অরুর বয়সের ছেলের তো বিপদ বেশি।'

শুনে আমার বুকের মধ্যেটা কেমন কেঁপে উঠল। আমি একেবারেই নিঃসহায়। অরুর ওপর পাহারা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মা বলল—'অরু ডাকাবুকো ছেলে, ওর ওপর চট করে কেউ হাত দেবে না।' মা যেন সব জেনে বসে আছে। মহুয়াকে ডেকে বললাম—'অরুকে একটু তোর কাছে আটকে রাখিস তো!' দিদিকে অরু খুব মানে। মহুয়া বলল—'তোমারও ভয় করছে পিসিমণি?' সাহসী, মাথা-ঠাণ্ডা বলে আমার খুব খ্যাতি এ বাড়িতে। আমার সাহস যে নিরুপায়ের সাহস তা মহুয়া কি করে বুঝবে!

দিন দশেক পরে প্রতাপদা এলেন। মেজদার সঙ্গে কি চুপিচুপি কথাবার্তা হল, তারপরেই শুনলাম আমাদের সবাইকেই, অর্থাৎ বড়দের সবাইকে উনি ডাকছেন। আমি, মা, বড়দা, বড়বউদি সবাই গেলাম। সব চুপচাপ। প্রতাপদা সিগারেট খাচ্ছিলেন, মাকে দেখে সেটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন।

'কী ব্যাপার? কিছু পেলে?' বড়দা বললেন।

রহস্যময় হাসি হেসে প্রতাপদা বললেন—'পেলাম আবার পেলামও না।'

'খুলেই বলো না !' মেজদা মাথা ঝুঁকিয়ে বসেছে।

প্রতাপদা বললেন—'অমিতাংশু আদৌ কারো ডাকে সাড়া দিয়ে যায়নি, এমনি এমনিই চলে গিয়েছিল। ওসব দাড়ি-অলা গেরুয়াধারী ওর কপোলকল্পনা। মিথ্যে কথা।'

মেজদা গরম হয়ে বলল—'অমু মিথ্যে কথা বলছে ?'

বড়বউদি বলল—'তাতে ওর লাভ ?'

'সেটাই তো ধরতে পারছি না। প্রথমে ওর বর্ণনা থেকে মনে হয়েছিল লোকটা ছদ্মবেশ পরে আছে। দাড়ি চুল সব নকল। সেটা মাথায় রেখেই অমু যেখানে গেছে বলে বর্ণনা দিয়েছে, সেখানে সেখানে খোঁজ করেছি। অমুর খোঁজ পেয়েছি অথচ লোকটার কথা কেউ বলতে পারছে না। অমুর যাত্রাপথটা আমি মোটামুটি ট্রেস করতে পেরেছি।'

'পেরেছ ?'

'পেরেছি। কিন্তু সেটা লোকজনকে জিজ্ঞেস করে করে। ওর বর্ণনামতো এগোতে গিয়ে দেখলাম ও মিথ্যে কথা বলছে। উত্তেজিত হয়ো না অসিত', একটু হেসে প্রতাপদা বললেন—'ছেলে তোমার একা একা কোথাও এখনও যায়নি বিশেষ কিছুই জানে না, চেনে না। বড় নদী, কলকারখানা এইসব অস্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে ও আমাদের বোঝাতে চেয়েছে ও গঙ্গার পশ্চিম পাড় ধরে এগিয়েছে মোটামুটি। শেষকালে পৌঁছেছে জয়নগর। অথচ জয়নগরের পথ আদৌ গঙ্গার ধার দিয়ে নয়। আর সেখানে মেছুয়াপাড়া বলেও কিছু নেই। আমি যদ্দূর ধরতে পেরেছি, ও ঘুসুড়ি, বালি, উত্তরপাড়া হয়ে হুগলির দিকে চলে যায়। ব্যান্ডেল পর্যন্ত ও গিয়েছিল, কখনও বাসে, কখনও পায়ে হেঁটে। এখন বলো ওদিকে তোমাদের কোনও আত্মীয় বা অমিতের কোনও চেনাশোনা আছে ? কিংবা জয়নগরে ? যার কাছে ওর যাওয়ার ইচ্ছে থাকতে পারে !'

আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। কেউ নেই। আমাদের চেনা কেউ নেই। না ব্যান্ডেলের দিকে, না জয়নগর। অমুর চেনা কেউ আছে কি না কি করে জানব ? এতদিন ধারণা ছিল অমুকে আমরা চিনি, অমুর চেলাদেরও চিনি। এখন মনে হচ্ছে অমুকেও পুরো চিনি না, সে ক্ষেত্রে ওর চেনা অথচ আমাদের অজানা লোক থাকতেই পারে। প্রতাপদা এবার খাটো গলায় বললেন—'রাগ করবেন না, কোনও লভ অ্যাফেয়ার-ট্যাফেয়ার !'

'পাগল হয়েছো ? অমু করবে প্রেম ? মেয়ে দেখলে এখনও শিঁটোয় !'

'ওইরকম ছেলেরাই বেশি প্রেমে-ট্রেমে পড়ে, অসিত।'

বড়বউদি বলল—'না, না, ওসব নয়। হলে আমি জানতে পারতুম।'

'পরীক্ষা দিচ্ছিল না ?' প্রতাপদা জিজ্ঞেস করলেন, 'পরীক্ষা কি রকম হয়েছে ? কবে রেজাল্ট ?'

বড়দা বলল—'খুব ভাল হয়েছে। জয়েন্টে চান্স পাওয়া তো কারো হাতে নয়, তবে উচ্চমাধ্যমিক খুবই ভালো হয়েছে।'

বড়বউদি বলল—'রেজাল্ট বেরোতে এখনও অনেক দেরি।'

'হু', প্রতাপদা গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'বাড়িতে কোনও ঝগড়া বিবাদ, ছেলেপুলেদের পক্ষে ট্রমাটিক কিছু ! সঙ্কোচ করলে চলবে না।'

মেজদা বলে উঠল—'প্রশ্নই ওঠে না। এ বাড়ি পাড়ার মধ্যে সব চেয়ে ভদ্র বাড়ি। কোনও ঝগড়া-ঝাঁটি এখানে কখনও হয় না।'

কথাটা সত্যি। আশেপাশের বাড়িতে যখন তখন ধুন্ধুমার ঝগড়া, বাসন ফেলাফেলি,

কান্নাকাটির আওয়াজ পাই। আমাদের বাড়িতে ওসব নেই। কিন্তু আওয়াজ নেই বলে যে বিবাদও নেই, কথাটা সত্যি না। মহুল বলে, 'পিসিমণি আমাদের বাড়ি ঠাণ্ডা লড়াইয়ের বাড়ি, কি বলো?' ঠিক কথা। এটা বরাবর ছিল। আমার বাবা যখন বেঁচে ছিলেন তখনও। বাবা বড়দাকে পছন্দ করতেন, ভালোবাসতেন বেশি। বড়বউদির ওপরও তাঁর ভরসা ছিল বেশি। বিনা কারণে হয়নি ব্যাপারটা, বড়দা যেমন নির্মলচিত্ত, স্নেহপ্রবণ, বড়বউদিও তেমন কর্মঠ আপন পর জ্ঞানশূন্য ছিল। সে সময়ে আমাদের পয়সার টানাটানি চলেছে, মেজদার চাকরি হয়নি, ছোড়দা ভুগছে, তখন বড়বউদি ঘরে বাইরে যে পরিশ্রম করেছে ভাবলে চোখ দিয়ে জল পড়ে। এমনিতে ওর সকালবেলায় স্কুল। দুপুরেও একটা পার্ট-টাইম নিল। বাড়ি ফিরে তিনটে থেকে টুইশনি। সপ্তাহে তিন চার দিন। কোন ভোরবেলা উঠে রান্না সারছে, আমি বাপের বাড়ি থাকলে হয়ত যোগান দিচ্ছি। মা পুজো না করে নিচে নামবে না। বাবারও তখন অনেক ফরমাস ছিল। সেসব মা সামাল দিত। দু হাতে সব কাজ সেরে, গোছগাছ করে বউদি ঝড়ের বেগে স্কুলে চলে যেত। ফিরে স্নান খাওয়া করে আবার। সে সময়টা পাপুল হয়নি। বাবা-মা সব সময়ে বাইরে কিংবা কাজে ব্যস্ত। দীপু আর মহুয়া যে কী করে মানুষ হয়েছে! যাই হোক। মায়ের ঝোঁক কিন্তু বরাবর মেজদার দিকে। ছোটকে মা খানিকটা সমীহ করত। মেজ বরাবর রাগী, জেদী, মা তার রাগকে তেজ, জেদকে দৃঢ়তা বলে প্রশ্রয় দিয়ে গেছে। বাড়ির মধ্যে এই দুই-দুই চিরকাল অশান্তি জাগিয়ে রেখেছে। ধিকি ধিকি আগুনের মতো। বড়বউদির মার ওপর গভীর অভিমান। বড়দাও বাবা চলে গিয়ে যেন সংসারের মধ্যে খুঁটিহীন একলাটি পড়ে গেছে। মেজবৌ শীলা কোনদিন বড়বউদিকে দেখতে পারে না। ওর জ্বালাটা আমি বুঝি। বড়লোকের মেয়ে, বড় চাকরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, কিন্তু একেবারে গো-মুখ্যু। সংসারে বড়বউদির এই প্রতিষ্ঠা। বাইরে তার মান সম্মান এ জিনিস ও এখনও সইতে পারেনি। মানতে শেখেনি। অথচ বড় ওকে আপন বোনের মতো স্নেহ করতো। স্পষ্টাস্পষ্টি দোষ ধরতে না পারলে জ্বালাটা বোধহয় আরও তীব্র হয়। আমি জানি মেজবউদি তার জ্বালার অনেকটাই মেজদার মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছে। মেজদা আগে থেকেই বড়দার ওপর খাপ্পা ছিল, এখন তাকে একেবারে দেখতে পারে না। বড়বউদিকে বলে মাস্টারনি। বাড়িতে কেউ খেতে এলে, জোর করে মেজবউদিকে দিয়ে একটা পদ রাঁধায়। অতিথিকে খাওয়ার সময়ে জিজ্ঞেস করে—'কোন কোন রান্নাটা ভালো হয়েছে?' যদি কেউ এখনও মেজবউদিরটা ভালো বলে তো কূট চোখে চারদিকে তাকায়, বিশ্রী হাসে। শুধু বড়বউদি নয়, মহুয়া পাপুল পর্যন্ত এ জিনিসগুলো ধরতে পারে। পারে না খালি আমার মা। বলে 'হ্যাঁ, শৌখীন রান্নায় মেজবউমার হাত ভালো। ব্যাগারঠালা কাজ নয়তো!'

বড়বউদির অভিমান হবে না কেন! তা এইসব ক্ষুদ্রতা, প্রতিদিনকার নীচতা কি ভাষায় প্রকাশ করার যোগ্য? না এ কাউকে বলা যায়! অফিস ফেরত মেজদা যে বড় দোকানের কেক-প্যাটিস আনে, ভালো সন্দেশ আনে, দরজা বন্ধ করে স্বামী-স্ত্রী খায়, ছেলের জন্যে রেখে দ্যায়। আর বড়দা যে সামান্য একটু নতুন গুড়ের সন্দেশ আনলেও তার কুটি কুটি ভাগ হয় সবার জন্যে, আর এই জিনিস নিয়ে বড়বউদি কান্নাকাটি করলে মা বলে—'ও করছে করুক গে, বউমা, তুমি বড়, বড়র মতো ব্যাভার করো'—এ-ও তো সত্যি! দীপু হোস্টেলে থাকে। কিন্তু মহুয়া পাপুয়া যে মেয়ে, সংসারের ভেতরকার সব গোঁজামিল টের পায়। টের পেয়েও চুপ করে থাকে। কখনও কখনও গম্ভীর উদাস হয়ে যায়, এ

তো আমি দেখতেই পাই। সত্যিকার মানসিক ধাক্কা খাওয়ার কথা ওই দুটি মেয়ের। অমু, অরু এরা কতদূর এসব অনুভব করে আমার জানা নেই।

প্রতাপদা বললেন, 'ইনভেস্টিগেশন আমি চালিয়ে যাচ্ছি। তবে কোনও লাভ নেই। আমি নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট শিওর অমিত মিথ্যে বলছে, সত্যটা তোমরা স্বীকার করো চাই না করো।'

প্রতাপদা বেরিয়ে গেলেন। মেজদা ফুঁসছে। 'আমার ছেলে মিছে কথা বলবে ?' মেজবউদিও ফোঁপাচ্ছে---'অমু আমার ছেলে হয়ে মিছে কথা বলবে এ আমি ভাবতেও পারছি না,' কেন ভাবতে পারছে না ভগবান জানেন। আমি যা জানি তা হল এই মেজদা মেজবউদি প্রায়ই ট্যাক্সি ভাড়া করে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি লৌকিকতা করতে যায় এবং বড়দা-বউদির নামে তাদের ছেলেমেয়েদের নামে অকথ্য সব মিথ্যে কথা লাগিয়ে আসে। আমার নামেও লাগায়। আমি নাকি ননদিনী রায়বাঘিনী, আমার সমস্ত খরচ ওরাই বহন করে, অথচ আমি ছেলেকে চুপিচুপি আলাদা খাওয়াই। পরিবেশন করতে গেলে বড় মাছটা নিজের ছেলের পাতে তুলে দিই। আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি গেলে আমার বা বড়দার পরিবারের আজকাল যে হতচ্ছেদ্দা মিলছে তা এই কারণেই, আমি জানি। এ সব কথা কেন যে লোকে বিশ্বাস করে সেটাও আমার কাছে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। ওরা কি দেখেনি বড়দার নিষ্পাপ চোখ, মন্টু পাপুর মিষ্টি ব্যবহার। নিজেদের চোখে দেখেনি বড়বউদির ভূতের খাটুনি ! দেখেছে, দেখে অনেক সময়েই বলেছে---'বড়কে একটু সব দিক দেখতে হবে বইকি !' তা না হয় দেখল। কিন্তু তারপরেই মা যদি নালিশ করে, 'সংসারের চাবিকাঠিটি বড়বউমার হাতে ! কলকাঠি সব ওই নাড়ছে।' তবে সেটা অন্যায় হয় না ? সে গতরে করবে, বুদ্ধিতে করবে, অর্থ দিয়ে করবে, তোমাদের হাতে চাবিটি তবে থাকে কি করে ?

বড়দা বলল---'অসিত, প্রতাপ যতই হোক একজন অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার, তার কথাটা একেবারে ফেলে দিও না।'

মেজদা তেড়ে উঠল—'মানে, তুমি তা হলে ওকে মিথ্যেবাদী হতেই শিখিয়েছ ?'

বড়দা বলল—'মিথ্যের প্রশ্নই উঠছে না। আমি বলছিলুম ওকে একজন ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাও।'

'বলছ কি, আমার ছেলেকে পাগল বলছ ? পাগল বলতে চাইছ ?'

'শোনো অসিত, মাথা ঠাণ্ডা করো, মাথা গরম করার সময় এ নয়। শুধু পাগলরা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যায় না। অনেক রকমের মানসিক বিপদ আছে তা ছাড়াও। তুমি ওকে ডাক্তার দেখাও। ওকে যেন এখন মিথ্যেবাদী বলে শাসন করতে যেও না।'

'শাসন করব না মানে ? পিঠের ছাল তুলে নেব !'

'তার আগে শিওর হও যে ও মিথ্যে কথা বলছে !' বড়দাকে কোন দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত কথা মেজদার সঙ্গে বলতে দেখিনি। বড়দা নিজের ঘরে গিয়ে বড়বউদিকে বলল—'উমা, টাকা বার করো, ও না যায় আমিই ডাক্তারের কাছে যাব।'

বউদি বলল—'না, তুমি যেতে পারবে না। টাকা আমি দেব না।'

বড়দা আহত দৃষ্টিতে চেয়ে বলল—'একথা তুমি বলতে পারলে ? এই মহা বিপদের সময়ে তুমি ছোটখাটো সাংসারিক মনোমালিন্যর কথা ভেবে হাত গুটিয়ে নিচ্ছ ?'

বউদির চোখ ছলছল করছে, সে বলল—'সুবর্ণ, তুই সাক্ষী রইলি, যার ছেলে তার সিদ্ধান্তের ওপর হাত দিলে যে কী ভয়ানক অশান্তি হতে পারে তা জানি বলেই নিষেধ

করছিলুম। কিন্তু তোর দাদা আমাকে আপাদমস্তক ভুল বুঝল।' বউদি আলমারি থেকে বার করে দিল টাকা।

বড়দা বলল—'আমি তো ওকে নিয়ে যাচ্ছি না উমা, ডাক্তারকে শুধু কেসটা বলব, মতামত নেব। কাউকে কিছু বলবার দরকার নেই। আমার প্রাণটা বড় অস্থির লাগছে।'

সত্যিই বড়দা যেন ধড়ফড় করতে করতে বেরিয়ে গেল।

মেজদা অবশ্য শেষ পর্যন্ত বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শে ঠিকই করল অমুকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। সকলেই বলছে কৈশোর বড় খারাপ সময়। ডাক্তার দেখিয়ে নিতে ক্ষতি কি?

অমু প্রত্যেক সপ্তাহে ডাক্তারের কাছে সিটিং দিতে যায়। দু'বার করে। মেজদার সময় হয় না সব দিন। বেশির ভাগ দিন আমিই যাই। আমার কাজ আর কিছু না। বাইরে ওয়েটিং রুমে বসে থাকি। আধ ঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় নেন ভদ্রলোক। ইনি শুধু ডাক্তারই নন, সাইকো-অ্যানালিসিসও নিজেই করেন। হয়ে গেলে অমু বেরিয়ে আসে, আমি ওকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাই।

মাসখানেক পরে ডাক্তার আমায় ডেকে পাঠালেন। কথাবার্তা যা হল তা এই : ডক্টর চন্দ্র : 'আপনি তো অমিতাংশুর পিসি!'

'হ্যাঁ।'

'নিজের?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কত দিন এদের বাড়িতে আছেন?'

'বছর দশেক।'

'আপনার ছেলের বয়স?'

'চোদ্দ।'

'আপনার ছেলে অমিতাংশু যে স্কুলে পড়ত সেখানে পড়ে না কেন?'

এসব প্রশ্নের অর্থ কি আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। বিরক্তিও লাগছিল। এটা আমার একটা গোপন ক্ষতের জায়গা। অরুকে পাড়ার স্কুলে দিয়েছি। অর্ধেক সময় ক্লাস হয় না। পাজি ছেলেদের আখড়া একটা। পাঁচিল টপকে টপকে সব পালায়। প্রতিবছর অর্ধেক ছেলে ফেল করছে, সবাই প্রোমোশন পেয়ে যাচ্ছে। এখানে আমার দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু অরুকে যখন ভর্তি করেছি ওর মাথাটা কাঁচা ছিল, একদম: অমুদের স্কুলটা দূরেও বটে, কড়াও বটে। মেজদা একটু ধরাধরি করলে হয়ে যেত কারণ দীপু, অমু দুজনেই ওই স্কুলের ভালো ছাত্র। কিন্তু মেজদা বা বড়দা কেউই সেটা করেনি। বড়দার স্কুল কলকাতায়। সেখানে ভর্তি করার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু আমি আশা করেছিলাম, মেজদা না হোক বড়দা অমুদের স্কুলে অরুকে ভর্তি করবার চেষ্টা করবে। কিন্তু করল না। বড়দাও না। আমি এখন বুঝি বড়দা খুব ভালো, কিন্তু মাস্টারমশাই হিসেবে ও ভালো ছেলেদের জন্যে যতটা দরদ অনুভব করে, সাধারণ ছেলেদের জন্য ততটা নয়। তা ছাড়া আমার সন্দেহ হয় অরুর বাবার নামটা ওরা সবার কাছে বার করতে চায় না। অরুকে পড়িয়ে শুনিয়ে অবশ্য বড়দা-বউদিও তারপর তৈরি করেছে। স্কুলের সায়েন্স টিচারের কোচিংয়ে না দিলে তিনি ওকে ঠিকঠাক নম্বর দেবেন না তাই দেওয়া। এত কথা ডাক্তারকে বলা যায় না। বলার মানেই বা কি? আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ডক্টর চন্দ্র বললেন—'প্রাসঙ্গিকতা না থাকলে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতাম না। মাই পেশেন্ট ইজ

ভেরি মাচ হার্ট।'

আশ্চর্য! কি বলছেন উনি? আমি বললাম—'দেখুন আমার স্বামীর রেখে যাওয়া সঞ্চয়ের ওপর নির্ভর করে আমাকে চলতে হয় অনেকটাই। অমুর স্কুলে পড়াবার আর্থিক সাধ্য আমার নেই। আমার ছেলে ভর্তির সময়ে তত চৌখসও ছিল না। অ্যাডমিশন টেস্টে পারেনি। এ প্রশ্ন উঠছে কেন আমি বুঝতে পারছি না।'

ডক্টর চন্দ্র হেসে বললেন, 'দেখুন পিসিমণি, আমার পেশেন্ট বহুদিন ধরে লক্ষ্য করেছে বাড়ির সব ছেলেমেয়ে বড়দের কাছ থেকে এক ব্যবহার পাচ্ছে না। আপনার ছেলের স্কুল ভর্তি নিয়ে নিশ্চয় বাড়িতে যথেষ্ট কথা কাটাকাটি হয়েছে। আমার পেশেন্ট মনে করে আপনার ছেলেকে এবং আপনাকেও অবহেলা করা হচ্ছে, এটা একটা পয়েন্ট। কিন্তু শুধু তাই-ই নয়, অনেক রকম পারিবারিক অবিচার, স্কুলের অবিচার সামাজিক অবিচার ওর মনের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে বলে মনে হচ্ছে।'

'তো কি? ও কি তাই জন্যেই পালিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে।'

'মে বি, হী ওয়াজ ট্রাইং টু গেট অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ফ্যামিলি, ফ্রম দা সোসাইটি। বাট হী ইজ টেলিং আস ট্রুথ হোয়েন হী সেজ হী ওয়াজ সর্ট অফ ডিউপড্ বাই এ ম্যান। পিসিমণি ওই লোকটি সত্যি। তবে সে লোকজন জড়ো হতে পালিয়ে গিয়েছিল কি না, অমিতাংশু অ্যাট অল ঘুসুড়ির পথে গিয়েছিল না বামুনগাছির পোল হয়ে কোনা জগদীশপুরের দিকে যায় সেটা এখনও বুঝতে পারিনি। বাই দা ওয়ে, আপনারা কি জানেন অমিতাংশু খুব ভালো ছবি আঁকতে পারে?

—'না তো! তবে বউদি বলে ম্যাপ ট্যাপ খুব ভাল আঁকে। বউদির ইচ্ছে ছিল ও জোগ্রাফি পড়ে। কার্টোগ্রাফি নিয়ে পড়াশোনা করে।'

'কে বউদি? পেশেন্টের মা?'

'না, ওর জ্যাঠাইমা, বড়মা বলে।'

'হুঁ।' ডক্টর চন্দ্র চুপ করে গেলেন, তারপরে বললেন, 'অমিতাংশু আমাকে একটা ছবি এঁকে দিয়েছে, ফ্রি হ্যান্ড এঁকেছে, কিন্তু একেবারে নিখুঁত। ওই লোকটির ছবি।'

—'কে লোক?'

—'যে ওকে ডেকেছিল।'

ড্রয়ার থেকে সাদা একটা কাগজ বার করে আমার সামনে রাখলেন ডক্টর চন্দ্র। এবং আমি ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম। ছবিটা এগার বছর আগে নিরুদ্দিষ্ট আমার স্বামীর। ওর একটা ছবি আমার ঘরে আছে। ধুলোময়লা পড়ে মলিন চেহারা। বছরে একদিন হয়ত হাত পড়ে তাতে। মালা কখনও পড়ে না। যদিও আমার বিশ্বাস ও আর নেই, তবু মালা পরাতে হাত কেঁপে যায়। তা ছাড়া যে মানুষ তার স্ত্রী এবং শিশুপুত্রকে পুরো সংসারের সামনে একলা অসহায় ফেলে রেখে নিজের যন্ত্রণা, নিজের অভিমানকে বড় করে দেখে পালিয়ে যেতে পারে তার ফটোর কি মালা পরা সাজে? অবিকল সেই ছবিটি এঁকেছে অমু। মাথায় কাঁচা পাকা চুল, কাঁচা পাকা দাড়ি। কিন্তু ভেতরের মুখটি চিনতে অন্তত আমার কোনও ভুল হয়নি। ও কি তবে বেঁচে আছে? সত্যিই আমাদের বাড়ির কাছে এসেছিল? অমুকে ডেকে আমার কথা জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল? তা হলে তা না করে ওকে ওভাবে ডেকে নিয়ে যাবার অর্থ কি? ওভাবে পালিয়ে যাবারই বা অর্থ কি? ওর কি মাথার ঠিক নেই?

ডাক্তার আমার মুখের ভাব দেখছিলেন, বললেন—'চেনেন?' আমার দিকে এক গ্লাস

জল এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'জলটা খেয়ে নিন। তারপরে উত্তরটা শুনব।'

খানিকটা কবুল করতেই, বললেন—'গোপন করবেন না। ডাক্তার আর উকিলকে কিছু গোপন করতে নেই, জানেন না?'

গোপন করার আর আছেটা কি? তবে সেসব কথা এখন আমার মনে করতেও কষ্ট হয়। অফিসে টাকা তছরূপের দায়ে সাসপেন্ড হলেন। মস্ত দায়িত্বশীল পদে কাজ। পেমেন্টের জন্য বিল সই হতে আসে অজস্র, প্রতিদিন। রুটিন কাজ। গোছা গোছা ফলস বিল সই করিয়ে নিয়ে গেছে। অধস্তন অফিসারদের এতো বিশ্বাস করতেন যে তাঁর নিজের সইয়ের জায়গাটি পর পর খুলে ধরলে বিলে তাদের সই আছে কি না দেখে নেবার দরকারও মনে করতেন না। কখনও কখনও এরা তাড়াতাড়ির নাম করে ব্ল্যাঙ্ক চেকও নাকি সই করিয়ে নিয়েছে। এসব আমি পরে শুনেছি। মুখের কথাই ছিল বিশ্বাস করে ঠকব তা-ও ভালো। তো ঠকো। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা ওর আত্মপক্ষ সমর্থন কেউ বিশ্বাস করেনি। নিজের উকিলও না। কেস যখন সাব জুডিস তখন কোথাও আমাদের মুখ দেখাবার উপায় ছিল না। রকম-সকম দেখে ওর রোখ চেপে গেল, বলল—'কারা করেছে এখন আমার কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। তাদের আমি ধরাবই।' অফিস থেকে কোনও সাহায্য পাবার উপায় নেই। একজন অনুগত পিওনের সাহায্যে প্রত্যেকটি অফিসারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করল, অমানুষিক পরিশ্রম আর বুদ্ধি খরচ করে।

এই পর্যন্ত শোনার পর ডক্টর চন্দ্র বললেন, 'ও হো মনে পড়েছে, সে তো সেনসেশন্যাল কেস। আসামী ধরা পড়েনি। পি কে দত্ত বেনিফিট অফ ডাউটে মুক্তি পেলেন। আচ্ছা। সেই কেস।'

আমি বললাম—'আসামী ধরা পড়েছিল। প্রতীক দত্ত বেনিফিট অফ ডাউটে মুক্তি পাননি। বেকসুর খালাস পান। তাঁর অধস্তন তিনজন অফিসার এক সাপ্লায়ারের সঙ্গে মিলে বেশ কিছুদিন ধরে এভাবে টাকা মারছিল। তাদের শেষ পর্যন্ত প্রতীক দত্তই ধরিয়ে দেন। প্রত্যেকের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। কিন্তু ডক্টর চন্দ্র, আপনি যেমন কেসটার সম্পর্কে ভুল তথ্য জানেন, বিশ্বসুদ্ধু লোকও তেমনি জানে। কেন জানেন? খবরের কাগজের গাফিলতি। যতদিন একটা পদস্থ, মানী লোককে টেনে মাটিতে নামাবার সুযোগ ছিল, তার নাম কলঙ্কিত করবার সুযোগ ছিল ততদিন রগরগে সংবাদগুলো তেল মশলা ঢেলে পরিবেশন করেছে। তার পরের কথা আর কিছু লেখেনি। কিচ্ছু না। কাজেই আপনার মতো সবাই অর্ধসত্য জানে।'

ডক্টর চন্দ্র মুখে একটা দুঃখসূচক শব্দ করলেন, উনি আমার দিকে সোজা তাকিয়ে আছেন। আমি বললাম, 'আর আজ আপনার ব্যবহার যা, এগার বছর আগে গোটা সমাজের ব্যবহারও অবিকল তাই-ই ছিল। আমাদের নিজেদের লোকেরা, আমার এবং আমার স্বামীর বাবা ভাই কেউ বিশ্বাস করেননি সে নির্দোষ। বেকসুর খালাস পাবার পরও তার সঙ্গে আপনজনদের ব্যবহারে দ্বিধা অবজ্ঞা অবিশ্বাস মিশে ছিল। উকিল বলেন—'এইবার আপনি সরকারের নামে মানহানির মামলা করুন মিঃ দত্ত।' উনি চুপ করেছিলেন। অপরাধীদের ধরতে ওঁর সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। এবং অপরাধীরা যে তাঁর ভাইয়ের মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো ছিল, এই চেতনা, এই বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, কেস মিটে যাবার পরও। আর তারপর একদিন শেষ রাতে, এই অসহনীয় সামাজিক নির্যাতন সইতে না পেরে উনি নিরুদ্দেশ হয়ে

যান।'

ডক্টর চন্দ্র বললেন—'এক্সট্রীমলি ইন্টারেস্টিং। তার মানে বোঝাই যাচ্ছে উনি বেঁচে আছেন। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছেন। অমিতকে হয়ত নিজের ছেলেই ভেবেছেন। কেন বাড়িতে আসেননি, বাড়ির কাছাকাছি কোথাও বসে ওর সঙ্গে কথা বলেননি, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই তার কোনও সঙ্গত ব্যাখ্যা আছে। তা হলে আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে যান ইটস নট এ কেস অফ হ্যালুসিনেশন। যদিও একটা কথা আমি আপনাদের বলবই ডাক্তার হিসেবে, অমিতাংশু ছেলেটি একেবারে স্বাভাবিক নয়। একটু বেশি স্পর্শকাতর। ও পরিবারের এবং তার বাইরের বৃহত্তর সামাজিক গণ্ডির সব সমস্যা নিয়েই ভেতরে ভেতরে খুব উদ্বিগ্ন। তা ছাড়াও, ও নিজে যা হতে চায়, তা ওর প্রিয়জনেরা ওকে হতে দিচ্ছে না। এ সমস্যাগুলো ওর রয়েছেই। আপনারা ওর সম্পর্কে একটু সাবধানে চলবেন।'

'কী হতে চায়, ও' জিজ্ঞেস করলাম।

—'সম্ভবত পেন্টার বা আর্কিটেক্ট।'

ডাক্তারবাবুর কথা শেষ হলে তাঁর একশ পঞ্চাশ টাকা পারিশ্রমিক টেবিলে রেখে এয়ার কন্ডিশনের বাইরে বেরিয়ে এলাম। সপ্তাহে দুবার দেড়শ করে তিনশ, তার মানে মেজদার মাসিক খরচ হল বারোশ, ডাক্তারের ফি বাবদ। এ ছাড়া ব্রেন স্ক্যান, ই ই জি, ইত্যাদির জন্য আলাদা খরচ তো হয়েছেই। -ওয়েটিং রুমে ঢুকতেই একঝলক গরম হাওয়া লাগল। অন্ধকার বাইরে। অমু ছিল শেষ পেশেন্ট। শূন্য ঘরে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ও বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল।

বললাম—'অমু, আয় রে, হয়ে গেছে।'

অমু আমার চোখে চোখ রেখে বলল—'পিসিমণি, আজ এতো দেরি করলে? আজও ডাক্তার দেড়শ টাকাই নিলেন?'

আমি হেসে বললাম—'আধঘণ্টা তোর সঙ্গে আধঘণ্টা আমার সঙ্গে কাবার করতে হল—ফি-টা আর এমন বেশি কী!'

অমুর মুখে একটা তীব্র প্রতিবাদ ঝলসে উঠল। পরক্ষণেই খুব মোলায়েম গলায় বলল—'পিসিমণি। ঠিক করলাম, আমি ডাক্তারই হবো।'

—'কেন রে? এতো রোজগার দেখে?'

—'তাই-ই। একজন, অন্তত একজনও যদি রোগীকে টাকা ম্যানুফ্যাকচার করবার যন্ত্র বলে না ভাবে, আস্তে আস্তে তার থেকে একটা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়বে না?'

তা জানি না, কিন্তু ওর এই সিদ্ধান্তে ওর বাবা খুব খুশি হবে না। ডাক্তারের দাঁড়াতে, উপার্জন করতে অনেক বছর কেটে যাবে। সে তুলনায় একজন এঞ্জিনিয়ার অনেক তাড়াতাড়ি উপার্জনক্ষম হয়ে ওঠে। কিন্তু আড়চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি ওর মুখের সেই ধন্দ-লাগা, বোকা-বোকা উদাস ভাবটা একদম চলে গেছে। আমি জানি, ডক্টর চন্দ্রর সিদ্ধান্ত ঠিক নয়, অমু যার ছবি এঁকেছে, তাকে ও ওর মনের গোপন ইচ্ছা থেকেই এঁকেছে। তাকে ও সত্যি দেখতে পারে না। প্রতীক দত্তর সুইসাইড নোটটা যে আমি পেয়েছিলাম। ঠিক এগার বছর আগে সে আমায় লিখে জানিয়েছিল—সমস্ত জীবন তার কাছে বিস্বাদ হয়ে গেছে। সে আত্মহননের পথ বেছে নিল। হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশে গিয়ে সে বহু ফুট নিচুতে ঝাঁপ খেয়ে নিজের প্রাণ নষ্ট করবে। আমরা কেউ তার দেহ পাবো না।

বুঝলাম, তোমার যন্ত্রণাটা বুঝলাম। তোমার সঙ্গে সঙ্গে যে আমিও সে যন্ত্রণা সমানে ভোগ করেছি, তোমাকে সান্ত্বনা আর সাহস যোগাবার জন্যে যে আমি প্রাণপণ করেছিলাম। কিন্তু প্রতীক, এভাবে পালিয়ে যাওয়ায় তোমার সারা জীবনের সততার ইতিহাসটা মিথ্যে হয়ে গেল। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে যে শেষ পর্যন্ত রুখে যাওয়া চাই। সত্য যার হাতের অস্ত্র সে কেন কাপুরুষের মতো স্ত্রী-পুত্রকে তার নিজের পরিত্যাগ করা সমাজের হাতে ফেলে রেখে চলে যাবে? তাই তুমি নিরুদ্দিষ্ট। পথভ্রষ্ট। তুমি আমাদের প্রতি প্রাথমিক কৃত্য করোনি, আমিও তোমার শেষকৃত্য করিনি। কিন্তু আমার আশা পূর্ণ হয়েছে। অমু পালিয়ে গিয়েছিল। তার পরিণত কৈশোরের স্পষ্ট সরল দৃষ্টি দিয়ে গোটা সমাজখানার চেহারা দেখে ভয়ে, বিতৃষ্ণায় পালিয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল তার পিসেমশাইয়ের পথটাই একমাত্র পথ। ও-ও তো ওই নিরুদ্দেশের গল্পটাই জানে। পালিয়েছিল। কিন্তু অমু ফিরে এসেছে। এমনি করেই দীপু, অরু, মহুল, পাপুল সব্বাই যে যার পলায়নের জায়গা থেকে যদি ফিরে আসে! আমরা যারা নিরুদ্দিষ্ট, আর আমরা যারা হারিয়ে গেছি, ক্রমাগতই হারিয়ে যাচ্ছি, আমি, মেজদা, বড়দা, মেজবউদি, বড়বউদি, মা, ডক্টর চন্দ্র, সেই সব সাংবাদিক যাঁরা স্টেট ভার্সাস প্রতীক দত্তর মামলার অসম্পূর্ণ অর্ধসত্য বিবরণ ছেপেছিল, এই সব সবাইকে, এমন কি আত্মঘাতী প্রতীক দত্তকেও ফিরিয়ে আনবার দায়িত্ব যদি অমিতাংশুরা নেয়!

অন্য ভাই

শমী এসেছে আগে। ধৈর্য ধরতে না পেরে। মেয়েকে নিয়ে একলা। ওর স্বামী বিনায়ক কথা দিয়েছে শিগগির আসবে। দু-একদিন থেকে ওদের নিয়ে ফিরে যাবে। সময় জিনিসটা ওর কক্ষনো হয় না। ছুটি জিনিসটাও ও কক্ষনো নাকি পায় না। আসল কথা, শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কের কারো অতিথি হয়ে থাকতে বিনায়কের ভীষণ আপত্তি। কতবার শমী বলেছে, 'দিদির তো নিজের সংসার। শ্বশুরবাড়ির কেউ নেই। সংকোচ কিসের ? অতবড় বাংলো, গেলেই একখানা পুরো ঘর, বাথরুম, সামনের ব্যালকনি ছেড়ে দেবে। ব্যালকনিতে তুমি যত খুশি যোগাসন কর না, কেউ দেখতে আসবে না। অত করে বলে জুলি, যেতে দোষ কি ?' দিদি বেশি বড় নয়, শমী তাকে জুলি বলে ডাকতেই অভ্যস্ত। বিনায়কের সঙ্গে কথায় কেউ পারবে না। বলবে—'কি আশ্চর্য, দিদি অমন একখানা গ্ল্যামারাস শালী, যেতে বলছে, আমি কি উপায় থাকলে যেতুম না !'

শমী এর চেয়ে বেশি কথা বলতে পারে না। তার ছিপছিপে নাতিদীর্ঘ শরীরের ওপর পাতলা ঈষৎ পাণ্ডুর মুখ। গভীরভাবে বসানো চোখের বাদামি মণি হঠাৎ হঠাৎ বড় বড় পল্লব দিয়ে পুরোপুরি ঢেকে ফেলে সে। কোনও তর্কাতর্কির সম্ভাবনা দেখলেই এই তার প্রতিক্রিয়া। নাকের পাটা একটু কাঁপে। কপালের ওপর একটা লম্বা শিরা জেগে উঠেই মিলিয়ে যায়। শমী বেশি কথা বলতে পারে না।

হঠাৎ দেখলে মনে হবে সে খুব ধাতস্থ। কাণ্ডজ্ঞানের বেড়া ভাঙবার মতো ভাবাবেগের কারবারি আদৌ নয়। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে ভাবাবেগ কখনও কখনও তার গলার কাছের পেশি ত্বক সব কিছুকে প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে। তারপর বহু চেষ্টায় মস্ত বড় একটা খাদ্যপিণ্ডের মতো এবার নেমে যাচ্ছে গলনালী দিয়ে। এসব জিনিস কেউ বড় একটা লক্ষ্য করে না। শমীর স্বামী বিনায়কও না। কাজেই শমী যে কী, শমী যে কে এ প্রশ্ন অনুত্তরই থেকে যায়। আরও অনেক মেয়ে, কিছু কিছু পুরুষ, অর্থাৎ আরও কিছু কিছু মানুষের মতো এ লোকযাত্রায় শমী পরিচয়হীন রয়ে গেছে। ছাইয়ের ওপর হালকা ফুলছাপ শিফন শাড়ি পরে, একটা পাতলা সুটকেস একহাতে, আর তার সযত্নলালিত বারো বছরের মেয়ে লোপামুদ্রাকে আর একহাতে নিয়ে শমী যখন প্ল্যাটফর্মে পা দিল, তার দিদি জুলি আর জামাইবাবু বরুণদা দু ধার থেকে মহা হই-চই বাধিয়ে দিলেন—'যাক শমী তুই শেষ পর্যন্ত আসতে পারলি তা হলে। সূর্যটা তো ঠিক দিকেই উঠেছিল রে।'

—'দেখো চাঁদটা লক্ষ্য করতে হবে। চাঁদের একটা কিছু গোলমাল হয়ে থাকতে পারে।'

জুলি আদর করে কাঁধে হাত রেখে বলল, 'তুই কিন্তু খুব রোগা হয়ে গেছিস। বরুণদা

বললেন, 'নিজের সঙ্গে তুলনা করলে তুমি সব্বাইকেই রোগা দেখবে জুলি। ওটা করো না।'

—'নিজেকে বাদ দিয়ে কথা বলো না।' জুলি খ্যাঁক করে উঠল, যতই হোক তোমার মতো ভুঁড়ি আর ডবল গাল তো আমি বাগাতে পারিনি। জানিস শমী, তোর বরুণদার ক্লাবের ওপর কী টান, কী টান। ক্লাবে গিয়ে রোজ সন্ধেবেলা কি হয় বলো তো?'

শমী একটু মৃদু স্বভাবের। সে বাধা দিয়ে বলল—'ওঃ জুলি, বরুণদার কি সুন্দর লালচে গাল হয়েছে, তুই শুধু ফ্যাটটাই দেখলি!'

বরুণদা গালে হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন—'দেখো বাবা গালাগাল দিচ্ছো না তো?'

লোপামুদ্রা ওরফে লুপ তখন তার তিন বছরের বড়দাদা সীজারের সঙ্গে গল্পে মত্ত। উত্তেজিত হাত-পা নাড়ার মধ্যে থেকে স্টেফি, এডবার্গ, লেন্ডল বুলেটের মতো এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ছে। দুজনে এগিয়ে যাচ্ছে প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে স্টেশন ছাড়িয়ে। বড়রা কেউ এলো, না এলো লক্ষ্যই নেই।

বরুণদা বলল—'চলো, জুলি, শমী তাড়াতাড়ি পা চালাও, সুটকেসটা আমার হাতে দাও, কী এমন মহামূল্যবান সম্পত্তি ওতে করে নিয়ে এসেছো যে তখন থেকে আঁকড়ে রয়েছ?'

জুলি বলল, 'হ্যাঁরে শমী, তাড়াতাড়ি পা চালা, নইলে স্টিয়ারিং সীজারের হাতে চলে যাবে।'

শমী ভুরু কুঁচকে বলল—'সে কী? ওর কি লাইসেন্স আছে নাকি! ওর বয়সের ছেলেকে কি লাইসেন্স দ্যায়?'

জুলি বলল—'ষোল-আঠার ওসব সাধারণ মানুষের নিয়ম শমী। জিনিয়াসদের ক্ষেত্রে বয়সটা কোনও বাধাই নয়।'

বরুণদা বললেন—'তা ছাড়া গাড়ির স্টিয়ারিং তো সামান্য কথা, জীবনের স্টিয়ারিংটাই আমার ছেলের হাতে চলে যাবার উপক্রম হয়েছে।'

শমী হেসে ফেলল—'তা হলে আর দেরি নয়, শিগগির চলুন যদি আটকাতে পারি।'

বরুণদা কটাক্ষে দুই বোনের দিকে তাকিয়ে বললেন—'তুমি আটকাবে সীজারকে? বলে হাতি ঘোড়া গেল তল, এখন মশা মাপে কত জল!'

জুলি রেগে উঠল—'দ্যাখো আমাকে যখন তখন হাতি, ঘোড়া, জলহস্তী, বাইসন যা খুশি বলো আমার গা সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু আমার বোনকে খবর্দার মশা মাছিটাছি বলতে পারবে না।'

বরুণদা হাসতে হাসতে বলল— 'মাছির আগে যদি টুক করে একটা মউ বসিয়ে দিই? তবে? তবে গ্রাহ্য হবে তো?'

শমী বলল—'জুলি রাজি হসনি। মউমাছি কি রকম ভিনভিন করে দেখেছিস? ঘেন্না লাগে না ঘুরঘুর করলে? আর সুযোগ পেলেই হুল ফোটায়। আমাদের বারান্দার পাশে দোলনচাঁপার অত সুন্দর গাছটা কেটেই ফেলতে হল মউমাছির জ্বালায়।'

বরুণদা বলল, 'দুই বোনই দেখছি সমান বিচক্ষণ।'

গাড়ি যখন জুলিদের বাড়ির গেটের ভেতর ঢুকল তখন তামাটে দিগন্তে সূর্য একটি গনগনে লাল গোলা। দু দিকের দুটো দরজা খুলে সীজার আর লুপ আগে-পিছে দৌড় দিয়েছে। শমী বলল, 'কি সুন্দর রে জুলি। রোজ ভোরবেলা বেড়াতে যাবো।'

বরুণদা বলল—'খবর্দার ওটি করো না। ভীষণ ডাকাতের উপদ্রব এ অঞ্চলে, ভোরই বলো, সন্ধেই বলো, নির্জন সময়ে পায়ে হেঁটে এসব রাস্তায় বেরোনোর কথা কল্পনাও করো

'না।

শমী হতাশ গলায় বলল—'কি যে বলেন বরুণদা। ওসব আপনার বাহানা। বেরোলে সাহেবের প্রেসটিজ যায় নাকি ?'

বরুণদা বলল, 'বেশ তো দিদিকে জিজ্ঞেস করো।'

—'সত্যি রে,' জুলি বলল—'আমাদের থেকে দক্ষিণে কোণাকুণি ওই বাড়িটা, ওখানে চ্যাটার্জিরা থাকে, রবিবার সকালে চাবি দিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে, এসে দ্যাখে স্কুটার, টিভি, টোস্টার, মানে যাবতীয় গ্যাজেট চুরি গেছে। সেই সঙ্গে ভালো ভালো জামাকাপড়। তা ছাড়াও শুনেছি, গ্যাং রাস্তার মাঝখানে পথ আটকে কত লোকের ঘড়ি আংটি হার সব খুলে নিয়েছে।

শমী বলল—'এসব পরাই বা কেন!' সীজার, লোপামুদ্রা কখন ওদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা খেয়াল করেনি, সীজার বলে উঠল—'ডোন্ট ওয়্যারি মাসি। আমি তোমাদের বেড়াতে নিয়ে যাবো। শুধু টাইমটা আমায় বলে দিও।' 'গ্যাং-ট্যাং এলে কী করবি ?' শমী হেসে বলল। 'গ্যাং ? আমি নিজেই তো একটা গ্যাং। কি করবে ওরা আমি থাকতে ? ফুঃ।'

বরুণদা জনান্তিকে বললেন, 'সীজারের বাণী কিন্তু ফাঁকা আওয়াজ হয় না, বুঝেছ শমী ? সাধারণত উনি এতো উদার হন না। হয়েছেন যখন অফারটা নিয়ে নাও।'

টেনে বাঁধা চুল খুলতে খুলতে বারান্দায় এসে দাঁড়াল শমী। তামাটে রঙের মাটি। সুন্দর সুন্দর বাড়ি। ছবির মতো। সন্ধে হতেই ঝুপ করে নির্জনতা নেমে পড়ল যেন পাখা বিস্তার করে। জুলি নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—'এখানে জঙ্গল নেই, না রে ?'

—'নাঃ। জঙ্গল এখানে পাবি না। তবে এত গাছ, এতো সুন্দর সাজানো, সযত্নে গড়ে তোলা পার্ক যে জঙ্গলের অভাব তুই টেরই পাবি না।'

শমী ভুরু কুঁচকোল—'কী যে বলিস ? সাজানো পার্ক আর জঙ্গল এক হল ? জঙ্গল যে অরণ্য, আদিম একেবারে প্রাথমিক, স্বতঃস্ফূর্ত,' বলতে বলতে শমী হঠাৎ যেন সঙ্কুচিত হয়ে থেমে গেল। সে বেশি কথা বলতে পারে না। যখন বলে, বলে ফেলে, তখন এমনি করে সঙ্কুচিত হয়।

জুলি ঈষৎ অন্ধকারে তার দিকে চেয়ে আছে। চোখে যেন ভর্ৎসনার দৃষ্টি। বলল, 'শমী তোর জঙ্গল জঙ্গল বাই এখনও গেল না ? সাজানো গাছপালা, বীথিকা, মানুষের হাতে পরিকল্পনা করে পোঁতা গাছ অনেক ভালো বুঝলি ?' জুলি নিঃশ্বাস ফেলল একটা। তারপর বলল—'হ্যাঁ রে, বিনায়ক ঠিক আসবে তো ?'

—'না এলে কী ? আমি একলাই তো এলাম। একলাই আবার চলে যেতে পারব।'

—'তা নয়, মানে হ্যাঁরে শমী। তোরা একসঙ্গে বেড়াতে যাস না ? এই যে তুই চলে এলি ওর দেখাশোনা কে করবে ? শাশুড়ি ? কিন্তু তোর মন খারাপ করবে না ?'

শমী হেসে ফেলল, বলল—'কেন বেড়াতে যাবো না, এই তো গত বছরই গোয়া ঘুরে এলাম, জানিসই তো ! আর শাশুড়িই তো বরাবর দেখাশোনা করে এসেছেন, এখনই হঠাৎ সেটা বদলে যাবে কেন ?'

জুলি স্বস্তির হাসি হাসে, বলে—'যাই বলিস বাবা, বরছাড়া বিয়ের পর পর কোথাও যেতে কেমন কেমন লাগে। যেন মনে হয় লোকে মনে করবে দুজনে বনিবনা নেই।'

—তুই কি তাই-ই ভাবছিস না কি ?' এবার গম্ভীর হয়ে শমী জিজ্ঞেস করল।

—'না তা ঠিক নয়।'

—'জুলি ভুলে যাস না তের বছর বিয়ে হয়ে গেছে আমার। ছোটখাটো হলেও একটা কাজকর্ম আমি করি। বনিবনার বাইরের চেহারাটা তোদের মতো গাঢ় নাও হতে পারে।'

—'ভেতরের চেহারাটা ঠিক থাকলেই হল' জুলি হেসে বলল—'যাক চল তো এখন, তোর বরুণদা চায়ের জন্য অনেকক্ষণ ধরে হাঁকডাক করছে।'

চায়ের আসরে দুই ছেলে-মেয়েকে দেখা গেল না। শমী ব্যস্ত হলে বরুণদা বললেন, 'তুমিও যেমন, সীজার নিশ্চয় লুপকে নিয়ে ক্লাবে চলে গেছে। দুজনেই খেলা পাগল, এখন ক্লাবে জুনিয়রদের টেনিস হবে।'

শমী বলল—'বলে যাবে তো!'

—'বলে যাবে সীজার? তা হলেই হয়েছে। বলে-টলে যাবার কথা তার স্মরণে থাকলে তো!' জুলি কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলল। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শমীর ঘুম আসে না। চারদিক থেকে একটা নিবিড় আরাম ঘিরে ধরেছে তাকে। এই ফাঁকা ফাঁকা কলোনি, নিষ্কলঙ্ক বিশুদ্ধ বাতাস, বাতাসে গাছের গন্ধ, এ তার কিশোরী বয়সের প্রতিবেশ। গত চার বছর ধরে জুলিরা এখানে আছে। প্রথম থেকেই তাকে ডাক দিচ্ছে। এতদিনে তার আসার সময় হল। যেন মনে হচ্ছে সে এখানেই ছিল। মাঝখানটা অর্থাৎ 'হোস্টেল', গোয়াবাগান, এন্টালি, বিনায়ক এই সবশুদ্ধ জীবনের অংশটা স্বপ্ন। দরজায় টুকটুক করে আওয়াজ। উঠে দরজা খুলে দিল শমী। যা ভেবেছে তাই। জুলি উঠে এসেছে। ফিসফিস করে বলল—'ঘুমোসনি তো! আমিও ঘুমোতে পারিনি। কতদিন পরে দু-বোনে, বল তো! তোর মেয়ে ঘুমিয়েছে?'

—'অনেকক্ষণ। আমিই এপাশ ওপাশ করছি।'

—'কেন রে? বালিশ-টালিশ ঠিক হয়েছে তো? তুই তো পাতলা বালিশে শুস।'

—'বালিশটা কোনও সমস্যা নয়। আমার ঘুম হচ্ছিল না...'

—'নতুন জায়গা বলে না কি রে?'

—'নতুন বলে নয় রে জুলি পুরনো বলে', শমী যথাসম্ভব ফিসফিস করে বলল।

বিছানার ওপর উঠে এসে জুলি সাবধানে লোপামুদ্রাকে সরিয়ে দিল। তারপর বোনের পাশে ঝপাং করে শুয়ে পড়ল।

—'তোর এ জায়গাটা পুরনো লাগল?'

—'দিনের আলোয় লাগেনি। এখন রাতের অন্ধকারে লাগছে...।'

শমী বেশি কথা বলতে পারে না। জুলি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,

—'কি করে যে তোর পুরনো লাগছে জানি না। কোথায় সে শালের জঙ্গল? বনকাটা বসত কই? রোজই কোয়ার্টার্স উঠছে নতুন নতুন... সদ্য কাটা গাছের গুঁড়ি, ডালপালার ছাঁট রাস্তার পাশে সে সব কই?'

—'না-ই থাকলো'—ছোট্ট গলায় জবাব দিল শমী—'অন্ধকারে আমি শালমঞ্জরীর গন্ধ পাই এ রকম ফাঁকা জায়গায় এলেই। আসিনি অনেকদিন। গন্ধটাও পাওয়া হয়ে ওঠেনি। সেই সব দিনের গন্ধ।' শমী পাশ ফিরে জুলিকে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রাখে। জুলি বলল—'শমী, তুই কি চিরকাল ছেলেমানুষ থাকবি!' শমী জুলিকে ছেড়ে সরে শুল, বলল—'আমি তো ছেলেমানুষ নই! আমি তো কোনকালেও ছেলেমানুষ ছিলাম না জুলি, চিরকাল জ্ঞানবৃদ্ধ, তৌল করে, মেপে চলি, চলি না!'

জুলি তরল গলায় বলল—'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই একেবারে ঠাকুমা-দিদিমা আমি জানি। এখন চুপ কর তো! লুপটা ঠিক তোর মতো হয়েছে। না রে?'

শমী অবাক হয়ে বলল—'লুপকে তুই আমার মতো কোথায় দেখলি ? ও কি দস্যি জানিস ! তা ছাড়া ও খুব মিশুক। খেলাধুলো করে। ওর চেহারাও খানিকটা ওর বাবার মতো। সবাই বলে।'

—'সবাই বলুক। ভীষণ একটা আদল আছে। আসলে আজকাল ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার ধরনটা এমন হয়েছে যে ওরা খানিকটা দস্যিগিরি দলে পড়েই করে। এগুলো বাইরের ব্যাপার। ভেতরে ভেতরে ও তোর মতন।'

—'আমার মতো হয়ে আর কাজ নেই। তুই একদিন দেখেই ওর ভেতরটা বুঝে ফেললি।'

—'তোরা রোজ দেখিস তো ! আমরা মাঝে মাঝে দেখি বলে আদলটা ঝট করে ধরতে পারি। চুলের ফেরটা ঘাড় কাত করে তাকাবার ভঙ্গিটা। দেখিস ও-ও কথা বলতে বলতে হঠাৎ তোর মতো চুপ হয়ে যায়।'

—'তোর ছেলে কিন্তু তোরও এক কাঠি বাড়া হয়েছে রে জুলি।'

—'যা বলেছিস। সমস্ত গ্যাজেটস এর পার্টস খুলে ফেলে জানিস, যখন তখন কার্নিশ বেয়ে বেয়ে ছাদে উঠে যাচ্ছে, লগি দিয়ে বাথরুমের ছিটকিনি ফেলে দিচ্ছে। বাড়িতে লোক এলে তার স্কুটার নিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে, যা-তা একেবারে।'

—'পার্টস খুলে ফেলে ? তার মানে ও এঞ্জিনিয়ার হবে, দেখিস।'

—'মেকানিকও হতে পারে', জুলি মস্তবড় একটা হাই তুলল।

'আমরা পাহাড়ে যাচ্ছি, মা, বাবা, মাসি, আমরা পাহাড়ে...' স্কুটার নিয়ে বোঁ করে বেরিয়ে গেল সীজার।

—'সীজার, সীজার' সীজারের বাবা আতঙ্কিত রুষ্ট গলায় চিৎকার করতে করতে দৌড়ে এলেন। কিন্তু স্কুটারের আওয়াজে বেচারার গলার আওয়াজ একেবারে চাপা পড়ে গেল।

—'জুলি, তুমি কিছু বললে না।'

—'বলবার সময় পেলে তো বলব।' জুলি স্যান্ডউইচে মাখন মাখাতে মাখাতে উত্তর দিল। স্যান্ডউইচগুলো হাতে করে তৈরি করে প্রথমেই দুই ছেলে মেয়েকে দিয়েছে। দুধ ঢেলে দিয়েছে কাপে। সীজার তো খায় না, গেলে। চোঁ করে দুধ খাওয়া হয়ে গেল। তিন চার কামড়ে স্যান্ডউইচ শেষ। লুপকে বলল—'দেরি করছিস কেন ? আর স্টাইল করে খেতে হবে না। এখনও গোঁফে দুধ লেগে যায়। আবার কড়ে আঙুল উঁচু করে কাপ ধরা হয়েছে !'

জুলি একটা ধমক দিল—'ওর তোর মতো সাপের গেলা নয়। দাঁত আছে তার ব্যবহার করছে। স্টাইল আবার কি ? ভদ্রভাবে খাচ্ছে। তোর মতো হাউমাউ করছে না এ আমাদের অনেক ভাগ্য।'

লুপ কিন্তু একগাল হেসে উঠে দাঁড়িয়েছে—হাতে তখনও স্যান্ডউইচের টুকরো—'আমার হয়ে গেছে।' চুল নাড়িয়ে সুর করে সে বলল। বলতে বলতে দু-জনেই খোলা দরজা দিয়ে ছুট। তিনজনেই ভেবেছে ওরা বাগানে যাচ্ছে। সীজার যে সোজা গ্যারাজে গিয়ে স্কুটার বার করে ফেলবে, ভাবেনি কেউ।

জুলি বলল—'এমনিতে কোনও ভাবনা নেই। কিন্তু ট্যাঁকে গুঁজে মেয়েটাকেও নিয়ে গেল যে, দলমা পাহাড় কি এখানে ?'

শমীর চোখে-মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠেছে, আর থাকতে না পেরে বলল—'কি হবে বরুণদা ! পাহাড়ের পথে স্কুটারের পেছনে। লুপের তো স্কুটারে চড়ার কোনও অভ্যেসই

নেই।'

বরুণদার মুখে চোখে ছেলের প্রতি গভীর বিরক্তি ফুটে উঠেছে। কিন্তু উদ্বেগ খুব বেশি নেই। বললেন, 'ভাবনার কিছু নেই। বিপদের ভয় নেই। ও ছেলেকে এখানে সবাই চেনে। আমার আপত্তি হচ্ছে এই ডোন্ট কেয়ার ভাবটাতে। নিজে প্ল্যান করেছে, বলবার জানাবার দরকার মনে করে না। মায়ের আদরের ফল। ফল ভোগ তো করতে হবেই। চোদ্দ পনের বছরের ধেড়ে ছেলেকে সব সময়ে আমার জোনি, আমার যিশু করে ন্যাকামি করার ফল পেতেই হবে।'

জুলি বলল—'আর তুমি যে একেকটা দুরন্তপনামি করে আর বাহবা-বাহা-বাহা করে ওঠো ? শুধু "জোনি যিশু" করলেই আদর হয় না। সবেতে ও রকম আমার ছেলে কি দারুণ কীর্তি করেছে ভাব দেখালে প্রশ্রয় হয় যেটা আদরের চেয়েও খারাপ। জানিস শমী, সেদিন ভুলে চাবি না নিয়ে সদর দরজা টেনে দিয়ে বেরিয়েছে। তিনজনেই বেরিয়েছি। চাবি না নেওয়ার দোষটা ওর। তারপরে ফিরে রাত নটায় আর বাড়ি ঢুকতে পারি না। ওদিকে উনি, মানে সীজারচন্দ্র কোত্থেকে লাঠি জোগাড় করে পেছন দিকের দরজা দমাদ্দম পিটিয়ে তার ছিটকিনি খুলে ফেলেছে। সে এক কাণ্ড ! আর তোর বরুণদার সে কি স্মিতমুখ, ভাবটা ছেলের মতো ছেলে তৈরি করেছি একখানা। গণ্ডগোলটা নিজে পাকিয়েছিল কিনা ! এখন তুইই বল রাত নটায় ওভাবে খিড়কির দরজার ছিটকিনি খোলার কৌশলটা যদি চোর-ডাকাতের চোখে পড়ে যায় ?'

বরুণদা বলল—'লুপের জন্য তুমি ভেবো না শমী। সীজার কিন্তু সত্যিই খুব ডিপেন্ডেবল।'

দুপুর একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে জুলি বলল- 'খেয়ে নিই আমরা। ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

শমীর ইচ্ছে নেই—বলল, 'আরেকটু দেখি, ওরা খেল না।'

বরুণদা আর জুলি হাসি হাসি মুখে চোখাচোখি করল, বরুণদা বললেন, 'একটা বেজে গেছে অথচ সীজার খায়নি এ হতে পারে না। আর সীজার খেলে লুপুও খাবে। শমী তুমি বিনা দুশ্চিন্তায় খেয়ে নাও।'

খেয়ে-টেয়ে মশলা মুখে দিয়ে দু বোনে সব তোলাতুলি করছে, দুই মূর্তি ঢুকল। আওয়াজে আগেই জানান দিয়েছিল।

জুলি মারমুখী হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার ? পিঠে বেত ভাঙব নাকি ? নিজে তো যা খুশি করছ, বোনটার যে মুখ শুকিয়ে গেছে না খেয়ে না দেয়ে। সে খেয়াল নেই ?'

সীজার উবাচ—'না খেয়ে না দেয়ে ? লুপ !' বলে লুপের দিকে তাকিয়ে হাসিতে ফেটে পড়ল।

লুপ বলল—'না মাসি আমরা নটরাজ থেকে খেয়ে এলুম। সীজারদা অনেক খাইয়েছে।'

—'রেস্ত কোথায় পেলি ?' জুলি সীজারের দিকে তাকিয়েছে।

—'তোমার ব্যাগ।' অম্লানবদনে উত্তর দিলেন সীজারবাবু।

বরুণদা বললেন, 'ওকে চুরি বলে, তুই চোর তা হলে ?'

সীজার বলল, 'পকেট মানি দিচ্ছ না যে ! গার্ল-ফ্রেন্ডদের কাছে আমার প্রেসটিজ থাকে না।'

সীজার আঙুলে চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

শমী-জুলি চুপ। বরুণদাও। লুপ চুপিচুপি মার কানে কানে বলল—'মা খুব রাগ করেছো ? সীজারদা ব্রেকফাস্টের সময়েই ঠিক করল পাহাড়ে যাবে, বলবার দরকার নেই বলল। দারুণ অ্যাডভেঞ্চার হয়েছে মা। দারুণ।'

শমী যেন অনেক দূরে চলে গেছে, জবাব দিচ্ছে না, কিন্তু তার মুখে রাগের চিহ্নমাত্র নেই। সেও কি যাচ্ছে ? স্কুটারে না, সে সময়ে স্কুটারের এতো চল তো ছিল না। সাধারণ বাইসাইকেলে ডবল ক্যারি করছে তাকে একটি ছিপছিপে চেহারার লম্বা ছেলে। খুব কোমল মুখ। সবে গোঁফ দাড়ি গজিয়ে মুখটা জঙ্গল হয়েছে। ত্বকের লালিত্য যায়নি এখনও। চোখ দুটো স্বপ্নে ভরা। শালজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কখনও সাইকেলে, কখনও সাইকেলকে হাঁটিয়ে নিজেরা পায়ে হেঁটে, শুকনো শালপাতা দু পায়ে মাড়িয়ে মড়মড় শব্দ করতে করতে।

'এই জঙ্গলটা পার হলেই একটা ছোট্ট টাকলামাকান মরুভূমি বুঝলে শমী। বালিতে পা ডুবে যাবে। মরুভূমি পার হলে তবে অজয়। অজয়ে হাঁটুজল। পার হলে কেন্দুবিল্ব। যদি কপালে থাকে, আর রাত জাগতে পারো তো আসল বাউলের গান শুনতে পাবে—'ভালো করে পড়গা ইস্কুলে—এ-এ, নইলে কষ্ট পাবি শেষকালে।'

জুলি বলল—'গেছিস, গেছিস। মাকে না বলে গেছিস কেন রে ?'

'দ্যাখ, মা কী ভীষণ অভিমান করেছে, লুপু আর এ রকম করিস না।' জুলি দাঁড়াল না, তার অনেক কাজ। বরুণদা ঘরে চলে গেছে। এই একটা দিনই তো বিশ্রাম। লুপু মায়ের উরু জড়িয়ে মাটিতে বসে পড়ে বলল—'মা তুমি সত্যি রাগ করেছ ? সীজারদাটা যে কি ? এমন করে বলে আমি না বলতে পারি না। ওর যা এনথু না ! মা, সীজারদাটার মাথায় কয়েকটা স্ক্রু ঢিলে আছে, কিন্তু একেবারে ফ্যানটা :'

শমী মৃদু হেসে বলল—'এখনও কিছু প্রোগ্রাম আছে না কি তোদের ?'

—'তেমন কিছু না। ওয়ার্ড-মেকিং খেলি একটু ! খেলি ?'

—'এতদূর থেকে রোদে রোদে টহল দিয়ে এলি একটা বই-টই নিয়ে বসলে তো হত !'

—'দূর, টহল আবার কি।' লুপ ফিক করে হেসে ফেলল।

সত্যিই ওদের বয়সে শুয়ে বসে থাকা কারোই রুটিনে লেখে না। জুলি বেড়াত সারাক্ষণ টঙস টঙস করে। শমী একটু শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু সেও পড়াশোনার সময়টুকু ছাড়া দেখো জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নতুন গড়ে উঠছে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কলোনি। দেখতে দেখতে উঠে যাচ্ছে সামনে পেছনে জমিশুদ্ধ সুন্দর সুন্দর কোয়ার্টার্সি। লরিতে করে কাটা গাছের গুঁড়ি যখন তখন হু হু করে চলে যাচ্ছে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে। শমীদের বাড়িটা তখনও শেষ বাড়ি। তারপর থেকেই জঙ্গলের সীমানা আরম্ভ হয়েছে। শালের ঘন জঙ্গল। তার সঙ্গে প্রচুর সেগুন, মহুয়া, ছাতিম, শিরীষ গাছ। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরাটাই ওর প্রধান করণীয়। তার ফাঁকে ফাঁকে খাওয়া পড়াশোনা ছোটখাটো ঘরের কাজকর্ম। বাবা সকালবেলা ইনস্টিট্যুটে চলে যাবেন। দুপুরবেলা কোনদিন খেতে আসবেন। কোনদিন টিফিন ক্যারিয়ার পৌঁছে দিতে হবে। বেশিরভাগ দিনই বাড়ির কম্বাইন্ড-হ্যান্ড দীনবন্ধু যায়, সে না পারলে জুলি চলে যায় সাইকেলে চড়ে। কেউ নেই আর, কেউ কোথাও নেই, একমাত্র মেজপিসিমার ছেলে রিনটিনদা ছাড়া। সে ইলেকট্রিক্যাল পড়ছে। হোস্টেলে থাকে। যখনই সময় পায় হঠাৎ হঠাৎ করে দুই বোনের কাছে চলে আসে। জঙ্গলটা চষা হয় আরও ভালো করে। অনেক দূর চলে গেছে ছুটির দিন সন্ধেবেলায়। সপ্তপর্ণী বৃক্ষের পেছন থেকে চাঁদ ওঠা দেখা হয়েছে।

জুলি বলছে, 'রিনটিনদা তোর খিদে পায়নি, আমরা বেরিয়েছি তখন আড়াইটে, তিনটে হবে। দেখ তো কটা বাজে ! জঙ্গলে শেয়াল ডাকছে।'

ঘড়িটা রিনটিন রুমাল দিয়ে চট করে বেঁধে ফেলল। —বলল, 'সময়কে একটু ভোলো, ভুলতে শেখো, খিদে তো আমারও পেয়েছে। খিদে পাওয়ার ফিলিংটা অদ্ভুত সুন্দর নয় ? লেট ইট লাস্ট এ লিটল মোর।' সুগন্ধ রাতটাকে সিল্কের চাদরের মতো গায়ে জড়িয়ে, হিম আর জ্যোৎস্না মেখে বাড়ি ফেরা। বাবা টেবল ল্যাম্প জ্বালিয়ে পড়ছেন, কিছুই খেয়াল নেই। দীনবন্ধু বাইরে দাঁড়িয়ে। মুখ গম্ভীর। তার সব খেয়াল আছে। হিম লেগে পরদিন শমীর ঠেসে জ্বর। গনগনে মুখের ওপর জুলি ঝুঁকে পড়েছে 'ওষুধটা খা। শমী।' শমী মুখ টিপে আছে। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রিনটিনদা বলছে—'জ্বর হলে আমিও চট করে ওষুধ খাই না। জ্বরের ফিলিংটা আমার অসাধারণ লাগে। কি রকম দাঁত কষতে ইচ্ছে করে। কি রকম একটা ঝিমুনি ধরে। লালচে ঝিমুনি ! শমী, দেখো, চোখ চেয়ে দেখলে ঘরবাড়ি জীবন সব এখন স্বপ্ন মনে হবে। আসলে জ্বরটর হলেই সত্যি বোঝা যায় জীবনটা স্বপ্ন।'

—'জীবনটা স্বপ্ন ?' জুলি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছে।

জ্বরোজ্বরো গায়ে শমী মুগ্ধ হয়ে ভাবছে জীবনটা স্বপ্ন !

রিনটিন জানলার কাছ থেকে সরে এসে দাঁড়িয়েছে, শমীর বিছানার খুব কাছে—'হ্যাঁ ! ঘুমিয়ে পড়েছি, সামহোয়্যার এলস দেখছি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে—আমি শমী, আমি জুলি, আমি রিনটিন, আমার কত কাজ, কত ইচ্ছা, সাধ ! হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাবে, বুঝতে পারব...।'

—'কী বুঝতে পারবো ? আমি জুলি নই !' জুলি অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করছে।

শমী উদগ্র আগ্রহে উত্তরটার জন্যে অপেক্ষা করছে। রিনটিন হেসে বলছে —

'জানি না, জানি না তো কী বুঝতে পারবো। এখনও তো ঘুম ভাঙেনি !'

'যত্ত বাজে কথা। রোজ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেগুলো দেখি সেগুলো তবে কি ?'

—'স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন। তার ভেতর আরও স্বপ্ন। ভেতর থেকে ভাঙতে ভাঙতে আসবে স্বপ্নগুলো।'

জ্বরের ঘোরে শমী শুনছে আর তলিয়ে যাচ্ছে, কোন গভীর গহন, অন্যরকম অন্যলোকে। সমস্ত অন্তরঙ্গতা, বন্ধুতা, ভালোবাসাগুলো তো স্বপ্নই। ভেতর থেকে ভাঙতে ভাঙতে আসে। ঠিক যেমন শুনেছিল। অবিকল। নিশ্বাস ফেলে শমী পাশ ফেরে। ম্যাগাজিন হাতে করে, ছবি আর লেখার ওপর চোখ, মনের মধ্যে অন্য ছবি অন্য শব্দ। দিনের জাগরণবেলা নিমেষেই ফুরিয়ে যায়। বিকেলের ঘুম ভাঙে।

লুপের বাবা এসে গেছে। জুলি বলল—'এসেছো খুব ভালো কথা, আমরা হাতে চাঁদ পেয়েছি, কিন্তু ঘোড়ায় জিন দিয়ে এলে কেন ? দুদিন থাকো !'

বিনায়ক বলল, 'উপায় নেই। সময় নেই। নাই নাই নাই যে সময়। দিদি কত কষ্ট করে একটা উইক-এন্ড বার করেছি যদি জানতেন।'

'উইক এন্ড আবার বার করতে হয় না কি ? ও তো প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে থাকেই !'

—'আরে ? শমীকে জিজ্ঞেস করুন ! কত শনিবার আমাকে হুটহাট করে টুরে চলে যেতে হয় !'

শমী হাসছে। গুছিয়ে নিচ্ছে আস্তে আস্তে সব। পেছনের বাগানে শুকোচ্ছে তোয়ালে, পেটিকোট, পটির কাছটায় একটু ভিজে। শাড়িটা পাট করে নিচ্ছে। ঘরে এলো। লুপ পেছন পেছন বাগানে গিয়েছিল। এখন আবার পেছন পেছন ঘরে ফিরে

এসেছে। বায়না ধরেছে—'ও মা, আর দুদিন পর তো এমনিই ছুটি ফুরিয়ে যেত। আর একটা দিন, জাস্ট একটা দিন থেকে গেলে কী হয়!'

বাবা বলল—'তোর তো দিনপঞ্জী মাসির আদরে এখন সবই ওলট-পালট হয়ে গেছে রে লুপু। অভ্যেসে ফিরতেই তো ও দুটো দিন লেগে যাবে।'

পকেটে হাত, ঠোঁটে সিগারেট বাবা চলে যাচ্ছে। এখন কেউ নেই। বাবা, মাসি, মেসো সব লনে নেমে গেছেন, গল্প করছেন। মাসি লুপের জন্য রং-বেরঙের একটা জাম্পার বুনেছেন, তাড়াতাড়ি করে ঘর বন্ধ করছেন এখন। একটু পরেই বেরোতে হবে। এখানে শুধু মা, মায়ের হাঁটু জড়িয়ে ধরে লুপু কাঁদছে। বুকভাঙা কান্না। যেন লুপু নয়, তার বুকের ভেতর বসে অন্য কেউ এ কান্না কাঁদছে। শমী আশ্চর্য হয়ে গেছে—'আবার তো ছুটি পড়বে লুপু তখন আসব, গ্রীষ্মের ছুটিতে এসে বেশি করে থাকিস। তখন আম পাকবে, কাঁঠাল পাকবে, মাসি বলছিল শুনিসনি?'

গুমরে গুমরে কাঁদছে লুপু। আম-কাঁঠালের জগৎ থেকে অনেক দূরে।

—'লুপু শোন, এ রকম বোকার মতো কাঁদে না।'

—'সীজারদা যে জানে না। ও যে নেই! টুর্নামেন্ট খেলতে গেল টেলকোয়। কাল আসবে, দেখা হবে না।' লুপু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল।

—'তাতে কি হয়েছে! টুর্নামেন্ট খেলতে গেছে জানি তো। আবার পরে যখন আসবি, দেখা হবে!'

—'আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।' ভাঙা ভাঙা বোজা গলায় লুপ বলল।

শমী হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে। স্তম্ভের মতো অনড়। নির্বাক। থোকা থোকা চুল লুপুর মাথায়। তার কোলের ওপর। চারদিকে ছড়িয়ে আছে লুপুর সাদা নাচ-ফ্রক লাল-কালো স্কার্ট, ব্লু জিনস, লুপুর ছোটবেলা। টুকরো টুকরো এইসব যাত্রার আয়োজন এবং মেয়ের ছোটবেলা সামনে রেখে শমী ফিরে যাচ্ছে তার নিজস্ব সেই অন্ধকার বারান্দায়। ওই তো জুলি কিছুদূরে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আঙুলে শাড়ির আঁচল পাকাচ্ছে। রিনটিন বলছে—'ট্রেনের সময় হয়ে এলো, এবার তো আমায় যেতেই হবে। জুলি, শমীকে বলো একবার আমার দিকে ফিরতে, একটিবার আমার সঙ্গে কথা বলতে, ওকে বুঝিয়ে বলো জুলি। আমি...আমি যে আর আসব না।'

শমী যে বেশি কথা বলতে পারে না। নিজের ভেতরের অনুভব বাইরে প্রকাশ করতে অসীম সঙ্কোচ। ধূসর অন্ধকারের মধ্যে সে শুধু ধূসরতর ছায়া। বিবর্ণ। প্রাণশূন্য। জুলি ফিসফিস করে বলল—'তুই কেন এলি? আমরা তো বেশ ছিলাম। রিনটিনদা তুই কেন এলি?' তার গলায় অভিমান, তিরস্কার।

—'বোধহয় সত্যি আসিনি জুলি, স্বপ্নে এসেছিলাম...তোরা একবার বল আমি শমীকে নিয়ে যেতে আবার আসব...'

—'না।' জুলি চাপা ক্রুদ্ধ গলায় বলল—'যা, তুই যা প্লীজ।'

রিনটিনের পায়ের শব্দ কোনদিনই হয় না। নিঃশব্দে সে কখন চলে গেছে।

এখন মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শমীর গলা দিয়ে মস্ত বড় একটা পিণ্ড নামছে। গলার পেশী, ত্বক সব কিছুকে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে। মা বলল,—'লুপ এখনই এত অধীর হলে চলবে কি করে? এইটুকুতেই যদি ভেঙে পড়ো। তা হলে এর পর?'

কান্নাভেজা মুখ তুলল লুপ। মায়ের গলা নির্লিপ্ত, উদাসীন, যেন অনেক দূর থেকে বলছে। মা কখনও লুপকে তুমি বলে না! দুঃখ? অধীর? এর পর? আরও আছে?

এর পর আরও আছে ?

—'যাও, মুখ ধুয়ে এসো।'

অন্য গাড়ির হেডলাইটের আলো পড়েছে লুপুর মুখে। জুলি মাথায় হাত বুলিয়ে ভিজে গালে চুমু খেয়ে বলল—'মন খারাপ করছিস কেন ? আবার আসবি মাসির কাছে। অনেক দিন থাকবি।'

শমী মনে মনে বলল—'না জুলি না, আর আসব না, আর ও থাকবে না। আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। ওই সিঁদুরে আগুন আমাকে পার হতেই হবে।'

ট্রেনে উঠে বিনায়ক ডবল সিটে গুছিয়ে বসল মেয়েকে নিয়ে। মৃদু আলো জ্বলছে—'ও কি রে লুপু! তোর মুখখানা যে কেঁদে কেঁদে ফুলে গেছে মা। এত কেঁদেছিস কেন ?'

লুপ কিছু বলছে না। বিনায়ক বলল—'কী ব্যাপার শমী ? কিসের কষ্ট ওর ? অত কেঁদেছে। জাস্ট মাসিদের জন্য মন কেমন ! কিচ্ছু বলছে না যে !'

বাবার মুখে উদ্বেগ। ট্রেনের শব্দ। গতিবেগ বাড়ছে। বাইরে অন্ধকার লম্বা দৌড়ে নেমেছে। শমী তার ঈষৎ ভাঙা অথচ কেমন এক রকম মিষ্টি গলায় যেন আপন মনে বলল—'জানলে তো বলবে ! ও যে জানেই না।'

পদ্ম কলি

সুদর্শন সরকার এ জায়গা সে জায়গা নানান জায়গায় আধাসরকারি কর্ম করে যখন অবসর নিলেন ঠিক তখনই, বলা নেই, কওয়া নেই, তাঁর পাকা আমের মতো টুকটুকে মা জননীটি টুক করে বোঁটা থেকে খসে পড়লেন। সুদর্শন বড্ড মাতৃভক্ত ছিলেন। প্রচলিত ধরনে নয়। বৃদ্ধা জননী ও প্রৌঢ় কনিষ্ঠ পুত্রের মধ্যে একটা ছ্যাবলামির স্রোত বইত সব সময়ে। যেমন, সুদর্শন বলতেন—'এই যে মিসেস সরকার এইবার বেলাবেলি কেটে পড়ুন দেখি, আপনার কোলেরটিও ষাট ছুঁতে চলল। এরপর আর কাছা গলায় দিয়ে, খালি পায়ে প্যাঁকাটির পাকের হবিষ্যি সহ্য হবে না।'

জননী বললেন—'আ মর মুখপোড়া, মুখের আগল নেই। তুই-ই বা কেন এক পা ওদিকের বয়স পজ্জন্ত দামড়া রইলি। আমায় বুঝিয়ে বল। তুই সনকার নখীন্দর। তোকে তোর বেউলো জুটিয়ে দিতে পারলে, এ জন্মের মতো আমার গঙ্গার চানের সাধ মিটে যাবে।'

তবে তুমি তোমার পুত্তুরের মুয়ে আগুন দিতে বসে থাকো। আমি চললুম। বলে সুদর্শন তাঁর ছোট সুটকেসটি নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। যেতে হবে সেই মুর্শিদাবাদ। জেলা, গঞ্জ, গ্রাম, টাউন চষে বেড়ানোই তাঁর কাজ। কলীগরা, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সীরাও ফ্যামিলি নিয়ে নানান অসুবিধের কথা বলে বদলির দায়গুলো অপত্নীক সুদর্শন সরকারের ঘাড়ে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত। সুদর্শন ছাতুবাবুর ঘাটের দিকে চললেন। হরঠাকুরের সঙ্গে দেখা করা দরকার। হরঠাকুর বাড়ির বাঁধা পুরোহিত। লক্ষ্মীপুজো, সত্যনারায়ণ ইত্যাদি বাড়ির যাবতীয় পুজো করেন। রাম সীতার মন্দিরের চাতালে তাঁকে পাওয়া যাবে।

দূর থেকে সুদর্শনকে আসতে দেখেই হরঠাকুর তাঁর গাঁজা খাওয়া দমকা গলায় বললেন—'ঠিক আছে ছোটবাবু। চিন্তা নাই।'

'আমি তা হলে নিশ্চিন্তে যাই?' সুদর্শন হেঁকে বললেন।

ব্যাপারটা আর কিছুই না। সুদর্শনের অশীতিপর জননী নিত্য গঙ্গাস্নান করেন। সুদর্শন যতদিন বাড়ি থাকেন, মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাঁকে ডুব দিইয়ে আনা তাঁর নিত্য-কর্ম। কিন্তু তিনি না থাকলে? তখন যাতে মায়ের বিপদ-আপদ না হয় তাই নানান জায়গায় তিনি লোক ফিট করে দিয়ে যান। গঙ্গার ঘাটে হরঠাকুর, তো হরিসভায় পঙ্কজিনী দাস। বৈঠকখানা ঘরে শোয় পাড়ার পরোপকারী যুবক পান্তু গুছাইত আর সত্যেন মণ্ডল। এদিকে রান্নাঘর সামলাতে কমলি তো আছেই। স্বপাকে ছাড়া জননী খাবেন না। অথচ চোখে দ্যাখেন না। কমলি জলে চাল ফেলে দিয়ে সময়মতো

বলে—'কই গো ঠাকুমা। এই নাও। ন্যাতাটা বেড়ে ধরো। ডাঁড়াও ডাঁড়াও, পুড়ে মরবে যে ! ব্যস, তোমার স্বপাক হয়ে গেল।' বৃদ্ধার নিদন্ত মুখে ভর-ভর্তি হাসি উথলে ওঠে। বলেন—'যাক, এতখানিটা বয়েস পজ্জন্ত যখন পর-পরালির হাতে-পাতে খেতে হল না, তো আর হবেও না, কি বল !' কমলি বলে—'হ্যাঁ গো ঠাকুমা, স্বগগ তোমার বাঁধা।'

সে যাই হোক সুদর্শন সরকারের গল্পের সঙ্গে এসবের আর কতটুকু সম্পর্ক ! অবসর নিয়ে সুদর্শন চেপে বসলেন, মাতৃসেবা করবেন। একে মায়ের কোল পোঁছা, তার ওপর চাকরির সুবাদে মাতৃসঙ্গ—আশ মিটিয়ে করাও হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তাঁর কপাল খারাপ। এক সকালে মা-জননী উঠছেন না দেখে ডাকতে গিয়ে দেখেন মশারির মধ্যে পাকা আমটি খসে রয়েছে। পাতা নেই, বোঁটা নেই। শুকিয়েও উঠেছে এরই মধ্যে। আর, এর পরেই তাঁকে ধরল তাঁর সারা জীবনের সবচেয়ে বড় অসুখ—হেপাটাইটিস-বি। এমনি অসুখ যে ঝাড়া তিনটি মাস নার্সিং হোমের যত্নে থেকে সুদর্শন যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন তাঁর বয়সের মেদমাংস সব ঝরে গিয়ে বয়সকালের সোজা সাপটা আড়াটি বেরিয়ে পড়েছে। ডাক্তার বললেন—'চেঞ্জে যান। এখানে আর একদণ্ড নয়। জীবপালিনী গঙ্গা এখন বিষপালিনী হয়ে উঠেছেন।'

সুতরাং মা-গঙ্গার আওতা ছাড়িয়ে সুদর্শন চললেন শালমউলের দেশে। শাল, মউল, ইউক্যালিপটাস, শিশু, শিরীষ। লাল-মাটির ভাপে গাছের রোগহর বাতাসে, ইঁদারার জলে যদি স্বাস্থ্য ফেরে।

রিকশাঅলা গাড়ি ছুটিয়েছে শনশন করে। সুদর্শন বলেন—'আস্তে চল্ বাবা, অত হুটর হুটর করবার কিছু নেই। দাঁড়া দাঁড়া বাহান্ন বিঘে আরম্ভ হয়ে গেল বলছিস ? ইঁদারাতলা ছিল যে একটা রাস্তার মোড়ে ! অ্যায়, এই তো ! এইবার একটু বাঁদিকে ঘেঁষে চল দেখি। "শুভময়ী কুটির" বলে একটা বাড়ি চোখে পড়ে কিনা দেখি।

'শুভময়ী কুটির যাবেন ? মায়ের হোটেল ? তা আগে বলেননি কেন বাবু ?'

'হোটেল ?' সুদর্শন যেন ভূত দেখলেন।

'মায়ের হোটেলই বলি কিনা আমরা।' ঠাকুরদের হোটেলের মত নয়। ওই যাঁরা বাড়ির মতন থাকতে চান, দু-চার জন তাঁরাই মায়ের হোটেলে কাটিয়ে যান বাবু।'

'হোটেল দেখে কে ?'

'বা ! মা নিজে রয়েছেন। তেনাদের মেনেজারবাবু নিতাইপদ রয়েছেন। বুধন রিকশাঅলা-ও পরিবার নিয়ে বাগানেই থাকে ; সবাই দেখে।'

সুদর্শন আর কিছু বললেন না। তিনি ঘরের মত একটি হোটেলেরই সন্ধান করছিলেন। হেপাটাইটিস-বি'র পরে সাধারণ হোটেলের রান্না খেতে হলে তাঁকে এ জগতের পাততাড়ি গুটোতে হবে।

'বোর্টার এসেছে গো !' টিং টিং করে বেল মেরে জানান দিল রিকশাঅলা। ভেতর থেকে খোঁচা খোঁচা দাড়িঅলা হাফ পাঞ্জাবি আর ধুতি পরা নিতাইপদ মেনেজার বেরিয়ে এলো।

সুদর্শন ঘরটি একটেরে পেয়েছেন। নেটের মশারি খাটিয়ে রাত্রে শোন। মশারির বাইরে রাশি রাশি রঙবেরঙের পোকা আর মথ ঘোরে, ভোরবেলা জানলার ঠিক বাইরে পেঁপে গাছের সারির মধ্যে থেকে গুব গুব গাব গুব করে হলদে ন্যাজের পাখি ডাকে। আধ-ঘুমন্ত সুদর্শনের ভোরের ঘুমে বড় খেদ হয় বড় হয়ে ইস্তক মায়ের সঙ্গ, মায়ের সেবাটি করা হল না। এদিকে নাগাড়ে চাকরি করে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা জমেছে কার ভোগে

লাগবে ? দূর করো অমন চাকরি !

মেনেজার নিতাইপদর খড়মের আওয়াজে ঘুম ভাঙে কাঁচা সকালে। শুভময়ী কুটিরের ইঁদারার জলে মনে হয় হেপাটাইটিস-বি'র ধন্বন্তরী ওষুধ আছে। সুতরাং দিন কে দিন সুদর্শন সরকারের খিদে বাড়ে।

পুকুরের টাটকা মাছের ঝোল, কিংবা দিশি মুরগীর সুরুয়া দিয়ে ভাত বেড়ে দ্যান শুভময়ী কুটিরের সুধা। ভাতের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। বিকেলবেলা বেড়াতে বেড়াতে লালচে মাঠে সূর্যাস্তের কাছাকাছি চলে যান। দেখতে দেখতে যান একটার পর একটা বাড়ি কেমন যত্নের অভাবে, মানুষজনের অভাবে অসহায়ের মতো ভেঙে পড়ছে। দেখতে দেখতে বাড়ি ফেরেন যখন সন্ধে। সকালে চা খান না। সন্ধেবেলা পাতলা সুগন্ধি এক কাপ চা একখানা বিস্কুটের সঙ্গে খান। তারপর কুটিরের বারান্দায়, বাগানশুদ্ধু ভুরভুরে অন্ধকার নিয়ে বসে থাকেন, বসেই থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না সামনেটা তারার মাঠ হয়ে যাচ্ছে।

এই সময়ে কোন কোনদিন শুভময়ী কুটিরের সুধা পেছন দিকে একটি বেতের চেয়ার নিয়ে এসে বসে থাকেন। মধ্যবয়সী মহিলা, খুব শান্ত সৌম্য চেহারা, মাজা রঙ, ধনেখালির ডুরে শাড়ির আঁচলটি গায়ে জড়ানো থাকে। সুধা চুপচাপ মানুষ। কিন্তু সুদর্শন খুব চুপ করে থাকবার লোক নন। সুধার সঙ্গে কথা জমাতে না পারলে নিতাইপদ আছে, সে সিঁড়ির গোড়ায় থেবড়ে বসে, চুলের মধ্যে জোনাকি পোকা ঢুকে যায়। বুধন রিকশাঅলার সঙ্গেও একেক সময়ে জোর আড্ডা জমে যায়। তা ছাড়াও আছেন মোড়ের বাড়ির বয়োবৃদ্ধ শান্তিবাবু। কখনও তিনি আসেন, কখনও সুদর্শন নিজেই যান।

চুপচাপ হলেও সুধাময়ী খুব সহজ আমুদে মানুষ। কথা যখন বলেন, দূরত্ব রেখে বলেন না। একদিন বললেন—'মা-টিকে তো বলছেন খেয়ে বসে আছেন, এখন করবেনটা কি শুনি ?'

সুদর্শন বললেন—'তাই তো দেবী, ভেবেছিলুম ভ্রমণ করে করে কাটিয়ে দেবো। দেখবার জায়গা তো পৃথিবীতে কিছু কম নেই। কিন্তু যা রোগে ধরল চট করে কোথাও যেতে সাহস পাচ্ছি না। বাড়িতে আছে এক কমলি ঠানদি, ক'টা দিন দেশে জুড়োতে গেছে। সরকার-মা তো জ্বালিয়েছেন কম না ! তা সেই কমলির হেপাজতেই বাকি জীবনটা কাটাতে হবে দেখছি।'

'তা যাঁর হেপাজতে কাটাতে হলে ভালো লাগত সে মানুষটিকে ঘরে আনলেন না কেন ?' সুধা মুখ টিপে হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

'সে এক ভারি মজার গল্প। শোনেন তো বলি'—সুদর্শন নড়েচড়ে বসলেন।

সুধা এতদিনে অতিথির স্বভাব টের পেয়ে গেছেন। বড় গল্প একখানা শোনবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসলেন।

'কর্মব্যপদেশে নানান দেশে ঘুরেছি জানেন তো ?' জমিয়ে আরম্ভ করলেন সুদর্শন। 'সেবার বদলি হলুম এক নিঝঝুম জায়গায়। না আছে বাসস্থান, না আছে একটা কথা বলবার লোক। শেষ কালে অফিসের এক সহকর্মী আমার জন্য একটা পেয়িং গেস্ট থাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন। ভদ্রলোক বিপত্নীক। পাঁচ মেয়ে আর একটি বাড়ি, কুল্যে এই তাঁর সম্বল। আমাদের অফিসেই কলম পেষেন। বাড়িতে নাকি জায়গা প্রচুর। থাকা-খাওয়ার কোনও অসুবিধে নেই। আমাকে হাত জোড় করে বললেন—"আপনি যা ধর্মত মনে হয় দেবেন খাই-খরচ বাবদ। থাকার জন্য খরচা করতে পারবেন না।"

বাড়িটি সত্যি বড় সুন্দর। পাখিডাকা গাছ-গাছালি-ভরা ছায়া-অলা বাংলো বাড়ি। আমার ঘরটি একেবারে দাওয়ার পাশে। ইচ্ছে করলে দাওয়ায় বসে পড়ালেখা করতে পারি, ইচ্ছে করলে বাগানে নেমে যেতে পারি। খালি বাথরুম যেতে হলে অন্দরের উঠোন পেরিয়ে যেতে হয়। সে-ও আলাদা, আমার একার বাথরুম। চালের ওপর কুমড়োলতা তোলা আছে। সকালবেলা তা থেকে বৃষ্টির জলের মতো দানা দানা শিশির পড়ে।'

সুধা হেসে বললেন—'আপনি কি কবিতা লেখেন নাকি ? টপটপ করে শিশির পড়ে তো সেই জলেই চান করে নিতেন না কেন ? অমন দানা দানা কুমড়োলতার জল !'

সুদর্শন বললেন– 'হাসছেন ? আরে বাবা চিরকালই কি এমন বুড়ো-হাবড়া রসকষহীন ছিলুম ? তারপর শুনুন। ভদ্রলোকের পাঁচটি মেয়ে যেন পাঁচটি রত্ন। মুক্তো, চুনী, হীরে, পান্না, প্রবাল। আমার বালিশ, বিছানা, পর্দা, তোয়ালে, জামা কাপড়, সব সময়ে ধবধব করছে। সে তাদের কারো হাতের কাজ। সকাল-বিকেল চা এনে দিত। অমন রঙ আর গন্ধ সারা জীবন আর কখনও পেলুম না। কে করেছে, কেমন করে করেছে জিজ্ঞেস করলে মুখ টিপে খালি হাসত। রান্নার আর কি বলব তুলনা হয় না। সত্যি অন্ন-ব্যঞ্জনের অমন স্বাদ,সাধারণ শাকের ঘণ্ট, মাছের মুড়োর কালিয়া কি শুক্তো যেন অমৃত। আর কী বর্ণ ? আহা ! মনে করলেও দশ-বিশ বছর বয়স কমে যায়।'

সুধা হেসে বললেন—'বুঝেছি, বুঝেছি ওইসব রঙ খানিকটা ছিল আপনার চোখেও নইলে...'

'সত্যি বলছি সুধাদেবী', সুদর্শন হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'আমার বয়সটা তখন রঙ দেখবার বয়স হতে পারে। কিন্তু অমন জিনিস, তেল ঝাল-মশলার বাড়াবাড়ি নেই, পুষ্টিকর, অথচ অতি সুখাদ্য আমি তারপর জীবনে আর খাইনি। তা সে যাই হোক, আমি বলতুম পঞ্চকন্যে। ছোটটি নেহাতই ছোট। বছর ষোল-সতের, তাকে পড়া দেখিয়ে দিতুম, কবিতা-টবিতা পড়লে আর চারজনও এসে বসত, তাদের বাবাও ঘুরঘুর করতেন। ভদ্রলোক ভালো আবৃত্তি করতে পারতেন। ক্রমশ দেখলুম ওইই নির্জন অরণ্যবাস পঞ্চকন্যের কল্যাণে গানে-গল্পে যত্নে কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে আমি টেরই পাচ্ছি না। খুব কষে মন দিয়ে আদিবাসী কল্যাণ করতে লাগলুম।

'তারপর একদিন প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙলো মৃদু মধুর গন্ধে। গন্ধটি অপরিচিত। চোখ খুলে দেখি আমার তক্তপোশের পাশে যে ছোট টেবিলটাতে সকালে চা খেতুম, রাত্রে পড়ার বইটা মুড়ে রেখে শুয়ে পড়তুম, সেই টেবিলের ওপর সরু একটি বেলে পাথরের গ্লাসে একটি আধফোটা পদ্ম কলি। ওপর দিকটা সাদা, তলার দিকটা গোলাপী, মৃণালের ওপর হেলে আছে। চমৎকার। ভাবলুম, বাঃ, ভারি সুন্দর তো ! এখানে চারদিকে অনেক ফুল, তবে বেশির ভাগই রঙিন মৌসুমী ফুল, পদ্ম কার বাগানে কোন্ পুকুরে ফোটে কে জানে, তারপর কাজে-কর্মে ভুলে গেছি।'

সুধা বললেন—'অত ভালো লাগল জিনিসটা। অথচ ভুলে গেলেন ! আচ্ছা তো !'

'আরে মশাই শুনুনই না, এ হল গিয়ে ভুলে থাকা. সত্যি সত্যি ভোলা নয়। রাত্তিরে শোবার সময়ে মশারিতে ঢুকেই প্রথম কথা মনে হল আহা কাল সকালেও যদি চোখ মেলে অমনি একটি পদ্ম কলি পাই ! খুব ভোরে তখনও চারদিক অন্ধকার হয়ে আছে, হুট করে ঘুমটা ভেঙে গেল, মশারির জালির মধ্যে থেকে দেখলুম আরে ! পঞ্চকন্যের মেজকন্যে ঢুকছে যে ! হাতে সেই পদ্ম কলি ! এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে ভীরুর মতো ঢুকল। কলিটিরই মতো লতিয়ে, তারপর আমার টেবিলে সরু বেলে পাথরের গ্লাসে ফুলটি নামিয়ে

রেখে এক রকম দৌড়ে চলে গেল।

'ভালো রে ভালো!' সারাদিন ধরে কাজের ফাঁকে ফাঁকে মেজকন্যের মুখখানা মনে পড়তে লাগল। রঙটি সুগৌর, হতে পারে মুখে একটু ভুটিয়া-ভুটিয়া ভাব আছে, কিন্তু আহা কী শোভা কুচকুচে কালো চুলের ঢালে। কাঠামোটি চওড়া, মোটা নয়, দোহারা। আর কী কোমল! সারা দিন স্বপ্ন দেখে কাটিয়ে দিলুম। ভাবছি ক'দিন যাক তারপর মেজকন্যের পিতাঠাকুরের কাছে প্রস্তাব রাখবো। ওমা! দু-চার দিন পরই দেখি ভোরবেলা আবার আমার ঘরে ছায়া ঘুরঘুর করছে। এ কী? এ যে ছোট কন্যে। সেই ষোল-সতের বছরের সদ্য কিশোরী। মুখে কাঁচা আমের আভা। এখনও ভালো করে শাড়ি পরতে শেখেনি, ঠোঁট দুটি ছোট্ট একটি পাহাড়ি গোলাপের মতো, আচ্ছা পাকা পক্কান্ন তো! টুক করে পদ্মকলিশুদ্ধু গেলাসটি নামিয়ে রেখে সে ছুট্টে বাইরে চলে গেল। এমনি করে ভোরবেলা জেগে জেগে পঞ্চকন্যের পাঁচটিকে একদিন একে, একদিন ওকে পদ্মফুল রেখে যেতে দেখলুম। সে কী মধুর ব্রীড়া! কী অপরূপ ভঙ্গি। পাঁচটি কন্যেকেই এইভাবে আমার দুয়ারে প্রণয়প্রার্থী দেখে আমি মহাধন্দে পড়ে গেলুম সুধাদেবী। তাই বদলির সুযোগ পাওয়ামাত্র মনে মহাদুঃখু নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এলুম। মনের খেদে আর বিয়ে করাই হল না। বিবাহের কথা হলেই সেই পাঁচটি মেয়ের ফুটফুটে মুখ মনে পড়ত। একজন নয়, দু'জন নয়, পাঁচ-পাঁচজন কুমারীর হৃদয়, সে কি সোজা কথা! বলুন!'

সুধা হেসে বললেন—'আপনি আশ্চর্য লোক তো! খুব অহঙ্কারীও দেখছি! আপনার একবারও মনে হল না ব্যাপারটা একটু খোঁজ নিয়ে দেখা দরকার!'

সুদর্শন বললেন—'এখন বয়সে এমনি হয়েছি। হেপাটাইটিসটাও ধরে গেল। নইলে তখনকার সুদর্শন সরকার একটু বাড়াবাড়ি রকমের সুদর্শনই ছিল যে দেবী!'

সুধা বললেন—'তাই তো বলছি আপনি বড্ড অহঙ্কারী। গুমোরে চোখে দেখেও দ্যাখেন না। আপনার মনে হওয়া উচিত ছিল, মেয়েগুলির নানান বয়স, পরস্পরে ভাব, মনের মিলও খুব, তারা একসঙ্গে সবাই এক পাত্রে মজতে না-ও পারে।'

'কি বলতে চাইছেন আপনি!' সুদর্শন চমকে উঠলেন।

'বলতে আর কি চাইবো? আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন তো বলব পাঁচজনের মধ্যে একজনই আপনাকে পদ্মকলি নিবেদন করত, বোনেদের হাত দিয়ে নিশ্চয়ই সে-ই পাঠাত ফুলটা। আর আপনার সেবা-যত্ন, আদর-আপ্যায়নের পেছনে পাঁচজনের আড়ালে একজনের হাতই যে খুব বেশি করে থাকা সম্ভব, সেটুকু বোঝার মতো বুদ্ধিও আপনার ঘটে ছিল না। আসলে আপনি নিজেই পাঁচজনের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন।'

সুদর্শন বললেন—'তুমি ঠিক বলছো? সেই পাঁচজনের মধ্যে একজন, একদম একা একজন একমাত্র? সে কি তবে তুমিই?'

সুধা হাসতে লাগলেন। সুদর্শন উৎসুক স্বরে জিজ্ঞেস করলেন—'আর চারজন কোথায় গেল? কি হল তাদের? কও দেখি।'

সুধা বললেন—'মেজ মায়া থাকে দিল্লি, তার বর সেখানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সার্ভিসে আছে, রূপা রয়েছে কলকাতায়। বর মস্ত কনট্র্যাক্টর, একটার পর একটা বহুতল বাড়ি তুলছে, গীতু থাকে মিডল ইস্টে, বছরে একবার করে আসে, কত জিনিস যে নিয়ে আসে! আপনি যে মাখমের মতো নরম চাদরে শুচ্ছেন, পালকের বালিশে মাথা দিচ্ছেন, হাল্কা নাইলনের কম্বল গায়ে দিচ্ছেন, সব ওর আনা।'

'আর...ছোটটি ? স্নেহ ?'

সুধা আঁচলে মুখ ঢেকে ফেললেন।

'কি হল ? থামলে কেন ? বলো ?'

'স্নেহ আমাদের বুক খালি করে দিয়ে চলে গেছে। তার সব গান, সব কথা নিয়ে।' সুধা ধরাগলায় বললেন।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সুদর্শন আপন মনে বললেন—'মায়াময়ী, রূপময়ী, গীতময়ী, স্নেহময়ী আর...সুধাময়ী ?' ঝুঁকে বসলেন তিনি—'তুমি ? তুমিই তা হলে আমার মতো একা একা রয়ে গেলে ? আমার জন্যে ?'

মাসখানেকের মাথায় সুদর্শন বউ নিয়ে হাওড়ায় দেখাতে চললেন। এতদিনে লখীন্দরের বেহুলা জুটল। 'সবই হল—বুড়ো মায়ের সাধটুকু শুধু মেটানো হল না'—এই বলে পাঁচজনে অনুযোগ করলে সুদর্শন জীবনে এই প্রথম মুখ কাঁচুমাচু করে জানালেন—'তিনি তো বেশি দেরি করেননি। সনকাদেবীর একটু তর না সইলে তিনি আর কী করতে পারেন !'

পৌত্তলিক

গাড়ি থেকে নেমে শুভব্রত টাইয়ের গিঁটটা আলগা করে নিল। এই এক গেরো। দেশটা গ্রীষ্মপ্রধান। কণ্ঠ বন্ধনী-পরা সাহেবরা বিদায়ও নিয়েছে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর। কিন্তু এই ভাদুরে গুমোটেও সিনিয়র এগজিকিউটিভকে সেই সাহেবদের বেঁধে দেওয়া নেংটিটি গলায় বাঁধতেই হবে। একেই বোধহয় বলে গলায় গামছা বেঁধে ধরে আনা। এদিকে সামনে লম্বা দুটো ঝুমঝুমি সাপ। একটি আপ একটি ডাউন, মাঝে মধ্যে আরও কিছু-কিছু ঢুকে পড়েছে। থেকে থেকেই হর্নের প্যাঁ পোঁ এবং বিষাক্ত নিশ্বাস। পেছন দিকে সেই ঝুমঝুমি সাপ বোধহয় কোনও বহুপুচ্ছ—পৌরাণিক সরীসৃপে পরিণত হয়েছে। স্ট্র্যান্ড রোড। কলকাতা শহরের বিখ্যাত জ্যাম। ফল-ফুলুরির জ্যামের থেকে এই জ্যাম এখানে অনেক সস্তায় মেলে। একেই অনেকে বাসে-ট্রামে 'জাম্প' বলে থাকেন। 'জাম্প'ই বটে। রামভক্ত বজরংবলীর মতো একখানা জগঝম্প লাফ না দিলে এই জ্যাম থেকে উদ্ধার পাবার কোনও সম্ভাবনাই নেই। তারই মতো বহু অভাগা গাড়ি-ট্যাকসি-বাস থেকে নেমে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন চোখে সরীসৃপের খাঁজ খোঁদল পরীক্ষা করছে, যদি কোনও ফোকর দিয়ে কোনও ফিকিরে বেরিয়ে যাওয়া যায়। ঘাড় আর গলার মধ্যে ঘাম আর ময়লা জমে কুটকুট করছে। রুমাল চালিয়ে বেশ খানিকটা হিউম্যান কাদা মুছে ফেলে দাগী রুমালটার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শুভব্রত।

শফার বলল—'একটু হাওয়া খেয়ে উঠে পড়ুন সার। এখান থেকে নিউ আলিপুর তো আর হেঁটে যেতে পারবেন না! যখন জাম ছাড়বে, তখন যাবেন।'

না, হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। বছর কুড়ি আগে হলে দুর্গা বলে নেমে পড়া যেত। কিন্তু এখন আর হয় না। তা ছাড়া লাগেজ রয়েছে। সামান্য হলেও লাগেজ। এবং অফিসের কিছু জরুরি কাগজ-পত্তর। দিল্লি থেকে অনেক যত্নে সঙ্গে করে বয়ে আনা। লাস্ট মিনিটে পি. এ. গদাধর 'রাজধানী'র টিকিটটি হাতে ধরিয়ে দিল। আকাশের টিকিট মেলেনি। ট্রেন-জার্নির সময়টুকু বাদে ঠিক দু'দিন হাতে। তারই মধ্যে নিজেদের অফিসের ব্রাঞ্চ, মার্কিন এমব্যাসি, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তর। আগস্ট মাসের গরমে এই প্রাণান্তকর ছুটোছুটির পর স্ট্র্যান্ড রোডে কালো জাম। ড্রাইভার-কর্তৃক হেঁটে নিউ-আলিপুর যাবার প্রচ্ছন্ন পরামর্শ। স্বভাবটা আদৌ রাগী না হলেও শুভব্রতর গায়ের মধ্যে নানান জায়গায় কেমন চিড়বিড় করতে লাগল। একেই বোধ হয় বলে গায়ের ঝাল! আচ্ছা একখানা জীবন! সেই ইনফ্যান্ট ক্লাস থেকে ফার্স্ট হতে হতে আসছে। প্রতি বছর ফার্স্ট প্রতি বছর দুশ্চিন্তা—পরের বছরও হবে তো! ক্লাস-টিচার প্রোগ্রেস রিপোর্টটা হাতে তুলে দিয়ে চিৎকার করে বলতেন 'আসছে বছর...'। ছেলেরা সমস্বরে স্লোগান দিত 'আবার

হবে।' সেই 'আবার হবে' এম-টেক অবধি গড়ালো। গড়াবার মূল্যস্বরূপ গেল রাতের ঘুম, দিনের শান্তি। বন্ধু-বান্ধব যখন হই-হই করে আড্ডা মারছে, সিনেমা দেখছে, ফার্স্ট বয় তখন আসছে বছরের জন্যে মুখ গুঁজে টেবিলে। রাত-আলো ভোরের আলোয় মিলিয়ে যাচ্ছে। শেষ ডিগ্রিটার পরে দম ফেলতে না ফেলতেই পাঁচ হাজারি মনসবদার। তারপরেই গুরুজনরা উলু-উলু করে গলায় লটকে দিলেন একটি সালঙ্কারা ঢুলুঢুলু চোখ সলজ্জ নায়িকা। নায়িকা খোলসা করে কিছুই বলেন না, খালি আভাসে ইঙ্গিতে জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে চলেন। একমাত্র ছেলেটাকে কোনমতেই দার্জিলিং সেন্ট পলের কমে দেওয়া গেল না। মেয়েটাও মুসৌরি। বিয়ের পরে কাশ্মীরে হনিমুন ছিল। ডাল লেকে নারী জলের শোভা দেখতে দেখতে কণ্ঠলগ্না হচ্ছেন, অঙ্গে নিত্য নতুন কাশ্মীরি শাল, আর তুমি ভাবছো ট্রাভলার্স চেকগুলো তো ফুরিয়ে এলো ? আর কলকাতার ফেরার পর দিনই সাইট দেখতে মধ্যপ্রদেশে পাড়ি দিতে হবে।

শুভব্রত সরকার একটা সাঙ্ঘাতিক সুখী মানুষ। বন্ধুদের ভাষায় 'লাকি গাই', সুন্দরী শান্ত স্বভাবা স্ত্রী। দুটি ছেলে মেয়ে পৃথিবীর যেখানে যা বিদ্যে আছে সব আয়ত্ত করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। একটি বাবা, একটি মা। এখনও চোখ কান হাত-পা বজায় আছে। নিচের তলায় বিশ্বাসী কাজের লোকসহ বাস করছেন। আলাদাকে আলাদাও হল আবার যৌথকে যৌথও। রবিবার-রবিবার খাবার টেবিলে সবাই একত্র। অফিস-অতিথি না থাকলে। সকালে লাফ মেরে মেরে অফিস বেরোবার সময়ে দুর্গা নামও রোজ শোনা হচ্ছে মায়ের মুখে। খবরের কাগজের আবডাল থেকে বাবার 'সাবধানে চোলো', যেন শুভব্রত চলে ! সে যে সদা সর্বদাই চালিত হচ্ছে, বাবা কি জেনেও জানেন না ! সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত চেন-রিঅ্যাকশন। একটা নিউট্রন গিয়ে আরেকটা নিউট্রনকে ধাক্কা মেরে যাচ্ছে, সে আবার আরেকটাকে, এইভাবে চলল। জনগণের মঙ্গল হচ্ছে। বাড়ি হচ্ছে, গাড়ি হচ্ছে, শাড়ি, রকমারি পোশাক, বিউটি পার্লার এয়ারকুলার, অ্যাক্রিলিক পেন্ট, ভি সি আর সব হচ্ছে। তোমার কি হচ্ছে ? তুমি মানুষটি আসলে আর মানুষ নেই। নিজেই জানো না। জাপানি রোবটে পরিণত হয়েছো। তোমার সুখ বলতে চায়ের রঙটা ঠিক হয়েছে কিনা, শান্তি বলতে ভেড়া গুনতে গুনতে রাত আড়াইটেয় ঘুম এলো কিনা, আহ্লাদ বলতে এক পাত্র মদিরার কৃত্রিম স্নায়বিক উত্তেজনা।

মাসকয়েক আগে স্কুলের বন্ধু নিখিলেশের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে-ও এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে ছুটোছুটির মাঝখানে। বলল, 'চল না—একটু কফি হাউসে বসা যাক।' মাস্টারমশাইদের স্ট্রাইকে লাগাতার ছুটি। তোমার আর কি শালা। এদিকে আমি শুভব্রত সরকার আসলে আমার ওপর-অলাদের বাজার সরকার। 'সময় নেই' শুনে নিখিলেশ বলল—'খাসা আছিস সত্যি।' বলতে বলতে সিগারেটের প্যাকেটে আঙুল ঠুকতে ঠুকতে মহা-আনন্দে কফি হাউসের দিকে চলে গেল। সময় না থাকাটা যে কি করে খাসা থাকার লক্ষণ হতে পারে শুভব্রতর মাথায় আদৌ আসে না। সিগারেটের প্যাকেটে টোকা দিতে দিতে কফি হাউসের দিকে চলে যাওয়াটা, যেতে পারাটা বরং তার কাছে ঈর্ষণীয় সৌভাগ্যের লক্ষণ বলে মনে হয়।

—'আরে, শুভ না ?' সামনে দাঁড়িয়ে কালো দাড়ি-অলা ফর্সা রং হাফ-পাঞ্জাবি পরা এক হৃষ্টপুষ্ট সৌম্য চেহারার ভদ্রলোক যাঁকে শুভব্রত কাস্মিনকালেও দেখেনি। আপাদমস্তক দেখে নিয়ে অগত্যা সে আমতা আমতা করল, 'আপনাকে তো ঠিক...

হাসিমুখে ভদ্রলোক নিজের দাড়িটা চেপে ধরে উজ্জ্বল চোখে শুভব্রতর দিকে চেয়ে

রইলেন।

—'আরে তাই বল, চিত্ত ? জব্বর দাড়ি রেখেছিস তো ?' শুভব্রত এগিয়ে গিয়ে বন্ধুর কাঁধে হাত রাখল।

—'দাড়িতে মুখের চেহারা কিভাবে পাল্টে দেয় দ্যাখ, সাধে কি আর ক্রিমিন্যালরা দাড়ি রাখে ? তা তুই এখানে কোত্থেকে ?'

—'গঙ্গায় চান করে ফিরছি !' ইঙ্গিতে চিত্ত হাতের পুঁটলিটা দেখাল।

—'গঙ্গাচ্চান, এই সন্ধেবেলায় ?' শুভব্রতর মুখ হাঁ।

চিত্ত হেসে বলল—'মুখটা বুজিয়ে ফেল, আরশুলো ঢুকে যাবে, তুই জ্যামে পড়ে গেছিস মনে হচ্ছে !'

গাড়িটার দিকে হাত দেখিয়ে শুভব্রত বলল—'তাই তো দেখা যাচ্ছে !'

—'নটা সাড়ে নটার আগে এ জ্যাম ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না রে। কোত্থেকে আসছিস ?'

—'আরে দিল্লি থেকে। গাড়ি স্টেশনে নিতে গিয়েছিল, তারপর এই।'

—'বলিস কি ? তুই ট্রেন-জার্নি করে এসে এইভাবে যাঁতাকলে পড়ে আছিস ? আয়, আয়, আমার সঙ্গে আয়। তোর কি নিজের গাড়ি না কোম্পানির ?'

—'ওই হলো।' শুভব্রত বলল।

—'ছেড়ে দে। চলে যেতে বল সময় মতো। তোর লাগেজও থাক। তুই আমার বাড়িতে একটু বিশ্রাম-টিশ্রাম করে যাবি এখন।'

—'কোথায় তোর বাড়ি ?'

—'আরে এই তো কাছেই, হ্যারিসন রোড ধরে যাবো, চিৎপুরের কাছে। একটা রিকশা নিয়ে নেবো এখন, আয় তো !'

শুভব্রত এক মুহূর্ত চিন্তা করল। প্রচণ্ড রকম ডায়াবিটিক শরীর। ঝিমঝিম করছে এখন। প্রেশারও আছে। সত্যি-সত্যিই পারা যাচ্ছে না।

ড্রাইভার মদন পাশে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিল। শুভব্রত ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—'কি মদন ? আমি তা হলে চলেই যাই ! তুমি লাগেজ পৌঁছে দিও।'

মদন বলল—'ঠিক আছে সার। ঠিকানাটা বলে দিন। জ্যাম ছাড়লে আমি একবার ট্রাই করতেও পারি।'

—'তার আর দরকার হবে না। শুধু শুধু আবার একগাদা ঘুরতে হবে তোমায়। তুমি চলে যেও।'

দরকারি কাগজের ব্রিফকেসটা শুধু হাতে তুলে নিয়ে শুভব্রত বলল—'চল।'

চিত্তর মুখটা মনে হল যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর হাত থেকে ব্রিফকেসটা একরকম ছিনিয়ে নিয়ে সে স্ট্র্যান্ড রোড পার হয়ে একটা রিকশা ধরল। রিকশাঅলা দেখা গেল ওকে চেনে। রাস্তা পার হতে না হতেই ঠুনঠুন করতে করতে এগিয়ে এলো। মুখে কৃত কৃতার্থের হাসি। জ্যামের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে কেটে যেতে কোনও আপত্তিই নেই।

রিকশায় উঠতে উঠতে শুভব্রত বলল—'মানুষের কাঁধে চড়তে আমার কেমন ইয়ে লাগে রে চিত্ত !'

চিত্ত হেসে ফেলে বলল—'মানুষের কাঁধে তো মানুষই চড়ছে রে বাবা, যন্ত্র তো আর চড়েনি ! নে, তোদের এই পুতুপুতু ভাবটা ছাড় তো। যে সিসটেমে আছে ওরা এই করেই

তো ওদের খেতে হবে। তুই না চড়লে আরেক জন চড়বে। তোর চেয়েও মোটা। ওর আরও কষ্ট হবে তখন। তা ছাড়া একটা গরিব মানুষের সম্মানের রোজগারে তোর অবদানটুকু থাকবে না!'

—'সবই জানি, তবু...'

—'সবই যদি জানিস তো আর দ্বিধা করিসনি। কেমন সুন্দর ফুরফুরিয়ে হাওয়া দিচ্ছে দেখ তো! রিকশায় উঠলে যেমন হাওয়া পাওয়া যায় অন্য কোনও যানে তেমন যায়? আর দ্যাখ দৌড়োনোর কায়দাটা। লোকনৃত্য করছে না রিকশা চালাচ্ছে বোঝা দায়! সাক্ষাৎ নটরাজ মহাদেবের শিষ্য সব।' চিত্ত সামান্য একটু ঝুঁকে বসল।

রিকশাঅলা চলছে। রেলগাড়ির ইঞ্জিনের পিস্টনের মতো তার কনুই দুটো তালে তালে সামনে পেছনে সামনে পেছনে সরছে। ঘাম চকচক করছে। ফুলে ফুলে উঠছে পেশিগুলো।

চিত্ত বলল—'দেখেছিস? দেখেছিস? অপূর্ব না? ভাস্করদের সাবজেক্ট রে। আমাদের মেঠো চোখ আর কি দেখছে!'

শুভব্রত হেসে বলল—'তুই এখনও তেমনি পাগলা আছিস চিত্ত। আঁকিস-টাঁকিস আজকাল?'

চিত্ত কিছু বলল না। হাসিমুখে চুপ করে রইল।

কতকগুলো জিনিস মানুষ কখনই ভোলে না। কেমন করে কে জানে ঠিক স্মৃতিতে থেকে যায়। চিত্তর পাশাপাশি চলতে চলতে সেই কথাগুলো এখন এমন জীবন্তভাবে মনে পড়ল শুভব্রতর যেন গঙ্গার পুলের তলা দিয়ে পঁচিশ বছরের জল গড়িয়ে যায়নি।

চিত্তটা অঙ্কর খাতায় সব সময়ে একটা কাঁটালি চাঁপা ফুল রেখে দিত। খানিকটা করে অঙ্ক কষবে আর ফুলের গন্ধ শুঁকবে। জিজ্ঞেস করলে বলত—'বুদ্ধির গোড়ায় ফুলের গন্ধ দিচ্ছি। আঁকগুলো কিরকম সুড়সুড় করে বেরিয়ে আসে দ্যাখ না।'

সত্যিই! জিওমেট্রিতে এঁটে উঠতে পারত না বলেই চিত্তটা শুভব্রতর থেকে কম নম্বর পেতো অঙ্কে। আঁকার সুযোগ পেলেই ও নানারকম কারিকুরি করবে। করবেই। ডায়াগ্রামের চারপাশে শেড দেবে। কোথাও গাঢ়, কোথাও হালকা। তলার লেখাগুলো সব বাহারি। প্রত্যেকবার অঙ্কের মাস্টারমশাই ওর কান ধরে দাঁড় করিয়ে দেবেন বেঞ্চে। তবুও ও করবেই। তা ছাড়া যা দেখবে তাই আঁকবে। ক্লাসঘরের জানলার পাটে বসে একটা দাঁড়কাক বিশ্রী স্বরে ক ক করত। তাকে সুদ্ধু এঁকে ফেলল ঠোঁটের ভেতরকার লাল সমেত। তার সেই ঘাড় বাঁকানো ভঙ্গিতে একচোখো তাকানো দেখে ক্লাসসুদ্ধু ছেলের কি হাসি!

চিত্ত বলল—'নাম। দে ব্রিফকেসটা আমার হাতে দে তো।' তড়াক করে অনায়াসে নেমেছে ও। শুভব্রতর একটু কষ্ট হয়। প্রথমত অনভ্যাস, দ্বিতীয়ত ভুঁড়িটা ঘনত্বে, বেড়ে বেশ, তৃতীয়ত হাঁটুতে আজকাল একটা খচখচে ব্যথা হচ্ছে।

সরু গলির মধ্যে হলেও চিত্তর বাড়িটা দেখা গেল খুব প্রশস্ত এবং পরিচ্ছন্ন। এসব অঞ্চলের রাস্তাঘাট যে রকম একটা ঘিনঘিনে নোংরা হয় সেরকম নয় মোটেই। বেশ বড় উঠোন তার চার দিক ঘিরে রোয়াক। উঠোনময় প্রচুর টবে ফুলগাছ। প্রত্যেকটা টব চকচক করছে। শুভব্রত চিত্তর বাড়িতে ঢুকেই যেন একটা ডুব দিল। দু হাতে জল সরিয়ে সরিয়ে, জল সরিয়ে সরিয়ে ঝপাৎ করে ডুব। সময়ের লহরীমালার অভ্যন্তরে কোথাও বুঝি মানুষের জীবনের পুরনো সময় টিকে থাকে। আসলে ওরা দুজনেই এক

গ্রামের ছেলে। শহরতলির গ্রাম। শুভব্রতদের ছেলেবেলায় সে সব গ্রাম খুব এঁচড়ে পক্ক হয়ে ওঠেনি। সারা গ্রীষ্ম রোদ্দুরের গন্ধ, জ্বলন্ত আকাশের গন্ধ ঠাণ্ডা জলের গন্ধ আর ফুলের গন্ধে টইটম্বুর হয়ে থাকত সেই শহরতলির গ্রাম। সিনেমার পোস্টার, ফিলমি গানের ঘেয়ো কুকুর তখনও তার সর্বাঙ্গ চাটেনি। সেইসব ফুলের গন্ধ চিত্ত তার উঠোনে কোন আশ্চর্য জাদুতে জিইয়ে রেখেছে। শুভব্রত মেশিন পার্টস চিনেছে চিরকাল, ফুল-টুল অত চেনেনি, বিশেষত দেশি ফুল। কিন্তু ফুলের গন্ধ তার সমস্ত চেতনা ছেয়ে আছে।

—'জুতোটা এখানে খোল শুভ, দাঁড়া একটা টুল এনে দিই'...চিত্তর গলার স্বরে সে চমকে উঠল।

রোয়াকের এক কোণে জুতো আর মোজা খুলে ঘরে ঢুকল শুভ। এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবার চমকে উঠল। চিত্তর ঘরের দেয়ালে দেয়ালে কুলুঙ্গি খুপরি, কাঠের তাক, এবং সর্বত্র পুতুল। ঘরটা ধূপের ধোঁয়ায় আবছায়া, বাইরের ফুলের গন্ধ এখানে চার দেয়ালের মধ্যে আরও প্রবল। ফুলদানিতে, গেলাসে, বোতলে, রেকাবিতে সর্বত্র ফুল। একটা নিচু তক্তপোশে তাকে বসিয়ে চিত্ত বলল -'দাঁড়া আসছি। সিগারেট খাসনি ভাই প্লীজ।'

সিগারেট খাওয়ার অবশ্য কোনও প্রশ্নই নেই। ডায়াবিটিসের সঙ্গে হাই প্রেশার। ডাক্তার একদম ত্যাগ করতে বলেছেন। তবে ধীরে। এখন দুবেলায় দুটো এসে দাঁড়িয়েছে। খাওয়ার পর একটা করে ধরায়। ওই ধরানোই। কিং সাইজ সিগারেট আঙুলের ফাঁকেই ছাইয়ের স্তম্ভ হতে থাকে। দু-একটা টান দেয় কি না দেয়। ঘরে ঢুকল চিত্ত এক হাতে থালায় প্রচুর খাবার, আরেক হাতে চা। বলল—'ওই টুলটা টেনে নে না ভাই!'

শুভব্রত বলল—'খিদে পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু এত খাবোই বা কি করে আর জোগাড়ই বা করলি কোথা থেকে? তুই একা না দোকা তা-ই তো এখনও বুঝতে পারলুম না রে!'

চিত্ত হেসে বলল—'খিদে পেয়েছে, খেয়ে নিবি, ফুরিয়ে গেল। মেয়েদের মতো না না না করিসনি তো! এই সব লুচি, আলুরদম, ঘুগনি, সব আমার দিদির হাতে করা, দোকানের নয় একটাও। তা ছাড়া স-ব ঠাকুরের ভোগ। খা।'

—'ঠাকুরের ভোগ? কী ব্যাপার বল তো?'

চিত্ত হাতটাকে ঘরের চারদিকে ঘুরিয়ে এনে বলল—'এই তো সব ঠাকুর। আমরা যা কিছু খাই, খাওয়াই স-বই দেবতার ভোগ রে শুভ, আলু-টালু কিছুই খেতে দ্বিধা করিসনি।'

শুভব্রত বলল—'বলিস কি? আমি এক্ষুণি ভাবছিলুম এতো পুতুল তুই জোগাড় করলি কোত্থেকে! এসব শখ তো মেয়েদের থাকে বলেই জানতুম।'

চিত্ত রহস্যের হাসি হেসে বলল—'পুতুলই বটে! মিথ্যে কিছু বলিসনি। আর শখের কথা বলছিস! দু-চারটে আমার কিংবা দিদির কেনা। বাস।'

—'বাকিগুলো? সব গিফ্‌ট?'

চিত্ত বল, 'ধর যদি রাস্তায় একটা ছোট্ট অনাথ ছেলে এসে তোকে আশ্রয়ের জন্যে ধরে, আর ধর তোর সংসার বলতেও কিছু নেই, অভাব বলতেও কিছু নেই। তুই কী করবি শুভ?'

—'কি আর করব, ভাগিয়ে দোব।' চিত্তর কথাবার্তা বেশ অসংলগ্ন মনে হচ্ছিল শুভব্রতর।

—'কিন্তু তার পরেও যদি দেখিস ছেলেটা ঠিক তোর বাড়ি চিনে চিনে এসে হাজির

হয়েছে আর জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত নিখুঁত ভাবে সেরে ফেলে শুধু তোর একটু মায়া-মমতার আশা করে রয়েছে, তবে ?'

—'তা হলে তাকে রাখা যায় বটে। ছোট ছেলে, সুতরাং কর্পোরেশন স্কুলে লেখাপড়ার একটা ব্যবস্থাও করে দেওয়া যায়।'

চিত্ত অন্যমনস্ক ভাবে বলল—'ঠিক। আমিও ঠিক তাই-ই করেছিলুম রে। মাইনে তো নিলই না। স্কুলেও গেল না। যাবার কোনও দরকারও ছিল না।'

'ব্যাপারখানা কী খুলে বল তো।' শুভব্রত লুচিতে কামড় দিয়ে বলল, তারপরেই বলে উঠল—'তোর দিদির রান্না বললি না! এটা কি প্রিপেয়ারেশন রে ? অদ্ভুত ভালো খেতে তো!'

চিত্ত বলল—'ভোগ অমনিই খেতে হয় রে শুভ। দিদির বাহাদুরি সামান্যই।'

আনমনার মতো হেঁটে হেঁটে চিত্ত ঘরের মাঝখানে একটা কুলুঙ্গির দিকে চলে গেল। কুলুঙ্গিতে একটা কৃষ্ণমূর্তি, নীলচে রঙ, হাতে বাঁশি। একলা মূর্তি। রাখালবেশী বালক কৃষ্ণ।

'চমৎকার না ?' চিত্ত বলল, 'এরকম মূর্তি কখনও দেখেছিস ?'

শুভ বলল—'পুতুলটা খুবই সুন্দর, সত্যিই। কৃষ্ণনগরের নাকি রে ?'

—'ঠিকই ধরেছিস।' চিত্ত বলল, 'বছর দশেক আগেকার কথা, কেষ্টনগর বেড়াতে গেছি। ঘূর্ণিতে গিয়ে অনেক কিছুর মধ্যে এই মূর্তিটা খুব পছন্দ হয়ে গেল। সঙ্গে ছিলেন তেজেশবাবু আমার এক সহকর্মী। তখন পাকপাড়ার একটা স্কুলে কাজ করতুম। ভদ্রলোক ফিজিক্সের লোক, বললেন—কিনছেন তো অন্য জিনিস কিনুন, পুরনো সংস্কারের ওই সব ভূতগুলোকে আর কিনবেন না চিত্তবাবু। বরং ওই টিকটিকি জোড়া কিনুন। আসলের থেকে তফাত করতে পারবেন ? আমি বললুম, আমার ঘরের দেয়ালে টিকটিকির অভাব নেই তেজেশদা। এ পুতুলটা আমার চমৎকার লাগছে। তা আমার গরজ দেখে লোকটা একটা সৃষ্টিছাড়া দাম হেঁকে বসল। রাগ করে চলে এলুম। কলকাতায় ফিরে ভিড়ের মধ্যে দেখি একটা বছর দশ বারোর ছেলে আমার পেছু ধরেছে— বাবু তোমার মোটটা আমায় দাও না। যত বলি মোট কোথায় যে দেবো ? থাকার মধ্যে তো খালি একটা ব্যাগ বা ঝোলা যা বলিস। "ওইটেই নোব।" ভাবলুম বোধহয় খুব অভাব, পয়সাটা পেলে ওর উপকার হয়। দিলুম ব্যাগটা। নে বাবা, ব'। সেদিনও এমনি জ্যাম। সারাটা পথ হাঁটিতে হাঁটিতে বাড়ি। পয়সা দিতে গেলুম নিল না। বললে, "দুটি দুধ-ভাত দেবে ?" দিদি খেতে দিল ভালো করেই। নিঃসন্তান বিধবা। বাচ্চা ছেলে-মেয়ের ওপর একটু অতিরিক্ত মমতাই। তা সেই থেকে ছেলেটা দিদির মন ভিজিয়ে বাড়িতে থেকে গেল। পায়ের কাছে চকচকে জুতো। হাতের কাছে জামা। দিদি কলঘরে থাকতে থাকতেই অর্ধেক রান্না সেরে ফেলে। এদিকে একদম ভদ্রলোকের ছেলের মতো কথাবার্তা টানটোন। দিদিতে আমাতে ঠিক করলুম ছেলেটাকে মানুষ করব। সব ব্যবস্থা করে ফেলে বললুম- কি রে কেষ্টা, তোর তো খুব মাথা। স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে আসি চল। কি বলল জানিস ?—'ক'দিন পরেই তো বুড়ো হবো, তার পরেই পট করে মরে যাবো। তোমার ইস্কুল শেখাতে পারবে কি করে বুড়ো-টুড়ো না হয়ে যতদিন ইচ্ছে বেঁচে থাকা যায় ? নইলে লেখাপড়া শিখে সেগুলো কাজে লাগাতে না লাগাতেই তো মরে যাবো!' পাকা পাকা কথা শুনে আমরা ভাইবোন তো হাঁ।

'পর দিন সকাল থেকেই ছেলেটাকে আর খুঁজে পেলুম না। দিদির সন্দেহ হয়নি।

আমার তো পাপ মন। তন্ন তন্ন করে খুঁজে পেতে দেখছি কিছু হারিয়েছে কিনা। যে ঝোলা নিয়ে কেষ্টনগর গিয়েছিলুম সেই ঝোলার ভেতরে দেখি সেই কেষ্টনগরের কৃষ্ণমূর্তি। কি বলব শুভ—এই দ্যাখ আমার গায়ে এখনও কাঁটা দিচ্ছে।'

শুভব্রতর একবার মনে হল গলা ফাটিয়ে হেসে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণে চিত্তর মুখের দিকে তাকিয়ে ও থেমে গেল। তন্ময় দৃষ্টিতে সে কৃষ্ণ মূর্তিটার দিকে চেয়ে রয়েছে।

শুভ বলল—'ছেলেটা নিশ্চয় পড়ার ভয়ে পালিয়েছে। হয়ত ঘূর্ণি থেকে মূর্তিটা সরিয়ে তোর পেছু নিয়েছিল, অনাথ-টনাথ হবে। তা সেই থেকেই কি তুই ঠাকুরের মূর্তি জোগাড় করে চলেছিস?'

চিত্ত বলল—'না রে শুভ, একটা মূর্তিও আমি জোগাড় করিনি।'

—'তবে? এই যে তোর দুর্গা, কালী, নটরাজ, সরস্বতী, লক্ষ্মী—এটা কি?'

—'গঙ্গা। মকরবাহিনী, দেখছিস না?'

—'এসব তুই জোগাড় করিসনি?'

—'তুই হরিদ্বারে গেছিস?'

—'একবার গিয়েছিলুম বটে', শুভব্রত বলল।

—'তুই গিয়ে কি দেখেছিলি জানি না, আমি তো গঙ্গার ঘোলা জল আর গুচ্ছের কুষ্ঠরুগী দেখে দারুণ হতাশ। গঙ্গার ধারেই একটা ধর্মশালায় উঠেছি, দাদা-বউদির হোটেলে দু বেলা ভাত খাই। আর কনখলে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমে গিয়ে বসে থাকি। কি রে বোর হচ্ছিস না তো?' চিত্ত হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল।

শুভব্রত তখন প্লেটের খাবারের একেবারে শেষাংশটুকু আনমনে চাটছে। কতদিন খেতে বসে আঙুল চাটা, থালা-চাঁছা হয় না। এ-ও ছেলেবেলার এক লুপ্ত স্মৃতি। লুব্ধতার স্মৃতি। যে লুব্ধতা এখন অসভ্যতার নামান্তর। সে বলল—'তুই বলে যা চিত্ত। আমি ঠিক শুনে যাচ্ছি।'

চিত্ত বলল—'একদিন ভোরবেলা বেরিয়ে পড়েছি। দারুণ ফর্সা একজন গাড়োয়ালি যোগিনী মতো গঙ্গার ধারে বসে জপ করছে দেখি, ব্রিজটার ঠিক মুখে, আমাকে দেখে বলল—"এ বেটা উধর মাৎ যাও। ইধর যাকে গঙ্গাজীকি মন্দির মে পূজা চড়াও!" গলায় যেন খানিকটা আদেশের সুর। সত্যি দিন তিন-চার হয়ে গেল এসেছি। গঙ্গামন্দিরের দিকে যাই-ই নি। মহিলা ঝুলি থেকে বার করে ওই মূর্তিটা দিলে, ভালো লাগল মূর্তিটা, দাম জিজ্ঞেস করলুম, বললে—"মন্দির সে ওয়াপস আ যাও, পৈসা লে লুঙ্গী।" তো ঠিক আছে। গঙ্গামন্দিরে গিয়ে পুজো চড়াব কি মূর্তি দেখে আমি অবাক, অবিকল সেই যোগিনী, ফেরবার পথে মহিলাকে আর দেখতে পাইনি। যে ক'দিন ছিলুম হরিদ্বার চষে ফেলেছি। একদম বাতাসে মিলিয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা।'

শুভব্রত হেসে বলল—'তুই কি সিদ্ধি-টিদ্ধি খাস না কি বল তো? বরাবরই তুই ছিটে পাগলা। কিন্তু এসব রোগ তো তার ছিল না?'

চিত্ত হাসিমুখে বলল—'নাই বা শুনলি এসব গুলগপ্পো। ছেলেবেলাকার মতো আড্ডা মারি আয়।'

শুভব্রত নিজের মনের ভেতর খানিক হাতড়ে বলল—'প্রোফেশন্যাল টক করে করে ব্রেনের ভেতরটা কি রকম ইয়ে হয়ে গেছে রে চিত্ত। তুই শুরু কর। তুই আজকাল করছিসটা কি? সেই পাকপাড়ার স্কুল?'

—'ছেলেবেলায় যা করতুম তাই। পাকপাড়ার ইস্কুলেও তাই। এখানেও তাই।'

—'অর্থাৎ ?'

—'অর্থাৎ আঁক কষছি।'

—'মাস্টারি-ই ?'

—'না রে, এক ব্যবসাদারের গদিতে হিসেব-নিকেশ করি।'

—'বড়বাজারি নাকি রে ?'

—'হ্যাঁ ; কেন বল তো ?'

—'ওরা তো সাবর্ডিনেটদের সঙ্গে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করে। শুনেছি চাকরবাকরের মতো দেখে ! মনে করিসনি কিছু।'

– 'না, মনে করব কেন ? তুই তো ঠিকই বলেছিস। করত। আমার মনিবও করত। এখন আর করে না। আমার সঙ্গে তো নয়ই। অন্য কোনও কর্মচারীর সঙ্গেও না।'

—'আগে করত। এখন করে না ?' শুভব্রত অবাক হয়ে বলল। একটু থেকে ও আবার বলল, 'খুব ঝেড়ে দিয়েছিলি বুঝি ? বেশ করেছিস। এই তো চাই। চিত্ত তোর গায়ের জোরও তো কম ছিল না রে, তেঁতুলবাগানের কুস্তির কথা মনে আছে ? সেই গোবরবাবুর ফটো সামনে রেখে একলব্যের মতো... ?'

চিত্ত হাসতে হাসতে বলল—'তুই তো কিছুই ভুলিসনি দেখছি।'

শুভব্রত বলল—'এত যে আমার মনে আছে তাই-ই জানতুম না। ওঃ সে একখানা সিন করেছিলি তুই, এক-একজন আসছে আর বলছিস—"উঠাকে পটাক দেগা !" বাপ্‌স্‌ রে। কতজনকে কাত করেছিলি বল তো ?'

—'জনা চার-পাঁচ হবে। ও কিছু নয়। আসলে ওগুলো ছিল কাপুরুষ। না হলে নিরীহ মাস্টারমশাইকে অপমান করে ?'

—'কি করেছিল বল তো ?'

—'দূর দূর ওসব ছাড়।'

—'তা তোর মনিবকেও কি ওই রকম পটকে দিয়েছিলি নাকি !'

—'দূর দূর তাও কখনও কেউ করে ?' চিত্ত হাত নেড়ে বন্ধুর কথা একদম উড়িয়ে দিল।

এই সময়ে বাইরে থেকে একটা হাঁক শোনা গেল 'বাবুজী ! চিত্তরঞ্জন ভাইয়া !'

চিত্ত তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে বেরিয়ে গেল। শুভব্রত দেখল রোয়াকের ওপর উঠে আসছেন ফিনফিনে মিলের ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি পরা দুধে ঘিয়ে অতিরিক্ত পুষ্ট ধবধবে ফর্সা এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক। পেছনে একটি চাকরশ্রেণীর লোক। তার হাতে খুঞ্চিপোষ ঢাকা মস্ত থালা। উঠতে উঠতে ভদ্রলোক বললেন 'কেতোবার বলিয়েছি চিতজী হামাকে আপনি শিউরতনভাই বলবেন, তো হামি এতো পাপ-তাপ করিয়েসে যে একঠো বাত রাখতে পারলেন না।'

চিত্ত বলল—'আগরওয়ালজী আপনি তো বয়সেও আমার থেকে বড়। এতদিনের অভ্যাস কি করে ছাড়ি বলুন তো ?'

—'হাঁ উমর, উমর। কেতো উমর হামার ? চিতজী পিছলে পিছলের সোব জনম হিসাব করেন, জরুর দেখবেন আপনি হামার থেকে বোরো আছেন।'

শিউরতনবাবু জুতো খুলে উঠলেন। সঙ্গের লোকটি খালি পায়ে এসেছিল, চিত্ত বালতি থেকে মগে করে তার পায়ে জল ঢেলে দিতে লাগল। শুভব্রতর দিকে লাজুক দৃষ্টিতে চেয়ে শিউরতনবাবু বললেন—'দেখছেন তো। এ চিতজী বিলকুল পাগলা আদমি

আছেন। নোকর উকর কুচ্ছু মানবেন না।'

ঘরের মধ্যে ঢুকে লোকটির হাত থেকে বিশাল থালাটি নিজের হাতে নিয়ে নিলেন শিউরতনবাবু। বাঁ দিকে একটি তাকের সামনে চলে গেলেন, খুঞ্চিপোশের ঢাকা খুলতেই এক শতাব্দী আগেকার গাওয়া ঘি-এর গন্ধে ঘর ম ম করে উঠল। আড়চোখে চেয়ে শুভব্রত দেখল থালাটি রুপোর, তার ওপর পুরি, কচুরি, লাড্ডু, রাবড়ি; এবং আরও নানারকম বস্তু বাটিতে বাটিতে সাজানো। তাকে গণেশের একটি ছোট্ট মূর্তি। এক বিঘৎ মতো। মাটির ওপর শিউরতনের লোক বোধহয় গঙ্গাজলের আছড়া দিল, তিনি থালা নামিয়ে রেখে ধূপ জ্বালিয়ে দিলেন। চিত্ত ইশারা করল। শুভব্রত তার সঙ্গে বাইরে চলে এল। কিছুক্ষণ পর শিউরতনও বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন। দশ মিনিট চোখ বুজিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর হঠাৎ জয় রামজী, জয় বজরংবলী, জয় গণেশজী বলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। পেছন পেছন চিত্ত ও শুভব্রত।

হুমড়ি খেয়ে থালাটায় কী দেখছেন শিউরতন। হঠাৎ আবার 'জয় বজরংবলী' বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

—'কী হল?' শুভব্রত নিজের অজান্তেই বলে উঠেছে।

—'গণেশজী কী কিরপা মিল গয়া।'

চিত্ত প্রশান্তমুখে বলল, 'ঠাকুর দৃষ্টিভোগ করেন আগরওয়ালজী। আপনাকে আমি আজও বোঝাতে পারলুম না।'

—'আরে চিতজী। দৃষ্টিভোগ তো জরুর করেন। কিরপা কি লিয়ে কচৌড়ি, মিঠাই, খান ভি কভি কভি। দেখিয়ে লিন লাড্ডু সে, জিলাবি সে কুছু কুছু সেবা করিয়েসেন।'

শ্যেন দৃষ্টি মেলেও লাড্ডু বা জিলাবির মধ্যে কোনও বৈলক্ষণ্য দেখতে পেল না শুভব্রত। শিউরতনের মতে লাড্ডুর ওপর বড় বড় বাদামের টুকবো ছিল ন'টি তিনি স্পষ্ট দেখেছেন এখন আট টুকরো আছে।

ততক্ষণে শিউরতনের লোকটি ভেতর থেকে একটি থালা নিয়ে এসেছে। শিউরতন তার ওপর তুলে দিচ্ছেন কচুরি, লাড্ডু মতিচুর রাবড়ি।

চিত্ত অধৈর্য হয়ে বলল—'শিউরতনজী আপনাকে কতবার বলেছি প্রসাদ কণিকামাত্রই যথেষ্ট, কেন আপনি এইভাবে...'

হঠাৎ শিউরতন হুড়মুড়িয়ে চিত্তর পায়ে পড়ে গেলেন। গদগদ স্বরে বললেন—'বজরংবলীর কিরপা মিলল, গণেশজীর কিরপা মিলল চিতজী আপনার কিরপা মিলল না এখনও।'

—'করছেন কি করছেন কি ভাইয়া, ইস উঠুন।'

সত্যি-সত্যি সজল চোখে উঠে দাঁড়ালেন শিউরতন। —'বাস আপ নে মুঝে ভাই বোলা, তো কিরপা আধা মিলই গয়া।'

ভদ্রলোক নোকরের হাতে থালাটি তুলে দিয়ে যেমন এসেছিলেন তেমনিই ফিরে গেলেন।

শুভব্রত বলল—'কি ব্যাপার রে, চিও? এ যে দেখি রীতিমতো নাটক?'

চিত্ত নিশ্বাস ফেলে বলল—'উনিই আমার মনিব, তোরা যাকে বলিস বস্। নানারকম ইলেকট্রিক্যাল গ্যাজেটস-এর এজেন্সি, তা ছাড়াও কাপড়ের দোকান, উলের স্টকিস্ট। আমি ওঁর গ্যাজেটস্-এর দোকানে বসি।'

—'বসিস, ভালো করিস। তো আজকের নাটকের ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু খুলেই বল না

বাবা।'

অনিচ্ছুক স্বরে চিত্ত বলল—'তা হলে তো আবার গল্প বলতে হয়।'

—'বল বল, গল্পই বল, খুব দর বাড়াচ্ছিস চিতে !'

পুরনো নাম শুনে চিত্ত হেসে ফেলল বলল—'ব্যাপার কিছুই না। যা হয় আর কি ! লোকটা প্রতিদিন ক্যাশ মেলাবার সময়ে এসে ঝামেলা করত।'

—'এ বাঙালি বাবু সোব মালে পক্কা-ক্যাশ মেমো দিবে তো হমার খাতা মিলবে কি করে ? বুরবক কঁহাকা !' রোজ রোজ।

আমি হিসেবের কারচুপিতে রাজি নই। এদিকে আমার মতো ভালো অ্যাকাউন্টসও ওখানে কেউ জানে না, বিশ্বাসীও না সবাই। একদিন এসে কি করল জানিস ? দোকানের সামনের ঝাঁপ পড়ে গেছে, পেছন দিক দিয়ে বেরোচ্ছি দুজনে। শেয়ালের মতো হেসে বললে—'চিত্তরঞ্জনবাবু, কয়েদখানার ভেতরটা দেখিয়েছেন ?'

আমি বললুম, 'মানে ?'

—'মানে আপনি তো কুছু কুছু করে আমার বহুৎ রূপেয়া সরিয়েছেন, কয়েদঘর দেখতে হোবে না ? সোচুন, সোচে লিন খাতা ঠিক করবেন কি শ্বশুরাল যাবেন।'

আমি বললুম—'আজই আপনার চাকরি আমি ছেড়ে দিচ্ছি।'

—'আসানি কি বাত ক্যা বাবু ? লাখো রূপেয়া মারকে ভাগ যানা এত্না আসান ?' বলে লোকটা চোখ ছোট ছোট করে আমার দিকে চেয়ে রইল।

টলতে টলতে বাড়ি চলে এলুম। খেলুম না, দেলুম না। পর দিন জ্বর এসে গেল। অনেক রাতে দিদি মাথা ধুইয়ে দিতে দিতে বলছে শুনলুম· 'শিউরতনের গণেশ মূর্তিটা নিয়ে এসেছিস বেশ কবেছিস। হনুমানটাকেও আনলি না কেন ?' মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা তারই মধ্যে আমি উঠে বসেছি—'শিউরতনের গণেশ মূর্তি ? আমি আনব কেন ? কি যাতা বলছ ?'

সামনেই তাকের ওপর বসানো গণেশ ওই যে যেটিকে পুজো করে গেলেন শিউরতনজী। ওঁর গ্যাজেটের দোকানে ছিল গণেশ মূর্তি, আর কাপড়ের দোকানে হনুমানজী। গণেশটিকে দেখতে গিয়ে হনুমানজীকেও পেলুম। কৃষ্ণমূর্তিটির পেছনে লুকিয়ে ঝুকিয়ে বসে আছেন।

আমার যন্ত্রণা তো আরও বেড়ে গেল। সকালেই হয়ত চুরির দায়ে শিউরতন আমাকে অ্যারেস্ট করাবে। দিদি বলল—'মূর্তিদুটো তা হলে লুকিয়ে ফেলি।' আমি বললুম—'না, যেমন আছে, তেমন থাক।'

পরদিন বিকেল নাগাদ ঠিক একটা ঝড়ো কাকের মতো শিউরতন আমার বাড়ি পৌঁছলো।

—'চিত্তরঞ্জনবাবু হমার গণেশজী চোলে গেলো, ইনকম ট্যাকসের ধরপাকড় হচ্ছে বহুত্। ডাকু ক্লথ স্টোর্সমে আগ লগাকে ভাগ গিয়া। লেকেন দেওতা তারা লেয়নি। কেন লেবে ? মিট্টি কি মুরত, উসমে হ্যায় ক্যা, উন লোগোঁকে লিয়ে ?'

—আমি বললুম—'শিউরতনবাবু আপনার দুই মূর্তিই আমার ঘরে, বজরংবলীও। আমি কিন্তু নিয়ে আসিনি। ওই দেখুন।'

খুব হম্বি তম্বি করে মূর্তি নিয়ে চলে গেল। পরদিন আমার জ্বর আরও বেড়েছে, দিদি ভীষণ ব্যস্ত, ঘোরের মধ্যে শুনছি ডাক্তার বলছেন—'শক ফিভার মনে হচ্ছে, জ্বরটা ভালো ঠেকছে না। ডঃ ধরকে কনসাল্ট করুন।'...

এমন সময়ে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল শিউরতন। আমার অবস্থা দেখে চমকে গেল। খুব নরম সুরে দিদিকে বলছে শুনি—'বহেনজী আপ ঘাবড়াইয়ে মৎ ডাগদারবাবুকে হমি গাড়ি ভেজকে ডেকে আনছি। হমারা মূরত ফির কিসনে চোরি কিয়া। বহুত গলত হো গয়া মেরা। যে আদমী, দুসরা খাতা বনাতে হমার পসিনা ছুটিয়ে দিল সে চোরি করবে ?' বলতে বলতেই শিউরতন দিয়েছে এক দারুণ লাফ। লম্ফ যাকে বলে,

—'ওই তো হামার মূরত !' ঠিক যেখানে আগের দিন গণেশের মূর্তিটি ছিল সেখানে গোলাপি পেটের ওপর সাদা শুঁড়টি গুটিয়ে ভদ্রলোক বসে আছেন। কৃষ্ণমূর্তির পেছনে বীরবাহাদুর হনুমান এক হাতে গদা এক পা তুলে পাশ ফিরে দণ্ডায়মান। ফ্যাল ফ্যাল করে সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শিউরতন আমার দিদির পায়ে পড়ে গেল, তারপর আমার পায়ে।

সেই থেকে ও কারো সঙ্গেই খারাপ ব্যবহার করে না। মূর্তিদুটি আর নিয়ে যায়নি। ফি সপ্তাহে তিন দিন করে পুজো করে যায় এখানে। তা ছাড়া ডেইলি ভোগ পাঠায়। আমাকে রোজ ধরছে ওকে দীক্ষা দেবার জন্যে। কিছুতেই বোঝাতে পারি না আমি কিছুই জানি না। একজন সাধারণ মানুষ। ওর ধারণা আমি ছদ্মবেশী মহাপুরুষ-টুরুষ হবো।'

শুভব্রত হাসতে হাসতে বলল—'আমারও তো তাই ধারণা রে। শাস্ত্রের তেত্রিশ কোটি দেবতা নিজের থেকে যেচে তোর কাছে এসে পড়ছে। বিপদে টিপদে পড়লে একটু দেখিস বাবা।'

চিত্ত বলল—'ঠাট্টা করছিস ? ঠাট্টা করারই কথা। কেন যে এমন হয় আমি সত্যিই বুঝতে পারি না। কত পুণ্যবান মানুষ আছে জগতে। ছেলেবেলা থেকে মূর্তি দেখতে, গড়তে ভালোবাসতুম। এইটুকুই শুধু...'

ঘরের মধ্যে একটি মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন। চিত্তর মতো দশাসই নয়। হঠাৎ দেখলে চিত্তর থেকে বয়সে ছোট বলে মনে হয়। সাদা ধবধবে সবুজ পাড় একটা শাড়ি পরনে। চিত্ত বলল—'দিদি রে শুভ, আমার দিদি।' 'আমার দিদি' কথাগুলোর মধ্যে কি যেন ছিল। শুভ উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। মহিলার হাতে দুটো থালা, হাসিমুখে বললেন—'প্রসাদ খেয়ে নাও।'

শুভব্রত শিউরে উঠে বলল—'এইমাত্র অত খাওয়ালেন, আবার প্রসাদ ?'

'একজন সিদ্ধিদাতা গণেশ, আরেকজন ভক্তি এবং শক্তিদাতা শ্রীহনুমান। এঁদের প্রসাদে কখনও না করতে আছে!' দিদি দুজনের দিকে দুটো পাথরের থালা এগিয়ে ধরলেন। ভদ্রমহিলা ছোটখাটো হলে কি হবে, বেশ একটা ব্যক্তিত্ব আছে।

বাবা বললেন—'আমরা বুড়ো হয়েছি খোকা, আমাদের অবস্থাটার কথা একটু বিবেচনা করো।' গলা বেশ গম্ভীর। মা মাথায় কাপড় টেনে বললো—'কে এসে বলল বন্ধু, অমনি তুই চলে গেলি ! রাত দশটা বেজে গেল। আমরা কেউই এখনও কিছু মুখে দিইনি।'

বয়োবৃদ্ধ বাবা-মাদের ভালোবাসার এই একমাত্র প্রকাশ। প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের বাড়ি-ফেরা না-ফেরার সময় নিয়ে অযথা চিন্তা করা। তাঁদের দুশ্চিন্তা হবে বলে তুমি নিয়মমতো বাড়ি ফেরার রুটিন ভঙ্গ করতে পারবে না। রুটিন পালন করতে করতে তোমার জীবনের রস মূল থেকে শুকিয়ে গেলেও না।

রাত-আলোর সবুজ আলোয় বিছানার ওপর পাশ ফিরে কনুইয়ে ভর দিয়ে অনুশীলা বলল 'হ্যাঁ গো, দিল্লির চটি আর সালোয়ার-সেট এনেছো ?' ওপাশ ফিরতে ফিরতে শুভব্রত বলল—'হুঁ।' অনুশীলা সবুজ-আলোয় স্বপ্নের মৎস্যকন্যা।

—'আর কার্ডিগ্যান ? ওখানে তো ডিসকাউন্ট দেয়।'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ'—শুভব্রতর গলায় বিরক্তি।

—'রাগ করছো কেন বাবা ? ওখানে কত সস্তায় চমৎকার চমৎকার পাওয়া যায়। তোমারই খরচ কমাচ্ছি।'

খরচ কমানোর জন্য খরচ বাড়াবার এই এক চিরকালীন ধান্দা এদের। শুভব্রত বলল—'চাবিও জানো। সুটকেসের সঠিক অবস্থানও জানো। আমাকে একটু ঘুমোতে দিলে হত না ? দুটো বড়ি গিলেছি।'

অনুশীলা সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে গেল। বাঁচা গেল। চিত্তটা কি গাঁজা খায়, না সোজাসুজি লোক ঠকায় ? কৃষ্ণনগরের বাজার থেকে পছন্দসই কৃষ্ণমূর্তিটা নির্ঘাত হাত সাফাই করেছিল যদি না পুরো গল্পটাই গাঁজা হয়। হনুমান আর গণেশের মূর্তিদুটো সেও শিউরতনকে জব্দ করবার জন্যে নিজের বশংবদ কাউকে দিয়ে সরিয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহই অবশ্য নেই। করেছে বেশ করেছে। এন্ডস অলওয়েজ শুড জাস্টিফাই মীন্‌স্। শিউরতন লোকটা তো চিরকালের মতো জব্দ হয়ে গেছে ! ব্যস। কিন্তু গল্পের পেছনের আসল গল্পটা বন্ধুর কাছে চেপে যাওয়াটা কি উচিত হল চিত্তেটার ? তা ছাড়া ওই সব গঙ্গা-ফঙ্গা। সেইজন্যেই সন্দেহ হয় চিত্তটা হয় গেঁজেল নয় গুলবাজ। চেহারাটা বেশ সৌম্য-সৌম্য বাগিয়েছে কিন্তু। যেন খুউব শান্তিতে আছে ঘর ভর্তি ওই সব পুতুল-ফুতুল নিয়ে।

'দারুণ হয়েছে গো শালটা। সেমি পশমিনা, না আসল ?' ও ঘর থেকে অনুশীলার গান গান গলার আদুরে চিৎকার ভেসে এলো।

চিত্তর দিদির ব্যাপারটা কিন্তু হেভি গোলমেলে। নিজের দিদি নয়, মাসতুতো। চোরে চোরে মাসতুতো একেবারে। নিঃসন্তান, বালবিধবা। এই সব মহিলারা সাঙ্ঘাতিক হয়। সেক্স-স্টার্ভড্ হিস্টিরিক। চিত্তেটাকে হিপনটাইজ করে রেখেছে কিনা কে জানে ? পয়সাকড়ি আছে মহিলার। খালি আপনজন কেউ নেই। চিত্তই একমাত্র আপন। মহিলা যদি ঘোরে ডালে ডালে তো চিত্তে ঘোরে পাতায় পাতায়। দুজনের মধ্যে রিলেশন ফিলেশন...ওষুধ ঘুমের ঘোর নামছে। একটা ফিনফিনে পাতলা মসলিন কেউ তার চেতনার ওপর টুপ করে ফেলে দিল। তলিয়ে যাচ্ছে এবার। কবোষ্ণ একটা সমুদ্রের মধ্যে মিছরির দানার মতো গলে যাচ্ছে যে সে কি সত্যিই কেউ ? কোথাও যাচ্ছিল ? তারপর যেতে যেতে...আদৌ কি সে আর কোথাও যেতে পারবে ? কে যেন সুখী সুখী মাজা-মাজা চর্চিত গলায় বলে উঠল—'তুমি ছিলে কর্মবীর। আজকের এই দিনটিতে গত বছর মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলে। তোমায় আমরা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে স্মরণ করি বাবাই, মোনালিসা, অনুশীলা বাবা ও মা।' চমকে খানিকটা ভেসে উঠল সে। মোনালিসার গলা না ? সে তা হলে মরে গেছে ? সত্যিই তা হলে...বাবা মা সবাই তার শ্রাদ্ধ করছে ? কথাটা শ্রাদ্ধ না শ্রদ্ধা ? কাকে ? কারা ? আপাদমস্তক ঘেমে পুরোপুরি জেগে উঠল সে। ঢং ঢং করে কোথাও রাত দুটো বাজল। খলবলে পায়ে খাট থেকে হুমড়ি খেয়ে নামল, টেবিলে রাখা বোতল থেকে ঢকঢক করে জল খেয়ে নিল। পুরো আধ বোতল খেয়ে থামল। বুকের মধ্যে জল আটকেছে। ব্যথা। আস্তে আস্তে সেটা নেমে গেল। জানলার ধারে গিয়ে ঠোঁটে একটা সিগারেট গুঁজে দিল। ধরাল না। আকাশটা ঝকমকে কালো। কালীপুজোর রাতে টুনি বালবের মতো তারাগুলো জ্বলছে, নিবছে। সে স্পষ্ট দেখতে পেল তার আকাশে তমিস্রা, তবু

জীবনের ঘুড়িখানা মাঝ আকাশ বরাবর টানটান হয়ে উড়ছে। এখান থেকে বেশ লাগছে। সে, একমাত্র সে-ই জানে বড্ড টান। যে কোনও মুহূর্তে ভো কাট্টা হয়ে যেতে পারে। তা যাক। কিন্তু তারপর ? হঠাৎ সে টের পেল দিকচিহ্নহীন মহাকাশের মধ্যে এক ফোঁটা বস্তুবিন্দু তার ওই ঘুড়িখানা গোঁত্তা খাচ্ছে। তার বড্ড বিপদ এবং সে চিত্তর সঙ্গে তার আকাশ বদল করতে চায়। এখন, দমবন্ধকরা গ্রীষ্মের নিদ্রাহীন মাঝরাতে তন্ন তন্ন করে আকাশময় সে আসলে খুঁজছে কোনও মিষ্টিমুখের রাখাল পুতুল, যার বাঁশির আওয়াজে ভয় ভোলা যায়, কিংবা কোনও গৌরকান্তি যোগিনী মূর্তি যে তার বহতা জটাভার মেলে তাকে চমকে দিয়ে বলে উঠবে—'উধর মৎ-যাও বেটা, ম্যায় য়হাঁ হুঁ।'

কেয়ামত

পিউ এসে জিজ্ঞেস করে গেল —'কাকিমণি তুমি বিকেলে কখন বাড়ি ফিরছ ?' তখন সবে প্রথম গ্রাস ভাত মুখে তুলেছি। আমার সিসটেমটা একটু অদ্ভুত। আগে খাওয়া, পরে চান। রান্না-টান্না সেরে ছেলেকে স্কুলের ভাত দিয়ে, ছেলের বাবাকে অফিসের ভাত দিয়ে, নিজে খেয়ে নিই, তারপরে রান্নাঘর, যাকে বলে হেঁশেল, তুলে গুছিয়ে আর যেখানে যা বাকি আছে করে, তবে চানে ঢুকি। হপ্তায় দু দিন অর্থাৎ শনি-রবিবার ছাড়া চুল ভিজোই না, যেমন বেণী তেমনি থাকে। ভালো করে মাথা ছাড়া স্নান, তারপর একেবারে তৈরি হয়ে বেরোই। স্বাস্থ্যসম্মত নয় জানি, কিন্তু এ ছাড়া আমার উপায়ও নেই। সকালের খাওয়ার চেয়েও সকালের চানটা আমার কাছে জরুরি বেশি। পিউকে বললুম—'পাঁচটার মধ্যে। কেন ?'

পিউ বলল—'মা জিগগেস করেছিল। আচ্ছা আমার স্কুলের দেরি হয়ে যাবে, যাই কাকিমণি।' পিউ একছুট্টে চলে গেল।

পিউ আমার প্রতিবেশীর মেয়ে। দু চারটে বাড়ি পরে থাকে। পিউয়ের বাবা মস্ত অ্যাডভোকেট। চারতলা বাড়ি। আধুনিক কেতার যৌথ পরিবার। পিউয়ের ঠাকুর্দা-ঠাকুমা, বাবা-মা থাকেন প্রথম দু তলায়। ওপর দিকে তার দুই কাকা কাকিমা। ভিন্ন হাঁড়ি। কিন্তু একই বাড়িতে বাস। বাবা মা থাকতেই পিউয়ের বাবা সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ফলে যৌথ পরিবার জনিত অশান্তি ওদের বাড়িতে খুব কম। বরং পিউ কাকা-কাকিদের কাছ থেকে যথেষ্ট স্নেহ ভালোবাসা পায়। আসলে পিউ বলতে গেলে ওদের বাড়ির একমাত্র মেয়ে। ওর এক কাকা এখনও নিঃসন্তান, অন্য কাকার দুই ছেলে, পিউয়ের নিজের দিদিও বেশ বড়। ওর থেকে চোদ্দ পনের বছরের বড়, তার বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন। তার মেয়ে তো বলতে গেলে পিউয়ের ভক্ত শিষ্যা গোছের। কাজেই পিউ খুব আহ্লাদি। পিউয়ের ফ্রক ড্রেস ইত্যাদি হয় ডজন হিসেবে। জন্মদিনের উপহারে একটা পুরো শোকেস ভরে গেছে। পুজোর সময় পিউ এত রকমের জামা কাপড় পায় যে ইচ্ছে করলে বোধহয় ঘন্টায় ঘন্টায় বেশবদল করতে পারে। মেয়েটাকে দেখতেও বেশ সুন্দর। ফর্সা। গোল বাচ্চা-বাচ্চা মুখ। আধুনিক ফ্যাশনে বয়-কাট করা চুল। বড় বড় চোখ। ফুলো ফুলো ঠোঁট। দেখলেই ভালো লাগে। পিউ অজস্র কথা বলে। নেচে নেচে চলে। চলার মধ্যে ভারী সুন্দর একটা ছন্দ আছে। আধা-খেলোয়াড়ি, আধা-নাচিয়ে ছন্দ। নাচ শেখে বলে নয়, এমনিতেই মেয়েটার এমনি চটপটে ছন্দোময় চলাফেরা। অনেক সময়ে পিউ যখন রাস্তা দিয়ে নাচের স্কুলে, কি যোগের স্কুলে, কি আঁকার স্কুলে যায়, আমি জানলায় চোখ পেতে রাখি। রাস্তাময় খানা-খোঁদল। এখানে একটা ইঁট, ওখানে

একটা আধলা। বর্ষার জল ছোট ছোট গর্তে ভরে আছে। পিউ ছোট্ট একটা ফড়িং-এর মতো লাফ দিয়ে একটা গর্ত পার হল, আরেকটা, আরেকটা, কাহারবা কিংবা ঝাঁপতালের ছন্দে। আমার স্বামী তিলক বলে—'কী ব্যাপার ? তুমি এতক্ষণ ধরে জানলায় দাঁড়িয়ে কী দেখছ বলো তো ? ভালুক-নাচ বা বাঁদর খেলার ডুগডুগি শুনিনি তো ?'

আমি ওর ইয়ার্কি অগ্রাহ্য করে বলি—'দেখবে এসো না, পিউ কী সুন্দর যাচ্ছে।'

তিলকবাবুর মুখ হাঁ হয়ে যায়। —'পিউ কি সুন্দর যাচ্ছে ? নাঃ মাথাটা একেবারেই খারাপ দেখছি।'

তা কী করব, আমার সৌন্দর্য বড় ভালো লাগে। কথার সৌন্দর্য, চলার সৌন্দর্য। আমাদের বাড়ির কোণের জানলায় দাঁড়ালে ট্রাম-রাস্তা দেখা যায়। আমি ট্রামের ছন্দও দেখি। ট্রাম, বাস, গাড়ি যখন নিজস্ব চালে চলবার সুযোগ পায়, তখন আমি যদি বাড়ি থাকি তো অবকাশ করে নিই দেখব বলে। যা কিছু গতিময়, আনন্দময়, প্রাণময় তা-ই আমার ভালো লাগে। আর সে হিসেবে, একটা চোদ্দ বছরের ফুটফুটে মেয়ে যে নাকি পৃথিবীতে এসে থেকে অনাদর, অভাব, অপ্রাপ্তি কাকে বলে জানেনি, যার জীবনের ছন্দ চলার ছন্দের সঙ্গে হুবহু মিশে গেছে তার টুকটুকে পায়ে প্রজাপতির মতো গোষ্পদ পেরোনো যে আমার দারুণ ভালো লাগবে এ তো জানা কথাই।

পিউ অবশ্য একটু পাকা। অনুমান হয় ওর মা কাকিমা-ঠাকুমারা ওর সামনেই সব কথা বলেন। তাই পিউ কিছুটা ওর ঠাকুমার মতো, কিছুটা ওর মার মতো, কিছুটা ওর কাকিদের মতো, এমনকি ওর বাবা কাকা ঠাকুর্দাদার মতোও কথা শিখেছে। কিন্তু ও বোকা নয়। আর ওর পাকামিটাও একরকম নতুন স্বাদের ছেলেমানুষি। যেমন, ও আমাদের বাড়িতে ঢুকেই হয়ত বলবে—'ও কাকিমণিগো। আজকে কি সব্বোনাশ হয়েছে শোনো একবার।' কিংবা বলবে, 'যার ভালো তার সব কি ভালো হতে হয় কাকিমণি ! আমাদের নতুন টিচার সঙ্ঘমিত্রাদি ! যেমনি দেখতে, তেমনি পড়ান, তেমনি গান করেন, তেমনি সুন্দর আচার-ব্যবহার। কি নম্র।' পিউ যে সব সময়েই এই রকম বড়দের ভঙ্গিতে কথা বলে তা নয়। তবে মাঝে মাঝেই তার কথাবার্তায় এই সব আর্ষ প্রয়োগ ঢুকে পড়ে।

বিকেলে আমি বাড়ি ফেরার একটু পরেই পিউয়ের মা মিসেস সরকার এসে ঢুকলেন। মুখ পান-জর্দায় ভর্তি। সেসব সামলাতে সামলাতে বললেন, 'আজ শুককুরবার, আজ আর ছাড়ছি না। কাল ছুটি, পরশু ছুটি। তরশুও হয়ত বিদ্যাসাগরের জন্যে ছুটি হয়ে যেতে পারে। মৃত্যুর শতবর্ষ পূর্ণ হল, না ?'

আমি হেসে বললুম : 'ছাড়ছেন না কেন সেটাই বলুন আগে ?'

'আজ সারা রাতের প্রোগ্রাম। সাত-সাতখানা ক্যাসেট এসেছে। পরপর চলবে। পান সিগারেট চা কফি স্ন্যাকস সব আমার। আপনাদের খালি কমপ্যানি দিতে হবে। কর্তা না যান, গিন্নিকে যেতেই হবে।'

ওরে বাবা ! সারাদিন ধরে গাধার খাটুনি, খাতা দেখতে হয় পাহাড় প্রমাণ। প্রতিদিন . যে কটা পয়সা রোজগার করি আমার মালিকরা তার প্রতিটি উশুল করে নেন। রাত্রে বিছানায় পড়ি আর ঘুমসাগরে তলিয়ে যাই। কে কী কেন কবে কোথায় কিছু খেয়াল থাকে না। যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে তুমি কী সবচেয়ে ভালোবাসো ? আমি নির্দ্বিধায় বলব ঘুম। কিন্তু অ্যাডভোকেট গিন্নি নতুন ভিসিপি কিনেছেন। টিভি একটা পাল্টে আরেকটা এনেছেন, তার রং নাকি চোখ জুড়িয়ে দ্যায়। প্রতিবেশীরাই যদি না দেখল, বাছা-বাছা প্রতিবেশী অবশ্য, তবে আর এসবের দাম কি ? ওঁদের বাড়ি থেকে

অষ্টপ্রহরই ভেসে আসে হরেক কিসিমের গান বাজনা, স্টিরিয়োয় উদ্দাম। প্রথম প্রথম খুব ভালো লাগত, আমার ছেলে কিচলু তো সেঁটে থাকত আগে আগে। '—মা, আমাদেরও একটা স্টিরিয়ো কেনো না!'

কিচলুর বাবা বলত, 'হ্যাঁ ভূতের ভয়ে চড়লেম গাছে, ভূত বলে তোরে পেলেম কাছে। দূরে দূরেই অস্থির হয়ে যাচ্ছি। এবার তুই ঘরের মধ্যে গানের বন্যা বইয়ে দে।'

আমি বলি—'তুই স্কুল পেরিয়ে কলেজে ওঠ, দোব।'

কিচলুর মুখ কাঁচুমাচু হয়ে যায়। তার স্কুল পেরোতে এখনও অনেক দেরি। কিচলু মিউজিক সিসটেমের বদলে দাবা-বোর্ড পায়, খুব শৌখিন। খেলতে খেলতে বাপ-ছেলের হুঁশ থাকে না। জানলা-পথে গাঁক গাঁক করে কিছু নকল কিশোরকুমার ভেসে আসে। ভালো জিনিস ভালো। কিন্তু কম কম। মাত্রা বেশি হয়ে গেলে খুব ভালো জিনিসের বেলাও যেন মনে হয় ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

কিন্তু মিসেস সরকার ভিসিপি উদ্বোধন করবেন, না গেলে রাগ করবেন। মিসেস সরকারের আর কি! ধনী বাপের একমাত্র মেয়ে। শরৎচন্দ্রের ভাষায় এক পুঁটলি টাকা নিয়ে শ্বশুরঘরে এসেছেন। এখন তো বোধহয় বাবা-মা গত। সবই ওঁর। জীবনে কোনদিন কুটো ভেঙে দুখানা করতে হয়নি। এখনও ওঁর বাপের বাড়ির বুড়ি আয়ি ওঁকে দুধ নিয়ে সাধাসাধি করে। উনি বারান্দায় বসে বসে রাস্তা দেখেন, একটা খুদে ছেলে ওঁর পা টিপে দেয়। বুড়ি আয়ি দুধ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই দুধের রং ওঁর গা থেকে ফেটে পড়ে। ক্রমশই এতো মোটা হয়ে পড়ছেন যে ভয় হয় হার্টের ব্যামো-ট্যামো না ধরে। আমাকে বলেন—'পিউদের যোগ-স্কুলে ভর্তি হবো? নাকি বলুন তো!' আমার ইচ্ছে হয় বলি—'তার আগে একটু নড়ে বসুন দিদি।' টাকা আছে বলে আমার নড়া-চড়াগুলোও অন্য লোকে করে দেবে এ কেমন কথা! তা হলে জীবনটাও অন্য কেউ বেঁচে দিলে হয়!

উদ্বোধন বেশ জমজমাটিই হল। ওদের বাড়ির সবাই তো আছে, মায় পুঁচকে পা-টেপার ছেলে, খুদে ফরমাসের মেয়ে পর্যন্ত। কুটুম্বরাও আছেন। পিউয়ের দিদি, তার একরত্তি মেয়ে, শাশুড়ি, পাড়ার কেউ কেউ, ওঁদের কাছে-পিঠের আত্মীয়স্বজন। পিউয়ের কাকিমা সকলকে কফি আর ডালমুট পরিবেশন করল। কিন্তু আমার আবার এত লোকজন সহ্য হয় না। অসোয়াস্তি লাগতে থাকে। প্রথম ছবিটি দেখেই তো আমার চক্ষু চড়ক গাছ। পিউ পাশেই বসেছিল, দেখলুম 'মুগ্ধ নয়ান, পেতে আছি কান' গোছের অবস্থা। একবার আমার হাতটা টিপে বলল, 'কাকিমণি কী সুন্দর না?' দুটোর পরে আমি আস্তে আস্তে উঠে এলুম। মিসেস সরকার একবার গাল কাত করে বললেন, 'ও কী! চললেন যে!' মৃদুস্বরে বললুম—'বড্ড ঘুম পেয়েছে, আর থাকতে পারছি না।'

আমরা মানে আমি, আমার স্বামী তিলক একটু সেকেলে। সব কিছু আমরা কিচলুকে সঙ্গে নিয়ে বসে দেখতে পারি না। সব কিছু কিচলু দেখুক, শুনুক সেটাও চাই না। এ ব্যাপারে আমার স্বামীর, আমার, আমাদের নিকটজনদের সম্পূর্ণ ঐকমত্য আছে। সেহেতু আমাদের দেখা শোনাগুলোও খানিকটা কিচলুর স্ট্যান্ডার্ডের হয়ে গেছে। কিন্তু মিসেস সরকার করেছেন কি? অতগুলি অত বয়সের লোক জড়ো করে কী দেখাচ্ছেন? নিজের না হয় করবার কিছু নেই। তাই বলে...। আমাকে আবার আশ্বাস দিয়েছিলেন, যত রাত হবে ততই নাকি এ-মার্কা ছবি দেখাবেন।

আমি আর যাই না। কিন্তু প্রতি শনিবার পিউদের বাড়ি ভিডিও ক্যাসেট চলতে থাকে। তার বাইরেও দেখি পিউয়ের মা গাড়ি নিয়ে মেয়ে নিয়ে সিনেমা যাচ্ছেন।

'কোথায় যাচ্ছেন অঞ্জলিদি ?'

'দূর আপনাকে বলবো কেন ?' অঞ্জলিদি ঠোঁট ফোলান। তার পরেই হেসে বলেন, 'ববি এসেছে, দেখে আসি।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বল্লি, 'এই যে সেদিন বাড়ি বসে দেখলেন ?'

'হলে বসে বড় পর্দায় দেখার মজা আলাদা, আপনি বুঝবেন না।'

পিউ কানের রিং দুলিয়ে বলে—'হ্যাঁ কাকিমণি, মা ববি কোথাও এলে দেখবেই, সে যেখানেই হোক, যতদূরেই হোক, যত অখাদ্য হলেই হোক।'

মিসেস সরকার ধরাপড়া মুখে হেসে বললেন—'এই কিশোর-প্রেমের ছবিগুলো দেখতে আমার দুর্দান্ত লাগে জানেন মিসেস মিত্র। একটাও বাদ দিই না, ববি, জুলি. এক দুজেকে লিয়ে, চাঁদনি, কেয়ামত সে কেয়ামত তক...।'

পিউ বলল—'ববি মা কতবার দেখেছো যেন ? ছত্রিশ বার না ? আর কিউ এস কিউ টি পনের বার। প্রত্যেকবার চারটে করে রুমাল ভেজাবে মা, জানো কাকিমণি !'

'হ্যাঁ, তোকে বলেছে।' মিসেস সরকার লজ্জা পেয়ে যান। তারপরেই গাড়িখানা হুশ করে চলে যায়।

মায়ের এই অত্যধিক সিনেমা-প্রীতির জন্য প্রায়ই পিউয়ের নাচের ক্লাস, যোগ-ব্যায়ামের ক্লাস কামাই হয়ে যায়। অথচ মেয়েটার মধ্যে সত্যি ক্ষমতা আছে। যোগনিদ্রা, উত্থিত পদ্মাসন, আকর্ণ ধনুরাসন সব শক্ত শক্ত আসন এত সুন্দর করে যে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। আর নাচ তো ওর স্বভাবের অঙ্গ। সরকার বাড়ির প্রধান ব্যক্তি মনে হয় মিসেস সরকার। তাঁকে কেন্দ্র করেই সংসারখানা ঘোরে। তাঁর সিনেমা দেখার ইচ্ছে হলে, একলা-একলা যেতে ভালো লাগে না বলে বেশির ভাগই পিউকে এমনি সঙ্গী হতে হয়। পিউ নিজেও অবশ্য কম যায় না। তার স্কুল, যোগ-স্কুল, নাচ-স্কুল মিলিয়ে অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে, তাদের জুটিয়ে নিয়ে ও-ও প্রায়ই দেখি সিনেমা দেখতে কি অন্য কিছু হুজুগে চলেছে। পিউয়ের প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী হয় গৌতম নয় টুলটুল। প্রথমটি যোগ-স্কুলের, দ্বিতীয়টি পড়ার স্কুলের। এ ছাড়াও অন্যেরা থাকে। কিন্তু এ-দুজন ওর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। দুজনেই পিউয়ের থেকে বয়সে বড়, কিন্তু ভীষণ বন্ধু।

একদিন হাসতে হাসতে গল্পচ্ছলে মিসেস সরকারকে বলেছিলুম, 'আচ্ছা মিসেস সরকার, ছেলেমেয়েদের নিয়ে, এমন কি পুঁচকে বা বড় কাজের লোক নিয়ে সবরকম ফিল্ম দেখতে আপনার অসোয়াস্তি হয় না ?'

মিসেস সরকার মুখ টিপে হেসে বলেন, 'কী ভাবেন কি ওদের ? অ্যাঁ ? আপনার আমার চেয়ে ওস্তাদ ওরা, বুঝলেন ?'

'পিউকে নিয়ে অত ফিল্ম আপনি না দেখলে পারেন, মিসেস সরকার, ওর পড়াশোনার ক্ষতি হয়।'

'আহা-হা-হা, ও নিজে যেন দেখে না, রাজ্যির বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে রাতদিন দেখছে, আমার সঙ্গে দেখলেই যত দোষ !' পিউয়ের মা তাঁর লিপস্টিক মাখা ঠোঁট দুখানা অভ্যাসমতো ফোলান।

আমি সুযোগ পেয়ে যাই—'আচ্ছা অঞ্জলিদি, এই যে ও এত বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মেশে, এখান-ওখান ইচ্ছেমতো যায়, এতে আপনার কোনও ভয় হয় না ? আপনি এগুলো হতে দ্যান ? একটু রেসট্রিকশন...।'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উনি বলেন—'আপনি কোথায় আছেন মিসেস মিত্র,

মানে কোন যুগে ?'

আমি কিছু বলি না। উনিই বলেন আবার 'আপনি বোধহয় গত শতাব্দীতে পড়ে আছেন ভাই, কিছু মনে করবেন না। এখন ফ্রি মিক্সিং-এর যুগ। তা ছাড়া ওদের স্বাধীনতা দিতে হবে। স্বাধীনতা না দিয়ে ঘরের কোণে পুতুপুতু করে রেখে, দাবা খেলে আর ট্যাঁকে করে মিউজিয়াম-টিয়াম দেখিয়ে ছেলে মানুষ করবেন ভেবেছেন ? পিউয়ের বাবা কি বলেন জানেন ? 'মেয়ে যা চায় দাও, যা চায় দাও। ভগবানের ইচ্ছেয় অভাব তো কিছু নেই।' আসলে কি জানেন, অঙ্ক ইংরিজির দিদিমণিরা বড্ড কড়া হয়।' বলে হেসে ফেললেন মিসেস সরকার।

আমার কথার জবাব দেওয়া হল, আমাকে বেশ করে যাকে বলে 'ঠোকা' হল, আমি ছেলে মানুষ করতে পারবো না এই মর্মে সতর্কীকরণ করা হল, নিজেদের ঐশ্বর্য এবং আধুনিকতার ফিরিস্তি হল, কাজেই শেষ পর্যন্ত মিসেস সরকার আপাদমস্তক সন্তুষ্ট হয়েই বিদায় নিলেন।

মমতা, আসক্তি এসব ভালো জিনিস নয়। বিশেষত যে আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে তার ওপর। কিন্তু আমি যে পিউকে, পিউদের ছন্দকে কখন নিজের অজান্তে ভালবেসে ফেলেছি ! তিলককে দেখো কী সুন্দর নিজের ঘরের জানলার ধারে বসে একমনে সিগারেট টেনে যাচ্ছে। নিজের ছেলেটি আর বউটি ছাড়া বিশ্বসংসার চেনে না। —'কে রে ? পিউ ? কে পিউ ? অ ! পি-উ ! তাই বল ! শাড়ি পরে তোকে যে চেনাই যাচ্ছে না।' এই হল তিলক, সরকারি আপিসের অফসর।

'রে রে ? পিউ এলি নাকি ? বাঃ বাঃ কী সুন্দর শাড়ি পরেছিস ! রোজ রোজ তাই বলে পরিস না। তুই যেমন ছোট্ট আছিস, ছোট্ট থাক !'

'বারে কাকিমণি আমি বুঝি চিরকালই ছোট্ট থাকব ? জানো আমার ষোল বছর বয়স হল !'

'তাই বুঝি ? ষো—লো ? বলিস কি ? এ যে বুড়ি দিদিমা হয়ে গেলি ? ষো—লো ?'—এই হল তিলকের বউ, মানে আমি, মানে অঙ্ক ইংরিজির দিদিমণি।

আমি আসক্ত, আমার মমত্ববোধ এসেছে পিউয়ের সম্পর্কে তাই আমার মাথার ভেতরে কে বসে বসে সাইরেন বাজায়। আমি চকিত হয়ে শুনি। ওই পিউ যাচ্ছে, সঙ্গে টুলটুল, সঙ্গে গৌতম।

বাদল শেষের এক অপরাহুবেলায় পিউয়ের মা মিসেস অঞ্জলি সরকার এসে আমার বসার ঘরের চৌকিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গলগল করে ঘাম বেরোচ্ছে। পাউডার ফুটে উঠেছে। চোখে আতঙ্ক।

আমি বললুম, 'কি হল ? কি হয়েছে ? একটু শরবৎ করে আনি।'

—'শরবৎ-টরবৎ থাক, মিসেস মিত্র, সর্বনাশ হয়েছে। আপনিই ভরসা।'

বিপদে শ্রীমধুসূদন শরণ জানি। আমি কিভাবে মিসেস সরকারের বিপদবারণ বিপত্তারণ হতে পারি বুঝলুম না।

'পিউ ওর ছোট কাকিমাকে কী বলেছে জানেন ?'

—'কী ?'

—'ও নাকি গৌতমকে ভালো ওঃ ভালোবাসে, বিয়ে করবে, উঃ বাবারি।'

—আমি বললুম, 'ছেলেমানুষ বলছে, বলতে দিন না।'

'না না। ও বলছে ও ছেলেমানুষ নয়। ওর সঙ্গে গৌতমের এক্ষুনি বিয়ে দিতে

হবে।'

'সে কি ? ওর তো এখনো আঠার হয়নি ?'

'আরে ওর দিদির তো পনেরয় বিয়ে দিয়েছিল ওর বাবা। ও বলছে ওসব আইন আছে আইন থাক, ওর সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গৌতমের বিয়ে দিতে হবে। নমিতা, আমি আঠারয় কেন ষোলতেও বিয়ে দিতে রাজি আছি, সে আমরা নিজে দেখে শুনে পছন্দ হলেই দেবো। তাই বলে গৌতম ?'

গৌতম ছেলেটি পিউদের যোগ স্কুলের বন্ধু। ওর চেয়ে বড়। কুড়ি একুশ হবে। কি পড়াশুনো করে জানি না। চাকরি-বাকরির স্তরে এখনও ওঠেনি যদ্দূর জানি। খুব সুদেহী। যোগব্যায়াম যারা করে, তারা জামা না খুললে তো দেখা যায় না তারা এত সুন্দর! আমি একবার গৌতমকে টিভি-তে দেখেছিলুম। অল বেঙ্গল যোগকুমার হয়েছিল। কিছু যোগাসনও করে দেখিয়েছিল। ভিকট্রিস্ট্যান্ডের ওপর যখন দাঁড়িয়েছিল তখন মনে হচ্ছিল কোনও গ্রীক ভাস্কর্য প্রাণ পেয়েছে। সেবারও তিলককে ডেকেছিলুম—'দেখে যাও, দেখে যাও কী সুন্দর।' মহা অনিচ্ছায় দাবা-বোর্ড ছেড়ে উঠে এসে তিলক একটু দেখল তারপর বলল, 'তুমি রেগ পার্ককে দেখেছো ?'

'কে সে ?'

'এক সময়ের মিঃ ইউনিভার্স। কোন বছর মনে করতে পারছি না।'

'আমি কি করে দেখব ?'

'তার কাছে দাঁড়াতে পারে না।'

এই সব লোকের সঙ্গে কথা চলে ? মোট কথা গৌতম একটি কালো অ্যাপলো। পিউ এখন একটা ষোল বছরের প্রাণবন্ত সুন্দর মেয়ে। পিউয়ের দোষ নেই।

মিসেস সরকার বললেন, 'কিছু বলুন মিসেস মিত্র ? কিছু তো বলুন ?' অসতর্ক মুহূর্তে উনি আমাকে নাম ধরে তুমি করে ডেকে ফেলেছিলেন। এখন আবার ফর্ম্যালিটির খোলসে ঢুকে পড়েছেন।

বললুম, 'গৌতম কী বলছে ? তার বাড়ির লোক ?'

'গৌতম কী বলছে তার বাড়ির লোক কী বলতে পারে এসব অবান্তর কথা আমি ভাবছি নাকি ? গৌতম তো একটা রাস্তার ছেলে। ওর বাবা কি করে জানি না। ছোটখাটো কিছু বোধহয়। আমাদের কত বড় বংশ বলুন তো। এসব কথা চিন্তা করা যায় ?'

'আমি জানতে চাইছিলুম গৌতমও কি পিউকে বিয়ে করতে এতটাই আগ্রহী ? ওর বাড়ির লোকে কিভাবে জিনিসটা নিতে পারেন ?'

'ওই ছোঁড়াই তো যোগের নাম করে ছেলেমানুষ মেয়েটাকে ভুলিয়েছে। ওরই তো দোষ। কি সব কম্পুটার-টার শেখে। এক কড়ার মুরোদ নেই। শিববাবুদের একতলায় ভাড়া থাকে। ও-ই তো যত নষ্টের গোড়া।'

গৌতমকে যতবার দেখেছি আমার ওকে খুব ভদ্র, সরল এবং সহজ মনে হয়েছে। মিসেস সরকার বললেন—'পিউকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো। খুব কাকিমণি কাকিমণি করে। আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন মিসেস মিত্র! প্লী-জ।'

মিসেস সরকার চলে গেলেন।

পিউ এল। শনিবার দুপুরবেলায়। আমি চুল শ্যাম্পু করে পাখার তলায় শুকোচ্ছিলুম। বেল বাজল। খুলে দেখি পিউ। সবুজ রঙের একটা চুড়িদার পরা পিউ। কিন্তু পিউয়ের মুখে হাসি নেই। চোখ দুটো ভারাক্রান্ত। মুখে একটা বিস্ময়ের

ভাব। বললুম—'পিউ আয়।'

পিউ ঢুকতে ঢুকতে বলল—'মা তোমাকে সব বলেছে কাকিমণি, না ?'

'হ্যাঁ।'

'তুমিও কি আমাকে বকবে ? মারবে ?'

'কি বলছিস পিউ ?'

পিউ তার কামিজটা তুলে পিঠ দেখাল। একটা কালশিটে দাগ মেরুদণ্ড বরাবর। কোমরের ওপরের খানিকটা অংশ ফুলে উঠেছে। আমি শিউরে বললুম, 'একি ?'

পিউ বললে, 'কাকিমা জুতো দিয়ে পিটিয়েছে, আমি নাকি বংশের মুখে চুন কালি লেপেছি। আর মা একটা স্টীলের জলসুদ্ধ ঘটি ছুঁড়ে মেরেছিল। মুখে কিছু বলেনি।

আমি তাড়াতাড়ি ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে ওষুধ বার করছি, পিউ বলল,—'কাকিমণি, ওষুধ দিয়ে আমার মনের কালশিটে সারাতে পারবে ? আমার মনের ইনফ্ল্যামেশন, ব্যথা কমাতে পারবে ?'

পিউ বরাবরই পাকা-পাকা কথা কয়। আজ আমি অবাক হয়ে গেলুম। শুধু কথা নয়, কথার ধরনে। পিউ বলল—'কাকিমণি, আসলে ওষুধ দিয়ে তুমি তোমার মনের ঘাটা সারাতে চাইছ। আমারটা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা নেই।'

বললুম, 'পিউ, কী বলছিস, ভালো করে বল আমি বুঝতে পারছি না।'

'কাকিমণি, সবাই আমাকে ভালোবাসছে এই ধারণাটাকে ভালোবাসে। ওষুধ দিলে ভালোবাসার সেই ধারণাটা তোমাদের শান্ত হবে। নিজেকে তোমরা বোঝাবে পিউয়ের পিঠে ব্যথা করছিল, আমি তো ওষুধ দিয়েছি। আমি তো আমার কর্তব্য করেছি। আচ্ছা কাকিমণি, মা কেন গৌতমের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চাইছে না ?'

পিউ আমার মুখের দিকে বড় বড় চোখ মেলে চাইল। চোখে না-বোঝার বিপুল বিস্ময়।

'কেন বলো তো ? আমি ভেবেছিলুম মা-ই আগে অ্যাপ্রুভ করবে, কাকিমারা ঠাকুমা তারপরে। সবশেষে বাবা আর দাদু।'

'তুই কেন এমন ভেবেছিলি পিউ ?'

'মানুষের হাব-ভাব পছন্দ-অপছন্দ দেখে একটা ধারণা হয় না ? এতদিন ধরে আমি আমার বাড়ির লোকদের একটুও বুঝতে পারিনি, এটা কি করে হয় কাকিমণি ! ছোটকাকিমা, যে নিজের মেয়ে নেই বলে, অর্ধেক গয়না আমাকে দিয়ে দিয়েছে সেই ছোটকাকিমা, আমার এতটুকু জ্বর হলে যে সারাক্ষণ জলপাটি নিয়ে বসে থাকে সেই ছোটকাকিমা আমায় জুতো মারল !'

আমি কী বলব ? কী করে বলব ? অথচ বলতেই হবে। নইলে আমার চোখের সামনে এই সুন্দর ফুলটা শুকিয়ে যাবে। বললুম—'পিউ, মানুষ অনেক সময়ে ভালোবেসেও মারে, শাসন করে, উল্টো আচরণ করে, তার মানে এই নয় যে তোর মা-কাকিমা তোকে ভালোবাসেন না।'

পিউ বলল, 'জুতোতে অনেক সময়ে কাঁটা উঠে থাকে। ফুটলে শিওর ধনুষ্টঙ্কার। কাকি তো একবারও দেখল না আমার পিঠে কাঁটা ফুটেছে কি না, কাকি শাসন করছে বলে মা তো তেড়ে এল না ! মা শাসন করছে বলে কাকিও তো তেড়ে এল না কাকিমণি ! ওরা কি তা হলে অন্য কোনও পিউকে ভালোবাসে ? যাকে আমি চিনি না ?'

আমি বললুম, 'পিউ তুই গৌতমকে বিয়ে করতে চাইছিস। বেশ তো, তোর বয়সটা

হোক, গৌতম পাশ-টাশ করে চাকরি করুক। তারপর বিয়ে করবি। তাড়া করছিস কেন?'

তখন পিউ বড় অদ্ভুত কথা বলল। বলল, 'কাকিমণি আমার মায়ের, মানে দাদুর অনেক লাখ টাকার সম্পত্তি। সমস্ত আমাদের দু বোনের নামে। এ আমি ছোট্ট থেকে শুনে আসছি। আজকালকার যা দিনকাল তাতে গৌতমের মতো সাধারণ ছেলের দাঁড়ানোর বলতে গেলে কোনও সম্ভাবনা নেই। আমার অনেক টাকা আছে, গৌতমের খাটবার শক্তি আছে, ইচ্ছে আছে। এই টাকাটা দিয়ে যদি একটা কম্পুটার সেন্টার খোলা যায়, তা হলেই গৌতম দাঁড়িয়ে যাবে। আমাদের কোনও অভাব থাকবে না। ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই ভাল না?' মনে মনে বললুম, 'সর্বনাশ'। মুখে বললুম—'আইডিয়াটা কার? গৌতমের?'

পিউ বলল, 'গৌতমের তো বটেই। ও শো করে করে এখন টাকা জমাচ্ছে। তবে ও আমার টাকার কথা জানে না। আমি কিচ্ছু বলিনি। একেবারে অবাক করে দোব।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। পিউ বলল—'কাকিমণি সব্বাইকেই ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, প্রোফেসর বিয়ে করতে হবে কেন? গৌতমকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি। গৌতমও আমাকে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসে...' বলতে বলতে এতক্ষণে পিউ কেঁদে ফেলল। তারপর বলল, 'কাকিমণি, তুমি মা-দের একটু বোঝাও। গৌতমকে ছাড়া আমি বাঁচব না।'

পিউ পিউয়ের মা দুজনেই আমাকে বলে গেল অপর পক্ষকে বোঝাতে। ওদের বাড়ি আমি পারতপক্ষে যাই না। গেলুম। মিসেস সরকার বললেন, 'বুঝিয়েছেন? আশার কিছু আছে?'

বললুম, 'আঠার বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে ও বোধহয় রাজি হয়ে যাবে। তবে বিয়ে গৌতমকেই করবে। আর মিসেস সরকার, ছেলেটি তো ভালোই। বয়স খুব অল্প, এখন থেকেই তো বলা যায় না ভবিষ্যতে কে কী দাঁড়াবে। অত সুন্দর স্বাস্থ্য, সুন্দর চেহারা, খাটিয়ে, বুদ্ধিমান, মানুষ হিসেবে ভালো, বাকিটুকু তো ওকে আপনারাই গড়েপিটে নিতে পারেন। পিউয়ের যখন এত পছন্দ!'

'কী বললেন?' প্রায় বাঘিনীর মতো গর্জন করে উঠলেন মিসেস সরকার। 'আপনাকে কেউ গৌতমের হয়ে সালিশি করতে ডাকেনি মিসেস মিত্র। আপনি আর বংশমর্যাদার কী বুঝবেন, আপনাকে কিছু বলাই আমার ভুল হয়েছিল।'

আস্তে আস্তে পিউয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি। সত্যি কী ভুল! আমি নিম্ন মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়ে। আমি, আমার মা, আমার বোন, বাড়ির সবাই চাকরি করতুম, পড়াশোনা করতুম। আমার মা আমার সঙ্গে স্কুল ফাইনাল, বি. এ., এম. এ. পাশ করেছেন, এখনও তিনি একটা স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড-মিসট্রেস। আমার ছোট বোন বেসরকারি ফার্মে স্টেনো টাইপিস্টের কাজ করে, আমি স্কুলে পড়াই, আমার শ্বশুরবাড়িও এমনি কারুর কস্মিনকালেও কোনও জমিজমা, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া টাকাকড়ি ছিল না। যে যেমন পেয়েছে লেখাপড়া করেছে, কোনও না কোনও ভদ্র চাকরিতে ঢুকে গেছে। বংশমর্যাদা তখনই হয় যখন অন্যের জমানো টাকা-পয়সা খরচ করবার অধিকার বর্তায়।

আমি আর পিউদের বাড়ি যাইনি। কিন্তু আমি মহা ভুল করেছিলাম। পিউ ঠিকই বলেছিল—আমরা আসলে ভালোবাসি না। ভালবাসি এই অহঙ্কারটা করতে ভালোবাসি। টুলটুল একদিন আতঙ্কিত মুখে এসে বলল, 'নমিতাদি, পিউকে ওরা ঘরে বন্ধ

করে রেখেছে। বেরোতে দেয় না। ও খাচ্ছে না। ওর বাবা বলেছে, তেমন অবস্থা হলে স্যালাইন দেওয়া হবে।'

একদিন গৌতম স্বয়ং এল, কাতরগলায় বলল, 'নমিতাদি আপনি পিউকে বাঁচান, আমি কথা দিচ্ছি আমি চলে যাবো, অনেক দূরে চলে যাবো। ওর বাবা, কাকারা ওর ওপর অকথ্য অত্যাচার করছেন। চুলের মুঠি ধরে মেঝেয় ফেলে, বুট দিয়ে—উঃ' গৌতম কেঁদে ফেলল। আমি কোনরকমে চোখের জল চেপে কঠোর গলায় বললুম, 'গৌতম, তোমার তো কুড়ি একুশ বছর বয়স হয়েছে, কিছু বোঝো। বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করার সময়ে এসব মনে ছিল না ?'

গৌতম ধরাগলায় মুখ নিচু করে বলল—'বিশ্বাস করুন নমিতাদি, কিভাবে ইনভলভড হয়ে গেলুম আমি জানি না। অনেকবার নিজেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করেছি। পারিনি। কিন্তু এই পরিস্থিতি যে হতে পারে, ওঁরা যে পিউকে এমনিভাবে মারবেন, অত্যাচার করবেন তা আমার স্বপ্নেও জানা ছিল না। ওঁরা এত লিবার‍্যাল। মেলামেশা করা, ছবি-টবি দেখা, কোনও ব্যাপারেই তো ওঁদের কনজারভেটিভ বলে মনে হয়নি। তা ছাড়া পিউকে ওঁরা এত ভালোবাসেন !'

ওই একটা কথাতেই এসেই সব ঠেকে যাচ্ছে। ভালোবাসা। ভালোবাসা কী ? আমি তিলককে সব বললুম, অনুরোধ করলুম—'চলো, আমরা দুজনে মিলে যাই। তা হলে হয়ত একটু ওজন দেবে।'

তিলক বলল, 'খেপেছো ? অযাচিত উপদেশ দিতে মহাজনরা বারণ করে গেছেন। জানো না ? পরের ব্যাপারে নাক গলানোর অভ্যেসটা তোমার বিপজ্জনক। ওটা বন্ধ করো। ওরা শুধু অপমান করে পথ দেখিয়ে দেবে পানু সরকারকে আমি খুব ভালো করে চিনি।'

আমার বুকের মধ্যেটা ফাটতে লাগল। আমি মাথা কুটতে লাগলুম। কিন্তু আমার অহঙ্কার, আমার স্বামী, আর মহাজনবাক্য আমায় যেতে দিল না। অনেক রাত্তিরে যেন শুনলুম—পিউ ডাকছে, 'কাকিমণি, কাকিমণি, দরজা খোলো', সর্বাঙ্গে কালশিটে পড়া আলুথালু পিউ, মুখটা এমন ফুলেছে যে চেনা যায় না। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিলুম—'আয়, পিউ, আয় মা, আমি তোর সব ব্যথা সারিয়ে দেবো।' তারপরেই ঘুম ভেঙে গেল। তিলক আমাকে ঝাঁকাচ্ছে।—'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বাচ্চা মেয়ের মতো—কাঁদছো কেন ? আচ্ছা তো !'

তখনও ঘুমের ঘোর যায়নি। কী করে তিলককে বোঝাই। মানুষের বয়স বাড়ে, তার অনুভূতির বয়স সব সময়ে বাড়ে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ঘুমোতে লাগলুম।

ভোররাতে সত্যিকার দরজা ঠেলাঠেলিতে সবাইকার ঘুম ভেঙে গেল। আমার বাড়ি, তার পাশের বাড়ি, তার পাশের বাড়ি, গোটা পাড়া। গোটা পাড়া ভেঙে পড়েছে উনচল্লিশ নম্বরের দরজায়। পিউ জ্বলছে। সে বন্ধ ছিল। দফায় দফায় তার প্রিয়জনেরা থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ করেছে। কিল, চড়, লাথি, চোরের ঠ্যাঙানি, বাড়ির একমাত্র প্রিয়তম মেয়েটির ওপর। যতক্ষণ না তার নরম শরীরে মনে কালশিটের দাগ পড়ে যায়, যতক্ষণ না থেঁতলে যায় তার এতদিনের আদরে গড়া জীবন্ত মনটা, যতক্ষণ না সে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুতে পরিত্রাণ দেখতে না পায়। সে কখনও কখনও বাথরুমে যাবার জন্য ছাড়া পেত, কখন কেরোসিন জোগাড় করে রেখেছে, কেউ জানে না, হয়ত তেমন করে জানবার চেষ্টাও করেনি। তার পরে পরিত্রাণ নেই দেখতে পেয়ে বুঝতে পেরে পিউ এখন জ্বলে

যাচ্ছে।

দরজা বন্ধ। জানলা দিয়ে ঘরের ভেতরে লকলকে শিখা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কোনও আওয়াজ নয়। দরজা জানলা ভেঙে যখন ভেতরে পৌঁছনো গেল, যখন দমকলের ঘণ্টা সমস্ত পাড়া চকিত করে ছুটে এল তখন পিউ একটা শুকনো কালো কাঠকয়লার লম্বাটে টুকরো মতো হয়ে গেছে।

পিউয়ের মা কাকিমা অজ্ঞান হয়ে গেছে আতঙ্কে। বাবা কাকারা ছোটাছুটি করছে। ছেলেগুলোকে পাশের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এমন সময়ে শুনতে পেলুম গৌতমও জ্বলছে। বাঃ কেমন সুন্দর পরিসমাপ্তি। দি এন্ড।

এই নমিতাদি শুনেছিলুম কপাল ঠুকতে ঠুকতে নিজের মাথাটাই ভেঙে ফেলেছিলেন। স্বামী তিলকনাথ মিত্রকে তিনি কাছে ঘেঁসতে দিচ্ছিলেন না। ছেলে এসে—মায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে তিনি অবশেষে রক্তাক্ত মাথায় অজ্ঞান হয়ে যান।

গল্প নয়। এটা সত্য ঘটনা। এই সমাজ যখন তার একচক্ষু ভোগসর্বস্বতার আগুনে ছোট ছোট নিষ্পাপ কিশোর-কিশোরীদের এমনি করে পুড়িয়ে মারে তখন কোনও গল্পকার তাঁর শিল্পকৃতির গজদন্তমিনারে বসে ফর্ম আগে না বিষয় আগে এই চিরন্তন নান্দনিক তর্কে নিজেকে নিযুক্ত রাখতে পারেন না। তাঁকে তখন উপন্যাস, ছোটগল্প, রম্যরচনা, কবিতা সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে আসতে হবেই। পিউরা যে জ্বলছে!

পরভৃৎ

কুল্লে দেড়খানা ঘর। এক চিলতে বারান্দা, ধুলো বাঁচাতে টিনের আড়াল দেওয়া। রাস্তার একেবারে ওপরে তো ! একফালি রান্নাঘর। দেয়াল থেকে আস্তর খসছে দিনভর রাতভর, সে নতুন চুন করালেও খসে। মিস্তিরি বলে নোনা ধরেছে কি না বাবু, গঙ্গার এতো কাছে ! তা ছাড়াও বাড়ি যে করেছিল সেই কনট্রাকটর বাজে মাল দিয়েছিল। ইঁট বদলালে তবে যদি কিছু হয়। যা অসম্ভব সুতরাং তা অসম্ভবই। সারা দিন রাত যখন তখনই গেল গেল রব।

'ওগো শীগগীরই এসো।'

'কি ব্যাপার ? কি হল ?'

'ভাতের হাঁড়িতে পড়ে গেল।'

'ভাতের হাঁড়িতে পড়ে গেল, বাঃ চমৎকার, আমি তবে না খেয়ে আপিস যাই !'

কাঁচুমাচু মুখ এবার আস্তে আস্তে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। 'কবে থেকে যে বলছি ওপরটা ফেঁপেছে ভেঙে দাও, ভেঙে দিয়ে যাও, শুনেছো ?'

'এরকম যখন এখন-তখন অবস্থা হয়ে আছে তখন রান্নাগুলো ঢাকা দিয়ে করতে পারো তো !'

'ফ্যান উথলোচ্ছে, ঢাকা দেবো ? তুমিই রান্নাটা করো তা হলে।'

'হ্যাঁ ওইটেই বাকি আছে।'

এক খাবলা তেল মাথায় চড়িয়ে গামছা কাঁধে বাবু তারাপদ সেন মহাশয় লম্বা লম্বা পায়ে বাথরুমের গোঁসা ঘরের দিকে চলে যেতে থাকেন। সেদিকে আড়চোখে তাকিয়ে ভাতের হাঁড়ি থেকে লম্বা লম্বা চুনের শক্ত ফালি তুলে ফেলতে থাকেন মিসেস রমলা সেন। হাঁড়ি নামিয়ে টাটকা গরম জল বসান, গরম জল ভাতে ফেলে এবার ফ্যান গালতে থাকেন, 'যা বালি ভেসে ভেসে বেরিয়ে যা, যা বাবা চুন এতো করে জল ঢেলেছি বেরিয়ে যা।'

পিঁড়ি পেতে তারাপদবাবু বসলে ধবধবে ভাত ধরে দিয়ে, মাছের ঝোল সাঁৎলাতে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েন গিন্নি।

তারাপদবাবু বলেন, 'বাঃ ভাতগুলো আজ বেশ চুনকাম হয়েছে। ফর্সা কাচা ভাত খাবার কপাল আজ আমার। খেয়ে দেয়ে মাঝ-আপিসে মেডিক্যাল কলেজ হয়ে নিমতলা।'

সাঁৎলানো ঝোলে জিরে-ফোড়নের সুগন্ধ ভাসছে। বাটি পাতের পাশে বসিয়ে দিয়ে মিসেস বললেন, 'অ্যামবুলেন্সটা বাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে বোলো। তোমাকে যদি যেতে

হয় তো আমাকেও হবে।'

এই সমস্ত নিত্য-নৈমিত্তিক নাটকের অনেকটাই মঞ্জু জানে না। তার ভোরের কলেজ। ফিরতে বেশির ভাগ দিনই এগার সাড়ে এগার। তার অনেক আগেই বাপ খেয়ে দেয়ে পগার পার। খেতে বসে মা-মেয়ে, বেলা একটা। মঞ্জু বলে, 'মা, আমার ভাত আলাদা কেন ?'

'গোপালের মা চাইল কিনা, খানিকটা দিয়ে দিয়েছি, একটু কম পড়ে গেছে তাই।'

'গোপালের মা চাইল ? কোন দিন তো চায় না ? কই দেখি, ওই তো হাঁড়িতে যথেষ্ট ভাত !'

'ওটা রাতের জন্যে রেখে দিয়েছি। তুই যে বাসমতী ভালোবাসিস !'

'একবার বলছো গোপালের মা চাইল, একবার বলছো রাতের জন্যে রেখে দিয়েছো। আবার বলছ, আমি বাসমতী ভালোবাসি। কোনটা সত্যি গো মা !'

'সবগুলো সত্যি !' মা ঝংকার দিয়ে ওঠে, 'নে এখন খা তো !'

নিজের পাত থেকে এক খাবলা মায়ের পাতে তুলে দিয়ে মঞ্জু বলে, 'তা হলে দুজনে মিলেমিশে খাই।'

হাঁ-হাঁ করে নিজের পাত ঢাকে রমলা-মা। আসলে সেই যে সেন মহাশয় টুকে দিয়ে গেছেন আপিস হয়ে মেডিক্যাল কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ হয়ে নিমতলা ! চুনপড়া ভাত কিছুতেই মেয়েকে ধরে দিতে পারেনি। যদি কিছু হয় ! নিজেদের বেলায় ঝুঁকি নেওয়া যায়। নিতে হচ্ছে। ছোট সংসার, দুজনেরই হিসেব-বাতিক পরিচ্ছন্নতা বাতিক। তাই চলছে। এটা নেই সেটা নেই প্রকট হচ্ছে না, নইলে কি যে হত বলা যায় না। কিন্তু মেয়ে একমাত্র মেয়ে, তার বেলা হিসেব শিথিল, পরিচ্ছন্নতার বাতিক আরও কড়া। মঞ্জু বুঝতে পারে কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে। কিন্তু কিসের গোলমাল ধরতে পারে না। তার মাথায় এখন সলিড জোমেট্রি ঘুরছে। সে কোনমতে খেয়ে উঠে পড়ে।

মা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। তার এখন হেঁশেল তোলা, কাপড় মেলা ঘর-গুছোনো হাজারো কাজ বাকি। সব করে সে একটু নিশ্চিন্তে জিরোতে চায়। মঞ্জু এখন খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করুক, ঘুমিয়ে নিক, নইলে চোখের তলায় কালি পড়বে। মুখ চুপসে যাবে। তার চেয়ে তার মা বেশি বিউটি-কনশাস। এই বেসম মাখ, মুখে সাবান দিসনি, এই ঝামা দিয়ে পা ঘসে ফেল। এই চুল আঁচড়া, একশো বার গুনে গুনে চিরুনি চালাবি। হপ্তায় দুবার করে মাথা ঘষ। রিঠের জল করে রেখেছি। কেশুত, মহাভৃঙ্গরাজ, আমলা দিয়ে তেল করা আছে। মাখ্।

—'উঃ, এতো তুমি জানলে কোথায় মা ?'

—'একটু চোখ কান মেলে থাকলে তুইও জানতে পারতিস !'

—'তা নিজে করো না।'

নিজের মাথার পাতলা চুলের বিনুনিটাকে দু-একবার চাপড়ে রমলা-মা বলে, 'ধুৎ !' আড়চোখে মেয়ের পিঠ ভর্তি ঢেউখেলানো কেশ কলাপের দিকে চায়, মসৃণ কাঞ্চনবর্ণ মুখশ্রীর দিকে চায়, ফোটা ফুলের মতো আঙুলের গোছার দিকে চায়, চোখ দিয়ে স্নেহ গর্ব গলতে থাকে, মনে মনে বলে —'আমার কি ওই রকম !'

মেয়ে যখন বাড়ি থাকে না, কোচিঙে যায় কি কোনও বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে যায়, স্বামী-স্ত্রীতে গোপন সভা বসে অনেক সময়। রমলা বলে, 'সত্যি, ও ওরকম হল কি করে বলো তো !'

রোগা বুক ফুলিয়ে তারাপদ বলে, 'হুঁ হুঁ বাবা। এ শর্মার যৌবনের চেহারাটা ভুলে যাচ্ছো !'

মুখ বেঁকিয়ে রমলা বলে, 'আহা হা হা, কী চেহারা, কী চেহারা। দিদিরা সব বললে রাজপুত্তুর বর এসেছে! দেখে আয়। তা চুপি চুপি বারান্দা দিয়ে দেখি, খ্যাংরা কাঠির মাথায় আলুর দম।'

—'আর রংটা ? রংটা ?' হাঁ হাঁ করে ওঠেন তারাপদ।

—'এখন কেউ বলবে ? এখানে কালো ছোপ, ওখানে কালো ছোপ।'

—'আহা ছিল তো !'

—'ঠিক আছে, ঠিক আছে, রঙ যেন ছিল, কিন্তু সরস্বতীর মতো অমন মুখশ্রী !'

—'সরস্বতী নয়, সরস্বতী নয়, মেরিলিন মনরো !'

—'নিজের মেয়ের সঙ্গে ওই সব মুখপুড়ি হতচ্ছাড়িদের তুলনা করতে লজ্জা করে না ?'

—'ফ্যাক্ট ইজ ফ্যাক্ট। যে দেখে সেই বলে, চোখ দুটো অবিকল মেরিলিন মনরোর মতো, ইয়ংরা বলছে, কুচোরা বলেছে, আমি বললেই দোষ হয়ে গেল ?'

—জ্বলজ্বলে চোখে সেনমহাশয় বলতে থাকেন—'মেরিলিনের মতো চোখ বলেই তো আর ও মেরিলিন হয়ে যাচ্ছে না ? ইকনমিক্স অনার্স নিয়ে পাস করতে যাচ্ছে। এম. এ. পড়বে, এম. বি. এ. পড়বে। বিজনেস এগজিকিউটিভ হয়ে ঢুকবে ইয়াব্বড় কোম্পানিতে, তখন এই বাড়ির ইঁট শুদ্ধু পাল্টে ফেলব। দোতলা তুলব। ম্যাগাজিন দেখে ঘর সাজাবো। তুমি গোলাপি রঙের হাউস কোট পরে এ-ঘর ও-ঘর করবে।'

—'আহা হা হা, গোলাপি রঙের হাউস কোট পরে এ-ঘর ও-ঘর করবে ! অল্প বয়সে পর্যন্ত কোনদিন যে কালো বলে গোলাপি লাল পরতে দিলে না ? এখন মাথায় টাক, হাতে পায়ে শির জেগেছে, এখন গোলাপি হাউস-কোট। তুমি পরো গে যাও !'

বলেই রমলা স্বামীকে গোলাপি হাউস-কোট পরা কল্পনা করে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে।

স্বামী-স্ত্রী মিলে দুটি সমকেন্দ্রিক বৃত্ত তৈরি করেছে। কেন্দ্র হল মঞ্জু। মঞ্জুকে ঘিরে দুজনে পাক খাচ্ছে। ভাত-রুটি, মাছ-মাংস, ফল দুধ, সুষম খাদ্য, ব্যায়াম গান, রূপচর্চা, পোশাক-পরিচ্ছদ—মা। বই খাতা, রাত হলে কোচিং থেকে গানের ক্লাস থেকে, বন্ধুর বাড়ির নিমন্ত্রণ থেকে নিয়ে আসা, অনেক সময়ে দিয়ে আসা, কেনা-কাটি, ছোটাছুটি, ডাক্তার-বদ্যি-বাবা। ছোট বৃত্ত বড় বৃত্ত কেন্দ্রবিন্দুটিকে ঘিরে পাক খাচ্ছে। পাক খাচ্ছে মহা আনন্দে। ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই। সবটাই যেন ভারি আনন্দের। সৃষ্টির আনন্দ, তৈরি করার আনন্দ। আরও আনন্দ এই জন্য যে পরিশ্রমের ফলাফলটা হাতে হাতে পাওয়া যায়। মায়ের যত্নে মঞ্জু আপাদমস্তক সুছন্দ, সুচারু, সু-স্বাস্থ্যবতী। গালে তার লালের আভা। চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ, পরিষ্কার। বন্ধুর বাড়ি বিয়ের নিমন্ত্রণে যাবার সময়ে মা তার একখানা বিয়ের সময়কার সাদা টিসু বেনারসী বার করে দেয়, মাথায় সাদা চন্দ্রমল্লিকা, গলায় ঝুটো মুক্তোর লম্বা হার। মার মার কাট কাট পড়ে যায়। মঞ্জু বাড়ি ফিরে এসে বিরক্ত মুখে বলে—'মা প্লীজ, তুমি আর আমাকে এতো সাজিও না।'

মা বলে, 'এর থেকে কম সাজ আর কিসে হয় আমি তো জানি না খুকু !'

সত্যিই ! মেয়ে মালাটা তুলে পরখ করে, শাড়ির আঁচলটা ঘুরিয়ে দেখে, তারপর হেসে ফেলে। তারপর বলে—'মা তোমার রুচিটা দারুণ, এতো আর্টিস্টিক এতো আধুনিক।

সায়ন্তনীর মা তো কলেজের প্রোফেসর, উনি বলছিলেন সাদা পরেছিস কেন ! অথচ...'

—'বল, থামলি কেন ?'

মঞ্জু লজ্জা পেয়ে যায়। মা জোর করে, 'বলই না কি বলবি।'

—'কী আর বলব, সব চোখ আমার দিকে, কনেকে কেউ দেখছে না। সবাই আমাকে। আসলে তোমার পছন্দটা...।'

রমলা বলে, 'তোকে কিন্তু আমরা পছন্দ করে আনিনি খুকু।'

—'ধ্যার, কি যে বলো !'

—'না রে, সত্যিই একেক সময় সন্দেহ হয়, হাসপাতালে বদল হয়ে আসিসনি তো !'

মঞ্জু মাকে জড়িয়ে ধরে, চোখ ভর্তি জল। —'মা, এমন করে বললে আমার কেমন ভয় করে, কষ্ট হয় মা !'

মা মেয়ের গালে চুমো খেয়ে বলে—'তা না। কখনোই না। তোর চলাফেরার আড়ালে তোর বাবা আর ঠাকুমা উঁকি মারেন। তোর দিদিমার হাতগুলো ছিল এমনি আ-ফোটা পদ্মের মতো। খুকু, আমার মাসী তাঁকে তুই দেখিসনি, তোর চুলগুলো যেন সেই কনে মাসীমার মতো। তুই ঘুরিস ফিরিস, তোর চোখের চাওয়াব ঠোঁটের ভঙ্গিতে নাকের আদলে যেন আমার অনেক দিনের অনেক ভালো লাগা মানুষের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আসলে খুকু, তুই ইচ্ছে হয়ে ছিলি মনের মাঝারে। ভগবান আমার সেই ইচ্ছেকে সম্মান দিয়েছেন। সাধারণত তো তা দ্যান না !'

বাবা বাইরে থেকে ব্যস্ত হয়ে বলে—'কই, তোমাদের হল ? মঞ্জু তোর নোটসগুলো জেরক্স করে এনেছি, আর এই নে তোর মাইক্রো-টিপ পেন।'

মা বলল —'ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ?'

—'এনেছি গো এনেছি !'

—'এনে থাকলে তোমরা খাও। মা খাও, বাবা খাও।' মঞ্জু খুব রাগ রাগ মুখে বলে। —'আমার আর ভিটামিনের দরকার নেই।'

মেয়ের দিকে এক পলক তাকিয়ে তারাপদবাবু বুঝতে পারেন সত্যিই মেয়ে ঠিকই বলেছে। কোনও প্রসাধন ছাড়াই যার গাল ঠোঁট এমন টুকটুক করে, চোখ যার অমন পরিষ্কার জলের মতো স্বচ্ছ, অমন সতেজ চলাফেরা, ভিটামিন তার আপাতত না হলেও চলবে।

বরং রমলা ! কালো ঠিকই। কিন্তু শ্রীময়ী ছিল তো ! মোটাসোটা হয়েছে ঠিকই। শরীরে কোনও রোগবালাইও নেই। কিন্তু শ্রীটা যেন একদম চলে যাচ্ছে। ভিটামিন কয়েক শিশি খেলে কী...।

সুদক্ষিণার মা এসেছেন। সুদক্ষিণা মঞ্জুর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। অ্যামবাসাডরটা গলি জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুদক্ষিণা নামল, সুদক্ষিণার মা নামলেন, সুগন্ধে ঘর ভরে গেল। সুদক্ষিণার মা সুজাতা একহাতে সুদক্ষিণাকে মঞ্জুর দিকে ঠেলে দিয়ে আরেক হাতে রমলাকে বেড়ে ধরলেন।

—'কি দিদি, বোন কি দিদির বাড়ি আসবে না ?'

—'ওমা, সে কি, সে কি। নিশ্চয়ই আসবেন। আসুন। আসুন।'

—'আপনার চোখ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে আপনি একেবারে অবাক হয়ে গেছেন।'

তা তো রমলা যেতেই পারেন। কলেজে ঢুকে অবধি শুনছেন সুদক্ষিণা, সুদক্ষিণা। —সুদক্ষিণার মাও শুনছেন। আজ নেমন্তন্ন, কাল ডে স্পেন্ড করতে যাবে,

মানে সারাদিন থাকবে, খাবে, পড়াশুনো করবে, গলির মোড়ে ছেড়ে দিয়ে যাবে সুদক্ষিণাদের গাড়ি। কিন্তু দুজনকেই এই প্রথম দেখলেন।

—'চা খাবেন তো?'

—'নিশ্চয়ই। টা-ও খাব, যদি দ্যান।'

সুন্দর করে চা করে দিলো রমলা। কৌটো থেকে কুচো নিমকি। খাওয়া-দাওয়া, অনেক সুখদুঃখের গল্প হল।

সুজাতা বললেন—'সুখবরটা দিই তা হলে আপনাকে।'

—'কিসের সুখবর? মেয়ের বিয়ে নাকি?'

—'ঠিক ধরেছেন দিদি, তবে আমার মেয়ে নয়, আপনার।'

—'আমার মেয়ের? বিয়ে?·খুকু বিয়ে করেছে?'

—'স্‌স্‌স্‌, কী থেকে কী ভেবে ফেলছেন, মেয়ে আপনার তেমন নয়।'

যাক তবু ভালো, রমলার এমন বুক টিপ টিপ করছে যে মনে হচ্ছে ঘড়ির আওয়াজের মতো সে শব্দও সবাই শুনতে পাচ্ছে।

—'আরে বাবা, আপনার মেয়ে বিয়ে করেনি। করবেও না। আপনি দেবেন। একটা খুব ভালো সম্বন্ধ আছে।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রমলা বললো—'আমরা এখন মেয়ের বিয়ে দোব না ভাই। ও পড়াশোনা করছে, গান শিখছে, করুক, শিখুক, নিজের পায়ে দাঁড়াক। তারপরে ভাবা যাবে। ভালো সম্বন্ধ তো ওর কথা ফোটার বয়স থেকেই আসছে!'

—'তা তো আসবেই। মেয়ে আপনার যা সুন্দরী। কিন্তু এখানে তো দিদি না করতে পারছেন না।'

সুজাতা হাত ব্যাগ খুললেন। একটা অ্যালবাম খুলে রমলার সামনে মেলে ধরলেন, পাতায় পাতায় ছবি।

'এই যে দেখছেন এইটি পাত্র। [রমলা : ভালো চেহারা]। আমার দাদার একমাত্র ছেলে। [রমলা : বাঃ বেশ ভালো]। প্রেসিডেন্টস গোল্ড মেডেল পাওয়া ছেলে। জীবনে কোনদিন সেকেন্ড স্ট্যান্ড করেনি। [রমলা : তা আমার কি]! রঙিন ছবি, চেহারা, রঙ, স্বাস্থ্য সবই ভালো করে দেখে নিন। [রমলা : দেখার দরকার নেই] আপনার অমন সুন্দর মেয়ে, যার তার সঙ্গে তো মানাবে না। [মানাবে না-ই তো] এম আই টি থেকে ডক্টরেট করে ফিরে এসেছে, এখন ব্যাঙ্গালোরে পোস্টেড। [সর্বনাশা] দেশে থাকতে চায় [বাঃ] বাবা, মানে আমার দাদা চার পুরুষে ডাক্তার। কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ মণীশ রায়ের নাম শুনেছেন তো! রমলা : 'শুনিনি, না, না শুনেছি শুনেছি মনে হচ্ছে! দাদার মেয়ে বড়, বিয়ে হয়ে গেছে কানাডায় থাকে। [রমলা : থাকুক গে না।] বউদিও ডাক্তার। [বেশ, বেশ]—কি হল আপনি যে কিছুই বলছেন না! আমি একদফা কাগজপত্র দিয়ে যাচ্ছি, আপনারা খোঁজখবর করুন।'

কাগজপত্রের সুদৃশ্য ফাইল বার করে সামনে রাখলেন সুজাতা, 'আমার ভাইপো বলে বলছি না, অমন চরিত্রবান, সোবার ছেলে এ যুগে চট করে পাবেন না।'

—'না, না, সে কথা নয়', রমলা তাড়াতাড়ি বলল—'আপনার ভাইপো, ভাইয়ের ফ্যামিলি সবই খুব ভালো। কিন্তু আমরা তো এখন ওকে পড়াবো। বিয়ে পরে। নিজের পায়ে দাঁড়াক। রোজগারপাতি করুক।'

সুজাতা হেসে বললেন—'কী পড়াবেন ওকে? বি. এসসি? এম. এসসি? পি-এইচ ডি

করবে ? বাইরে যাবে ?—ওঁরা সব করাবেন। ও থাকবে বাড়ির মেয়ের মতো। যতদূর খুশি পড়বে, যত ইচ্ছে গান শিখবে বড় বড় ওস্তাদ রেখে, বাইরে যেতে ইচ্ছে হলে যাবে। যা ইচ্ছে। ওঁরা নিজেরাই আসবেন। এসে আপনাকে বলবেন সব। আসল কথা, দীপঙ্করের বিয়েতে মঞ্জুকে দেখে আমার দাদা বউদির এবং ভাইপো তীর্থঙ্করেরও অসম্ভব পছন্দ হয়ে গেছে। ও যদি চাকরি করতে চায় করবে, কোনও ব্যাপারেই কোনও বাধা নেই।'

সুজাতারা চলে গেলে রমলা মঞ্জুকে ডাকলেন—'তুই জানতিস খুকু ?'

মঞ্জু ভারী মুখে বলল—'একদম না। প্রতি বিয়েবাড়িতেই তো কোথায় থাকো, কী পড়ো, ঠিকানা কী আর বাবা কি করেন প্রশ্নের তোড় আসেই মা। সুদক্ষিণারা এই মতলব নিয়ে—এসেছে আমি ঘুণাক্ষরেও জানি না। আমি এখন পড়ব।'

—'ওঁরা খুব ভালোভাবে পড়াবেন, বলছেন।'

তারাপদ রাত্রে এসে সব শুনে চিন্তিত হয়ে বললেন—'এমনি একটা রাজসিক সম্বন্ধ, তুমি অমনি না করে দিলে ?'

—'না করে দিলেই শুনছে কে ?'

মঞ্জু বলল—'বাবা আমি এখন বিয়ে করব না। পড়ব, চাকরি করব।'

—'ওরা তো বলেছেন পড়া, চাকরি করা যা তোর ইচ্ছে তা-ই করতে পারিস।'

—'চাকরি মানে, আমি—', মঞ্জু বাবার মুখের ওপর বলতে পারল না। চাকরি সে করবে বাবা-মাকে সুখে রাখবার জন্যে। মা-বাবারও মনের না-বলা আশা, তারও মনের না-বলা সংকল্প, সে বাবা-মার ছেলের কাজ করবে।

পরে যখন ডক্টর মণীশ রায় তাঁর স্ত্রী ডক্টর বিজয়া রায়কে নিয়ে এলেন, এবং একটু পরে ভিন্ন একটি বিদেশি গাড়িতে তাঁদের ছেলে তীর্থঙ্কর রায় এসে পৌঁছলো, সেন মহাশয় দম্পতি তাঁদের ভদ্রতায়, কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। মঞ্জুর সঙ্গে তীর্থঙ্করের বেশ আলাপ হয়ে গেল। বাঙ্গালোরে পড়াশোনার যে কত সুবিধে সেই নিয়ে মঞ্জুর সঙ্গে রীতিমতো আড্ডাই জমে গেল তীর্থঙ্করের। ডাক্তার দম্পতি চেয়ে চেয়ে রমলার মটরশুঁটির কচুরি খেলেন। ভূয়সী তারিফ করে। বললেন—'আপনাদের মতো সরল, সৎ, আন্তরিক মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক হলে আমরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করব।'

তারাপদবাবু আস্তে আস্তে বললেন—'সবই ঠিক ডক্টর রায়। কিন্তু মেয়ের বিয়ের জন্য আমরা যে এখন একেবারেই প্রস্তুত নই।'

ডক্টর বিজয়া রায় বললেন—'মেয়ের বিয়েব জন্যে প্রস্তুত হতে হবে কেন আপনাকে বিশেষ ভাবে ? এই যুগে ? শুনুন দাদা, বিয়ে হবে রেজিস্ট্রি আফিসে গিয়ে। আপনারা তিনজন আর আমরা তিনজন। তারপর আপনাদের বাড়িতে এসে রমলাদির হাতের মাছের ঝোল ভাত খাবো। দু-এক দিন পর কোনও হল ভাড়া করে কিংবা গ্র্যান্ডে কিংবা তাজবেঙ্গলে রিসেপশন দেওয়া হবে। জয়েন্ট। আপনাদের পক্ষের সবাইকে বলবেন : আমাদের সবাইকে বলা হবে। আর কনের বিয়ের সাজ, এঁদের ফ্যামিলির নিয়ম এঁরাই দ্যান। প্রপিতামহীর আমল থেকে। আমাকেও সাজিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। সুজাতাকে জিজ্ঞেস করবেন। সেই সেকালের আমলের ভারী ভারী গয়না ওসব মঞ্জুকে পরাতেই হবে। শাড়িটারই ওজন কী ? তা মঞ্জু লম্বা আছে পারবে। আমার যা কষ্ট হয়েছিল ! যেমনি রোগা ছিলুম তখন। হাইট তো দেখছেনই !' বলে বিজয় রায় হাসতে লাগলেন।

আশ্বিন মাসে বিয়ে হল। রেজিস্ট্রির তো কোনও লগ্ন নেই। বেয়াই বেয়ানকে

তাজবেঙ্গলে নিয়ে যাওয়া আসার জন্য আলাদা গাড়ি মোতায়েন রইল। রেজিস্ট্রির জন্য একটি হালকা বেনারসী শাড়ি আর সামান্য কখানা সোনার গয়না যা এতদিন মেয়ের জন্য তুলে রেখে দিয়েছিলেন, তীর্থঙ্করকে একটি ধুতি পাঞ্জাবি, কোলাপুরি চটি ও সোনার আংটি বোতাম দিলেন রমলা আর তারাপদ, আর কোনও কিছুর দরকারই হল না।

তাজবেঙ্গলে সবাই মিলে ভুরিভোজ করে বেরিয়ে গেলে তারাপদবাবু বললেন—ডক্টর রায়, আমার শেয়ারটা কিন্তু নিতেই হবে।

ডক্টর রায় হেসে চুপিচুপি বললেন—'দাদা আপনি সৎ স্বাভাবিক মানুষ, আপনার কি কৃষ্ণবর্ণের টাকা আছে ?'

—'মানে ?'

—'আমি ডাক্তার, আমাকে সাদা-কালো দুরকম টাকারই ব্যবস্থা রাখতে হয়। সরকারের ইচ্ছেয়। তাজবেঙ্গলের পার্টি পুরোটা কালো টাকায় হয়ে গেল। আপনার তো কালো নেই, কোত্থেকে দেবেন ? আপনার শুভ পবিত্র অর্থ আমি নেবোই বা কেন ?'

নতুন শীত পড়েছে। বিকেলগুলো বড় মলিন, বড় বিষণ্ণ হয়। আলো জ্বাললেও যেন আলো হয় না। তারাপদ বাড়ি আসতে চিঁড়েগুলো ভেজে ফেলল রমলা। কড়াইশুঁটি, বাদামভাজা দিয়ে মিশিয়ে একটা বড় বাড়িতে রাখল। দুজনের হাতে দু কাপ চা। চুপচাপ, চিঁড়েভাজা চিবোবার কুড়ুর কুড়ুর শব্দ। সন্ধে ঘন হয়ে আসছে। ঘরে ফেরা পাখির ডাকে কান পাতা দায়। মঞ্জু আর তীর্থঙ্কর গত সপ্তাহে বাঙ্গালোর চলে গেছে। তারাপদ অস্ফুটে একবার বললেন—'কোথা থেকে ম্যাজিকের মতো কী হয়ে গেল বলো তো ?'

রমলা ঘরের ভেতর দিকে তাকালেন, আড়চোখে রান্নাঘরের দিকে চাইলেন। বারান্দা, ছোট ঘর, কোথাও নেই। সে কোথাও নেই। কোকিল উড়ে গেছে। কাক আর কাকিনী তাদের ভাঙাচোরা বাসায় ফাটা ডিমের টুকরো মাঝখানে নিয়ে মুখোমুখি বসে থাকে।

করুণা তোমার

'ঠাকুরমার ঝুলি'র 'ছোটরানী আছাড় খাইয়া পড়িলেন'-এর মতো দৃশ্যটা। পাপু মেঝের ওপর শুয়ে পড়েছে। উপুড় পিঠটা নিথর। কাঁধের তলায় পিঠের ওপর দুদিকে দুটো ত্রিভুজ। একটু একটু উঠছে নামছে। ছোট চুল। বব-ছাঁট ছিল। একটু বড় হয়ে গেছে। তাই আগাগুলো মেঝেতে লুটোচ্ছে।

পাপুর বাবা ঘরে ঢুকেই অবাক।

—'একি ? পাপুর কী হলো ?' কোথাও কোনও জবাব নেই।

পাপুর বাবার পুনরুক্তি—'বলি, হলোটা কী ?'

পাপুর মা অর্থাৎ শ্রীলা উল বুনছিল। উলের থলি টেবিলের ওপর রেখে গম্ভীরভাবে বলল—'তুমি কি চা পান করবে ?'

হতভম্ব সুরজিৎ অর্থাৎ শ্রীলার স্বামী ওরফে পাপুর বাবা বলল—'চা তো আমি রোজই এ সময়ে পান করে থাকি। হঠাৎ প্রশ্ন ? প্রশ্নের জবাব এড়াতেই প্রতি-প্রশ্ন নাকি ?'

—'বোঝ তো বেশ। বুদ্ধি ভালোই। আরেকটু বাড়লে যেটা বুঝেছ সেটা মুখে বলে বোকা-বুদ্ধির পরিচয় দিতে না।'

—'বুদ্ধিও বুঝি। বোকাও বুঝি। বোকা বুদ্ধিটা কী ?'—সুরজিৎ তরল গলায় প্রশ্ন করছে। যদিও চোখ দুটো অনড় পিঠটার ওপর স্থির। মেয়ে সুরজিতের প্রাণ।

ঘরে ঢুকে পড়েছে পাপুর পিঠোপিঠি দাদা পিণ্টু।

—'বাবা জানো, আসলে...' পেছন থেকে তার মুখের ওপর হাত চাপা দিয়েছে শ্রীলা।

চা খাওয়া শেষ। চা এর সঙ্গে টা। পিণ্টু খেলতে বেরিয়ে গেল। রান্নাঘরে চায়ের বাসন ঠুনঠুন করে ধুচ্ছে বোধ হয় চুনী। শ্রীলা বলল—'চুনী, যা ঘুরে আয়। বেশি দেরি করবি না। ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যে তোর আড্ডা শেষ হওয়া চাই।'

কাচের চুড়ির আওয়াজ। চুনী বেরিয়ে যাচ্ছে। অন্য দিন মুখে খই ফোটে। আজকে দিদির মেজাজ খারাপ। আবহাওয়া থমথমে। চুনী তাই চুপচাপ বেরিয়ে গেল।

শ্রীলা বলল—'মেয়েকে ভালো শিক্ষা দিচ্ছো না।'

—'যা বাব্বা, আমি আবার কখন শিক্ষা দিলুম, ওসব তো তুমি আর তোমার কনভেন্টের মিসের এক্তিয়ার।'

—'না, ইয়ার্কি নয়। পুজোর কেনাকাটা করতে গিয়ে সেদিন পাপুর স্কাই ব্লু রঙের চাইনিজ সিল্কের চুড়িদার সেটটা কিনেছিলুম মনে আছে ? সাদা স্যাশের মতো আছে।'

—'তোমরা যে কেনাকাটা করতে গিয়ে কী কেনো, কত কেনো আর কতরকম কেনো...'

—'আচ্ছা, আচ্ছা হয়েছে। দয়া করে পুরোটা শোনো। চুনী সেটা দেখতে পেয়ে গেছে। ধরল ওকেও পুজোয় ঠিক ওই রকমই কিনে দিতে হবে। ওর খুব পছন্দ। ঠিক ওই রঙ, ওই ডিজাইন। এসব জিনিস তো ডুপ্লিকেট হয় না। দামও অনেক। আজকে ঠিক ওই জিনিসটাই দোকানে ঝুলছে দেখে কী মনে হল কিনে ফেললুম। মেয়েটা তো বরাবর পুরনো, রং জ্বলা জিনিস নিয়েই তুষ্ট আছে। বড় মুখ করে বলল। তা সেই থেকেই তোমার কন্যে অমনি পেছন উল্টে শুয়ে আছে।'

—'কেন ?' সুরজিৎ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

—'কেন বুঝতে পারছো না তো ! যাক, তোমার সম্পর্কে ভাবনা ছিল সেটা অন্তত ঘুচলো। বুঝতে পারছো না ? তোমার কন্যা চুনীর সঙ্গে একরকম জিনিস পরবে না।'

—'ও হো হো। তা পাল্টে দিলেই তো হয়। চাইছে না যখন।'

—'বাঃ চমৎকার। মেয়ের জেদ বজায় থাকবে ! হৃদয়বৃত্তি কোনদিন ডেভেলপ করবে না এমন করলে। দয়া করে একটু তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করো।'

সুরজিৎ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল—'তা হলে একটু টাইম দাও। তলিয়ে বুঝি।'

শ্রীলা রাগ করে সামনে থেকে উঠে গেল।

পাপুটার সঙ্গে চুনীটার যে কী রেষারেষি ! অনেক লোক বদলে বদলে অবশেষে এই মেয়েটাকে পেয়েছে সে। বছর পনেরর মেয়ে, পাপুর থেকে সামান্য ছোটই। দেখতে তো ছোট্টখাট্ট। একটু খরখরি। কিন্তু বেশ কাজের। অন্ততপক্ষে কথা বললে শোনে। বেশ চটপটে। মুখে হাসি লেগেই আছে। কথাও আছে সাতকাহন। একটু বড় হয়ে গেলেই এরা যেমনি সেয়ানা হয়ে যায়, তেমনি হয় বদমাশ। চুনী এসে শ্রীলার মনে শান্তি এনেছে। যেমন যেমন শেখায়, তেমন তেমন করে মেয়েটা। নিমেষে বুঝে ফেলে। ঘষর ঘষর বাটনা বাটছে, খচাখচ আনাজ কুটছে, ফটাফট জামা-কাপড় কেচে ফেলছে। কিন্তু কী যে নজর মেয়েটার ! পাপুর সঙ্গে সব কিছুতেই ওর পাল্লা দেওয়া চাই। ঠোঁটে রং, নেল পালিশ, জরিঅলা জুতো, চকচকে ঝলমলে জামা—এসব নিয়ে গোড়ায় গোড়ায় খুশি ছিল। এখন আর এ সব মনে ধরে না। পাপুর ফেলে-দেওয়া প্লীটেড স্কার্ট, জাম্পার, দর্জি দিয়ে তৈরি করানো সালোয়ার কামিজ এই সব মোটামুটি পায় ও। এইগুলো পরে পরে ওর রুচি ঘুরে যেতে শুরু করেছে। ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে পাপুর হেয়ার-ব্যান্ড মাথায় দিয়ে দেখছিল একদিন। পাপুর সেই থেকে ওর ওপর রাগ। শ্রীলা পরদিনই ওকে একটা হেয়ার-ব্যান্ড কিনে দিয়েছে। কিন্তু ও ঠিকই বুঝেছে দিদির জিনিসটার মহিমা আলাদা। মুখ গোঁজ করে থাকে। কথায় কথায় পাপুর সঙ্গে ওর লেগে যায়।

—'দুধে কেন সর রে ?' পাপু দুধে মুখ দিয়েই মুখ বিকৃত করে ফেলল।

—'মা তোমাকে কতবার, বলেছি তুমি নিজে ছেঁকে দেবে। এরকম করলে আমি দুধ খাবো না।'

শ্রীলা চেঁচাল—'চুনী, দুধ ছাঁকিসনি ? এত করে বলি যে...'

চুনীর খ্যানখেনে সরু গলা শোনা যাবে—'ছাঁকলুম তো। কতবার ছাঁকব ? আধ ঘণ্টা আগে দুধ ঠিক করে রেখে এসেছি। আবার পড়লে কি করবো ? দুধ আর ছাঁকনি নিয়েই সারা দিন দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তা হলে...' খরখরি বলেই যাবে, বলেই যাবে।

—'ও কিন্তু ঠিকই বলেছে পাপু, গরম দুধ আলগা থাকলে সর পড়বেই, যখন দেয়, তখন খেয়ে নিলেই পারিস।'

—'ও যখন যা দেবে, দয়া করে, ওর হাত থেকে সব নিয়ে নিয়ে খেতে হবে নাকি তক্ষুনি তক্ষুনি !'

পাপু ভীষণ রেগে যায়—'তুমি, তুমিই ওকে আশকারা দিয়ে দিয়ে এমনি করেছো।'

প্রায় কেঁদে ফেলে মেয়ে—'আমার একটা কথা থাকবে না। নিজের পছন্দমতো জিনিস কক্ষনো পাবো না। খারাপ হলে বলতেও পাবো না, যাও আমি খাবোই না।'

সাধাসাধি করেও মেয়েকে আর খাওয়াতে পারে না শ্রীলা। মহা জ্বালা হয়েছে তার। কোন দিকে যাবে ? পাপুর নালিশও ঠিক, পাপুর দিক থেকে। আবার চুনীর সাফাইও কতকটা ঠিকই তো।

পাপু পিন্টু কেউই খাবার দিলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে খায় না। ডেকে ডেকে মুখ ব্যথা হয়ে যায়। কাজের একটা শৃঙ্খলা আছে তো !

সুরজিৎ ডাকল—'পাপ্পু, আপ্পু উঠে পড়ো।'

কাঁধটায় একটু ঝাঁকানি দিল মেয়ে। ওর গড়ন একটু দোহারা। সামান্য এদিক ওদিক হলেই মোটা হয়ে যাবার ধাত। বাবা আপ্পু বলে ডাকলে ক্ষেপে যায়। খুব একটা সত্যি সত্যি নয় অবশ্য। সুরজিৎ নিচু হয়ে চুলের ঝুঁটি ধরল—'উঠে পড়।'

হঠাৎ একটা ঝটকা দিয়ে উঠে বসল পাপু। —'না বাবা, ইয়ার্কি নয়। মা কী বলতে চায় ! একটা কাজের মেয়ে আর আমি এক মায়ের কাছে ? আমাকে মা যা দেবে ওকেও ঠিক তাই দেবে ! পুজোর সময়ে ও আর আমি একরকম পরে ঠাকুর দেখতে যাবো !'

সুরজিৎ হেসে ফেলল—'বলিস কি রে ! একে দাদা তোর ভাগে ভাগ বসিয়ে রেখেছে। আবার আরেক শংকরা ?'

শ্রীলা বলল—'তুমি চুপ করো তো। দাদা ভাগ বসিয়েছে আবার কী ? ওকি একবারও বলেছে সে কথা ? তুমি তো দেখছি আরও জটিলতা, হিংসেহিংসি সৃষ্টি করছো।'

পাপু মুখ তুলে বলল—'হ্যাঁ আমি বাচ্চা কি না, বাবা বলল আর অমনি দাদাকে হিংসে করতে শুরু করে দিলাম।'

সুরজিৎ বলল—'আরে আমিও তো তাই-ই বলতে যাচ্ছিলুম। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করতে চললি, তুই কি একটা বাচ্চা ? বেবি !'

—'বেবি হলে এগুলো মনে হত না বাবা। মা লোকজন নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করে। মার সঙ্গে তো আর কিছু করবে না। তোমার সঙ্গেও না। মা মাথায় চাপাচ্ছে। আমাদের মাথায় উঠে নাচবে। তোমরা ফল ভোগও করবে না, বুঝবেও না।'

শ্রীলার ভীষণ রাগ হয়ে যায়, সেই সঙ্গে হতাশা। কাজের লোক তো দূরস্থান। অন্য কেউই সে কখনও ছেলে-মেয়ের সমান হতে পারে না, তা কী করে ওকে বোঝাবে ! সে বলল—'একটা, মাত্র একটা পোশাক তোমার মতো দিলেই, তোমার মনে হয়, ও আর তুমি আমার কাছে এক ? চমৎকার !'

—'তুমি অন্ধ মা, তুমি বুঝবে না। যেভাবে সব সময়ে ওর হয়ে ওকালতি করো। আমি হাল ছেড়ে দিচ্ছি। তোমাকে আমি বোঝাতে পারবো না।'

পিন্টু এসে ঢুকল। হাতে ঝুলছে ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট। বলল—'এখনও তোমাদের সেই এক নীলজামা প্রসঙ্গ চলছে ? আরে বাবা এটা বুঝছিস না কেন, তোর মতো জামা পরলেই কি চুনী তুই হয়ে যাবে ? চুনী চুনীই থাকবে।'

সুরজিৎ যেন হালে পানি পেল, বলল—'রাইট। দুজনে এক রকম জামা পরে বেরোলেও, কখনও দুজনকে একরকম দেখাবে না রে পাপু।'

পাপু গম্ভীর হয়ে বলল—'ঠিক আছে।'

সপ্তমীর দিনে চুনী সেজেগুজে নীল রঙের চুড়িদার পরে একগাল হেসে শ্রীলাকে প্রণাম করল, বলল—'পাপু দিদি, তুমি এই জামাটা কবে পরবে ?'

পিণ্টু বলল—'আরে এ চুনী, তু যে শাঁকচুন্নি বন গিয়া রে !'

চুনী বেশ কথার পিঠে কথা শিখেছে বলল—'আমার শাঁকচুন্নিই ভালো বাবা, কটা ভূত হয়ে কাজ নেই।'

পাপু নীল পোশাকটা আর কোনদিনই পরল না। অথচ খুব পছন্দ করে নিজে উদ্যোগী হয়ে কিনেছিল জিনিসটা।

জটিলতা এখানেই থেমে থাকল না। একদিন ওর বাতিল করে দেওয়া স্কার্ট-ব্লাউজ পরে চুনী পেছন ফিরে কি করছিল ঘরে, সুরজিৎ তাকে পাপু বলে ডেকে ফ্যালে। সেই থেকে পাপু আরও গম্ভীর হয়ে গেছে। ইদানীং ওর পুরনো জামা-কাপড়গুলোর শ্রীলা হদিস পাচ্ছে না। নিজের মেয়ের বয়সী কাজের মেয়ে থাকলে জামা-কাপড়ের খাতে খরচটা কমে। লোক রাখবার সময়ে এ হিসেবটাও মনে মনে করে নিতে হয়। জামা-কাপড়ের খরচ কি কম ? দিন কে দিন বেড়েই যাচ্ছে, বেড়েই যাচ্ছে। একদিন পাপুর অনুপস্থিতিতে তার আলমারিটা ভালো করে খুঁজে দেখল, তাকের পেছনের দিকে পুরনো তোয়ালে মোড়া বাতিল জামা-কাপড় গুছনো রয়েছে। কাউকে দেবে ? না নিজেই কিছু ভেবে রেখে দিয়েছে ? মেয়েকে হালকা গলায় জিজ্ঞেস করল—'হ্যাঁরে তোর কালো স্কার্টটা তো আর পরিস না, কোথায় গেল রে ?'

পাপু উদাস গলায় বলল—'কি জানি ?'

অথচ একটু আগেই শ্রীলা দেখেছে কালো স্কার্ট তোয়ালে-মোড়া সযত্নে রাখা রয়েছে। নিজেই রেখে দিয়েছে, অথচ অনায়াসে বলে দিল 'কী জানি !' মেয়েকে কিছু বলতে আর সাহস পায় না শ্রীলা। আসল কথা ওগুলোও চুনীকে দিতে দেবে না। এইভাবে নীরবে ওগুলো সরিয়ে রেখে সে কথাই ও জানাতে চাইছে। এখন শ্রীলা কী করে ?

অগত্যা আর বছরখানেকের মধ্যে শ্রীলা চুনীকে শাড়ি ধরায়। পাপুকে পারবে না। পাপু এখনও অনেক বয়স পর্যন্ত অনেক রকম পোশাক পরবে। চুনী তো আরও ক্ষয়া চেহারার মেয়ে, স্বাস্থ্য অনেক ভালো হলেও পাপুর কাঠামো সে পাবে কোথায় ? অনায়াসেই আরও ক' বছর চালিয়ে দিতে পারা যেত। চুনীর খুব পছন্দ হচ্ছে না ব্যাপারটা, বোঝাই যাচ্ছে। ফ্রক স্কার্টে বয়সটা বেশ ঢেকে রাখা যায়। সব মেয়েই বাচ্চা থাকতে চায়। শ্রীলাদের ঘরেব মেয়েও। চুনীদের ঘরের মেয়েও। শ্রীলা নিজের একটা লাল শাড়ি বাছে। লাল রংটা আজকাল আর পরছে না সে। শাড়িটা দিব্যি নতুন।

—'চুনী, চুনী, দ্যাখ দিকি, এই শাড়িটা পছন্দ হয় কিনা।'

লাল টাঙ্গাইল শাড়ি, জরিপাড়। এই অসম্ভব প্রাপ্তিতে খুশিতে ঝলমল করতে থাকে চুনী।

—'এটা আমার, মা ?'

—'হ্যাঁ রে তোর, বেশ লম্বা হয়ে গেছিস, শাড়ি ধরে ফ্যাল এবার।'

চুনী আমতা আমতা করতে থাকে—'মাঝে মাঝে পরব মা। সব সময়ে পরলে কাজের অসুবিধে হবে না ?'

—'যেগুলো আছে সেগুলো পরতে থাক। এরপর যখন দরকার হবে শাড়িই দেবো।' সিদ্ধান্ত নেওয়ার গলায় শ্রীলা বলে। আরেকটা পরিত্যক্ত ছাপা শাড়ি এনে চুনীকে গছায়,

সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিক সমস্ত। ব্লাউজগুলো একটু ঢলঢল করে, ছুঁচ সুতো দিয়ে তাকে মেরে ছোট করে নেয় চুনী। কখনও শ্রীলা নিজেই করে দেয়। এইভাবে একরকম হঠাৎই চুনীর ফ্রক-স্কার্ট থেকে শাড়িতে উত্তরণ ঘটে যায়। পাপুর সঙ্গে তাকে গুলিয়ে ফেলবার কোনও উপায়ই থাকে না। একজন জীনস টিশার্ট, অন্যজন শাড়ি। একজন লম্বা স্কার্ট, অন্যজন শাড়ি। একজন কাফতান, অন্যজন শাড়ি। শাড়ি এবং শাড়ি এবং শাড়ি।

প্রথম প্রথম কাঠিতে জড়ানো কাপড়ের মতো দেখাতো শাড়ি-পরিহিত চুনীকে। কিন্তু বেশ কয়েক বছর শ্রীলা সুরজিতের সংসারে থেকে তার কালো রঙে চাকচিক্য এসেছে, চুলে ঔজ্জ্বল্য। এখন শাড়ির আড়ালে হঠাৎ-ই যেন তার শরীর ভরে উঠতে থাকে। পরিচ্ছন্ন পাট পাট করে ধোপদুরস্ত, রঙ-মিলোনো শাড়ি ব্লাউজ পরে চুনী যখন ঘোরে ফেরে দোকানের শো-কেসের কালো মডেল পুতুলের কথা মনে পড়ে যায় শ্রীলার। কিন্তু খুব শীগগিরই শ্রীলা অস্বস্তির সঙ্গে আবিষ্কার করে চুনী শুধু তার চোখেই নয়, পাড়ার রিকশঅলা, বস্তুতলের কেয়ারটেকার, দারোয়ান, চায়ের দোকানের ছেলে, পাড়ার কিছু অকালকুষ্মাণ্ড—এদের চোখেও বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। চুনীর বিকেলের ছুটির সময় ক্রমশই বাড়ছে। অন্যান্য বাইরের কাজ, যেমন দুধ আনা, বাজার করা, মিষ্টির দোকান ইত্যাদিতেও সে অনেক বেশি সময় নিচ্ছে। এবং সময় টময় নিয়ে যখন বাড়ি ফিরছে তখন সারা শরীরে বেশ একটা হিল্লোল নিয়ে ফিরছে। চোখে মুখে যেন খুশি আর ধরে রাখতে পারছে না।

একদিন পিন্টু এসে বলল—'মা, চুনীটা কি ওস্তাদ হয়েছে জানো, রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা কুলি-কাবাড়ি লোকের সঙ্গে যাচ্ছে তাই ইয়ার্কি দিচ্ছিল। আমি দেখেও ফেলেছি, শুনেও ফেলেছি।'

শ্রীলা গৃহ-সমস্যার সব কথা সুরজিৎকে বলে না। এটা বলল—'দিনকাল ভালো না। এভাবে চললে বিপদে পড়তে কতক্ষণ?'

সুরজিৎ গম্ভীরমুখে বলল—'আরও আদর করে শাড়ি পরাও!'

—'কেন, কত দুঃখে শাড়ি ধরিয়েছি জানো না নাকি?' শ্রীলা রাগ করে বলে। সুরজিৎ হেসে বলল—'যে কারণেই পরিয়ে থাকো, তোমার হাত থেকে তাস এখন বেরিয়ে গেছে। এবার ট্রাম্পড হবার জন্য প্রস্তুত থাকো।'

সত্যিই চুনীকে সামলানো এবার দায় হয়ে উঠল। যখন-তখন খিল খিল খিল, চুনী কাজ করছে না তো, ঘরে-দোরে নদী বইছে, এত ঢেউ। চুড়ির রিনিঠিনি, বাহারি টিপের রং-চং, চটির ফটাস ফটাস। মাথায় টপ নট। ক্লিপ দিয়ে দু পাশ থেকে চুল তুলে মাথার পেছন দিকে আটকানো, বাকি চুল ছাড়া পেছনে, চুনী কিছুই শিখতে বাকি রাখেনি। লাল শাড়ি পরে এইভাবে ঢেউ কাটতে কাটতে চুনী সুরজিৎকে, পিন্টুকে জলখাবার দেয়। শ্রীলার চোখ করকর করে। নানা ছুতোয় ধমকায় সে মেয়েটাকে।

পিন্টু বলে—'কি রে চুনী, আজ যে দেখছি টিকায়াম আগুনম।'

চুনী দারুণ চালাক। ঠিক ধরতে পারে, বলে—'বাজে বকো না দাদা। যতই অং বং চং বলো ফিলিমের আসল হিরোইনরা রেখা শ্রীদেবী সব কালো, কুচকুচে কালো।'

সুরজিৎ বলে—'তাই নাকি রে?'

শ্রীলা প্রসঙ্গ থামাতে এক ধমক দেয়—'তুমি চুপ করো তো। চুনী চুপচাপ কাজ কর। যত্ত বাজে কথা।'

চুনী দাঁত বার করে বলল—'হিঁ, আমি সত্যি জানি মা, সব্বাই তো আর পাপুদিদির মতো গোরে গোরে নয়।'

—'তুই থামবি ?' শ্রীলা আবার বলল।

পাপু শেষ লুচিটা কোনমতে মুখে পুরে উঠে গেল।

চুনীকে সোজাসুজি ধমকানোটা আর এড়ানো যাচ্ছে না। হেমন্তের সন্ধে। রবিবার। শ্রীলা ছাড়া কেউ বাড়ি নেই। চুনী আড্ডা সেরে বাড়ি ফিরল।

শ্রীলা গম্ভীর মুখে বলল—'চুনী শোন। চটিটা ছেড়ে এসে এ ঘরে শোন।'

চুনী আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে এসে দাঁড়াল।

—'যত রাজ্যের ছেলের সঙ্গে অত বাজে বকবক করিস কেন রে ? সিঁড়ির মোড়ে দাঁড়িয়ে লিফটম্যান জালাল। নিচে দারোয়ান বাহাদুর, রাস্তায় হরেক রকমের ছোকরা তাদের সঙ্গে তোর অত কলকলানি কিসের ? বিপদে পড়তে চাস না কী ?'

চুনী আঙুলে শাড়ির আঁচল জড়াতে জড়াতে বলল—'দিদিও তো করে। দিদির তো অত ছেলে-বন্ধু, তারা বাড়িতে এসে যখন গল্প করে দিদিও তো হেসে হেসে ইয়ার্কি দেয়। তখন তো কিছু বলো না। তা ছাড়া আমি তো শুধু রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে একটু গল্প করি, দিদি যে সিনেমায় যায়, পিকনিকে যায়, সেগুলো বুঝি কিছু না।'

হাসবে না কাঁদবে শ্রীলা ভেবে পায় না। বলল—'ওরা তো সব দিদির কলেজের, ক্লাবের বন্ধু, মেয়ে-বন্ধুদের সঙ্গে ওদের কোনও তফাত-ই নেই। তোর কি তাই ? তুই যেটা করিস সেটা ভালো দেখায় না তো বটেই, তুই একদিন মহা বিপদে পড়বি। কী বিপদ, কেন বিপদ কিছু কিছু বোঝবার বয়স তোর হয়েছে চুনী।'

চুনী গোঁয়ারের মতো বলল—'সব্বাই মোটেই দিদির কলেজের বন্ধু নয়, দিদি তো একজন লম্বা গোঁফ দাড়িঅলা ছেলের সঙ্গেও একা একা ঘোরে। সিনেমা যায়। ইস্টিশানে একদিন ট্রেন থেকে নামল।'

—'তুই কোত্থেকে দেখলি ?'

—'আমি জানি।'

শ্রীলা স্তম্ভিত।

সেদিন সুরজিৎ ফিরলে তাকে সব খুলে বলে শ্রীলা দৃঢ়কণ্ঠে দাবি জানাল—'মেয়ের বিয়ে দিতে হবে।'

সুরজিৎ বলল—'ক্ষেপেছো ? সবে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছে, পার্ট ওয়ান এসে গেল। এখনই বিয়ে ? তুমিই না বলতে মেয়ে তোমার ছেলের সমান সমান। পড়বে, যতদূর ইচ্ছে, ডক্টরেট করবে, চাকরি করবে।'

—'সে আমার ভাগ্য আর আমার মেয়ের ভাগ্য। কপালে যদি না থাকে আমি কি করবো বলো, আমার দিক থেকে তো চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।'

সুরজিৎ বলল—'তুমি এখনই অত হতাশ, অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়ছো কেন ? সে ছেলেটি কে, কার সঙ্গে মিশছে, ব্যাপারটা আদৌ সত্যি কিনা এসব জানো, জানতে চাও। চুনী কি না কি বলল, তুমিও অমনি বিশ্বাস করে বসলে ? তা ছাড়া সত্যিই যদি সিরিয়াস কিছু হয় মেয়েকে টেনে এনে বিয়ে দিতে পারবে ? না সেটা উচিত হবে ? তুমি কোনকালে আছো বলো তো ?'

শ্রীলা গম্ভীরভাবে বলল—'তুমি ঠিকই বলেছো। কিন্তু আমি মা। আমাকে সব সময়ে আগামী কালে থাকলে চলে না। তুমি যত সহজে 'জানো, জানতে চাও' বললে আমি তা

পারবো না। উপদেশটা তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। এটা আমার চ্যালেঞ্জ। বাবারা সব সময়ে কথায় বার্তায় সুপার ফাস্ট। কাজে-কম্মে মান্ধাতার যুগে। আমি অন্তত এ বিষয়ে এটা চলতে দিতে রাজি নই।'

সুরজিৎ বলল—'ঠিক আছে। চ্যালেঞ্জটা আমি গ্রহণ করলাম।'

সুরজিৎ চ্যালেঞ্জ নেবার দিন সাতেকের মাথায় শ্রীলা জানল—'গোঁফ-দাড়িঅলা লম্বা একটি বন্ধু সত্যিই পাপুর হয়েছে। ছেলেটি হোস্টেলে থাকে। এম ই করছে। য়ুনিভার্সিটির চত্বরেই আলাপ। পাপুর গ্রুপের সঙ্গেও ওর ভালোই চেনা। তবে হ্যাঁ, পাপু দু-এক দিন ওর সঙ্গে কয়েকটা খুব ভালো ভালো বিদেশি ছবি দেখতে এসপ্লানেড পাড়ায় গিয়েছিল। বালিগঞ্জ স্টেশনে একবার ওরা কয়েকজন বন্ধুকে ট্রেনে তুলে দিচ্ছিল, নিজেরা কোথাও যায়নি। পাপু জানতে চেয়েছে কোথা থেকে সুরজিৎ এত কথা জানতে পারল। সে তো লুকিয়ে কিছু করেনি। অন্যান্য বন্ধুদের মতোই জয়ও একদিন এ বাড়িতে আসতোই। ইন ফ্যাক্ট জয় পরের রবিবার নিজেই আসতে চেয়েছে।

ছেলেটি—জয়দীপ—যেদিন বাড়িতে এলো সুরজিৎ, শ্রীলা তো বটেই পিণ্টু শুদ্ধু মুগ্ধ হয়ে গেল। সোজা স্বাস্থ্যবান চেহারা, দাড়ি গোঁফে দারুণ ইনটেলেকচুয়াল দেখায়। অথচ কোনও কৃত্রিমতা, কোনও দম্ভ নেই। এঞ্জিনিয়ার হলে কি হবে, কবিতা এবং ফিলম সম্পর্কে দারুণ আগ্রহ, শুধু পাশ্চাত্য সংগীত সম্পর্কে কথা বলেই সে পিণ্টুকে কাত করে দিল। খাবার সময়ে খুব সহজভাবে জয় জানাল সে শিগগিরই এম আই টিতে ডক্টরেট করতে চলে যাবে। বাবা মার ইচ্ছে বিয়ে করে যায়। বউকেও শিগগিরই নিয়ে যেতে পারবে। পাপুর সঙ্গে বিয়ে হলে সে খুব আনন্দিত হবে। শ্রীলা সুরজিৎ উভয়েই অবাক। এত তাড়াতাড়ি, এভাবে যে এমন প্রস্তাব কেউ করে ফেলতে পারে তারা ভাবতেই পারেনি। পাপুটারও মুখ লাল হয়ে গেছে। সে বোধ হয় এত সব ভাবেনি।

সুরজিৎ বলল—'সে কি! তোমার বাড়ি, বাবা-মা?'

জয় হাসল, বলল—'বাবার বর্ধমানে নার্সিং হোম আছে। ডাক্তার। মাও সেসব সামলান। ওঁরা নিশ্চয়ই শিগগিরই এসে দেখা করবেন। তবে বিয়ের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। পাপুর পার্ট ওয়ানের পরই বিয়েটা হতে পারে। ডিসেম্বর নাগাদ আমি চলে যাবো। পাপু পার্ট টু-টা দিক। তারপর আমি এসে নিয়ে যাবো। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স ওখানেই করবে। অসুবিধে কি? স্টুডেন্টস ভিসায় বরঞ্চ এটাই যাবার সুবিধে। আমি আমার বায়োডেটা কাল পরশুর মধ্যেই দিয়ে যাবো।'

জুলাই মাসের এক আশ্চর্য সুন্দর বৃষ্টি-ধোয়া অকালবসন্তের হাওয়া-বওয়া দিনে মাত্র উনিশ বছর বয়সে পাপুর বিয়ে হয়ে গেল। এবং জুলাই মাসেরই এক উপর্যুরিস্তু বাদল দিনে চুনী এসে শ্রীলাকে জানাল, সে কাজ ছেড়ে দিচ্ছে। কারণ সে বিয়ে করছে। বর রাজ-মিস্ত্রি। সনাতন মিস্ত্রির নাম এ দিকে কে না জানে, ঢালাই বাবদই হাজার হাজার টাকা কামায়। তাকে আর চাকরি করতে দেবে না বর। বারুইপুরে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে থাকতে হবে। কোনও ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা নেই। খালি এক শাশুড়ি।

শ্রীলা অবাক হয়ে বলল—'কবে হবে বিয়ে? কোথায়?'

চুনী সলজ্জে জানাল—'বিয়ে হয়ে গেছে গত পরশু। কালীঘাটে। চুলের ভেতরে সিঁদুর সে লুকিয়ে রেখেছিল।

শ্রীলা বলল—'আগে বললেই পারতিস। তোর বাবা-মা নেই। আমরাই দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিতে পারতুম। একটু খোঁজ-খবর নিতে পারতুম।'

চুনী সলজ্জ নতমুখে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে জানাল—'তারও দিদির মতোই হুট বলতেই বিয়ে হয়ে গেল।'

শ্রীলা মনে মনে খুব খানিকটা হাসল। কে জানে, দিদির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতেই বিয়েটা ও হুট করে করে ফেলল কি না! কিছুই অসম্ভব নয়। সে পাপুর উপহারের শাড়ি থেকে বেছে একটা রঙচঙে ভালো সিল্কের শাড়ি চুনীকে দিল। নিজের একটা হালকা রুপোর সেট ছিল, সেটাও দিয়ে দিল। বলল—'এতদিন চাকরি করে যা পয়সা জমালি সব পোস্ট অফিসে তোলা আছে। এই নে পাস বই। সাত বছরে এগার হাজারের মতো জমেছে। সাবধানে রাখিস চুনী। এই এখন তোর সর্বস্ব।'

চুনী শ্রীলাকে প্রণাম করে ছলছল চোখে বাড়ি ছাড়ল।—'বাবার সঙ্গে, দাদার সঙ্গে দেখা হল না মা। পরে এসে নিশ্চয়ই দেখা করে যাবো।'

আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর শেষ হয়ে গেল। প্রত্যেক মাসে, প্রত্যেকবার যখন পাপু আসে, শ্রীলা অবাক হয়ে দেখে, সে প্রতিদিন আরও সুন্দর, আরও শ্রীময়ী হয়ে উঠছে। বরাবরের গোলগাল ভাবটার ভেতর থেকে কে যেন বাটালি দিয়ে কেটে বার করে আনছে ধারাল চেহারা। গোঁয়ার, জেদী, রাগী ভাবটা কোমল ঝলমলে লাবণ্যে কবে মিলিয়ে গেল। সে যে আপাদমস্তক জয়দীপ নামে মানুষটার বিস্ময় দিয়ে মোড়া, এখনও বুঝতে পারছে না একটা অপরিমিত আনন্দের ভাণ্ডার তার সামনে কেমন করে খুলে গেল, এ বিস্ময় কেমন করে তার নিজের ভেতরেই লুকিয়ে ছিল—এ কথা শ্রীলা সুরজিৎ বুঝতে পারে। নিজেদের মধ্যে সুখের হাসি হাসে। যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। ডিসেম্বরে জয়দীপ চলে গেল। এপ্রিলে ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে পাপুও যাবে। এ কটা মাস প্রধানত মায়ের কাছেই থাকছে সে। একদিন নিজের পুরনো আলমারি গোছাতে গোছাতে পাপু একটা প্যাকেট হাতে বলল—'মা, একদম নতুন একটা চুড়িদার কামিজ রয়েছে, দ্যাখো, কি সুন্দর পাউডার ব্লু রংটা।'

শ্রীলা মুখ ডুবিয়ে ডাই জামায় বোতাম বসাচ্ছিল। মুখ না তুলেই বলল—'যা হঠাৎ তোর বিয়ের ঠিক হয়ে গেল, এখনও কত ওরকম নতুন ড্রেস পড়ে রয়েছে দ্যাখ। স্কার্ট-টার্ট নিয়ে যা না ক'টা। বিদেশে পরতে পারবি। নতুন নতুন জিনিসগুলো নষ্ট হবে, খুব গায়ে লাগে রে!'

পাপু বলল—'না মা, এটা একদম নতুন। কি সুন্দর চওড়া সাদা স্যাশ!'

শ্রীলা এইবার ফিরে দেখল। চিনতে পারলো। তিন-চার বছর আগের পুজোয় কিনে দেওয়া সেই চায়না-সিল্কের পোশাক যা পাপু কোনদিন স্পর্শ করেনি। কেন পরেনি সেটা ও বেমালুম ভুলে গেছে। সে হেসে বলল—'পর না পাপু, আজই পর।'

—'পরব?' চুল দুলিয়ে পাপু বলল—'আজ বিকেলে একটু লাইব্রেরি যাবো মা, তখন পরব, হ্যাঁ?'

সন্ধে পার হয়ে গেছে। এসব পাড়ায় শাঁখ বাজে না। কিন্তু ধূপ জ্বলে। শ্রীলা ঘরে ঘরে চন্দন-ধূপ জ্বালিয়ে দেয়। ধূপের অনুষঙ্গে শাঁখের আওয়াজও কেমন মনে এসে যায়, মনের মধ্যে বসে—স্বর্গতি পূর্বনারীরা শাঁখ বাজান। অমঙ্গল অশুভ দূর হয়ে যাক এই প্রার্থনা বুকে নিয়ে মধ্য কলকাতায় ভীরু কিশোরী সন্ধের শাঁখ। সে সময়ে চারপাশ ঘিরে বাবা-মা-ঠাকুমা-দাদা-দিদিরা থাকা সত্ত্বেও সন্ধের মুখটাতে পৃথিবীটাকে কেমন একটা নাম-না-জানা অপরিচিত রহস্যের জায়গা, দুঃখের জায়গা বলে মনে হত। সেই বিষাদের অনুষঙ্গও ধূপের গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে। এই সময়কার নির্জনতাটুকু শ্রীলা খুব

রোম্যান্টিকভাবে উপভোগ করে।

বেল বাজল। ছেলে গেছে দীঘা। সুরজিৎ আজ অফিস-ফেরত পাইকপাড়ায় যাবে। তার বৃদ্ধ জ্যাঠামশাই খুব অসুস্থ। আসতে দেরি হওয়ার কথা। তবে নিশ্চয় পাপুই। দরজার ফুটোয় চোখ লাগিয়ে কিন্তু সে পাপুকে দেখতে পেলো না। আধা-অন্ধকারে ল্যান্ডিংটাতে পুঁটলি হাতে করে যেন চুনী দাঁড়িয়ে আছে। দরজা খুলে দিয়ে শ্রীলা থমকে দাঁড়াল—চুনীই তো!

—'কি রে চুনী?'

চুনী হঠাৎ ল্যান্ডিংটার ওপরই বসে পড়ল। হাঁউ মাউ করে কেঁদে উঠে বলল—'মা আমায় তোমার কাছে আবার কাজ করতে দাও মা। তোমার কাছে আমায় ঠাঁই দাও মা!'

আলোটা জ্বেলে দিল শ্রীলা। পেছনে পাপু এসে দাঁড়িয়েছে। হালকা নীল চুড়িদারে তাকে বড় পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল, শান্ত, সুস্থিত লাগছে। কিন্তু শ্রীলা তাকে দেখছে না। দেখছে চুনীকে। চুনীর সেই কালীঘাটের কালীর মতো চকচকে কালো কোথায় গেল? আপাদমস্তক খসখস করছে। এই ক'মাসে সে অমন হাড়-জিরজিরেই বা হল কী করে? পরনের শাড়ি ব্লাউজ দুটোই চিট ময়লা। চুলে জট, যেন হাওড়া-শেয়ালদার সারাদিন ধরে বেগুন-ঢেঁড়স-বেচা শহরতলির ফেরিওয়ালী। কিংবা সোজাসুজি ভিখারিণী। কোলে একটা পেট ফুলো, ন্যাংটাপুটো বাচ্চা ধরিয়ে দিলে মানাত।

শ্রীলা বলল—'কাজ করবি তো বেশ কথা। কাঁদছিস কেন? সনাতনের কী খবর?'

—'ও মিনসের নাম করো না মা', এ ক'মাসে চুনীর মুখের ভাষারও অনেক অবনতি ঘটেছে, 'ঠগ, জোচ্চোর, আমার জমানো টাকাগুলো তুইয়ে বুইয়ে নিয়ে নিয়েছে, শাউড়িতে আর ওতে মিলে মেরে মেরে আমায় উচ্ছন্ন করে দিয়েছে মাগো! এই দ্যাখো।' ছেঁড়া ব্লাউজের ভেতর থেকে কালশিটের দাগ দেখায় চুনী, বলে, 'তারপর-পরশুদিন কোত্থেকে ছেলেপুলে সুদ্ধ একটা বউকে নিয়ে এসে বললে—"এই আমার আসল বউ। তুই দূর হয়ে যা"—চুনী আবার হাঁউমাউ করে উঠল।

শ্রীলা এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বলল—কাঁদিসনি চুনী। ওরা ওইরকমই হয়। তুই তো আমাদের কথা শুনিসনি। ঘরে আয়। কাপড় দিচ্ছি, সাবান দিচ্ছি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নে। সে আবার এসে গোলমাল করবে না তো?'

—'ইস্, গোলমাল করলেই হল? নিজেই তো বলল, "কালীঘাটের বিয়ে আবার বিয়ে!" এই বাড়িতে তোমার কাছে থাকতে পেলে আমি আর কোথাও কখনো যাবো না মা!'

শ্রীলার এত দুঃখেও হাসি পেলো। তার শাশুড়ি একবার বলেছিলেন, 'পেটের খিদে মিটে গেলে, গায়ে-গতরে একটু শাঁস-জল লাগলেই এদের অন্য খিদে চাগাড় দিয়ে উঠবেই। তখন মিষ্টি কথাই বলো আর টাকাই দাও। কিছু দিয়েই বশ মানাতে পারবে না।'

চুনী পুঁটলি খুলে বলল—'তোমার দেওয়া সিল্কের শাড়িখানা খালি আনতে পেরেছি মা, গয়নাগুলো সুদ্ধ গা থেকে খুবলে খুবলে নিয়েছে।'

'ঠিক আছে। তুই এই কাপড়খানা পর।' শ্রীলা নিজের ঘরে গিয়ে আলনা থেকে তার ঘরে পরার একখানা শাড়ি আর ব্লাউজ তক্ষুনি এনে দিল।

—'যা বাথরুমে যা চুনী। এরকম নোংরা হয়ে থাকিসনি। দেখতে পারছি না।'

চুনী বাথরুমে ঢুকে গেল। শ্রীলা হালকা মনে পাপুর ঘরে ঢুকল।

—'ভালোই হল, বুঝলি পাপু। এতদিন ধরে লোক খালি আসছে আর যাচ্ছে। একটাও ভালো...'

থমকে গেল শ্রীলা। পাপু বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে। নীল চুড়িদার পরনে। তার পিঠের দুটো তিনকোণা হাড় জামার মধ্যে দিয়ে উঠছে নামছে। ঝুঁটি বাঁধা চুল পিঠ থেকে কাঁধের ওপর জাপানি পাখার মতো ছড়িয়ে গেছে। ছবিটা কেমন পরিচিত লাগল শ্রীলার। সে ঝুঁকে পড়ে পাপুর পিঠে হাত রাখল। হঠাৎ কী হল?

সে নরম গলায় বলল—'পাপু! জয়ের জন্য মন কেমন করছে? আর ক'মাস পরেই তো দেখা হবে, কাঁদছিস কেন?'

পাপু তেমনি উপুড় হয়ে ভাঙা ভাঙা বোজাগলায় বলল—'মা; চুনীর কী কষ্ট...মা! কেন এমনি হবে?'

শ্রীলা ঝুঁকে ছিল। সোজা হয়ে গেল। খাটের মাথার দিকে শুভ্র দেওয়াল। সেখানে কি কোনও লিখন? অনন্ত-কারুণিক কোনও আশিস-দৃষ্টি? নিদাগ দেয়ালের সেই অলক্ষ্য চাহনির দিকে শ্রীলা তাকিয়ে রইল পরম আনন্দে, বিষাদে। কৃতজ্ঞতায়। পাপু কাঁদছে। নিজের জন্য নয়। চুনীর জন্য।

শিরিষ

আমার, তোমার, সবার দেশের মতনই সে এক দেশ ছিল। দেশে নগর ছিল, গ্রাম ছিল, গঞ্জ ছিল, বাজার-হাট-মেলা-মোচ্ছব সবই ছিল। কিন্তু কোনও কিছুরই যেন কোনও ছিরি ছিল না। কেউ গাইলে মনে হত সারাক্ষণই কেন অমন কাক ডাকে গো! কেউ নাচলে মনে হত যেন মামদো-গোভূতে নেত্য করছে। তাল ছটকে যায়, সুর হড়কে যায়, লয় পিছলে যায়। অন্নের স্বাদ খড়ির মতন। আনাজপাতি ভুসকো, জলের মাছ জলেই মরে, দেশ ভরা শুধু ধোঁয়া কালি আঁধার আর আওয়াজ।

কেউ জানে না সেই মামদো গোভূতের গাঁক গাঁক আওয়াজের দেশে শিরিষ কোথা থেকে এলো। এ চত্বরের সবচে' বুড়ো মানুষ, যার নাম নবীনমাধব, সে নাম এখন কেউ জানে না, সবাই ডাকে সাগুেলখুড়ো, সেই খুড়ো যে চোখে দেখে না, কানে শোনে না, কি শীত কি গ্রীষ্ম বাঁদুরে টুপি চড়িয়ে যে খালি কে যায়, কোথায় যায়, বলে সারাবেলা খামোখা হাঁকড়ে হাঁকড়ে ওঠে, সেই নবীনমাধবও না। কেউ যদি একবার জিজ্ঞেস করে—'শিরিষ ঠাকরুণ কোত্থেকে এলো গো?' অমনি সে কানের পেছনে হাত দিয়ে সাত বার কোশ্চেন করে শোনে, তারপর ভুরু কুঁচকে সরু চেরা বাঁশের মতো গলায় বলে ওঠে—'কি জানি বাপু, কেমন করে কখন ঘটে গেল ঘটনাটি।'

রাস্তার মোড়ে ঘেরা মাঠ, মাঠের ঈশান কোণে ঈশানী এক মহীরুহ বৃক্ষ। তার আগাপাশতলা খালি পাখির বাসা আর পাখির বাসা। সন্ধের ঝোঁকে গাছ ঘিরে কলকলানি ক্রমেই এমন জোরালো হয়ে ওঠে যে মনে হয় পাহাড়ি নদী বইছে, পাগলাঝোরা হয়ে এখুনি পাথর টপকে টপকে নামবে। এই গাছটিতে কখন পাতা ঝরে, কখন পাতা গজায়, কখন কোন পাখি বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে, বাচ্চা ফোটায়, আবার উড়ে যায়, কেউ কি কখনও নজর করে দেখেছে? কেউ দেখেনি। অথচ বৃক্ষ ক্রমেই আরও বলবান, আরও বীর্যবান, আরও আশ্রয়শীল, আরও ছায়াময় হয়ে উঠছে। কেউ জানে না তার ইতিহাসও।

মাঠের কোণের গোলাপি বাড়িটা কবে শিরিষের পিতৃপুরুষ কিনেছিলেন, কবে শিরিষ অন্য কোথাও জন্মালো, কবে, কেমন করে বড় হল, কেন এখানে সোমত্ত বিধবা (?) চলে এলো, কবে তার বিষাদ যোগ, সাংখ্যযোগ শেষ হয়ে কর্মযোগ শুরু হল, অতশত ইতিবৃত্ত কে-ই বা মনে রেখেছে। নবীনমাধব বলে 'আমায় শুধিও না বাপু, বলে নিজের জ্বালাতেই মলাম!' বুড়ো যেন সংসারের ভারি ভুরি বড় গিন্নির মতো পেটের মধ্যে অনেক কথা রাখে ঢাকে।

শিরিষের ঘরসংসারের বাইরের দিকে একটি দারোয়ান, একটি কোচোয়ান। একটি

মালি, আর ভেতরদিকে একটি দাস, একটি দাসী, এবং একটি একমাত্তর কন্যে। এরাই বাড়ির বারমহলে, অন্দরমহলে হাত পা ছড়িয়ে বসবাস করে। অতবড় বিঘের ওপর বাড়ি বাগান! তার দেখ-দেখালি, গোছ-গোছালি সব এরাই রয়ে বসে করে। ছোট্ট টুকটুকে মেয়েটি সাবেক কালের টমটম গাড়ির বাইরে বড় একটা পা দেয় না, টকাটক আসে, টকাটক যায়, এক ঝলকে লোকে শুধু দেখতে পায় ঠাকরুণের কন্যেটি যেন ভরা গ্রীষ্মের চম্পক, কিংবা গন্ধরাজ, সূর্যের সবটুকু সৌরভ শুষে নিয়ে তৈরি হয়েছে। অন্দরের বাগানে সে আপনমনে খেলে বেড়ায়, নেচে বেড়ায়, গেয়ে বেড়ায়, সব একা-একা। নয়তো তার মায়ের সঙ্গে। কিন্তু তার মা শিরিষ ক্রমেই অন্দরমহল থেকে বারমহল, বারমহল থেকে দেউড়ি, বারান্দা থেকে বাগান, বাগান থেকে বড় রাস্তা, দোকান, বাজার, ব্যাঙ্ক ইস্কুল, কলেজ, কেলাব, খেলাধুলো, যোগব্যায়াম, সাঁতার...।

জিনিসটার শুরু হয় এইভাবে। পাড়ার বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা চাঁদা চাইতে এসেছিল। সরস্বতীপুজো করবে। দারোয়ান রামখেলাওন তাদের হাঁকিয়ে দেয়। তার বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত। পাড়া বেপাড়া যেখানে যোতো সোরোসতী মাঈ আসছে সোবাই কি তার মাকে পুছে পুছে আসছে! পুছে পুছে যদি না আসলো তো ভাগ্ ভাগ্ হিঁয়াসে। বাচ্চা তো নয়, চুহা এক-একটা। বিল্লি ভি আছে। লেকিন মিলে মিশে আছে, তাইতে কেস বহোৎ খতরনাক হয়ে যাচ্ছে। এই রকম রামখেলাওনি বিশ্লেষণের মাঝমধ্যিখানে একটি চুহাসম বাচ্চা ভেতর বাড়ির দিকে দৌড়ে গিয়ে 'মাসিমা, মাসিমা, আসতে দিচ্ছে না' বলে সরু গলায় চেঁচাতে থাকে। শিরিষ তখন সেই মুহূর্তটা নিরানন্দের কেন্দ্রবিন্দুতে মধুতে আটকানো মক্ষীর মতো নিশ্চল ছিল। বাচ্চার মিঠে গলার তীক্ষ্ণ ডাক একেবারে তার বুকের মধ্যে গিয়ে পৌঁছলো, তার মনে হল সে নিজেই বুঝি কাকে কিছুতেই আসতে দিচ্ছে না। সেই কেউ তার দোরের বাইরে ধর্না দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার মিষ্টি সরু গলা অনেক আকিঞ্চনে তার কাছে প্রার্থী। সে তার দোতলার পুরনো মার্বেলের ঘর থেকে এক ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। হঠাৎই যেন তার মরা নদীর সোঁতায় জোয়ার এসেছে। উঠোনের এক দিকে লম্বা চওড়া ইয়া গোঁপ, ইয়া গুল রামখেলাওন, অন্যদিকে অস্বাভাবিক সাদা, ক্ষীণা এক উদাসিনী নারী। মাঝখানে পড়ে বাচ্চাটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চেঁচাতে ভুলে গেছে।

শিরিষ বলল—'চাঁদা নিয়ে কি করবি খোকন?'

বাচ্চাটি ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলে বলল—'খাবো।'

'কী খাবি?' শিরিষের মুখে সামান্য হাসি।

—'লুচি আলুর দম'- বাচ্চাটি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল।

আরও ছেলে-মেয়ের দল তখন অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছে। আস্তে আস্তে প্রকাশ পেলো পাড়ার বড়রা সরস্বতীপুজো করে ঠিকই, কিন্তু সকালের খিচুড়ি-লাবড়া ভোগ পর্যন্ত বাচ্চাদের অধিকার। সন্ধেবেলায় যে লুচি, আলুর দম, ফুলকপির তরকারি, পায়েস দিয়ে রাজসিক ভোগ হয় সে ভোগের কণামাত্র বাচ্চাদের কাছে পৌঁছয় না। তাই তারা এ বছর প্রতিজ্ঞা করেছে টুলুর বাড়ি কাঠের সরস্বতী আছে, তাই দিয়ে মিণ্টুর বাড়ির বাইরের ঘরে পুজো করবে, গণেশের বাবা অবসর সময়ে পুজো আচ্চা করে থাকেন, তিনিই পুজো সেরে দেবেন এবং চাঁদা তুলে সবাই লুচি আলুর দম খাবে, খাবেই।

—'কতজন আছিস তোরা?' শিরিষ নরম গলায় জিজ্ঞেস করল।

—'সতেরজন।'

—'আমার বাড়ি সরস্বতী পুজো হয়, সন্ধেবেলা তোদের নেমন্তন্ন। প্রসাদ খাবি।'

রামখেলাওনের মুখ ক্রমশই হাঁ হয়ে যাচ্ছিল।

সরসোতী পুজো ? পুজো-উজো এ কোঠিতে সে কোন দিন দেখেনি।

কিন্তু ছেলের দল এলো। প্রথমে সসঙ্কোচে, একটি দুটি করে। তারপর বেশ সপ্রতিভভাবে দলে দলে। বড় হলঘরে আসন পেতে সব্বাইকে খাওয়ালো শিরিষ। বালভোজন। সাদা সাদা লুচি, লালচে-হলুদ ফুলকপি, সাদা সবুজ আলু-মটরশুঁটি, টুকটুকে লাল চাটনি, হালকা বাদামি পায়েস। কমলাভোগ, যে যটা পারে।

বা রে বা ! সরস্বতী ঠাকুর কোথায় ? পুজো হবে না ? কাঁসর ঘণ্টা বাজবে না ? ছেলের দল হই-হই করছে। তখন ঘরে ঢুকল সত্যিকারের বাল সরস্বতী শিরিষের মেয়ে প্রসর্পিতা। সাদা সিল্কের শাড়িতে নীল পদ্ম-পাড়। হাতে তানপুরো। সে সবাইকে নিয়ে গাইবে, নাচবে। সরস্বতীর গান, লক্ষ্মীর গান, দুর্গার গান, আসলে যে যেখানে সব যশো দেহি, দ্বিষো জহি আছে সব্বাইকার গান।

এইভাবে দিন যায়। একদিকে প্রসর্পিতা গান গায়, অন্যদিকে বাগানের ফুলগুলি সব আহ্লাদ নিয়ে ফুটে ওঠে, গাছ আলো করে। প্রসর্পিতা হাসে। পাখিগুলির মধ্যে কূজনের প্রতিযোগিতা পড়ে যায়, প্রসর্পিতা নাচে তার সঙ্গে সঙ্গত করে বৈশাখ-আশ্বিনের ঝড়, আষাঢ়-ফাগুনের বিষ্টি, সহনর্তকীর ভূমিকায় নেমে পড়ে ফুলো ফুলো ব্যালের পোশাক-পরা সাদা মেঘের দল। শিরিষ প্রথমে ছোট ছেলেদের, তারপর মেয়েদের, তারপর বড় ছেলেদের, তারপর গিন্নিদের মজলিশে যায়। মজলিশের চেহারা পাল্টে যেতে থাকে। কবে যে পাল্টে গেল, কেউ বুঝতেই পারে না। খুব আশ্চর্যের বিষয়, কিন্তু একদম নির্জলা সত্যি কথা যে শিরিষদের পাড়ায় কোনও বাড়িতে দেওয়াল লিখন নেই। মিছিল যায় না। যে যার সময়মতো কাজে কম্মে যায়, বাড়ি ফিরে আসে। ছেলেমেয়ের দল প্রাণভরে খেলাধুলো করে আঁধার নামলে যে যার মতো বাড়ি যায়। আজান, গ্রন্থসাহেব আর গীতার আয়োজন যারা লাউডস্পিকারে করেছিল তারা আজকাল বড্ড ব্যস্ত। ওই যে মৌলভিসাহেব দাঁড়ি আঁচড়িয়ে, চোখে সুর্মা, কাকে কাকে যেন আজকাল আরবি পড়াচ্ছেন। বলবন্ত সিং-এর দলের এমন রমরমা সূর্য-উনুনের ব্যবসা যে তারা আর কিচ্ছুটির সময় করতে পারে না। গীতা ভাস্কর নীলমণি পণ্ডিত বাড়িতে টোল খুলেছেন। বহু জায়গা থেকে কথ্য সংস্কৃত শিখতে তাঁর কাছে লোক আসছে। সেই যে একবার নীলু পণ্ডিত সপ্তমী পুজোর শেষাশেষি বৃষ্টি আসতে দেখে বলে ফেলেছিলেন :

বৃষ্টি পততি পট পট পট
মনঃ করোতি ছট ফট ফট
ছত্রং ধরয় চট পট পট
তাত মণ্টু ডোন্ট সে নট।

সেই থেকে ছেলেদের বায়না হল নীলু পণ্ডিতকে এই সহজ সংস্কৃত শেখাতেই হবে। শিরিষের বাড়ির ঠাকুরদালানে তার ব্যবস্থা হল। শিরিষ এখন ছড়িয়ে গেছে সবখানে, সবখানে, সবখানে। সে আর সাদা একখানা খড়ির পুতুলের মতো নেই। কড়ির মতন সাদা কবেকার শঙ্খিনীমালার মুখ তার নেই। শঙ্খমালা এখন কাঞ্চনমালা হয়ে গেছে। ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর পায়ের আলপনা-ছাপ ফেলে শিরিষ এ কাজে সে কাজে নানা কাজে ঘুরে বেড়ায়। অঞ্চলটি আনন্দে গৌরবে সাফল্যে থই থই করে। তার ছটপরবের ঢোল কাঁসি, তার রঙ্গোলিবিহুর নাচ, তার বৈশাখীর আমোদ, তার লক্ষ্মীর পাঁচালি আর ভাদুর গানের মৃদু

মধুর সুর গ্রাম-গঞ্জের আবহাওয়াতে গাবগুবাগুবের মতো বাজতেই থাকে, বাজতেই থাকে।

এইসব করতে করতে শিরিষের হৃদয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে মধুর মতো গাঢ়, সেই বিষাদসিন্ধুর পরিধি ক্রমেই ছোট হতে থাকে। এক-এক দিন নিশিরাতে ঘুম ভাঙলে শিরিষ ছাতে উঠে যায়। নারকোল গাছের পেছনে একটি বাঁকা চাঁদ ঝুলে থাকে, কালচে আকাশে ফুটফুট করছে তারা। সেদিকে তার সাদা মুখের দ্যুতি তুলে ধরে শিরিষ কোন গোপন গহন অতীতের উদ্দেশে বলে ওঠে—'তুমি কোথায় আছো হে বঞ্চক, যেখানে যে স্বর্গের ময়ূরসিংহাসনেই থাকো তুমি আর আমার মনের নাগাল পাবে না। তুমি থাকো কঠিন মণিমাণিক্যময় প্রতারক স্বর্গে, আমি এই কঠিন পৃথিবী সবুজে ভরিয়ে ফেলব। সবুজ আরও সবুজ। সবুজের অগ্রভাগে স্বর্ণাভা লাগবে, সুবাস দুলবে বাতাসে, আমি যেখানে যেখানে যাবো, সেইখানে সেইখানে তোমার সোনা মরকতকে লজ্জা দিয়ে পৃথিবীর আপন হৃদয়ের সোনিমা শ্যামলিমা আমার পেছনে পেছনে যাবেই যাবে। বলে শিরিষ হাসতে থাকে। সে কোনও সশব্দ টংকারঅলা চ্যালেঞ্জের হাসি নয়। দিকদিগন্ত শান্তি ও সুষমায় ভরিয়ে তোলা সে এক অদ্ভুত অরোরা বোরিয়ালিস।

শিরিষ যখন তার মধ্যরাত্রির উদগীথ সেরে এইভাবে নেমে আসে তখন শোবার ঘরে তার হৃদয়ের কাছে চন্দ্রকান্তমণির মেয়েটি ঘুমের ঘোরে হেসে ওঠে। তার কোমল কপালে আলতো পরশ রাখে শিরিষ।

—'তুমি কী স্বপন দেখছো জাদু? তুমি কি আমার মতো ভুবনময় পঙ্কসরোবরে কমল ফোটাবার কাজটি নেবে? তোমাকে আমি শিখিয়ে দিয়ে যাবো ফুল ফোটাবার মন্ত্র। পাখি-হরিণ-কীটপতঙ্গ বশীভূত করার অখণ্ড বাঁশিটি আমি অনেক সাধনায় খুঁজে পেয়েছি, তোমার হাতে তুলে দিয়ে যাবো।

পাশ ফেরে প্রসর্পিতা। তারপরেই তার চোখের পাতার ভেতরে মণিদুটি কাঁপতে থাকে, মেয়ে ঘুমের ঘোরে ফুঁপিয়ে ওঠে। শিরিষ সন্তর্পণে মেয়ের অফোটা পদ্মের মতো বুকের ওপর থেকে হাত দুটি সরিয়ে রাখে। বুকের ওপর হাত রেখে শুলে পাথর দত্যি পিষে মারে। —'মা আমার ঘুমাও, শিয়রে জাগিয়ে রাখলাম ঘিয়ের বাতি, আমার নিঝুম দুটি চোখ, শীতল দুটি হাত রইল তোমার শিথানে। সুখে নিদা যাও মা।'

মেয়ে শিরিষের সুখ, মেয়ে শিরিষের শান্তি, মেয়ে তার আনন্দ আহ্লাদ, বিস্ময়, রোমাঞ্চ, মেয়ের ভেতর দিয়েই শিরিষ তার ভুবনখানি দেখে। প্রসর্পিতা যদি বলে—'মা আমি কেন এমন একা?' শিরিষ বলে—'আমার ঊর্ধ্ব এবং অধঃ, আকাশ এবং ভূমি, একবার মাত্র একবারই যে ঐকতানে বেজেছিল মা, এমন ঘটনা তো আর দ্বিতীয়বার ঘটে না!' প্রসর্পিতা যদি বলে, 'মা, আমার পিতা কে?' শিরিষ বলে 'তোমার পিতা পুরুষ, বীজ রোপণ ভিন্ন যার আর অন্য ভূমিকা নেই।' প্রসর্পিতা তখন বলে—'মাগো তুমিই কি আমার সব?' মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে শিরিষ বলে ওঠে—'আমি তোমার সব কি না জানি না মাগো, কিন্তু তুমি আমার সর্বস্ব।' সত্যি-সত্যি, মেয়ে হাসছে বলেই তার কোলের কাছে ভিড় করে আসা যাবতীয় শিশু বালক বালিকার হাসি শিরিষের বুকে দোলা দেয়। মেয়ে গায় বলেই, সে তার বাগান, বাগান পেরিয়ে পর-প্রতিবেশীর বাড়ির চুড়োয় দোয়েলের শিস শুনতে পায়, ফিঙের দোল দেখতে পায়, বেনে-বউ গটগটিয়ে হেঁটে গেলে ঝিলিক ঝিলিক হাসে। আর গভীর রাতে পাপিহা তীব্র করুণ স্বরে পিউ কঁহা পিউ কঁহা বলে ডেকে উঠলে কিশোরী মেয়েকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে মধ্যযৌবনের দ্রুতচ্ছন্দ

চঞ্চল হিন্দোলটি সে প্রাণপণে কল্যাণ ঠাটে এনে বাজাতে থাকে।

ওরা কেউ জানে না এই মৌজা, এই গ্রাম, এই গঞ্জ, এই উপনগর, মহানগর সব স-ব আসলে শিরিষরাই গড়েছে। কারণ গড়ে অনেকে মিলে, কিন্তু মন্ত্রটি কানে দেয় একজন-দুজন। থাকতে পারে রাজ্য, প্রয়োজনের খেয়ালে গড়ে ওঠা, কিন্তু তার বিচিত্র বেসুরে যে সঙ্গতি আনে সেই প্রকৃত রাজ্যপাল। ওরা এ ও জানে না বন্ধ্যা নিষ্ফলা কপিশ ভূমির এই যে তীব্র সবুজ স্বপন এর পেছনে আছে একটি মানুষের বিষাদের পারে পৌঁছনো গভীর মন্দ্রিত আনন্দ। ওরা এও জানে না এই আনন্দের পেছনে আছে রক্তমাংস নাক চোখ মুখের প্রাণভরা, তৃষাহরা, নয়নের মণি, বুকের কলজে এক কন্যে। শিরিষ নিজেও জানে কি ? সে যে এক দিক থেকে আরেক দিক পর্যন্ত একটা সাদা ফুরফুরে প্রজাপতির মতো উড়ে উড়ে বেড়ায়, তার পাখায় এমন বেগ, শরীরে এমন লঘিমা কে দিল, কেমন করে দিল, অতশত বিশ্লেষণে কি তার মন যায় ? সে শুধু জানে অনেক মিথ্যের ঝকমকানি তাকে এক সময়ে অন্ধকারের গহনে নিয়ে গিয়েছিল, সেই অন্ধকার সে একা একা পার হয়েছে, এখন তার চোখে মুক্তার লাবণ্যচ্ছটা। তাই সে প্রজাপতি, তার উড়ন্ত পায়ের আঙুলগুলি পরাগের রেণুতে রেণুতে রঞ্জিত হয়ে থাকে, আর সেই রঞ্জন আদিগন্ত ছড়িয়ে গিয়ে অফলা আমগাছটির শীর্ষ শাখাটি পর্যন্ত বউলে বউলে ঝমঝম করতে থাকে। আর, সবাই অতশত জানে না বলেই মানুষের ঠোঁটে ঠোঁটে নামগুলি হাটে হাটে বাটে বাটে ফেরে, যেন তারা প্রশ্বাস নিচ্ছে। নিশ্বাস ফেলছে।

সেদিন বসন্তকালের সন্ধেবেলা। মধুমাধবী সারঙের শেষ মূর্ছনার মতো গোধূলিবেলা মিলিয়ে গেল। আকাশ থেকে সাঁঝের কুয়াশা গাছগাছালির অলিতে গলিতে ঝুপঝাপ করে নেমে পড়ছে। শিরিষের বাড়িতে জগদ্দল কটা দু-ঠেঙে গাড়ি এসে থামল। কী তাদের চক্কর ! কী-ই বা তাদের গর্জন ! গাড়ির থেকে নেমে এলো এক, দো, তিন, চার, পাঁচ, ছে, রামখেলাওন গুনেছিল, মুশকো মুশকো লোক। শান্তিমণি দেখেছিল তাদের হাতে ইস্টিলের বালা, কানে রুপোর মাকড়ি, গলায় সোনার চেন, জামার খোলা বুকের ভেতর দিয়ে দলা দলা রোম দেখলে গা শিউরোয়। রামখেলাওন কবে ছেলেমানুষ আর ভিখারি তাড়াবার দারোয়ানগিরি করত, তাও সে কবেই ভুলে মেরে দিয়েছে। খইনি ডলতে ডলতে তার হাতের তালু ঝুলে পড়ল। ঘড় ঘড় করে গেট খুলে ছ জোড়া বুট সোজা অন্দরবাড়ির দিকে চলে গেল। গট গট গট গট গট গট... ।

—শীর্ষা দেবী আছেন ? শীর্ষা দেবী ?

—আপনারা কে ? এখানে শীর্ষা দেবী বলে কেউ থাকেন না।

—তাহলে শিশির দেবী, শিশিরকণা, শিশিরবালা, কিংবা শিশির মালা...

শিরিষ চুপ করে রইল।

—চট্টরাজদাকে চেনেন ? মোহিতবরণ চট্টরাজ ?

কে না চেনে ? শিরিষ চুপ করে রইল।

—মোহিদ্দা আপনাকে জানিয়েছেন এবার থেকে আপনি আমাদের নেত্রী। অভয়বিন্দু দাঁকে নেক্সট্ নির্বাচনে কাত করতে হবে।

শিরিষ গম্ভীর গলায় বলল—আমি এসব বুঝি না।

—বুঝে নেবেন। মোহিদ্দা বুঝিয়ে দেবেন।

—আমি এসব দলাদলি করি না।

—মোহিদ্দা করবেন, আপনি শুধু দাঁড়াবেন।

—আমি এসব ঘেন্না করি।

—আপনি ঘেন্না করলে কি হয়, মোহিদ্দা এসব ভালোবাসেন। অট্টহাস্য করে উঠল পাতালবাসী যুবকের দল।

—'নির্বাচন আমাদের রুজি, নির্বাচন আমাদের পুঁজি, নির্বাচনকে যে গাল দেয় আমরা তার কপালে স্টেনগান গুঁজি...।

দু পেয়ে জগদ্দলগুলো রাস্তা কাঁপিয়ে চলে গেল। নবীনমাধব তক সমস্ত মানুষ ক্রমে ক্রমে এসে ভেঙে পড়ল শিরিষের ভেতরবাড়ির আঙনে। কাঁচা-পাকা নানান গলায় শোনা গেল— শিরিষমা, শিরিষদিদি, শিরিষ বোন। না করো না মা, না করো না! মোহিতবরণ আর অভয়বিন্দু ও দুজনেই কাঁচাখেকো দেবতা। এ ছাড়লে ও ধরবে, ও ছাড়লে এ ধরবে। আর নিস্তার নেই।' যারা আরও অভিজ্ঞ, আরও বয়স্ক তারা ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়লে—'কথাটা যত সহজ সোজা শোনাচ্ছে ততটা কখনো নয়, উঁহু, এর ভেতরে কিছু গুহ্য কথা আছে, কিছু ভয়ঙ্কর কথা।'

সবাই চলে গেলে তখনও সিঁড়ির শেষ ধাপে বসে রয়েছে শিরিষ। চোয়াল দুটি কঠিন, কপালের মধ্যিখানে নীলশিরা দপদপ করছে। চুল যেন রুক্ষ ধূসরবর্ণ।

ঝড়ের আগের সময়ের মতো থমথমে দিন যায়। এক দুই তিন করে সাত দিন। শিরিষ আস্তে আস্তে আবার কাজকর্ম করছে। রামখেলাওন গেট খুলছে, গেট বন্ধ করছে। সাত দিনের দিন বাড়ি ফিরে শিরিষ দেখল, রামখেলাওন কপাল চাপড়াচ্ছে। শান্তিমণি কেঁদে কেঁদে অজ্ঞান হয়ে গেছে। মোহিতবরণের বিশাল ল্যান্ডরোভার এসে প্রসর্পিতাকে গেটের সামনে থেকে তুলে নিয়ে গেছে। শিরিষ ছুটল চট্টরাজের বাড়ি। গেটের পরে গেট, তারপরে গেট, তারপরে আরও গেট, সব তালাবন্ধ। লোকে বলল চট্টরাজদা হানিমুনে গেছেন। কোথায় কেউ জানে না। শিরিষ ছুটল থানায়, ভারপ্রাপ্ত অফিসার দেখালেন আঠার বছরের মেয়ে স্বেচ্ছায় মোহিতবরণের সঙ্গে চলে গেছে, তলায় স্বাক্ষর। শিরিষ সরোষে বলল 'এ সই জাল।' অফিসার বললেন—'স্ত্রীলোক বড় গোলমাল করে, সামনে থেকে নিয়ে যাও।' শিরিষ ছুটল অঞ্চলপ্রধানের বাড়ি, তিনি বললেন 'এ তো তোমার সৌভাগ্য মা। মেয়ে রাজরাণী হয়ে গেল।' শিরিষ গেল রাজ্যপ্রধানের বাড়ি। অনেক দিনের অনেক ধরনার পর তিনি যখন দেখা দিলেন, বললেন—'এতো বড় রাজ্য, তাতে এতো প্রদেশ, এতো মহকুমা, এতো জেলা, এতো তার কর্মযজ্ঞ, কোন পাড়াতে কোন মায়ের কোন মেয়ে উচ্ছন্নে গেল সে-ও কি তবে আমায় ব্যক্তিগতভাবে দেখতে হবে?'

মাঠের কোণের গোলাপি বাড়িটির পলেস্তারা খসে গেছে। ভাঙা গেটের ধারে টুলে বসে রামখেলাওন আর 'রাম ভজো' গান ধরে না। বাগানটি বিছুটিতে আক্রান্ত। কেউ জানে না শিরিষ কোথায়। মাঠে ছোট ছেলেমেয়েরা আর বল খেলে না, বড়রা খেলে। সন্ধে হলেই ফিসফাস, হি হি হি, হো হো হো, হিং টিং ছট। সকাল হলে রজনীগন্ধার বাসি মালা, আর খালি বোতল, চাঁটের ঠোঙা আর কাগজের পেলেট, আরও হাজারো অকথ্য নোংরা ঝাঁটাতে ঝাঁটাতে মালি খুশিমনে পকেটের পয়সা বাজায়। যখন-তখনই হাতে সাইকেলের চেন নিয়ে দু ঠেঙে গাড়িতে টহল দিয়ে বেড়ায় রাক্ষুসে যুবকের দল, যাকে হাতের কাছে পায় মেরে উচ্ছন্ন করে দেয়, রাতের আঁধারে ফ্যামিলিকে ফ্যামিলি কাদের চপারে শেষ হয়ে যায়, কেউ জানে না, খালি রক্তগঙ্গায় চুবে হু-হু করে কাঁপতে থাকে। হাটে বাজারে দোকানে রাস্তার মোড়ে বোমা ফাটে, টুকরো টুকরো হয়ে যায় বেসাতি,

দোকানঘর, কেনা-বেচা-করতে আসা মানুষজনের দল। নবীনমাধবের আজকাল পক্ষাঘাত। মেয়ে বউগুলি চোখ গোল গোল করে কেচ্ছা শোনে, কার বাড়ির ছেলে...কোন বাড়ির মেয়ে !

সে বছর বিষ্টি হল না। মাটি জ্বলে গেল, ধানগুলি সব খড়। দিগন্ত পর্যন্ত খাঁ খাঁ খোয়াইয়ের মতো লালচে মাটির দিকে তাকিয়ে রমজান মিঞা আর সুরিন্দর সিং, দুলাল হাজরা আর গোবিন্দ মাঝি হাহাকার করে কপাল চাপড়ালো। কুয়োর জল শুকিয়ে গেছে। শ্যালোয় শুধু চাগাড় মারাই সার। খালতলায় একটুখানি কাদাঘোলা। মাঠের ঈশান কোণের গাছটি এতদিন দাঁড়িয়েছিল, কেউ দেখেনি ঘুণপোকায় তার ভেতর ফোঁপরা হয়ে গেছে। সেই ফোঁপরা গাছটি হঠাৎ একদিন দড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল। আর তারপর আরম্ভ হল বিষ্টি, বিষ্টি, বিষ্টি। এক দিন দু দিন তিন দিন, তারপর দিনের পর দিন। গোঁ গোঁ শব্দ শুনে মাঝঘুমের মধ্যে একদিন চকিত হয়ে উঠে বসল মানুষগুলি, অন্ধকারে ভালো ঠাহর হয় না, তবু বোঝা যায় লক্ষ ফণা তুলে ছুটে আসছে হড়পা বান। গরু, বলদ, রাখাল, বাগাল ভাসিয়ে, মাটি খড়ের ঘর দুয়োর ফাঁসিয়ে, পাকা বাড়ির ভিত নাড়িয়ে অবশেষে ডাঙায় জলে একাকার করে সেই সর্বনেশে বন্যা সব ডুবিয়ে দিয়ে চলে গেল। থই থই করে দুলতে লাগল জল শুধু জল আর জল। এ মেরু থেকে ও মেরু পর্যন্ত। কৈলাস থেকে আরারত। সেই প্রলয়পয়োধিজলে একটি নূহর নৌকাও রইল না।


9 788172 152130